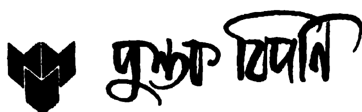
বিনয় সরকারের বৈঠকে

(বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি)

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত,
শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, শ্রীক্ষিতি মুখোপাধ্যায়,
শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল ও শ্রীমন্মথনাথ সরকারের
সঙ্গে কথোপকথন



২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

BENOY SARKARER BAITHAKE VOL–II

by Sri Haridas Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

ডিসেম্বর ১৯৪৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)

জানুয়ারি ১৯৪৪
(প্রশ্নকর্তা শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

বিষয় পৃষ্ঠা

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)

মার্চ ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

এপ্রিল ১৯৪৩

(প্রশ্নকর্তা শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

এপ্রিল ১৯৪৪

বিষয় পৃষ্ঠা

এপ্রিল ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

এপ্রিল-মে ১৯৪৪

মে ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)

জুলাই ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

বিষয় পৃষ্ঠা

আগস্ট ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

অক্টোবর ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

নবেম্বর ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

বিষয় পৃষ্ঠা

ডিসেম্বর ১৯৪৪

(প্রশ্নকর্তা শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

জানুয়ারি ১৯৪৫

(প্রশ্নকর্তা শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

মার্চ ১৯৪৫
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

এপ্রিল ১৯৪৫
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

বিনয় সরকারের বৈঠকে
দ্বিতীয় ভাগ
ডিসেম্বর ১৯৪৩

মার্ক্স্-নিষ্ঠায় বাঙালী প্রাবন্ধিক

১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—বিনয় ঘোষের আর-কোনো বই আছে?

সরকার—বিনয় ঘোষ-প্রণীত "সোভিয়েট-রুশিয়া" (১৯৪২) দুই খণ্ডে বেরিয়েছে। বেড়ে বই। সকলেরই প'ড়ে দেখা উচিত। দ্বিতীয় ভাগে ভারতের সঙ্গে রুশিয়ার তুলনায় আলোচনা আছে। এই বই দু'টায় ইংরেজি বুখ্নি ও বাক্যের অত্যাচার নাই। এইজন্য ভাল হ'য়েছে। এটা অবশ্য সাম্যবাদী সাহিত্য-সমালোচনার বই নয়। এতে কমিউনিস্ট্ দেবদেবীদের পীঠস্থানগুলা বিবৃত হ'য়েছে বস্তুনিষ্ঠভাবে।

লেখক—আপনি সেদিন ১৯৩৫ সনের উপর জোর দিলেন কেন?

সরকার—কোনো-কিছুর উপর জোর দেওয়া আমার দস্তুর নয়। তবে মনে হচ্ছে,—১৯২৫-৩৫ সনের বাঙালীর লেখা রচনাবলীতে কমিউনিস্ট জিনিষটার উপর দখল থাক্তো কম। বুঝে-না-বুঝে মাছিমারা কেরাণীর ঢঙে অনেকে ইংরেজি অথবা বাঙ্লা রচনা প্রকাশ কর্তো। সেই অবস্থা বোধ হয় ১৯৩৫ সনের সম-সম কালে কেটে গেছে। ঘটনাচক্রে এই সময়ে নয়া ভারত-শাসন-বিষয়ক আইন জারি হয়। এখনও অবশ্য তর্জমার যুগই চল্ছে। কমিউনিজমের ওপর স্বাধীন মগজ খেলাবার ক্ষমতা আস্তে-আস্তে দেখা দিচ্ছে মাত্র। সন্ধিক্ষণে দেখ্ছি "সংস্কৃতির রূপান্তর", "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ", "সমাজ ও সাহিত্য" ইত্যাদি বই। লেখকেরা সত্যিকার সাধক,—খেটে মাথা খেলিয়ে বই লিখ্ছে। একটা নতুন দর্শন পাকড়াও কর্বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্ছে। এদেরকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। সমালোচনা-ক্ষেত্রে উন্নতির যুগ,—কম্‌সে-কম বৈচিত্র্যের যুগ সুরু হ'য়েছে। বঙ্গদর্শন রকমারি মুড়োয়, রকমারি হাতে, রকমারি পথে, এগিয়ে চ'লেছে। "বাড়্তির পথে বাঙালী"। চলুক এই ধারা আরও কিছুকাল।

লেখক—আপনি কি মার্ক্সিস্ট্?

সরকার—আমি কোনো-'ইস্ট্' নই। "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" আর "ধনদৌলতের রূপান্তর" নামক তর্জমা-বই দু'টার ভূমিকায় মার্ক্স্-দর্শন সম্বন্ধে বলেছি—"বহুৎ আচ্ছা, চাই এসব। যেমন কুকুর তেমন মুগুর!" ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আবার দেখিয়েছি অদ্বৈত-নিষ্ঠ

আর্থিকতার ভুলচুক ও অসম্পূর্ণতা। সকলের সঙ্গেই আমার অমিল বেশী হয়,—যেখানে-যেখানে অর্থনৈতিক অদ্বৈতবাদের ছোঁআচ্। বিনয় ঘোষ-প্রণীত "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" আর "নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা" ইত্যাদি বইয়ের ভেতরকার অনেক মন্তব্য যুক্তিযুক্ত আর টেঁকসই,—বিশেষতঃ যে-সব অদ্বৈত-প্রভাবহীন।

("মার্ক্স্, কঁৎ, হার্ডার", ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ "প্রচার-সাহিত্য বনাম সাহিত্য-শিল্প", ২১শে জুন ১৯৪৩)

লেখক—"শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ," "সংস্কৃতির রূপান্তর" আর "সমাজ ও সাহিত্য" ইত্যাদি বইয়ের গুণ গাইছেন দেখে আমি অবাক্ হচ্ছি। গোপাল হালদার ইত্যাদি লেখকের যে-কোনো অধ্যায়েই আপনার শব্দগুলা জ্বল্-জ্বল্ কর্‌ছে। এই সব বইয়ের অনেক শব্দ ও বস্তু এবং চিন্তা তো আপনার "আর্থিক উন্নতি" মাসিকে আজ আঠার বছর ধ'রে—১৯২৬ সন হ'তে পেয়ে আস্‌ছি। সকল পাঠকই আপনার "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" বইয়ের দুই খণ্ডকে (১৯৩২) এই সকল ভাবধারার খনি বিশেষ বিবেচনা করে।

সরকার—তা হ'তে পারে। কিন্তু এই সকল প্রাবন্ধিক আমার নজরে নতুন। এদেরকে আমি নয়া বাঙলার অন্যতম চিহ্নোৎ ও সাক্ষী স্বরূপ সম্বর্ধনা কর্‌ছি। আঠার-বাইশ বছরের যে-কোনো ছেলে-মেয়ের পক্ষে এই বইগুলা পড়া উচিত।

(প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৫০-৪৫৬ দ্রষ্টব্য)

বিমল সিংহ'র "সমাজ ও সাহিত্য" বইয়ে রাবীন্দ্রিক 'কালান্তর'

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল-বেলার উপর বিমল সিংহ'র নজর বেশী বল্‌ছেন কেন?

সরকার—কথাটা বুঝ্‌তে বোধহয় ভুল হ'য়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিমল সিংহ'র একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়। বইটার ভেতর মাল আছে ঢের। বহরেও বড়।

লেখক—কী কী জিনিষ আছে?

সরকার—"সমাজ ও সাহিত্য" বইয়ে একালের ইংরেজি সাহিত্য আছে। সেকালের কালিদাস-ভবভূতি আছে। তা ছাড়া আছে সাহিত্য-জিজ্ঞাসুদের মত-সমালোচনা। এই সূত্রে ধরা দিয়েছে আরিস্ততল-ভরত-আনন্দবর্ধন হ'তে কড্‌ওয়েল-অতুল গুপ্ত পর্যন্ত হরেক রকম রস-বিশ্লেষক।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্য জুট্‌লো কোথ্‌থেকে?

সরকার—গোটা বাঙ্‌লা দেশই এসে জুটেছে। একাল-সেকালের রাষ্ট্র-কথা আছে। জমিদারি বন্দোবস্তটা বাদ যাবার নয়। আর্থিক সংখ্যার কুচোকাচা ছড়ানো আছে। তার সঙ্গে আছে চিত্র-স্থাপত্য, নাচ-গান-বাজনা। আর গদ্য-পদ্য ত আছেই। কাজেই মাইকেল-বঙ্কিম-রবি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকাল আর দুপুর দুই দিকেই নজর প'ড়েছে। অধিকন্তু আছে তার বিকাল-বেলা আর এরি লেজুড়স্বরূপ, প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ, "আধুনিক" ও "সাম্প্রতিক" বাঙ্‌লা সাহিত্য। তবে রাবীন্দ্রিক বিকাল-বেলায় আলোচনাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একে সাহিত্য-সমালোচনা অংশের কেন্দ্র বল্‌তে পারি।

লেখক—বিকাল-বেলাটার ওপর জোর প'ড়েছে বল্‌ছেন কেন?

সরকার—এইটে হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। "নবযুগের কাব্য—পূর্বভাষ" আর "নবযুগের কাব্য—রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়" অধ্যায় দুইটার আসল প্রাণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল-বেলা। বিকাল-বেলার আলো দিয়ে দুপুর ও সকাল বেলাটা দেখা হ'য়েছে। তা ছাড়া এই "আলোতে নয়ন রেখেই" পরখ করা হ'য়েছে অতি-আধুনিক বা সাম্প্রতিক বঙ্গ-সাহিত্যকে। বস্তুতঃ বইয়ের ভেতর রবিকে গুলে খাওয়া হ'য়েছে বলা চলে। যেখানেই কামড়াবি পাবি রবীন্দ্র-সাহিত্য। বইটার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে বিমল সিংহ'র মাখামাখি। কিন্তু এইখানেই আবার খানিকটা অসম্পূর্ণতাও ধরা প'ড়েছে।

লেখক—কেন? রবীন্দ্র-সাহিত্যকে নিয়ে মাখামাখিতে বিমল সিংহ'র অসম্পূর্ণতা কোথায়?

সরকার—অনেক জায়গায়ই রবীন্দ্রনাথের "কালান্তর" বইটা (১৯৩৭) লেখককে পেয়ে ব'সেছে। একমাত্র বা প্রধানতঃ রবিকে সাক্ষী ডেকে শ'দেড়েক বছরের বাঙালী জাত্‌কে চুম্‌ড়ে নেবার চেষ্টা দেখা যায়।

লেখক—তাতে দোষ কী?

সরকার—তাতে রবীন্দ্র-দর্শন বা রাবীন্দ্রিক বঙ্গ-দর্শন প্রচারিত হয়। তার কিম্মৎও ঢের। দেশ ও দুনিয়া সম্বন্ধে রবির মতামতগুলা জান্‌তে সকলেই উৎসুক।

লেখক—তাহ'লে বিমল সিংহ'র দোষ কোথায়?

সরকার—বঙ্গ-সংস্কৃতির একাল-সেকাল একমাত্র বা প্রধানতঃ রৈবিক চোখে দেখা ঠিক নয়। অরৈবিক চোখেও বঙ্গ-সংস্কৃতি আর বিশ্বশক্তিকে দেখ্‌তে পারা চাই। তা না হ'লে একচোখোমি ধরা পড়্‌তে বাধ্য। বিমল সিংহ'র বইয়ে প্রায় যেখানে-সেখানে "কালান্তর", "কালান্তর", "কালান্তর"। প্রথম বিশীর "রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ" সম্বন্ধে কী বলেছিলাম মনে আছে?

লেখক—আবার বলুন না?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি" (১৯১২), "ছিন্ন-পত্র" (১৯১২) আর "ভানুসিংহের পত্রাবলী" (১৯৩০) প্রমথ বিশীকে চেপে ধ'রেছে। তাতে রবির চোখ দিয়ে রবীন্দ্র-কাব্য দেখানো হ'য়েছে। এ একটা মস্ত দোষ। বিমল সিংহ'র কারবার ঠিক যেন সেই গোত্রের অন্তর্গত। তবে কিছু প্রভেদ আছে।

লেখক—প্রভেদ কী?

সরকার—বাঙলা দেশ, বাঙালী জাত আর বঙ্গ-সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যে-চোখে দেখেছেন, প্রধানতঃ বা একমাত্র সেই চোখে দেখা-শুনাই বিমল সিংহ বাঙালীর পাতে পরিবেষণ কর্‌তে চেষ্টিত। রবির চোখ দু'টা এমন-কোনো ছোট-খাটো চোখ নয়। কেশ বড়-বড়ই বটে। তার দাম লাখ টাকা। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে আরও অনেক চোখ ছিল ও আছে। সেই সকল চোখে কী দেখা হয়েছে বা হ'চ্ছে তার সংবাদও বঙ্গ-সংস্কৃতির লেখকদের রাখা উচিত। তাছাড়া বিমল সিংহ'র নিজের চোখও কি নাই? সেই চোখ দুটা দিয়ে যা দেখা যায় তার খানিকটা বইয়ের ভেতর পাওয়া গেছে বটে। কিন্তু নিজ চোখের দেখা-শুনাই আরও বেশী থাক্‌তে পার্‌তো। তা ঘটে নি। মনে হচ্ছে যেন রৈবিক "কালান্তর" জুটে" সমাজ ও সাহিত্য" ঝ'ল্‌সে দিয়েছে।

লেখক—"কালান্তর" বা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য মতামত কি বাঙালী জাতের ভূত-

ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে পুরাপুরি স্বীকারযোগ্য নয়?

সরকার—বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক, হরেক রকম দুনিয়া নিয়ে রবির কারবার। একটা কথা মাত্র বল্‌বো। পৃথিবীর এমন কে আছে যার সকল মন্তব্য পাঁচ-ছয় কোটি নর-নারীর শ'-দেড়েক বছরব্যাপী অতীত ও বর্তমান আর আগামী ভবিষ্যতের জন্য পুরাপুরি গ্রহণীয়? রবীন্দ্রনাথ রক্তমাংসের মানুষ তো? তিনি বঙ্গ-বিপ্লবের স্বদেশী-আন্দোলন, গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন, একালের মজুর-আন্দোলন, ষোল আনা বুঝে ছিলেন কি? আন্তর্জাতিক দুনিয়া নিয়ে তিনি মাথা খেলিয়েছেন। কিন্তু ১৯০৫ সনের পরবর্তী যুবক-বাঙ্‌লার অনুষ্ঠিত দেশী-বিদেশী কাজ-কর্ম তাঁর মাথায় কতটা ব'সেছিল? বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর ভারতকে তিনি কী চোখে দেখ্‌তেন? চীনা-জাপানী, জাপানী-মার্কিণ, বা চীনা-শ্বেতাঙ্গ সমস্যা তাঁর পক্ষে বুঝ্‌তে পারা সহজ ছিল কি? ফরাসী-জার্মাণ, মার্কিণ-বৃটিশ, জার্মাণ-রুশ বা ইংরেজ-জার্মাণ যোগা-যোগের মারপ্যাঁচ কব্‌জায় থাকা সম্ভব কি? রুশিয়ায় গিয়েও রুশ জীবনের কতটুকু তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন? বাঙালী জাতের আর অবাঙালী ভারতবাসীর ছোট-বড়-মাঝারি কয়জন প্রতিনিধির মনের কথা তিনি জান্‌তেন বা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন?

লেখক—কোনো পক্ষে আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক দুনিয়ার সব-কিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব হ'তে পারে কি?

সরকার—তাইতো বল্‌ছি। প্রত্যেক মানুষেরই সীমা আছে। চরম দশাননী বিশ-চোখো জাম্বুমানের মগজও ছয়-কোটি নর-নারীর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে অতি-সামান্যই বুঝ্‌তে পারে। কাজেই প্রধানতঃ বা একমাত্র রাবীন্দ্রিক চোখে বঙ্গ-সংস্কৃতি দেখ্‌তে গিয়ে বিমল সিংহ'র গবেষণা বেশ-কিছু অসম্পূর্ণ র'য়ে গেছে। তবে আমি রৈবিক চোখে বাঙালী জাত্‌কে আর দুনিয়াকে দেখ্‌তেও ভালবাসি। আর বিমল সিংহ'র মতন যারা রবিকে গুলে খেতে ভালবাসে তাদেরও আমি গুণগ্রাহী। "রবীন্দ্রনাথের কথা অমৃত সমান।"

স্বদেশী যুগের "বস্তি"-সাহিত্য ও "কাস্তে"-কাব্য

লেখক—বিমল সিংহ'র বইয়ের আর কোনো অসম্পূর্ণতা দেখ্‌তে পেয়েছেন?

সরকার—শুধু বিমল সিংহ কেন, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, হুমায়ুন কবির ইত্যাদি সকল "সামাজিক ব্যাখ্যাকার"ই একালের "সাম্প্রতিক সাহিত্য" ছাড়া আর কোথাও বোধ হয় বস্তুনিষ্ঠা দেখ্‌তে পান না। এই হ'চ্ছে মস্ত দোষ। "সেকালে"ও অর্থাৎ বঙ্গ-বিপ্লবের যুগেও (১৯০৫-১৪) তখনকার দিনের "সাম্প্রতিক সাহিত্য" ছিল। আর সেই সাম্প্রতিক সাহিত্যে বা "উদীয়মান" বঙ্গ-সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠার জয়-জয়কার দেখা যেতো। সমাজ-নিষ্ঠা, গরীব-নিষ্ঠা, চাষী-নিষ্ঠা, মজুর-নিষ্ঠা ছিল সেই বস্তু-নিষ্ঠার অন্তর্গত।

লেখক—তা তো কখনো শুনিনি?

সরকার—আজকাল হেমন্ত সরকার "ধাপার মাঠ"-এর গ্রন্থকার, সুরেশ চক্রবর্তী লেখেন "শ্রমিকের ছেলে" আর রবীন্দ্র মৈত্র "থার্ড ক্লাস"। তাছাড়া মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বেরোয় "পদ্মানদীর মাঝি" ও "সহরতলী" আর তারাশঙ্করকে লোকে চেনে "গণ-দেবতা"র অন্তর্গত "চণ্ডীমণ্ডপ" ও "পঞ্চগ্রাম"-এর লেখক ভাবে। কবিদের ভেতর কেউ একালে

চালায় কাস্তে আর কেউ শুঁক্‌তে অভ্যস্ত বস্তির গন্ধ। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত "সবহারাদের গান" (১৯৩০) কবিতাগুলা একালের নয়া বাঙ্‌লার প্রতিনিধি। এই সকল সাহিত্য বস্তুনিষ্ঠায় ভরপুর সন্দেহ নাই। তবে রোমান্টিক ভাবুকতার প্রভাবও যথেষ্ট। কিন্তু ১৯০৫-১৪ সনের যুগেও বস্তুনিষ্ঠ গাল্পিক আর কবি বাঙ্‌লা সাহিত্যের আসর জেঁকে ব'সেছিল। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগেও একটা বস্তি সাহিত্য ও কাস্তে-কাব্য দেখা যেতো।

লেখক—স্বদেশী যুগের বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীদের নাম কর্‌বেন?

সরকার—সত্যেন দত্ত, কুমুদ লাহিড়ী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন বাগ্‌চি, কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক,—এঁরা সবাই ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ কবি। যতীন, কালিদাস, করুণা আর কুমুদ মল্লিক বেঁচে আছেন। বেশী বুড়ো নন্‌। এঁদেরকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস্‌। বস্তুনিষ্ঠাই এঁদের একমাত্র লক্ষণ ছিল না। রোমান্টিক ভাবুকতায়ও তাঁদের মেজাজ শরীফ হতো। তাঁদের পূর্ববর্তী বিক্রমপুরের গোবিন্দদাসকে প্রধানত রোমান্টিকদের দলে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু পরবর্তী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "পল্লী-ব্যথা" নামক কবিতার বইয়ে (১৯২১) বস্তুনিষ্ঠা খুবই প্রবল। রোমান্টিকতাও আছে।

লেখক—এই সকল কবিরা বস্তুনিষ্ঠ কোন্‌ অর্থে?

সরকার—এঁদের কবিতায় চাষীর জীবন আছে। মুচি-ম্যাথরের কথা এই কাব্যে পাওয়া যায়। জেলে-গাড়োয়ানকে এঁরা চিত্ত হ'তে বয়কট করেননি। এই সাহিত্যে উত্তর-বঙ্গের পল্লী আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। পশ্চিম-বঙ্গের পল্লী, মধ্য-বঙ্গের পল্লী, মায় পূর্ববঙ্গের পল্লীও এই সাহিত্যে খুবই উজ্জ্বল রূপে দেখা যায়। এঁদের চোখে তাজমহল যেমন বর্ণনীয় বস্তু, তেমনি বর্ণনীয় ছিল পালামৌ, উজানি, পদ্মা, পঞ্চকোট, রেবা, শ্রীক্ষেত্র। পুরাণো বাড়ীঘরের বৃত্তান্তে এঁদের হৃদয়-দুয়ার খুলতো। আবার বর্তমান জীবন আঁক্‌তেও এঁরা বেশ ওস্তাদ ছিলেন। সদরই এই কবিদের একমাত্র বিষয়-বস্তু ছিল না। শহুরে মধ্যবিত্ত ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর সুখ-দুঃখ নিয়ে এঁদের কলম চ'লেছে। মজুর, শ্রমজীবী, নৈশ-বিদ্যালয় ইত্যাদির আবহাওয়া স্বদেশী যুগের উদীয়মান কাব্য-সাহিত্যে কিছু-কিছু ঠিকানা কায়েম ক'রেছিল। কাস্তে আর বস্তির দিগবিজয় সে কালেই সুরু হয়। বস্তুতঃ এই ধরণের বস্তুনিষ্ঠ কাব্য আর গল্পের স্বপক্ষে তখনকার দিনে একটা দস্তুরমতন আন্দোলন আর প্রাবন্ধিক প্রপাগাণ্ডা চালানো হতো। স্বদেশী যুগের পূর্ববর্তী গোবিন্দ দাসের "কস্তুরী", "কুঙ্কম" আর "প্রেম ও ফুল" ইত্যাদি বইয়ে বস্তুনিষ্ঠার আকার-প্রকার নেহাৎ নগণ্য। অপর দিকে স্বদেশী যুগের করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "শতনরী" বইয়ের (১৯৩১) কবিতাগুলা রোমান্টিকতাময় বস্তুনিষ্ঠায় ভরপুর।

সমাজ-নিষ্ঠার আন্দোলন

লেখক—স্বদেশী যুগেও বস্তুনিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ সাহিত্যের দরদ সমালোচক-মহলে দেখা যেতো?

সরকার—বেশীদূর যাবার দরকার নাই। এই অধমের সম্পাদিত "গৃহস্থ" পত্রিকায় (১৯১১-১৫) বস্তুনিষ্ঠ, পল্লীনিষ্ঠ, দরিদ্রনিষ্ঠ সাহিত্যের স্বপক্ষে আন্দোলন চ'লেছিল। "মফঃস্বলের বাণী" নামে পত্রিকার একটা অধ্যায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হ'তো। তাতে

শহরের বহির্ভূত—বিশেষতঃ কলকাতার বাইরের—বাঙলা দেশকে বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়েদের ভেতর সুপ্রতিষ্ঠিত করা হ'তো। তা ছাড়া নিরক্ষর পল্লী-কবিদের লেখা গান সব্য-ভব্যদের পাতে পরিবেষণ করার ব্যবস্থা ছিল।

লেখক—বস্তুনিষ্ঠার আর কোনো প্রচারক ছিল?

সরকার—বস্তুনিষ্ঠ গল্প ও কবিতার দরদী ছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। "উপাসনা" মাসিকের ভার ছিল তাঁর হাতে (১৯১৩-১৮)। "উপাসনা"য় জোরসে প্রচার চল্‌তো সমাজনিষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির স্বপক্ষে। এই ছিল তার সাহিত্য-সমালোচনার ধুআ। 'গৃহস্থ'কে সেকালে 'উপাসনা'র বড়্‌দা বল্‌তো। রাধাকমলের "পল্লীসেবক" প্রবন্ধ বেরোয় "গৃহস্থ" পত্রিকায় (১৯১৩)। তার ভেতর টুঁড়তে হবে একালের কাস্তে-বস্তির মাহাত্ম্য-কীর্তন। ১৯১৫-১৬ সনে প্রমথ চৌধুরী আর রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে বেরোয় "সবুজ পত্র" মাসিক। বস্তু-নিরপেক্ষ সাহিত্যের ইজ্জদরক্ষা ছিল তার "মুদ্দা"। "সবুজপত্র"-প্রচারিত আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই চল্‌তো "উপাসনা"র বস্তুনিষ্ঠা আর সমাজনিষ্ঠার। এই সূত্রে "প্রবাসী"র সঙ্গেও "উপাসনা" দু-একবার ঠোকাঠুকি ক'রেছে। "প্রবাসী"র সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন গাল্পিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই লড়াইয়ের কিঞ্চিৎ-কিছু আমি বিদেশে ব'সে দেখ্‌তাম। তবে লড়াইটা আমার পছন্দসই ছিল না। কেননা আমি বস্তু-নিরপেক্ষ সাহিত্যেরও বেপারী,—এমন সাহিত্য যদি কোথাও কখনো থাকে।

লেখক—আপনার বিচারে তাহ'লে বস্তি-সাহিত্য আর কাস্তে-কাব্য মার্ক্‌সিস্ট্‌ সাম্যবাদী বাঙালীদের নয়া আবিষ্কার নয়?

সরকার—ঠিক কথা। "গৃহস্থ"ও মার্ক্‌স-পন্থী বা অন্য কোনো পন্থী সোশ্যালিস্ট্‌ ছিল না। "উপাসনা"র অবস্থাও সেইরূপ। এই অধমের "স্বদেশ-সেবক" প্রবন্ধ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর "নব্যভারত" মাসিকে বেরিয়েছিল ১৯০৭ সনে। তাতেই ছিল মফঃস্বলের মাহাত্ম্য, পল্লীসেবার দরদ, নিরক্ষরের অধিকার, গরীবের আত্মপ্রতিষ্ঠা, গণ-নিষ্ঠার গৌরব-প্রচার। দেশের বা সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী, জাত, সঙ্ঘ বা দলকে পাকা-পোক্ত ও মজবুদ ক'রে তোলা ছিল সে-যুগের আকাঙ্ক্ষা।

লেখক—স্বদেশী যুগের সমাজনিষ্ঠা তাহ'লে কী?

সরকার—সে ছিল স্বজাতি-নিষ্ঠা, স্বদেশ-প্রেম, বা জাতীয়তার অন্যতম রূপ। জাতীয় শক্তি ও ঐক্য গঠন ছিল আসল উদ্দেশ্য। তখন শ্রেণী-চেতনা, শ্রেণী-বিবাদ, শ্রেণী-লড়াই মাথা খাড়া করে নি। সেই দর্শনে ক্রমশঃ এসে যোগ দেয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র "দরিদ্র নারায়ণ"-পূজা। সমাজ-সেবা দাঁড়িয়ে যায় একটা দর্শন বা ধর্মরূপে (১৯১০-১৪)। এই আবহাওয়ার সঙ্গে সমাজনিষ্ঠার কবিতা ও গল্প সুজড়িত। ১৯১৪ সনে,—বিদেশ-যাত্রার পূর্বেই—মালদহের কলিগ্রাম হ'তে "গম্ভীরা" পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করি। তাও এই সমাজনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠার আন্দোলনের অন্তর্গত। ভার ছিল কৃষ্ণচরণ সরকারের হাতে।

(প্রথম ভাগ, ২৪৭-২৫৫ দ্রষ্টব্য)

লেখক—"গম্ভীরা"র উদ্দেশ্য কী ছিল?

সরকার—এই পত্রিকার অন্যতম ধান্ধা ছিল ঝালে-ঝোলে-অম্বলে পল্লী-নিষ্ঠার, চাষী-নিষ্ঠার, গরীব-নিষ্ঠার প্রচার করা। নগেন চৌধুরী আর কুমুদ লাহিড়ী ছিলেন এই পত্রিকার বস্তুনিষ্ঠ কবি। "আদ্যের গম্ভীরা"-লেখক হরিদাস পালিত ছিলেন পল্লী-নিষ্ঠার ঐতিহাসিক ও সমাজ-শাস্ত্রী আর সমাজনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চণ্ডীদাস-গবেষক

মণীন্দ্র বসু "গম্ভীরা'র গোআলে হরিদাস পালিত, কুমুদ লাহিড়ী, নগেন চৌধুরী ইত্যাদি পল্লী-সেবকদের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ পুঁথি-বিশ্লেষণ ও সাহিত্য-সেবায় হাত মক্‌স ক'রেছিলেন। "গম্ভীরা"র পল্লী-সেবা, সাহিত্য-সেবা, আর সমাজ-সেবা চালানো হ'তো মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির তদ্‌বিরে। এই তদ্‌বিরে কলিগ্রামে একটা সাহিত্য-সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অমূল্য বিদ্যাভূষণ তার সভাপতি হ'য়েছিলেন। সাহিত্যবন্ধু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতও হাজির ছিলেন। তাতে হরিশ্চন্দ্রপুরের (মালদহ) পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক। একালে "সামাজিক ব্যাখ্যা"র স্বপক্ষে যে-সকল সাহিত্য-সমালোচক ঝুঁক্‌তে চান, তাঁদের পক্ষে অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে "গৃহস্থ", "উপাসনা" আর গম্ভীরা"র আব্‌হাওয়াটা খতিয়ে দেখা আবশ্যক হবে।

"গৃহস্থ"-উপাসনা"-"গম্ভীরা"র আবহাওয়া

লেখক—"গৃহস্থ", "উপাসনা" আর গম্ভীরা"র আবহাওয়া কী?

সরকার—"গৃহস্থ" কল্‌কাতায় প্রকাশিত। কিন্তু নজর তার মফঃস্বলের দিকে। অন্য পত্রিকাদু'টার বাড়ী মফঃস্বলে। "উপাসনা" বেরুতো মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ছিলেন মুরুব্বি। আর "গম্ভীরা" মালদহের কলিগ্রামে। এই তিনের সমবেত লক্ষ্য ছিল অজ্ঞাত-কুলশীলকে ঠেলে তোলা, অপরিচিতকে পরিচিত করানো, মফঃস্বলকে কল্‌কাতায় জাহির করা। "জনসাধারণের বাণী", "জনসাধারণের যুগ", "ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ-লক্ষ নরনারীর স্বার্থ"—ইত্যাদি বুখ্‌নি এই অধমের মুখে লেগেই থাক্‌তো। পল্লী, চাষী, মজুর, নিরক্ষর, কুটির-শিল্প, লোক-সাহিত্য, লোক-নৃত্য ইত্যাদি বস্তু নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মাথা-ঘামানো ছিল এই তিন পত্রিকার ধান্ধা। অন্য-কোনো পত্রিকার এই সব বালাই ছিল না। তারা চালাতো ব্যবসা। "গৃহস্থ", "উপাসনা", "গম্ভীরা" চালাতো প্রচার। শিক্ষা-প্রচার, সাহিত্য-প্রচার, শিল্প-প্রচার আর সেবা-প্রচার,—এই সব ছিল স্বদেশ-সেবার অন্তর্গত ' রাধাকমলকে জিজ্ঞাসা করিস্‌। ১৯১০-১৪ সনের আবহাওয়াটা বাৎলাতে পারবে।

১৯৪৩ সনের তুলনায় সে-যুগের সমাজনিষ্ঠা, চাষী-নিষ্ঠা, আর মজুর-নিষ্ঠা নেহাৎ আদিম বলাই বাহুল্য। তবে অন্যান্য অনেক জিনিষের মতন এই সবেরও সূত্রপাত স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৪)—এইটুকু জেনে রাখা ভাল।

লেখক—"স্বদেশ-সেবক", "পল্লী-সেবক" ইত্যাদি প্রবন্ধ কোনো বইয়ের ভেতর পাওয়া যায় কি? "গৃহস্থ", "উপাসনা" ও "গম্ভীরা" পত্রিকার "জনসাধারণ-নিষ্ঠা', দরিদ্রনিষ্ঠা, সমাজনিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক রচনাবলী সহজে পেতে পারি কোথায়?

সরকার—হরিদাস পালিত প্রণীত "আদ্যের গম্ভীরা "(১৯১২) বইটার নাম আগে ক'রেছি। তাতে লোক-সাহিত্য, লোক-শিল্প, লোক-নৃত্য ইত্যাদির গবেষণা ও প্রচার আছে। তা'ছাড়া দেখতে পারিস্‌ আমার "সাধনা" (১৯১২) ও "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪)। রাধাকমলের প্রণীত "দরিদ্রের ক্রন্দন" (১৯১৫) বইটার প্রবন্ধগুলা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। এই চারটা রচনায় অন্যান্য অনেক জিনিষও আছে বলা বাহুল্য।

রাবীন্দ্রিক "চিত্রা"-"চৈতালী"র সমাজনিষ্ঠা

লেখক—আপনি কবি ও গল্প-লেখকদেরকে দশ-বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ইতিহাস মনে রাখ্‌তে পরামর্শ দেন?

সরকার—সম্প্রতি কবি ও গাল্পিকদের কথা বল্‌ছি না। বল্‌ছি সাহিত্য-সমালোচকদের কথা। তাঁদের পক্ষে বিশেষতঃ "সামাজিক ব্যাখ্যাকার" ও মার্ক্‌স্-পন্থী সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী সমালোচকদের পক্ষে ইতিহাস মহা জরুরি। স্বদেশীযুগের বঙ্গসাহিত্যে বস্তু-নিষ্ঠ, পল্লীনিষ্ঠ, দরিদ্রনিষ্ঠ আর সমাজনিষ্ঠ সৃষ্টি তো ছিলই। এমন কি তার দশ বৎসর পূর্বেকার বাঙলা সাহিত্যেও (১৮৯৪-১৯০৪) সমাজ-সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিকদের নজর সেই দিকে থাকা উচিত।

লেখক—কোন্ লেখকের রচনায় সমাজ-চেতনা পাওয়া যায়?

সরকার—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই বস্তুনিষ্ঠ সংসার-নিষ্ঠ কাব্যের স্রষ্টা হিসাবে পাক্‌ড়াও করা সম্ভব। তাঁর "চিত্রা" প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সনে। তার অন্যতম বাণী নিম্নরূপ ঃ—

"এই সব মূক ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।"

এই মন্তরের আর ডাক-হাঁকের প্রভাব ছিল স্বদেশী যুগের যুবক বাঙলার উপর জবরদস্ত।

লেখক—আমার মনে হচ্ছে যেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই দিকটা আজকালকার ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জানেই না।

সরকার—এই বাণী সেকালের লিখিয়ে-পড়িয়ে কোন্ বাঙালী না শুনেছে? "বস্তি"-সাহিত্য আর "কাস্তে"-কাব্য রাবীন্দ্রিক দুনিয়ার বহির্ভূত নয়। আবার শোন্—

"বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষ-পট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি
একবার নিয়ে এসে স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।"

লেখক—অতি-সুন্দর, অতি-সরস। এ যে আসল সোশ্যালিজ্‌ম্?

সরকার—এই সুর সেকালের মার্কিণ কবি হুইট্‌ম্যানের চৌআড় ভাষায় চৌআড় ছন্দে গাওয়া হ'তো। সুললিত বঙ্গ-ভাষায় রবির কাছে পেয়েছে সেই সুর বাঙালী জাত্। বস্তুনিষ্ঠায়, সমাজ-নিষ্ঠার, দরিদ্র-নিষ্ঠায় এই রাবীন্দ্রিক আহ্বানকে পেরিয়ে যাওয়া সহজ নয়। একালের সাম্যবাদীরাও ডাক-হাঁকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই কয় টুক্‌রাকে আজ পর্যন্ত হারাতে পেরেছে কি না সন্দেহ।

"চৈতালী"র কবিতাবলীতেও রাবীন্দ্রিক সুর জবরদস্ত বস্তুনিষ্ঠ, সমাজনিষ্ঠ ও দরিদ্রনিষ্ঠ। এই বইটাও ১৮৯৬ সনের মাল।

রকমারি "সামাজিক ব্যাখ্যা"

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—সাহিত্য-সমালোচনায় সামাজিক ব্যাখ্যা বাঙলা দেশে আগে ছিল কি?

সরকার—ছিল। সামাজিক ব্যাখ্যা একদম নতুন নয়। সাহিত্য-সমালোচনা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত।

লেখক—কী কী দুই শ্রেণী?

সরকার—প্রধানতঃ শিল্পবিষয়ক। কাব্য-নাট্য-গল্পের ভিতরকার ঘটনা-বিশ্লেষণ, অবস্থা-বিশ্লেষণ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ এই শিল্পবিষয়ক বিশ্লেষণের অন্তর্গত। লেখকের সৃষ্টিশক্তি, সৃষ্টি-কৌশল, সৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির আলোচনা ইহার ভিতর পড়ে। সমালোচনার দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে সাহিত্যের আলোচিত বস্তু-সম্বন্ধীয়,—সামাজিক ব্যাখ্যা-বিষয়ক। প্রায় প্রত্যেক সমালোচক এই দুই তরফ হ'তেই সাহিত্যের সমালোচনা ক'রে থাকে। কোনো তরফ হ'তে বেশী. কোনো তরফ হ'তে কিছু-কম বিশ্লেষণ সমালোচক-মাত্রের দস্তুর।

লেখক—বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, বিমল সিংহ ইত্যাদি সমালোচকদের বিশ্লেষণগুলা কোন্ শ্রেণীর?

সরকার—এই সমালোচকদের বিশ্লেষণে শিল্প-বিশ্লেষণ প্রায় বাদ গেছে। বস্তু-বিশ্লেষণ বা বিষয়-বিশ্লেষণ ছাড়া আর কোনো দিকে এঁদের নজর নেই। বলা যেতে পারে যে, এঁরা প্রায় কট্টর ভাবে সামাজিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তাও দোষের নয়—যদি নির্ভুলভাবে চালানো যায়।

লেখক—আপনি কি বলতে চান যে, এই ধরণের সামাজিক বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী বাঙালী সমালোচকদের রচনায় পাওয়া যায়?

সরকার—হাঁ। তবে সামাজিক ব্যাখ্যা-প্রণালী রকমারি। সামাজিক বিশ্লেষণ জিনিষটা নানা ঢঙের জিনিষ। এই লেখকদের হাতে সামাজিক বিশ্লেষণ প্রধানতঃ দাঁড়াচ্ছে আর্থিক জীবনের বিশ্লেষণ। তার ভেতরও আবার প্রধান ঠাঁই পায় শ্রেণী-চেতনার বিশ্লেষণ। শ্রেণী-সংগ্রামের বিশ্লেষণ হচ্ছে এই সামাজিক ব্যাখ্যার যথার্থ মূর্তি। এই সমালোচনার আসল পারিভাষিক হ'চ্ছে মধ্যবিত্ত বনাম মজুর,—ধনী বনাম গরীব, বুর্জোআ বনাম প্রোলেটারিয়াট্।

লেখক—সামাজিক ব্যাখ্যার আর কোন্-কোন্ রীতি বা শ্রেণী থাকা সম্ভব?

সরকার—সমাজ সম্বন্ধে যে-সকল সমালোচক সচেতন তাদের কেহ-কেহ আর্থিক বিশ্লেষণ একদম আনাড়ি হ'তেও পারে। তারা হয়ত প্রধানতঃ বা একমাত্র ধর্ম-বিশ্লেষণে মশ্‌গুল।

লেখক—সাহিত্য-সমালোচনায় ধর্ম-বিশ্লেষণ সম্ভব কি?

সরকার—আলবৎ সম্ভব, খুবই সম্ভব। দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইটা কী? এই বইয়ের সামাজিক ব্যাখ্যা জবরদস্ত। দীনেশ সেন সমাজ-সচেতন চূড়ান্তভাবে। কিন্তু তাঁর মুখে মধ্যবিত্ত-মজুর ইত্যাদি বিষয়ক দ্বন্দ্ব নাই। তাঁর পারিভাষিক হচ্ছে বৈদিক, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ইত্যাদি। দীনেশের দ্বন্দ্বগুলা কালী বনাম কৃষ্ণ অথবা ঐ-ধরণের কিছু। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভাষা শাস্ত্রী আর সাহিত্যশাস্ত্রীরা সেকালে মোটের উপর সামাজিক ব্যাখ্যার অন্তর্গত ধর্ম-বিশ্লেষণই চালিয়ে গেছেন। নগেন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর, দীনেশ সেন তাঁদের অন্যতম। আজকাল বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্য যুগ যুগ যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের

সমাজ-চেতনার অধিকাংশই সাহিত্যের উপর ধর্ম-প্রভাবের বিশ্লেষণে মূর্তি পায়।

লেখক—সাহিত্য-সমালোচনায় সমাজ-চেতনার আর কোনো মূর্তি থাক্‌তে পারে? বাঙলা দেশে তার কোনো দৃষ্টান্ত আছে?

সরকার—স্বদেশী-বনাম-বিদেশী দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণও সামাজিক ব্যাখ্যাব অন্তর্গত। সমাজ-সচেতন সাহিত্য-সমালোচকেরা কখনো বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ ক'রে থাকেন। হেমেন দাশগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন ইত্যাদি সমালোচকেরা এই শ্রেণীর লেখক। তাঁদের অনেকে আবার বিদেশী প্রভাব পছন্দ করেন না। তাঁরা স্বাদেশিকতার চাঁই। কেহ-কেহ বা বিদেশী সাংস্কৃতিক মাল আমদানির পক্ষপাতী। যাহ'ক দুই দলকেই সামাজিক ব্যাখ্যার প্রতিনিধি বল্‌তে হবে। প্রাচ্যামির পাঁড় যারা তারাও সমাজ-সচেতন, আবার পাশ্চাত্যামি যাঁদের পছন্দসই তাঁদেরও সমাজ-চেতনা কম নয়। সকলেই হয়ত প্রবন্ধ বা বইয়ের লেখক নয়। কিন্তু সাহিত্য উপভোগ কর্‌বার বেলায় অনেকেরই প্রাচ্যামি আর পাশ্চাত্যামি বেরিয়ে পড়ে।

লেখক—কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙলা দেশে চ'লেছিল ইংরেজি-পন্থী আর সংস্কৃত-পন্থী শিক্ষা-বিধানের লড়াই। সেই লড়াইয়ের চৌহদ্দি একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি সব-কিছুই সেই দ্বন্দ্বের অন্তর্গত ছিল। বুঝ্‌তে হবে যে, সে-যুগে সামাজিক ব্যাখ্যার প্রতিনিধি ছিল লিখিয়ে-পড়িয়ে প্রায় সব লোকই।

লেখক—তার পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে একথা বলা চলে কি?

সরকার—স্বদেশী বনাম বিদেশীর সেকেলে গড়ন ছিল সংস্কৃত বনাম ইংরেজি অথবা হিন্দু বনাম খৃষ্টিয়ান। পরবর্তী যুগে তার গড়ন হলো অন্যরূপ। ভারতীয় বনাম অ-ভারতীয় অথবা প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য,—এই ছিল মোটের উপর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধের সমাজ-দর্শন বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাহিত্য ও শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যায় এই দ্বন্দ্বটা ফুটে উঠ্‌তো। সত্যি কথা, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আর দ্বিতীয় অর্দ্ধে আসল ফারাক একপ্রকার নাই বলা চলে। প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য এই হলো গোটা শতাব্দীর আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক লড়াই। তা আজও বেশ-কিছু চল্‌ছে।

লেখক—দ্বিতীয় অর্দ্ধের দৃষ্টান্ত কী কী?

সরকার—বোধহয় বাঙলা সাহিত্যের প্রত্যেক প্রবন্ধ-লেখক অল্প বিস্তর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য লড়াইয়ের সিপাই বা সেনাপতি। বঙ্কিম হ'তে রবীন্দ্রনাথ,—কোনো প্রাবন্ধিক বাদ পড়ে না। বিবেকানন্দ'র একটা বক্তৃতা-বইয়ের নাম "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"। এই নামের প্রবন্ধ রবীন্দ্র সাহিত্যেও আছে একাধিক। "হিন্দুত্ব"-ও "ত্রিধারা"-লেখক চন্দ্রনাথ বসু এই দ্বন্দ্বের জবরদস্ত সেনাপতি। ব্রজেন শীলও তাই। কাকে ছেড়ে কার কথা বলি? হীরেন্দ্রনাথ আর রামেন্দ্রসুন্দরকে বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে—বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এইরূপই দেখেছি। লেখকে-লেখকে প্রাচ্যামির ডোজ হিসাবে তফাৎ ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব-বিষয়ক সামাজিক ব্যাখ্যা বঙ্কিমোত্তর সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অতি স্পষ্ট। মায় এই অধমের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" (১৯১৩-১৪) বইটায় ভারতের "বাণী" হচ্ছে প্রাচ্যামির জয়স্তম্ভ।

লেখক—সাহিত্য-সমালোচনায় সামাজিক ব্যাখ্যার আর কোনো শ্রেণী আছে?

সরকার—অনেক সমালোচক নীতি-পন্থী। তাঁরা সাহিত্যের ভেতর সুনীতি-কুনীতির দ্বন্দ্ব দেখ্‌তে পান। নীতিবাগীশরা নিজ নীতি অনুসারে সাহিত্যের যাচাই কর্‌তে অভ্যস্ত। প্রাচ্যামির

ধুরন্ধরেরা অ-প্রাচ্য সব-কিছু জুতিয়ে থাকেন। ঠিক সেইরূপই নীতিবাগীশেরা যথাসময়ে বঙ্কিমকে জুতিয়েছেন ; রবিকে জুতিয়েছেন ; শরৎকে জুতিয়েছেন ; আর একালের আধুনিক বা সাম্প্রতিকদেরকেও জুতিয়ে চ'লেছেন। সুনীতি-কুনীতির কোনো দিকে আমি সায় দিচ্ছি না। বলছি শুধু এই যে, যারা নীতির কষ্টিপাথরে সাহিত্য ও শিল্প ঘ'ষে দেখেন তাঁরাও সমাজ-সচেতন সমালোচক। ব'লে যাচ্ছি সর্বদাই যে,—সামাজিক ব্যাখ্যা হচ্ছে রকমারি।

লেখক—সামাজিক ব্যাখ্যার আর-কোনো ধরণ-ধারণ দেখাতে পারেন?

সরকার—সাহিত্যের ও শিল্পের রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যাও আছে। ১৯০৫ সনের পরবর্তী বিশ বছরের ভেতর সাহিত্য-ও শিল্প-সমালোচনার এই গড়ন দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। অন্যতম সাক্ষী "গৃহস্থ" পত্রিকা। "প্রবাসী"ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

লেখক—"সবুজপত্র" সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—একটা কথা ব'লে রাখ্‌ছি। আমি "সবুজপত্র"'র সমাজ-নিরপেক্ষ শিল্প ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম না। কেন না এই অধম "শিল্প-স্বরাজে"র পক্ষপাতী। সাহিত্যের স্বরাজ আমি পছন্দ করি। "শিল্পের খাতিরে শিল্প" আমার প্রাণের কথা। অথচ শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাখ্যাও আমি চালাতে অভ্যস্ত। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতন সাহিত্য-সমালোচনায়ও আমি বহুত্বনিষ্ঠ।

লেখক—আপনি কয়েকবার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নাম ক'রেছেন। কেন বুঝ্‌তে পারছি না?

সরকার—১৯১১-২০ সনের দশক সম্বন্ধে রাধাকমলকে বঙ্গ-সমাজ ও বঙ্গ-সংস্কৃতির ঘটনাবলী উপলক্ষ্যে সাক্ষী ডাকা ভালো। পল্লীসেবা, সমাজসেবা, কুটির-শিল্প, সমবায়ের চাষী-সমিতি ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে সে সুজড়িত ছিল। সাহিত্য-সমালোচনার সামাজিক ব্যাখ্যা ছিল তার অন্যতম ধান্ধা। সেকালের সমাজ-সচেতন কবি ও সমালোচক সম্বন্ধে তার মন্তব্য পাওয়া যাবে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের "পল্লী-ব্যথা" নামক কাব্য-গ্রন্থের (১৯২১) ভূমিকায়। ভূমিকাটা লিখেছিল রাধাকমল। সাবিত্রীর কবিতাগুলা সরসভাবে সমাজ-সচেতন।

গোপাল হালদার ও বিনয় ঘোষ

সুবোধ—"সংস্কৃতির রূপান্তর" বইয়ের প্রশংসা ক'র্‌ছেন কেন? গোপাল হালদারের বিশেষত্ব কী?

সরকার—প্রথম কথা লেখক বইয়ের শ'-আড়াই পৃষ্ঠার ভেতর পৃষ্ঠা পঞ্চাশকেই দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের ধারাগুলা দেখতে। বিজ্ঞানসমূহের সামাজিক কিস্মৎ বুঝবার জন্য এমন দরদ বেশী বাঙালী লেখকের রচনায় দেখি নি। সেকালে রকমারি বিজ্ঞানের সঙ্গে আত্মীয়তা কায়েম কর্‌তে বেশ একটু মেহনৎ ক'রেছিলাম। এই জন্য রচনাটার দিকে সহজেই নজর গেল। বিজ্ঞানবিষয়ক অধ্যায়টা যে-কোনো বয়সের যে-কোনো পেশার যে-কোনো বাঙালীর প'ড়ে দেখা উচিত।

লেখক—আর কোনো কারণ আছে?

সরকার—নৃতত্ত্বের মশলা "নিয়ে ইতিহাস-চর্চার কায়দা দেখিয়েছেন লেখক। এই কায়দা আজও বাঙালী গবেষক মহলে সুপ্রচলিত নয়। নৃতত্ত্ব আমার অতিপ্রিয় বিদ্যা এই জন্য যে-

লেখকের রচনায় এর ছোঁআচ দেখি সেই লেখকের দিকে আমার দুর্বলতা ঢ'লে পড়ে। নৃতত্ত্ব পেটে না পড়লে বাঙালী ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক লেখকদের রক্ত সাফ্ হবে না। অনেকদিন ধ'রে এইরূপ ব'কে আস্‌ছি। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" বইয়ে নৃতাত্ত্বিক মাল আছে। গোপালের হাতে বইটার সদ্ব্যবহারও হয়েছে।

লেখক—আর কিছু বল্‌তে চান?

সরকার—অতিবৃদ্ধ মান্ধাতার যুগ হ'তে ১৯৪০ সন পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের ধারাটা লেখক আর্থিক ব্যাখ্যার কাঠামোর ভেতর ফেলেছেন। হাজার দশেক বছরের ওপর মার্ক্‌স্‌পন্থী অর্থনৈতিক যুক্তি খাটাবার সুচিন্তিত প্রয়াস যে-কোনো পাঠকের চোখ টেনে নিতে বাধ্য। আলোচনা বহরে বড়ও বটে। কিন্তু ব্যাখ্যাটা নিখুঁত নয়। যুক্তির ভেতর ফাঁক আছে। সে-সব হচ্ছে অদ্বৈত মার্ক্‌স্‌-নিষ্ঠার দুর্বলতা। তা সত্ত্বেও সকলেই ভারতীয় (বঙ্গীয় সমেত) তথ্যগুলাকে নতুন গড়নে আর নতুন পোষাকে দেখবার সুযোগ পাচ্ছে। এতে পাঠক মাত্রেরই লাভ ছাড়া লোকসান নাই। ইতিহাস-সেবকেরা নয়া গবেষণা-প্রণালীর সোআদ চাখ্‌তে পারবেন।

লেখক—রচনা-কৌশল কেমন?

সরকার—সংস্কৃত শব্দ বেশী। কিন্তু বাক্যগুলা ছোট-ছোট। সবই সহজ-সরল, পরিষ্কার-ঝর্ঝরে। আলোচনাগুলা চমৎকার। চিন্তায় গোঁজামিল নাই। তবে যেখানে-সেখানে ইংরেজি শব্দের অত্যাচার, মায় ইংরেজি হরফেরও উৎপাত। এতটা ভাষা-গোলামি এ যুগে আর চলে না। ভাবের গোলামি তো আছেই। তা অবশ্য পুরাপুরি বন্ধ করা এখনো বহুকাল অনেকটা অসম্ভব। বিদেশী মাল হজম ক'র্‌তেই হবে। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে যথাসম্ভব ষোল আনা স্বরাজী হওয়া চাই।

লেখক—রচনা-কৌশলে গোপাল হালদার আর বিনয় ঘোষ একরূপ কি?

সরকার—না। গোপাল হালদারেব বাক্যসমূহ জটিল নয়। বিনয় ঘোষের গাঁথ্‌নিগুলা, জটিলতাপূর্ণ। দুইয়ের রচনাই শাঁশাল। কিন্তু জোরাল বেশী 'সংস্কৃতির রূপান্তর" বাক্য-সাজানোর গুণে।

লেখক—এঁদের প্রভাব কিরূপ হবে মনে হচ্ছে?

সরকার—সাহিত্য ও সমালোচনার কথা বেশী আছে বিনয় ঘোষের বইয়ে। গোপাল হালদারের রচনায় আলোচিত হ'য়েছে সমাজ, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি বস্তু প্রধান ভাবে। কিন্তু এই দুই লেখকই বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে দাগ রেখে যেতে বাধ্য। বঙ্গীয় চিন্তা জগতে নয়া যুগের মোড় ফিরেছে। অন্যতম সাক্ষী এই দুই লেখক। এই দুয়ের দৌলতে বাঙলার সাহিত্য-সংসার বিশ্বশক্তিকে সদ্‌ব্যবহার কর্‌বার কাজে প্রকাণ্ড আরেক ধাপ এগিয়ে গেল।

মার্ক্‌সিস্ট্‌ সাহিত্য-সমালোচনার গলদ

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—আজও আপনি মার্ক্‌স্‌-পন্থী অদ্বৈত আর্থিকতার স্বপক্ষে নন?

সরকার—না সেকালেও ছিলাম না, আজও নই। অদ্বৈত আর্থিকতার গলদ সহজেই ধরা

যায়। কেননা শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত সব সময়ে জুটানো কঠিন।

লেখক—বিনয় ঘোষ ইত্যাদি লেখকদের বই থেকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

সরকার—শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ", "সংস্কৃতির রূপান্তর" আর "সমাজ ও সাহিত্য" বইগুলার যে-কোনো অধ্যায় খুল্‌লেই শ্রেণীসংগ্রাম মাফিক সাহিত্য-সমালোচনার অসম্পূর্ণতা পাকড়াও করা যাবে।

লেখক—তবুও দু-একটা বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণ দিন না?

সরকার—"বুর্জোআ", মধ্যবিত্ত, ধনিক ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে কোনো লেখকই নিক্তির ওজন রক্ষা কর্‌তে পারেন নি। রক্ষা করা সহজ নয়; তা'ছাড়া সমাজের, সংস্কৃতির আর শিল্প-সাহিত্যের যুগ-বিভাগ চালানো অতিমাত্রায় জটিল কাজ। কোনো যুগের উৎপত্তির মুহূর্তটা বুঝানো কঠিন। যুগের বিকাশ কখন হ'লো, তা অনেক সময়েই স্পষ্ট নয় আর যুগের লয় বা ক্ষয় বা অবক্ষয় কী চিজ তা বুঝাতে গিয়েও সমালোচককে গলদঘর্ম হ'তে হয়। "কালান্তর", "রূপান্তর", "পালাবদল", "হাওয়া-বদল" ইত্যাদি মাল শেষ পর্যন্ত শব্দের খেলায় দাঁড়িয়ে যায়। বস্তুতঃ এই তিন লেখকের বইগুলাতে আগাগোড়া শব্দের খেলাই অনেক সময় মালুম হবে।

লেখক—দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—অন্যতম নজির চিত্তাকর্ষক। বিনয় ঘোষের কষ্টিপাথরে যে-কবি নকড়া-ছকড়া, বিমল সিংহ'র বিচারে সে হয় ত নবযুগের নিদর্শন। অথচ দুই সমালোচকই কালান্তর দেখ্‌তে পাচ্ছে সমাজ-সচেতন ভাবে, শ্রেণী-লড়াইয়ের দার্শনিক হিসাবে।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে সামাজিক ব্যাখ্যায় এইরূপ মতবিরোধ বুঝিয়ে দেবেন?

সরকার—রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিমল সিংহ'র "সমাজ ও সাহিত্য" (পৃঃ ১৫৯) বল্‌ছেঃ—"এই শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচনা কর্‌লে প্রথমেই মনে হয় এগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিয়েছেন যা আনন্দ-উজ্জ্বল কবির স্বত-উৎসারিত গান নয়, যা জগতের বেদনা-ব্যথিত কবির বাণী। পীড়িত মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকেই এর বহু কবিতা লেখা"।

রবি সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ-প্রণীত "নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা"র (১১৯পৃঃ) বাণী নিম্নরূপ—"যে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি শান্ত সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগের মলিন অবশিষ্ট ত্যাগ-সাধনার ও নূতন প্রবিষ্ট ধনতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পুষ্ট তাতে "গীতাঞ্জলি" থেকে "বলাকা", "পূরবী", "মহুয়া" এবং "শেষের কবিতা"র উপন্যাস-গদ্য-কবিতা—সবই অবশ্যম্ভাবী"।

বিমল সিংহকে সাক্ষী ডাক্‌লে রবীন্দ্র-সাহিত্য দাঁড়িয়ে যাবে "সম্পূর্ণ পালা-বদলের, "হাওয়া-বদলের" "সৃষ্টি-বদলের" দৃষ্টান্ত। আর বিনয় ঘোষের ফার্মাণ অনুসারে রবীন্দ্র-সাহিত্য আগাগোড়া মধ্যবিত্ত বুর্জোআদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভাবালুতা।

লেখক—সাম্প্রতিক কবিদের সম্বন্ধে সামাজিক ব্যাখ্যাকারী বিনয় ঘোষ আর বিমল সিংহ'র মতবিরোধ কতটা?

সরকার—বেশ গভীর। বিনয় ঘোষের বিবেচনায় (পৃঃ ১৩৭) সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন ইত্যাদি কবিরা "সকলেই প্রায় উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত পণ্ডিত অধ্যাপক। এঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে দেশের বাকী সব মানুষকে এঁরা অপগণ্ড ও মূর্খ ভাবেন।" এঁদের রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য হচ্ছে ঃ—"এগুলোর তেমন কোনো মূল্য নেই।"

বিষ্ণু দে সম্বন্ধে বিমল সিংহ বল্‌ছেন—"তাঁর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং মন অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সচেতন তাই নয়, তাঁর কলা-কৌশল অদ্ভুত ও কারিগরী অত্যন্ত বেশী" (১৯৪ পৃঃ)। সমর সেন সম্বন্ধে বক্তব্য (২১৪ পৃঃ) নিম্নরূপ ঃ—'তাঁ কাব্যে এমন একটা অসুস্থতা-বোধ আছে যা ওরকমভাবে পূর্বে কোনো কবির কবিতাতেই মেলেনি।"

সুধীন দত্তও বিমল সিংহ'র কষ্টিপাথরে বিদ্রোহের কবি। "কবিতার মেজাজের মধ্যে সে বিদ্রোহ নিগূঢ়।" "বিদ্রোহটা স্পষ্ট নয়, ব্যঞ্জিত" (১৮৮ পৃঃ)।

লেখক—দুই সমালোচকই সামাজিক ব্যাখ্যার প্রচারক। অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুয়ের মতভেদ এত গভীর কেন? এই সমালোচনা-প্রণালীর আসল গলদ কোথায়?

সরকার—ইয়োরামেরিকায় একটা কালান্তর হয়ত দেখা যাচ্ছে। ব্যস্‌। অমনি আমাদের বাঙালী সমাজ-সচেতনেরা বাঙলা দেশেও একটা জল্‌জ্যান্তো কালান্তর দেখ্‌ছেন। এই হ'লো আসল গলদ।

লেখক—আপনি সাহিত্যের এইসকল পালা-বদল সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান?

সরকার—এর ভেতর শ্রেণী-লড়াই, শ্রেণী-বিপ্লব, সামাজিক ভাঙাগড়া, দুনিয়ার সর্বনাশ, সভ্যতার অবক্ষয় ইত্যাদি শক্তির প্রভাব বড়-বেশী দেখি না। দেখ্‌তে পাই যে—লেখকেরা নতুন-নতুন "বিষয়-বস্তু" নিয়ে মাথা খেলাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে নতুন-নতুন ছন্দ নিয়ে চল্‌ছে পরীক্ষা। নতুন-নতুন শব্দও এনে খাড়া করানো হচ্ছে। এই পর্যন্ত। অধিকাংশই নতুন কাহিনী, চরিত্র ও অবস্থা সৃষ্টি করবার ভাবুকতা আর আনন্দ। মধুসূদন হ'তে সমর সেন পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রায় এক ধারায়ই চল্‌ছে। মজুর-প্রাধান্য, চাষী-প্রাধান্য, নারী প্রাধান্য, প্রোলেটারিয়াট্‌-প্রাধান্য, গরীব-প্রাধান্য, অচ্ছুৎ-প্রাধান্য ইত্যাদি নয়া ঢঙের প্রাধান্য বঙ্গ-সমাজে আজও অতি-মাত্রায় মালুম হয় না। খাঁটি বাঙালী-মজুরই একপ্রকার নেই. কাজেই বাঙ্‌লায় মজুর-প্রাধান্য আস্‌বে কোথ্‌থেকে?

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, বাঙালী সমাজে রূপান্তর আসেনি?

সরকার—অতি সামান্য। বড় বেশী নয়। উল্লেখযোগ্য আকারের রূপান্তর দেখা যাচ্ছে না। এই অধমের "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" আর "বাড়তির পথে বাঙালী" বইয়ে এসব খতিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা আছে। নেহাৎ ধন-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের খাতিরে সংখ্যা খাটিয়ে বলি যে, কিঞ্চিৎ-কিছু ভাঙা-গড়া, রদ-বদল, রূপান্তর, পুনর্গঠন, বিপ্লব ইত্যাদি চিজ মালুম হয়। কিন্তু সবই হোমিওপ্যাথিক ডোজের কথা।

লেখক—নজির কিছু দিন না।

সরকার—একটা বস্তু-নিষ্ঠ প্রমাণ দিতে পারি। শরৎ-সাহিত্যের "পল্লী-সমাজ" দেখ্‌লেই বুঝা যায় রূপান্তরে দৌড় কতটুকু। এমন কি সেদিনকার "গণদেবতা" (প্রথম ভাগ "চণ্ডীমণ্ডপ" ১৯৪২) বইয়ের সমাজও বড় একটা রূপান্তরিত সমাজ নয়। ছুতোর-কামার-চামার-বাগ্‌দী লোকজনের আলোচনায় তারাশঙ্করের দরদ আছে। কিন্তু তিনি বাঙালী সমাজকে বঙ্কিমী আবহাওয়া হ'তে বেশ-কিছু দূরে টেনে আনতে পারেন নি। আনা সম্ভব নয়। তারাশঙ্করের রচনায় মার্কস্‌ও নাই সমাজতন্ত্রও নাই। যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে রোমান্তিকতা, পল্লী-নিষ্ঠুর ভাবুকতা, গণ-প্রীতির ভাবালুতা। কাজেই রূপান্তরিত সমাজের প্রভাবে সাহিত্যর রূপান্তরিত হচ্ছে একথা জোর্‌সে প্রমাণ করা সহজ নয়।

লেখক—বাংলা সাহিত্যে হাওয়া-বদল, পালা-বদল, রূপান্তর ইত্যাদি অবস্থা সৃষ্ট হোলো

তবে কোথ্‌থেকে।

সরকার—সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তথাকথিত "মধ্যবিত্ত", "ভদ্রলোক", "লিখিয়ে-পড়িয়ে" বা "বুর্জোআদের" সমাজই আজও বাড়তির পথে। তার ধ্বংস বা ক্ষয় এখনো নজরে পড়ে না। বরং আরও বেড়ে চল্‌তে বাধ্য। সবে সন্ধ্যা। তবে বিলাতে আজকাল এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার ইত্যাদি কবিরাই পশার ভোগ কর্‌ছে। কাজেই এই নয়া ঢঙের লেখকেরা ভারতেও দিগ্‌বিজয় চালাতে পেরেছে। হাজার হলেও ভারতখানা বিলাতের মফঃস্বল মাত্র। সেকালে অর্থাৎ মধু হ'তে রবি পর্যন্ত দিগ্‌বিজয় চলতো শেক্‌স্‌পীয়ার-মিল্‌টন-শেলী-বায়রণের। একালে ইয়োরামেরিকার সঙ্গে ভারতীয় নরনারীর আনাগোনা বেশ-কিছু বেড়ে গেছে। এইজন্য বিংশ শতাব্দীর বিলাতী সাহিত্য তাজা-তাজা অবস্থায় বাঙালী কবিদেরকে তাতাতে পেরেছে।

মনে পড়্‌ছে,—১৯১৪ সনে বিলাতে পৌছে দেখি রুশ দস্তয়েব্‌স্কির জয়-জয়কার চ'লেছে। তার আগে দেশে ব'সে তার নাম পর্যন্ত শুনিনি। তৎক্ষণাৎ "গৃহস্থ"—পত্রিকায় দস্তয়েব্‌স্কি আর তুর্গেনেভের আলোচনা সুরু ক'রে দিলাম। কিন্তু এই বিশ-ত্রিশ বছরে বাঙালীর বাচ্চারা ছোকরা রুশ লেখকদেরকে পাচ্ছে কড়া থেকে পড়্‌তে না পড়্‌তে। অনেক-কিছুই গরম-গরম পরিবেষণও কর্‌ছে।

লেখক—তা হ'লে এক কথায় বলুন সাহিত্যের শ্রেণী-সংগ্রাম মাফিক সামাজিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—সূত্র বা ফর্মুলা মাফিক সাহিত্যের সমালোচনা চালানো ঝক্‌মারি বা বিড়ম্বনা। জোর-জবরদস্তি ক'রে টেনেবুনে কোনো লেখককে "বুর্জোআ" বল্‌তে হয়। কাউকে বা শ্রেণী-সংগ্রামের সেনাপতি খাড়া কর্‌তে হয়। কিন্তু লাইনে-লাইনে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ সুরু কর্‌লে অনেক সময়েই দেখা যায় মজা। মধ্যবিত্তের কবি বা গাল্পিক, আর মজুর-চাষী-গরীবের কবি বা গাল্পিক দুই-ই হরে-দরে এক জাতের স্রষ্টা। শিল্প-স্রষ্টা হিসাবে এই দুই ধরণের লেখক সম্বন্ধে তফাৎ করা কঠিন। যা হ'ক, শ্রেণী-সংগ্রাম মাফিক সামাজিক ব্যাখ্যা আমি চাই। এই ব্যাখ্যায় ভুলচুক অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভুলচুক সত্ত্বেও যতটুকু ঝড়্‌তি-পড়্‌তি স্বীকারযোগ্য তার তারিফ আমি কর্‌বোই কর্‌বো। অধিকন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের সূত্র ছাড়াও অন্যান্য রকমের সামাজিক ব্যাখ্যা আছে ব'লেছি। সে সবও চলুক।

জানুয়ারি ১৯৪৪

জার্মাণ ইন্‌ফ্লেশন বা মুদ্রা স্ফীতি*

১ জানুয়ারি ১৯৪৪

মন্মথ—ভারতবর্ষে লড়াইয়ের সময় বর্তমানে যে ইন্‌ফ্লেশন চল্‌ছে সে সম্বন্ধে আপনি

*শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার এম্ এ এই মোলাকাৎ চালাইয়াছিলেন। মন্মথবাবু "আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের অবৃত্তিক গবেষক এবং "আর্থিক উন্নতি"র নিয়মিত লেখক। তাঁহার কোনো-কোনো রচনা বিনয় সরকার কর্তৃক সম্পাদিত "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং "সমাজ-বিজ্ঞান" প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

সার্বজনিক মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কয়েকটা আলোচনায় তার পরিচয় পাওয়া গেছে। একটাতে আমি উপস্থিত ছিলাম (২৮ মার্চ ১৯৪৩)। খবরের কাগজেও আপনার মতামত কিছু-কিছু বেরিয়েছে। এই সম্বন্ধে আজ আরও কিছু শুন্‌তে চাই।

সরকার—কী আর বল্‌বো? একটা বইও সম্প্রতি ঝেড়েছি (অক্টোবর ১৯৪৩)। নাম "ইকুয়েশন্‌স্ অব ওয়ার্ল্ড্‌-ইকনমি" (বিশ্বদৌলতের সাম্যসম্বন্ধ)। ঝগড়া বাঁধ্‌ছে ইনফ্রেশন শব্দটা নিয়ে। আমার বক্তব্য সোজা। বিনা ইনফ্রেশনে লড়াই চলতেই পারে না। ইনফ্রেশন জিনিষটা সর্বদাই অতি মারাত্মক নয়। ন্যায্য ইন্‌ফ্রেশনও আছে। সেই ন্যায্য ইন্‌ফ্রেশনের মাত্রা আজ পর্যন্ত ভারতে, বিলাতে, মায় জার্মাণিতে ও জাপানে ছাড়িয়ে যাওয়া হয় নি।

লেখক—সকলেই গত লড়াইয়ের জার্মাণ ইন্‌ফ্রেশনের ভয় দেখাচ্ছে কেন?

সরকার—তারা অতি-পণ্ডিত ব'লে। আসল কথা কী জানো?

লেখক—না। বলুন শুনি।

সরকার—দেশ-বিদেশের অনেক অর্থশাস্ত্রি-মহলে ১৯২১-২৩ সনের "অতি-মুদ্রা" (ইন্‌ফ্রেশন) বা মুদ্রা-স্ফীতিকে ১৯১৪—১৮ সনের মহা-লড়াইয়ার সমসাময়িক বা আনুষঙ্গিক অবস্থা ও ফল সম্‌ঝা হ'য়ে থাকে। অনাথ গোপাল সেনের লেখা "যুদ্ধের দক্ষিণা" বইয়েও (১৯৪৩) তাই দেখছি। ইহা মস্ত ভুল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে সেই বিশ্ববিশ্রুত জার্মাণ মুদ্রা-স্ফীতির সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। উহা লড়াইয়ের পরবর্তী ঘটনা। কারণগুলাও লড়াইয়ের বহির্ভূত অবস্থান ভিতরই ঢুঁড়তে হবে। দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের (১৯৩৯—) সময়কার বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি বিশ্লেষণ কর্‌বার সময় সেই জার্মাণ অতি মুদ্রার "কালো ভেঁড়াটা"কে সাম্‌নে রেখে ডর পাওয়া ঠিক নয়।

লেখক—আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, জার্মাণ মুদ্রা-স্ফীতির দরুণ জার্মাণিতে নাৎসি দলের উৎপত্তি হ'য়েছে। এই সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—এই মতটা আগাগোড়া ভুল। শুধু আমাদের ভারতে নয়,—ইয়োরামেরিকার অনেক মহলেই মায় পণ্ডিতেরাও হিটলার-রাজকে জার্মাণ ইন্‌ফ্রেশনের ফল ব'লে থাকে। রাত্রির পরে দিন আসে। তাহ'লে রাতটা দিনের কারণ কি? দিন গেলে রাত হয়। তাই ব'লে দিনকে রাতের কারণ বলা উচিত কি?

লেখক—আপনি তাহ'লে জার্মাণ ইন্‌ফ্রেশনের সঙ্গে জার্মাণ নাৎসি দলের কিরূপ সম্বন্ধ দেখ্‌তে পান?

সরকার—হিট্‌লারের আর নাৎসি-দর্শনের উৎপত্তি জার্মাণ "অতি মুদ্রা"র পরবর্তী নয়,—আগে অথবা সমসাময়িক। নাৎসি-নীতির আসল কারণ ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)। ইংরেজ আর ফরাসী জাতের উপর প্রতিহিংসা ছাড়া নাৎসি-দর্শন আর কিছু জানে না। হিটলার ভার্সাই-সন্ধির মুগুর আর ইংরেজ-ফরাসীর যম। জার্মাণরা ১৯১৪—১৮ সনের লড়াইয়ে হেরেছে। তার প্রতিশোধ নেবার জন্য যুবক জার্মাণিকে তাতিয়ে তোলা হচ্ছে হিট্‌লার, নাৎসি-দল আর হিট্‌লার-রাজের একমাত্র স্বধর্ম। তার সঙ্গে ইন্‌ফ্রেশন-ঠিন্‌ফ্রেশনের যোগাযোগ অতি অবান্তর।

ভারতীয় মুদ্রা-স্ফীতির সু-কু

মন্মথ—ভারতীয় স্বরাজ-স্বাধীনতার আন্দোলনকে সরকারী ইনফ্লেশন (মুদ্রাস্ফীতি) নীতির কারণ ঠাওরানো উচিত নয় কি?

সরকার—কোনো মতেই না। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই মুদ্রা-স্ফীতি হচ্ছে লড়াইয়ের টাকাকড়ির প্রথম বনিয়াদ। এই হচ্ছে মুদ্রা-স্ফীতির "সু"। কাজেই পরাধীন জাতকে স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য সাজা দিবার মতলবে কোনো বিদেশী সরকার অতিমুদ্রা রুজু করে,—এরূপ বুঝে রাখা চল্‌তে পারে না। লড়াইয়ে মোতায়ান দুই পক্ষের আর উদাসীন রাষ্ট্র-সমূহের ব্যবস্থাগুলা দেখ্‌লে এইরূপ সন্দেহ করবার কারণ জুট্‌বে না।

লেখক—আমাদের সংবাদ-পত্রসমূহে স্টার্লিঙের উপর টাকার বা নোটের ভিত্তি গঠন সম্বন্ধে সর্বদা প্রতিবাদ বেরুচ্ছে কেন?

সরকার—বিলাতী পাউণ্ড-স্টার্লিঙের ঢাক্‌নায়, জামিনে বা আশ্রয়ে ভারতীয় সিক্কা চল্‌ছে। এই জন্য রূপৈয়া-ওয়ালাদের পেটে ভয় ঢুকেছে। ভয়টা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। কেননা স্টার্লিঙের আপদ্-বিপদ্ ঘটলে রূপৈয়া নিরাপদ্ থাকবে না। জেনে রাখা ভাল যে, পাউণ্ডে-টাকায় এইরূপ যোগাযোগ নতুন-কিছু নয়। খোলা-খুলি অথবা গৌণ বা পরোক্ষভাবে এই সম্বন্ধ চিরকাল চল্‌ছে।

লেখক—এইরূপ চল্‌বার কারণ কী?

সরকার—আইনতঃ ভারতবর্ষ বিলায়েত মফঃস্বল। ইহারই সোজা নাম বৃটিশ ভারত। ডেভনশিয়ার-কেণ্ট-ল্যাঙ্কাশিয়ারের সঙ্গে লণ্ডনের যেরূপ যোগাযোগ, বাঙলা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব ইত্যাদি দেশের সঙ্গে লণ্ডনের কানুন-মাফিক যোগাযোগ প্রায় ঠিক সেইরূপ। নোনা জলের ফারাক আছে হাজার-হাজার মাইল। এই কারণে ভারতীয়-বিলাতী যোগাযোগের আকার-প্রকার স্পষ্টাস্পষ্টি মালুম হয় না। কিন্তু এই সম্বন্ধে চোখ বুজে ধনবিজ্ঞানের গবেষণায় বাহাল থাকা শেয়ানামির লক্ষণ নয়।

বিক্রমপুরের কবি গোবিন্দ দাস সোজাসুজি প্রচার ক'রেছেন ঃ—"স্বদেশ স্বদেশ কর্‌ছিস কারে, এদেশ তোদের নয়।" কথাটা কড়াও নয়, মিঠেও নয়। অতি নিরেট, কেঠো, সাচ্চা কথা। গোবিন্দ দাশ ধনবিজ্ঞানের বই মুখস্থ-করা পণ্ডিত নন। লোকটা কলিজাওয়ালা মানুষ—অতি-সহজ, সহৃদয়শীল, দরদী কবি। মনে হচ্ছে যে, ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী পণ্ডিতদের এই তত্ত্বজ্ঞানটা এখনো জন্মে নি।

লেখক—স্টার্লিঙের ক্ষতি হ'লে ভারতীয় নোট-টাকার ক্ষতি হবে না কি?

সরকার—তাও আবার বল্‌তে হবে? ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের দৈবদুর্বিপাকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গায়ে আঁচড় পড়বে না,—এরূপ কল্পনা করা গা-জুরি। মনিব দেউলিয়া হ'লে গোলাম সুখে-সচ্ছন্দে থাকতে পারে না।

লেখক—ভারতীয় টাকা-কড়ির কপাল বিলাতী পাউণ্ড-স্টার্লিঙের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কেন হ'ল? বিশেষতঃ লড়াইয়ের সময়?

সরকার—আগেই বলেছি, এরি নাম বৃটিশ ভারত। যেখানে-যেখানে মনিবের লড়াই, বিনা বাক্য-ব্যয়ে গোলামের লড়াইও সেখানে-সেখানে। এই বিষয়ে কথা-কাটা-কাটি করা চ্যাংড়ামি। ভারতের সন্তান আমরা অনেকেই চ্যাংড়া ছাড়া আর কিছুই নই। কী কর্‌বো বলো? "আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্মম আমি আজি।" তেতো সভ্যটা হজম করা আমার আত্মার

নিত্য-নৈমিত্তিক রেওয়াজ। চব্বিশ ঘণ্টা লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢাক-ঢাক-গুড়্-গুড়্ ক'রে জীবন চালানো ঝক্‌মারি।

লেখক—এর মানে কী?

সরকার—অতি সোজা। বিলাতের লড়াইটা ভারতেরও লড়াই। এই হ'লো নিরেট আইনের কথা। ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীরা এই আইন মাফিক চল্‌তে বাধ্য। ধন-বিজ্ঞানের আখড়ায় রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মেজাজ বা দম্ভল ছড়িয়ে লাভ নাই। বিলাতের সঙ্গে ভারতের মনিব-গোলাম সম্বন্ধ কেন ঘট্‌লো অথবা কেন থাক্‌বে? এই সব হচ্ছে ইতিহাসের মামলা, প্রত্নতত্ত্বের কথা, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সমস্যা। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার গৌরব-বিশ্লেষণ ধন-বিজ্ঞানের বৈঠকে অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর চিজ।

লেখক—এই মহা-লড়াইয়ের সময় ভারতীয় টাকা-কড়িকে নিরাপদ রাখার জন্য কোনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় কি?

সরকার—না। বিলাত নিজ পাউণ্ড-স্টার্লিঙের জন্য যে-সকল ব্যবস্থা ক'রেছে তার চেয়ে বেশী-কিছু বৃটিশ ভারতে কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। লড়াইয়ে বিলাতী লোকজনের রকমারি অসংখ্য লোকসান অবশ্যম্ভাবী। সেই সঙ্গে ভারতীয় নরনারীরও আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য। লড়াইয়ের কারবারে কতকগুলো লোকের ক্ষতি হ'তে বাধ্য। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য কতকগুলো লোক দাঁও মারে নিশ্চয়। ইন্‌ফ্লেশনের "কু"গুলা "সু"র সঙ্গে সুজড়িত। না খেয়ে মর্‌ছে আমাদের মতন বাঁধা-মাইনের লোক—কিন্তু সুখে আছে অনেকে। এমন বিলাস তারা জীবনে কখনো চাখে নি। "একস্য সর্বনাশঃ অনন্য তু পৌষমাসঃ"।

লেখক—বিলাতী পাউণ্ড-স্টার্লিঙের বিপদ্ ঘটা সম্ভব কি?

সরকার—"অতি-বিপদ্" ঘ'ট্‌বে ব'লে বিশ্বাস হয় না।

লেখক—কেন? এমন বিশ্বাস কেন হচ্ছে?

সরকার—অন্যতম কারণ বাৎলাচ্ছি। স্টার্লিঙের সর্বনাশে মার্কিণ ডলার চাচাও আটলাণ্টিকে ডুব মার্‌বে। এই দুই সিক্কা প্রাণে-প্রাণে গাঁথা র'য়েছে। অবশ্য ইংরেজ জাতের আসল রাষ্ট্রিক মতলবের সঙ্গে মার্কিণ জাতের রাষ্ট্রিক স্বার্থের ঝগড়া আছে বেশ। আড়া-আড়ি আর টক্করটা হচ্ছে সাম্রাজ্যিক। সাম্রাজ্য-বিস্তার নিয়ে কোঁদল। এই ঝগড়া ক্রমেই বেড়ে চল্‌বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান লড়াইয়ের হিড়িকে দুই জাতই নিজ-নিজ সিক্কা বাঁচিয়ে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে দস্তুর মতন। সিক্কা বাঁচানো দুই জাতের সমবেত স্বার্থ। কাজেই রূপৈয়া-গোলামের "অতি-ক্ষতি" সম্ভব নয়।

লেখক—রাষ্ট্রিক টক্কর সত্ত্বেও আপনি টাকা-কড়ির ঐক্য দেখ্‌ছেন?

সরকার—হ্যাঁ, পাউণ্ডের মালিকও হাজার-হাজার মার্কিণ নর-নারী। স্টার্লিঙকে নিরাপদে পুষে রাখা মার্কিণ রাষ্ট্রের জবর স্বার্থ। পাউণ্ড আর ডলার দুই মিঞা পরস্পর পরস্পরের দাড়ি ধ'রে সাগর-ডুবি খেলে তবে ভারতীয় রূপৈয়া-গোলামের "ছিদ্দৎ"। তার আগে নয়। সেই "ঢাকী শুদ্ধু বিসর্জনের" দুরবস্থা ঘট্‌বার সম্ভাবনা খুবই কম। ধরা যাক্ যেন বিশ্বব্যাপী সিক্কা-মৃত্যু ঘ'টে গেল। তাহ'লে বুঝ্‌তে হবে যে, তা হচ্ছে লড়াইয়ের অন্যতম অদৃশ্য, পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ খর্চা। লড়াইয়ের খর্চার সেই পরোক্ষ অংশ এড়িয়ে চলা কোনো জাতের পক্ষে পূরাপুরি সম্ভব নয়।

লেখক—রূপৈয়ার "অতি-ক্ষতি" বা সর্বনাশকে আপনি লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা বল্‌ছেন। আজকাল যে-ধরণের ইনফ্লেশন, অতি-মুদ্রা বা মুদ্রা-স্ফীতি জারি আছে তাকে

আপনি পরোক্ষ খর্চা বল্‌বেন না?

সরকার—নিশ্চয় বল্‌বো। ব'লেছি তো? আজকালকার ইন্‌ফ্লেশন (অতি-মুদ্রা)-ঘটিত অতি-মূল্য, বাজার-দরের চড়াই, জনসাধারণের অনাহার, অর্দ্ধাহার ও অকালমৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাও লড়াইয়ের দস্তুরমাফিক পরোক্ষ খর্চা। যারা লড়াইয়ের আকাশে, মাঠে ও জলে প্রাণ দিচ্ছে তারা হ'ল সোজাসুজি প্রত্যক্ষ খর্চার অন্তর্গত। ইন্‌ফ্লেশনের কৌশলে জনসাধারণ নানা প্রকার "কর্মভোগ", কষ্টস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ সইতে বাধ্য হয়। এই হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম "সু"।

লেখক—মুদ্রাস্ফীতি-ঘটিত জনসাধারণের দুঃখকষ্টকে "সু" বল্‌ছেন কেন?

সরকার—অনেক মধ্যবিত্ত, ধনী ও সুখী লোক এতদিনে বুঝ্‌লে সাংসারিক কষ্ট কাকে বলে। গরীবের আটপৌরে দুঃখ-কষ্ট তারা আন্দাজ কর্‌তে পার্‌তো না। এইবার তারা গুঁতোর চোটে বাবা ব'লতে-ব'ল্‌তে গরীবের সঙ্গে হামদর্দি কর্‌তে বাধ্য হচ্ছে। এর কিছু না-কিছু সুফল মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজে ফল্‌তে থাক্‌বে। এই সামাজিক বিপ্লবের দাম ঢের।

অনাথ সেনের "যুদ্ধের দক্ষিণা"

মন্মথ—দেখ্‌ছি,—অনাথ সেনের "যুদ্ধের দক্ষিণা" বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন আপনি। তাঁর সঙ্গে আপনার মতের মিল আছে?

সরকার—প্রায় কোনো জায়গায়ই না।

লেখক—তা হ'লে ভূমিকা লিখ্‌লেন কেন?

সরকার—বইটা "প্রায়-সার্বজনিক ভারতীয় অর্থশাস্ত্র"-মাফিক রচনা,—এইজন্য। আমার মত অবশ্য আগাগোড়া উল্টা। অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রেও লেখকদের সঙ্গে মতামতের মিল-অমিল সম্বন্ধে আমি থোড়াই হিসাব রাখি। দেখি প্রধানতঃ আলোচনা-প্রণালী। আমার দৃষ্টিভঙ্গীই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

লেখক—বইটা লেখা হ'য়েছে কেমন?

সরকার—অনাথ সেনের রচনাটা তথ্যপূর্ণ ও সরস। টাকাকড়ি, সরকারী আয়-ব্যয়, আন্তর্জাতিক কর্জ ইত্যাদি ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকেরা নানা কথা শিখ্‌তে পার্‌বে। তাতে দেশের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। ভুল শিখ্‌লেও মগজে নয়া ঢঙের সংখ্যা ও মন্তব্য তো ঘর ক'রে বস্‌বে। মন্দ কি?

লেখক—নিজ মতের বিরোধী মতওয়ালাদের সঙ্গেও আপনার সদ্ভাব চল্‌তে পারে কী ক'রে?

সরকার—মজার কথা। বর্তমান ক্ষেত্রে বেশ বুঝা যাচ্ছে। নানা দৃষ্টিভঙ্গীর দৌলতে বাঙালীর ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য ক্রমশঃ পুষ্ট হ'তে থাক্‌বে। নিজের মত-মাফিক লোক ঢুঁড়তে গেলে দুনিয়ার একজনও পাব কি না সন্দেহ। জ্ঞানযোগে এই অধম "সবার বিরুদ্ধে একা"। কিন্তু জীবন-যোগে সংসারের সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব। এ এক বিচিত্র অবস্থা। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও কোনো লোকের সঙ্গে ঝগড়া হয় নি। সকলেই আমাকে "ভাই" বা "দাদা" ব'লে ডাকে। অথচ মতে মেলেনা বোধ হয় কারু সঙ্গে।

লড়াইয়ের অর্থশাস্ত্র

৫ই জানুয়ারি ১৯৪৪

মন্মথ—বর্তমান লড়াইয়ের অর্থকথা সম্বন্ধে সহজে আরও খানিকটা বুঝ্‌তে চাই। সংখ্যারাশির সাহায্য না নিয়ে মোটা-মোটা কিছু ব'লে যাবেন? তা হ'লে অনেকের উপকার হয়। দৈনিক-সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগ র'য়েছে,—জানেনই তো? তাতে বুঝতে পার্‌ছি যে, লোকেরা লড়াইয়ের অর্থশাস্ত্রটা ঠিক যেন ধর্‌তে পার্‌ছে না।

সরকার—মোটা-মোটা কথা হচ্ছে নিম্নরূপ।

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র সুরু হ'য়েছে। তখন হ'তে দুনিয়ায় দেখা দিয়েছে লড়াইয়ের অর্থশাস্ত্র। তার আসল কথা সামরিক মাল, সামরিক রসদ, সামরিক যন্ত্রপাতি, সামরিক খোরপোষ, সামরিক যান-বাহন ইত্যাদি সব-কিছু সামরিকের উৎপাদনে বাড়্‌তি। সঙ্গে-সঙ্গে অ-সামরিক মাল, অ-সামরিক রসদ, অ-সামরিক যন্ত্রপাতি, অ-সামরিক খোরপোষ, অ-সামরিক যানবাহন ইত্যাদি ইত্যাদি অসামরিক সব-কিছুর উৎপাদনে ঘাট্‌তি। এই দুই বাড়্‌তি-ঘাট্‌তির অপর পিঠ হচ্ছে একদিকে সরকারী লোক-নিয়োগের হৈ-হৈ-রৈ-রৈ, করাদায়ের মরসুম, আর কর্জ-গ্রহণের ধুম-ধাড়াক্কা। অপর দিকে মামুলি গেরস্থর বরাতে তেল-নুন-ভাত, কাপড়-ওষুধ-বই ইত্যাদি সব-কিছুরই অভাব অথবা আগুন-দাম। টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়্‌ছে দেদার। "অতি-মুদ্রা"র যুগ চল্‌ছে। মুদ্রা ফেঁপে-ফুলে হ'ল ঢোল। ইহার নাম মুদ্রা-স্ফীতি। কঠিন শব্দ তারই জুড়িদার দেখা দিয়েছে দামের চড়াই,—"অতিমূল্য"। দাম উঠে ঠেক্‌লো আশ্‌মানে,—মূল্য-স্ফীতি। দুই-ই লড়াইয়ের অতি-স্বাভাবিক চিজ।

লেখক—"অতি-মুদ্রা" আর "অতি-মূল্য" লড়াইয়ের সময়কার অতি-স্বাভাবিক ঘটনা বল্‌ছেন? কিন্তু এই কথাটা বুঝ্‌তে গোল বাঁধ্‌ছে কেন?

সরকার—লড়াইয়ের খর্চাটা বুঝ্‌তে হ'লে আগে বুঝা দরকার লড়াই চিজটা কী। বর্তমান ভারতের নরনারী লড়াইয়ের অ আ ক খ সম্‌ঝিতে সমর্থ কি? লড়াইয়ের ভিতরকার মার-প্যাঁচ আমরা জানি না। এই জন্য কোথায়-কোথায় খরচ, কেন খরচ, কোন্‌-কোন্‌ দফায় লোকসান বা ধ্বংস, কতখানি অপব্যয়, কতটা লুট বা চুরি, কোন্‌-কোন্‌ খাতে খাঁক্‌তি,—এই সব কাণ্ড আমাদের মগজে বস্‌তে পারে না। এর তথ্যগুলাও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আর সংখ্যাগুলাও অজ্ঞাত। কাজেই "অতি-মুদ্রা" আমাদের চিন্তায় মারাত্মক আর "অতিমূল্য" তো ভয়ঙ্কর বটেই। কিন্তু যে-লোকটা লড়াই বুঝে তার কাছে এই সব মুড়ি-মুড়কি মাত্র।

লেখক—কেন? লড়াই-সংক্রান্ত তথ্য আর সংখ্যা আন্দাজ করা অসম্ভব কি?

সরকার—একদম অসম্ভব নয়। তবে আন্দাজের ভেতর ভুলের পরিমাণ অত্যধিক হ'তে বাধ্য। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কল্পনার আশ্রয় লওয়া যাক্‌। "শত্রুপক্ষ ধ্বংস কর্‌বার জন্য মোকাম মুর্শিদাবাদের শস্তা কিস্তীর উপর সাড়ে তিন শ' মণ আটা আর পৌনে দু শ' মণ লঙ্কা চাপিয়ে গৌড়ের ঘাটে এসে খুঁটো গেড়েছি। এইবার সুরু হবে শত্রুর সঙ্গে বর্মে-বর্মে কোলাকুলি। দেখা যাক্‌ দুস্‌মনের দৌড় কতখানি।" এই ধরণে বাজারে-বাজারে ঢাক পিটাতে-পিটাতে কোনো সেনাপতি লড়াইয়ের মাঠে আগুয়ান হয় কি? নিজের রসদ-সরঞ্জাম, মালপত্র আর লোকজন সম্বন্ধে গোমর ফাঁক কর্‌বার মতন আনাড়ি সেনাপতি কস্মিন্‌ কালেও ছিল না। এ কালে ত থাক্‌তে পারেই না। কাজেই লড়াইয়ের খরচা কী,

কোথায়, কতটুকু বুঝা যাবে কোথ্‌থেকে?

লেখক—লড়াইয়ের মার-প্যাঁচে তথ্য গোপনীয় রাখা একটা বড় কথা বল্‌ছেন। তা ছাড়া আর কিছু আছে?

সরকার—এক হিসাবে আর কিছু নাই। লড়াইয়ের ষোল আনাই গোপনীয়। হাজার-হাজার গোপনীয় চিজে লড়াই। কিন্তু জনসাধারণ হামেশা চায় "খবর"। কাজেই গল্প-গুজব, অলীক তথ্য, অত্যুক্তি, অনুক্তি, আজগুবি কাহিনী, ডাহা মিথ্যা ইত্যাদি "খবর" প্রচার করা সকল দেশেরই দস্তুর। মিথ্যা চালাবার প্রকাণ্ড ব্যবস্থা না থাক্‌লে লড়াই চালানো সম্ভব নয়। যেমন লাখ কথায় বিয়ে, তেমনি লাখ মিথ্যায় লড়াই। এই সবের ভেতর প্রবেশ করা রামা-শ্যামা, আবদুল-ইস্‌মাইলের কর্ম নয়। আমি এসব দূর থেকে সেলাম করি। লড়াইয়ের মারপ্যাঁচে নাক গুজ্‌বার বাতিক্‌ আমার নাই।

লেখক—আপনি লড়াইয়ের অর্থশাস্ত্র এত জটিল বিবেচনা করেন?

সরকার—কী কর্‌বো? আমি মূখ্‌খু। "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। এই ধরো একটা সামান্য কথা। লড়াইয়ের এক-তরফা জিত্‌ খাওয়া সাধারণতঃ কোনো সেনাপতির বরাতে দেখা যায় না। পাঁচ-সাত ঘা খেতে-খেতে দু-এক ঘা লাগাতে পারাটাই মোটের উপর মানুষের কপালে লেখাতে থাকে। সর্বদাই ক্ষতি লোকসানের পরিমাণ হচ্ছে জবরদস্ত্‌। কাজেই সব সেনাপতির পক্ষে নিজ লোকজনের অনিষ্ট, ক্ষতি, মৃত্যু, অপমৃত্যু আর মালপত্রের বরবাত বা ধ্বংস সম্বন্ধে বেশ-কিছু তৈয়ের থাকা অতি-স্বাভাবিক। অপব্যয় হচ্ছে লড়াইয়ের প্রাণ। রসদ, আস্‌বাব, সরঞ্জাম ইত্যাদি চিজ রাস্তায়-ঘাটে ধ্বংস ও নষ্ট হওয়া ক্ষতি-কিছু নয়। সর্বদা ঘট্‌ছে,—যেখানে সেখানে। লড়াইয়ের মাঠে ডাল, আটা, চিনি ও চাউল ফেলে আসার অভিজ্ঞতা—নেপোলিয়ানের জীবনে বহুবার ঘ'টেছে। তোমরা চাও যে নেপোলিয়ানগুলা বলুক যে, "ঢাকার ময়দানে আমাদের ফৌজ চরম সাহস দেখিয়েছে। শত্রুর পল্টন একদম কুপো-কষা হ'য়েছিল। তবে ঘটনাচক্রে আমরা শেষ পর্যন্ত শত্রুর মুল্লুক ছেড়ে দিলাম। দেড় হাজার বস্তা কাপড়-চোপড়, হাজার পাঁচেক মণ গুড়, আর শ' আড়াই গরুর গাড়ী শত্রুর হাতেই র'য়ে গেল।"

লেখক—এই কাল্পনিক দৃষ্টান্তের মানে কী?

সরকার—জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোনো ম্যাড়াকান্তকে সেনাপাতি করা হয় কি যে, লড়াই যখন চল্‌ছে তখনই "সত্যের খাতিরে" খোলা-খুলি নিজ লোকসানের পরিমাণ সম্বন্ধে এই ধরণের ঢাক পিটাবে? লোকসানের কথা গেয়ে বেড়ানো কোনো অতি-আহাম্মুকেরও সত্য নিষ্ঠায় ঠাঁই পেতে পারে না। সুতরাং লড়াইয়ের খর্চা সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হালে হ'তে সাহসী হয় কোন্‌ অর্থশাস্ত্রী?

কৌটিল্য-মাক্যাভেল্লি

মন্মথ—আপনি বল্‌তে চান যে, অর্থশাস্ত্রীদের পক্ষে লড়াইয়ের আলোচনা চালানো অসম্ভব?

সরকার—একপ্রকার তাই। তবে তথ্যাতথ্যের কুচো-কাচা এখানে-সেখানে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। এই পর্যন্ত। কি হার, কি জিত্‌—লড়াইবিষয়ক সকল তথ্যই গোপনীয়। লড়াই

যতদিন চালু থাকে, ততদিন এই সম্বন্ধে সত্যিকার সংখ্যানিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অসম্ভব। যুক্তিসঙ্গত আলোচনা আর বিজ্ঞান-মাফিক গবেষণা তখন চল্‌তে পারে না। লড়াই থামার কয়েক বৎসর পর চল্‌লেও চল্‌তে পারে। শুধু লড়াইয়ের সময়কার কেন, যে-কোনো সময়ের—গোপনীয় জিনিস মাত্রই গোঁজামিলে, অসত্যে, অত্যুক্তিতে, মিথ্যায় পরিপূর্ণ মাল।

লেখক—লাখ মিথ্যায় লড়াই বল্‌ছেন। তা'হলে মানুষের জীবনে সত্যের ঠাঁই কোথায়?

সরকার—বাবা রে! এ-যে খাঁটি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন। লড়াইয়ের সত্য-মিথ্যা মামুলি গেরস্থালির সত্যমিথ্যা নয়। রাষ্ট্রনীতিতে আর লড়াই-দর্শনে মিথ্যাই অনেক সময়ে,—অর্থাৎ প্রায় সব সময়েই,—আসল সত্য। এই নীতি আর দর্শন মেনে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন চালালে মানুষ জাহান্নমে যেতে বাধ্য। ওপথ মাড়িও না, বাবা।

লেখক—আপনি রাষ্ট্রিক ও সামরিক লেনদেনে আর জনসাধারণের আটপৌরে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এত প্রভেদ করেন?

সরকার—কী করা যাবে? লড়াই আর রাষ্ট্রনীতি চলে কৌটল্য ঋষির পাঁতি অনুসারে। মহাভারতের কূটনীতি কৌটল্য-দর্শনেরই মহাসাগর। ইয়োরামেরিকার কূট-দার্শনিক আসরে পূজা পায় ইতালিয়ান ঋষি মাক্যাভেল্লি। এই দুই ঋষিরই চেলা হচ্ছে একালের দেশী-বিদেশী রাষ্ট্রিক অবতারেরা।

লেখক—কূট ছাড়া এসব জিনিষ চলে না কি?

সরকার—না। লড়াই-বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রশিল্প বুদ্ধদেবেরও তোআক্কা রাখে না। আবার খৃষ্টদেবেরও তোআক্কা রাখে না। শত্রুকে ভয়-দেখানো আর নিজের দেশকে তাতিয়ে রাখা এই হচ্ছে লড়াই-ধর্ম আর রাষ্ট্র-ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের দেশের নর-নারীকে স্বদেশ-সেবায় চাঙ্গা ক'রে রাখ্‌বার জন্যও হুসিয়ার রাষ্ট্রবীরেরা অনেক সময় বিপদের পরিমাণটা অতিরঞ্জিত ক'রে দেখাতে অভ্যস্ত। সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র সত্য হচ্ছে যেন-তেন প্রকারেণ শত্রু-ধ্বংস। অধিকন্তু প্রতি মুহূর্ত ডাইনে-বাঁয়ে প্রচার করা চাই যে, শত্রুরা হার্‌ছে, কুপোকষা হচ্ছে, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হব-হব হ'য়েছে ইত্যাদি।

লেখক—তাহ'লে লড়াইয়ের খর্চা-বিষয়ক অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি তথ্যমূলক ও সংখ্যামূলক গবেষণা আশা করেন না?

সরকার—না। তবে হাত গুটিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থেকে কোনো লাভ নাই। লেখা-পড়া চালাতেই হবে। কেবল সর্বদা একটা কথা মনে রাখা উচিত। লড়াই-দর্শনে আর রাষ্ট্রদর্শনে নিরেট সত্য, খাঁটি সত্য, আন্তরিক বস্তুনিষ্ঠা, অকৃত্রিম "তথ্যাগ্রহ" ইত্যাদি চিজ দারুণ অসত্য বিবেচিত হবে,—চরণ বেআকুবি দেখাবে মাত্র। ফলতঃ লড়াইয়ের খর্চা বস্তুটা বর্তমানে আসল অর্থশাস্ত্রে আলোচ্য বিষয় হ'তেই পারে না।

লেখক—বর্তমান লড়াইয়ের সত্যসংগ্রহ আপনি অতিজটিল সমস্যা বিবেচনা করেন?

সরকার—ভেবে দ্যাখো না, আরাকান হ'তে আফ্রিকার ডাকার ও কেপ পর্যন্ত আর মক্কা হ'তে মস্কো ও লণ্ডন পর্যন্ত ভারতীয় মালের চলাচল ঘট্‌ছে। আর ভারতীয় মানুষ মোতায়েন আছে। এই সকল মাল ও মানুষের খতিয়ান করা লড়াইয়ের খর্চা-বিষয়ক অনুসন্ধান-গবেষণা-বিশ্লেষণের অন্তর্গত। এই বিশ্বব্যাপী মারপ্যাঁচের ভেতর থেকে খাঁটি তথ্য আবিষ্কার করা কি মুখের কথা? জাম্বুমানেরও বাপের সাধ্যি নাই। মামুলি অর্থশাস্ত্রী বেচারার দৌড় কতটুকুই বা? সত্যনিষ্ঠার বেপারী যারা তারা রাষ্ট্রনীতি আর লড়াই-নীতিকে "দূরাদস্পর্শনং বরং" সম্‌ঝে চল্‌তে অভ্যস্ত। এসব "অসত্যাগ্রহের" মামলা।

লেখক—কৌটিল্য-মাক্যাভেল্লির অসত্যাগ্রহ আপনি পছন্দ করেন?

সরকার—আমার পছন্দ-অপছন্দ'র উপর মিথ্যানিষ্ঠার দিগ্‌বিজয় বা অসত্যাগ্রহের জয়-জয়কার নির্ভর কর্‌ছে না। চিজটা সনাতন ও সার্বজনিক। এই কথাই একালের বার্ণার্ড শ'র মুখেও বেরিয়েছে "সেইন্ট জোন"—নাটকে খুব জোরের সহিত।

লেখক—কথাটা কী?

সরকার—লোকেরা সত্য হজম কর্‌তে পারে না। সত্য জিনিষটা বিশ্বাস করা কঠিন। লোকেরা চায় কবিতা, তুক্‌মুক্‌, আকাশ-কুসুম, সোনার পাথরের বাটি। ধর্মের বেলায় পুরুত ঠাকুরেরা সমাজে বেঁটে চলে অলীক, অপার্থিব, অতীন্দ্রিয়, বুজরুকি। ঠিক সেই রূপই সাংসারিক, রাষ্ট্রিক আর সামরিক লেনদেনে দরকার হয় ভাবালুতার, অসত্যের, অনুক্তির, অত্যুক্তির, মিথ্যার।

লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা

৭ই জানুয়ারি ১৯৪৪

মন্মথ—আপনি অনেক সময়ে লড়াইয়ের অদৃশ্য খর্চার কথা ব'লে থাকেন। সে আবার কী?

সরকার—লড়াইয়ের খর্চা খতিয়ান কর্‌বার সময় অর্থশাস্ত্রীরা সাধারণতঃ একমাত্র নগদ টাকা-কড়ির হিসাব নিতে অভ্যস্ত। এরোপ্লেনের হাম্‌লায় শহরে, পল্লীতে এবং লড়াইয়ের সাগরে বা মাঠে বহু লোক মারা যায় বা আহত হয়। তাদের নাম গুনে রাখাও দস্তুর। কিন্তু এই সব প্রত্যক্ষ বা দৃশ্য খর্চা মাত্র। তা ছাড়া অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ খর্চাও আছে।

লেখক—দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—দেশের ভেতর—লড়াইয়ের মাঠের বাইরে অসংখ্য লোক অনাহারে—দুর্ভিক্ষে—মারা পড়ে। পরোক্ষ খর্চার ভেতর এই সব মৃত্যু গুন্‌তে হবে। অসংখ্য লোক আধা বা সিকি বা আরও কম খোর-পোষ-কয়লা ইত্যাদি জিনিষ পাওয়ার দরুণ ব্যারোমে ভোগে। ওষুধ-পথ্যের অভাবেও রোগীর দুর্গতি। এই সকল রোগীও পরোক্ষ খর্চার অন্তর্গত। "অতি-মুদ্রা" (ইন্‌ফ্লেশন) ও অতিমূল্যের দৌরাত্ম্যে বহুসংখ্যক লোক দেউলিয়া ও হাভাতে-হাঘরে হয়। এই সব আর্থিক দুর্গতি, ক্ষতি ও সর্বনাশ লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চার ভেতর পড়্‌বে।

লেখক—আমাদের দেশে পরোক্ষ খর্চা কিরূপ?

সরকার—সকল দেশেই প্রকারান্তরে একরূপ। জার্মাণ, জাপানী, ইতালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিণ, চীনা ইত্যাদি সকল জাতই আজ, কাল ও পরশু এই পরোক্ষ খর্চা জোগাতে বাধ্য। ভারতবর্ষও এই পরোক্ষ খর্চা জোগাচ্ছে। ভারতের নরনারীর বরাতে জুট্‌ছে রূপৈয়ার স্টার্লিঙ-ঢাকনা, মুদ্রাস্ফীতি, বাজারদরের অতিবৃদ্ধি, চাউলহীন বাজার-হাট, বস্ত্রাভাব, দুর্ভিক্ষে গাঁ কে গাঁ উজাড়, দুধের খাঁক্‌তি, ম্যালেরিয়ার মরণ-ডাক, মাকিন কর্জ-ইজারার সুদ-আসল ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া আছে লড়াইয়ের পরবর্তী বছর পাঁচ-সাতেকের আর্থিক ব্যবস্থার ফলাফল।

লেখক—লড়াইয়ের পরবর্তী অবস্থায়ও আপনি লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা দেখ্‌তে পান?

সরকার—পাঁচ-সাত বছর ধ'রে গবর্মেণ্টকে অল্প-বিস্তর মুদ্রাস্ফীতি বজায় রাখ্তে হবে। জিনিষপত্রের দাম হিমালয়ের শিখরে হয়তো আর থাক্বে না,—কিন্তু বেশ-কিছু চড়া রাখা দরকার হবে। ফৌজ-শিপাহীর পেন্‌শন্, ভাতা ইত্যাদি খরচ নজরে রাখা আবশ্যক। লড়াইয়ের সময় ভারতের কাছে বিলাত কোটি-কোটি টাকার মাল কিনেছে। নগদ কেনা হয়নি, হচ্ছে ও না। ভারতের নামে বিলাতী খাতায় স্টার্লিঙ (পাউণ্ড) জমা করা হচ্ছে মাত্র। স্টার্লিঙগুলা ভারতের পকেটে আসা উচিত। এই জন্য বিলাতী গবর্মেণ্ট ভারতের কর্জ শুধ্‌তে বাধ্য। কিন্তু দেখা যাবে যে, হয়ত ভারত-গবর্মেণ্ট আইনের জোরে বিলাতী সরকারকে বেশ-কিছু মোটা টাকা দান ক'রে বস্‌লো। হয়ত বা জাপানী লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ খর্চার জন্যও ভারত-সরকারের ঘাড়ে বড়-একটা বোঝা চাপানো হ'লো ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই ভারত হয়ত স্টার্লিঙ পাবে না। ফলতঃ ভারতের লোকসান অনিবার্য। এই লোকসানকে লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা বল্‌তে হবে।

মার্কিণ কর্জ-ইজারা

মন্মথ—মার্কিণ কর্জ-ইজারা কিরূপ কারবার?

সরকার—ভারতবর্ষ, চীন, তুর্কী, বিলাত ইত্যাদি নানা দেশ মার্কিণ গবর্মেন্টের কাছ থেকে লড়াইয়ের জন্য ধারে মালপত্র যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রসদ পাচ্ছে। নগদ টাকা দিতে হচ্ছে না। এই ধারকে খোলাখুলি ধারও বলা হচ্ছে না। মার্কিণ সরকার জিনিষগুলা দিয়ে যাচ্ছে "ভাড়া" বা "লীজ" (ইজারা স্বরূপ)। পরে যেন জিনিষগুলাই ফেরৎ পাবে। অবশ্য জিনিষগুলার অনেক-কিছুই খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। যেটুকু অংশ বাকী থাক্‌বে সেই সব ফেরত যাবে। কিন্তু আসল কারবার এত সোজা নয়। এর ভেতর অমায়িক "দাতাকর্ণে"র রক্ত এক বিন্দুও নাই। আছে কড়ায়-ক্রান্তিতে "মূল্য দিয়া কথা কও"-এর দর্শন।

লেখক—একটু বুঝিয়ে বলুন?

সরকার—মার্কিণ লেণ্ড-লীজ বা কর্জ-ইজারা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের এক নয়া আবিষ্কার বা অবতার। কিন্তু এর মার-প্যাঁচ এখনো সর্বত্র বেশ-পরিষ্কার নয়।

মার্কিণ জাতের পক্ষে পৃথিবীর দেশগুলাকে সাহায্য কর্‌বার জন্য কোনো উপায় ছিল না। মালগুলা ভাড়া বা ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থায় এই সকল দেশের উপকারও হ'য়েছে ঢের। লড়াইয়ের পর এই জন্য ইজারা-কর্জওয়ালা দেশগুলার পক্ষে দেনা শুধ্‌বার পালা আস্‌বে। সেই অবস্থা বেশ-কিছু কষ্টের ও ক্ষতির অবস্থা। তুর্কী, ভারত, চীন ইত্যাদি কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এই কষ্ট অতি মারাত্মক সন্দেহ নাই। তারা অনেকটা কৃষিপ্রধান থেকে যেতে বাধ্য হবে। কেননা কৃষিজাত মাল ছাড়া আর কোনো জিনিষ দিয়ে ধার শুধা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

লেখক—ক্ষতি কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—লড়াইও কর্‌বে অথচ খরচও হবে না,—এমন অবস্থা কখনো ঘটে না। ক্ষতি প্রথমতঃ আর্থিক, দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রিক। দুনিয়ার বহুদেশে, মায় বৃটিশ সাম্রাজ্যে মার্কিণ টাকা-কড়ির সাম্রাজ্য কায়েম হ'তে চল্‌লো। এতে ইংরেজের চোখ টাটাচ্ছে। তার জন্য মার্কিণ জাত্‌কে দুষ্‌লে কী হবে? এই ঘটনাকে ভারতের উপর, চীনের উপর, ইরাণের উপর, বিলাতের উপর, রুশিয়ার উপর, ফ্রান্সের উপর মার্কিণ জুলুম বলা চল্‌বে না। দুনিয়ার "বৃহত্তর

আমেরিকা''র যুগ আস্‌ছে,—শনৈঃ শনৈঃ। বাবা, লড়াইয়ে মশ্‌গুল হয়েছে কেন? লড়াই হচ্ছে রূপচাঁদের খেলা। নিজের ট্যাকে পয়সা না থাক্‌লে মামলাবাজ লোক দেনাগ্রস্ত হয়। শ্যাম চাচা তোকে তোর মামলা-মকর্দ্দমার সময় কোটি-কোটি টাকার মাল জুগিয়ে বাঁচাবে। অথচ তাকে সুদে-আসলে মাল বা মূল্য ফেরৎ দেবার সময় কসাই বা ইহুদি ব'লে গালাগালি কর্‌তে চাস। এ কেমন যুক্তি? তবে মানুষ বিচিত্র,—যুক্তির ধার ধারে না। মার্কিণ জাতের উপর ইংরেজের রাগ হু-হু করে বেড়ে চ'লেছে—ক্রমশঃ আরও বাড়্‌বে। বেচারা ভারত-সন্তানের দোষ কী? আমরা তো দুনিয়ার যে-কোনো সুখী জাতের উপর চটা!

লেখক—ভারতের আর্থিক ক্ষতি কোন্ দিক্ থেকে দেখা দেবে?

সরকার—ভারতীয় নরনারী শিল্প-কারখানা, যন্ত্রপাতির কারখানা ইত্যাদি কারবারের দিকে হয়ত খানিকটা কম নজর দিতে বাধ্য হবে। চাষ-আবাদের ফসল বেচে ভারতবাসীকে মার্কিণ কর্জ শুধ্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। এতে আমাদের অতিপ্রিয় স্বদেশী আন্দোলন বেশ-কিছু চোট পেতে বাধ্য। তবে চাষের উন্নতি খানিকটা ঘট্‌বে মনে হচ্ছে। দেখা যাক্,—দুনিয়া কোথায় গিয়ে গড়ায়। অবশ্য চাষের দিকে নজর পড়াটাও মন্দ নয়। অধিকন্তু চাষ আবাদের আনুষঙ্গিক ভাবেও যান্ত্রিক আর রাসায়নিক শিল্প-নিষ্ঠার বাড়্‌তি সম্ভব।

ভারতের স্বদেশী-মার্কা অর্থশাস্ত্র

১০ই জানুয়ারি ১৯৪৪

মন্মথ—আপনি বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান পরিষদের অনেক সভায় "ভারতীয় সার্বজনিক" অথবা "প্রায় সর্ব-ভারতীয়" অর্থ-নৈতিক সুরের কথা ব'লে থাকেন। ভারতীয় নরনারীর "স্বদেশী-মার্কা-মারা" অর্থশাস্ত্র নামক একটা অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনার কথা-বার্তার ভেতর আলোচনা দেখ্‌তে পাই। ভারতবাসীর সেই "দাগ-দেওয়া" অর্থ শাস্ত্রটা কিরূপ?

সরকার—ভারতবাসীর সুপরিচিত আর্থিক গানের মুদ্দাটা শুন্‌তে চাও? তা হ'লে শোনো ঃ—"বৃটিশ-সাম্রাজ্যের আওতায় আর্থিক—"বৃটিশ-সাম্রাজ্যের আওতায় আর্থিক ভারতে যা-কিছু ঘট্‌ছে তার প্রায়-সবটাই একপ্রকার ভারতীয় নরনারীর পক্ষে অনিষ্টকারক। ভারতের শুল্ককে শুল্ক, মুদ্রাকে মুদ্রা, শিল্পকে শিল্প, কৃষিকে কৃষি, রেলকে রেল, কর্জকে কর্জ,—সব-কিছুই "কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা।" এই ধুআ গেয়েই আমরা ১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিপ্লব-সুরু ক'রেছিলাম। তার বৎসর বিশেক পূর্বে ভারতীয় ন্যাশন্যাল কংগ্রেস এই ধুআই যুবক ভারতে ধরিয়েছিল। এই ধুআরই অন্যতম মূলগায়েন ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের রমেশ দত্ত। তাঁর রচনাবলী ছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার আর্থিক ভারতের জন্য বেদ-বাইবেল-কোরাণ-স্বরূপ। এই সব গিলেই আমরা মানুষ হ'য়েছি। ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের সনাতন সুরে রাষ্ট্রনীতির গৎই বাজ্‌তো। আজও সেই গৎ বাজ্‌ছে।

লেখক—আপনি ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের এই সুর পছন্দ করেন?

সরকার—নতুন ক'রে আর কী বল্‌বো? এই বিশ-বাইশ বছর ধ'রে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক যা-কিছু ব'কেছি-লিখেছি তার প্রায়-সবই স্বদেশী-মার্কা ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যায়। আমার পোড়া-কপাল!

লেখক—কেন? এরূপ মতিগতি আপনার কেন হ'লো?

সরকার—আমি ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হ'তে সম্পূর্ণ ফারাগ চিজ বিবেচনা করি। এই আমার বাতিক। রাষ্ট্রনীতির সত্য একবস্তু আর অর্থনীতির সত্য আর এক বস্তু। এই হচ্ছে আমার মুদ্দা। কাজেই আমার গলায় সুর বেরোয় আলাদা। রাষ্ট্রনীতির গৎ আমার অর্থশাস্ত্রে বাজে না।

লেখক—আপনার অর্থনৈতিক বিচার-প্রণালী একটু পরিষ্কার ক'রে দেখাবেন?

সরকার—পরাধীন দেশের নরনারী রাষ্ট্রিক পরাধীনতাকে "যত দোষ নন্দ ঘোষ" বল্‌তে বাধ্য। তাদের চিন্তায়—"গোলামি-দোষো গুণ্ডারাশিনাশী" বিবেচিত হওয়া অতি-স্বাভাবিক।

লেখক—কেন? এই সম্বন্ধে আপনার মত কি উল্টা? আপনি কি পরাধীনতা বা গোলামি পছন্দ করেন?

সরকার—পছন্দ-অপছন্দ'র কথা হচ্ছে না। আমি কী চাই না চাই তা শুনে কারু লাভ-লোকসান নাই। আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে,—রাষ্ট্রিক গোলামি মানুষের সকল প্রকার দোষের কারণ—আর সকল প্রকার গুণের কবর কি না? আমি বলি—"না"।

লেখক—এই মতটা কিছু গুরুতর সন্দেহ নাই। বুঝা কঠিন। আরও-কিছু বিশদভাবে বলুন।

সরকার—আচ্ছা, যাচ্ছি কিছু ব'কে। রাষ্ট্রিক হিসাবে যে-সব দেশ স্বাধীন সে-সব দেশের লোকেরা সহজেই মার্ক্‌স্‌ মুনির মন্তরটা গিল্‌তে পারে। তারা সহজেই সমঝে নেয় যে, "দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী"। ভারতবাসী প্রধানতঃ বা একমাত্র "রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাখ্যায়' মশ্‌গুল। রবীন্দ্রনাথের "সভ্যতার সঙ্কট" (১৯৪০) তার অন্যতম সাক্ষী। ইয়োরামেরিকার স্বাধীন জাতিসমূহের লোকেরা প্রধানতঃ বা একমাত্র "অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার" তারিফ ক'র্‌তে অভ্যস্ত।

লেখক—আপনি কোন্‌ নতুন ব্যাখ্যার প্রচারক?

সরকার—আমার বিবেচনায় দুই-ই অদ্বৈতনিষ্ঠার প্রতিনিধি। দুই ক্ষেত্রেই অদ্বৈতবাদ ভুলে-ভরা দর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র দারিদ্র্যের দৌরাত্ম্যে মানুষের সব-কিছু নষ্ট হ'তে পারে না। ঠিক তেমনি একমাত্র রাষ্ট্রিক পরাধীনতার প্রভাবে মানুষের সকল প্রকার দুর্গতি ঘটে না। একমাত্র আর্থিক সম্পদই মানুষের স্বর্গে ঠেলে তুল্‌তে অসমর্থ। ঠিক সেইরূপ একমাত্র রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আওতায় মানুষ সুখে, সম্পদে, সাহসিকতায়, শৌর্য্যে, চরিত্রবত্তায় আর দেবত্বে জগদ্‌বরেণ্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। দারিদ্র্য কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়, রাষ্ট্রিক গোলামিও কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। দুইই সকল প্রকারে সর্বদা বর্জনীয়। কিন্তু এই দুই দোষ আলাদা-আলাদা অথবা এক-সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার নরনারী উন্নতি, প্রগতি ও বাড়্‌তির পথে চ'লেছে, চল্‌ছে ও চল্‌বে।

লেখক—স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক উন্নতির যোগাযোগ নাই কি? পরাধীন জাত গরীব হ'তে বাধ্য নয় কি?

সরকার—সবই বিচারের বস্তু, তর্কাতর্কির মামলা। এক কথায় জবাব দিব—"না"। স্বাধীন জাত মাত্রই ধনী নয়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা স্বত্ত্বেও আর্থিক হিসাবে উন্নত হওয়া সম্ভব! অবশ্য ধনী, গরীব, উন্নত, অবনত ইত্যাদি শব্দ আপেক্ষিক। দুনিয়ার অনেক স্বাধীন দেশ পরাধীন ভারতের দারিদ্র্য, ব্যাধি, দুর্গতি ইত্যাদি দুঃখ স'য়ে চ'লেছে। "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" এই মন্তরটা খুবই ভাল। স্বাধীন থাকাটাই সুখ ও গৌরব সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতার কদর করা উচিত। কিন্তু স্বাধীনতা মাত্রই

আর্থিক উন্নতির জনক ও সহযোগী এরূপ স্বীকার ক'রে নেওয়া চল্‌বে না। এইখানে মগজের খেলা।

পরাধীন জাতের আর্থিক আইন-কানুন

২০শে জানুয়ারি ১৯৪৪

মন্মথ—আপনার পরাধীন-জাত-বিষয়ক অর্থনৈতিক মতামত কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

সরকার—ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক্। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতায় ভারতবাসীকে কতকগুলা আর্থিক আইন-কানুন মেনে চল্‌তে হয়। স্বদেশ-সেবক হিসাবে, কংগ্রেস-পন্থী হিসাবে, স্বরাজ-সাধক হিসাবে, স্বাধীনতার পূজারি হিসাবে আমরা এই সকল আইন-কানুনকে গোলামীর লক্ষণ সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। আমাদের অতি-সহজ বিশ্বাসে এই সব আইন-কানুন পরাধীন জাতের জন্য খাশ-কায়েম-করা বিধি-নিষেধ বিশেষ। এই সকল কথার বিরুদ্ধে অনাথ সেন লিখিত "যুদ্ধের দক্ষিণা" বইয়ের ভূমিকায় পরিষ্কার ভাবে মত প্রচার ক'রেছি।

লেখক—আপনার বিশ্বাস কিরূপ?

সরকার—এই অধমের বিচারে সত্য কথা দাঁড়াবে অন্যরূপ। ইয়োরামেরিকায় আর এশিয়ায়,—অর্থাৎ দুনিয়ার বহু স্বাধীন আর নিম-স্বাধীনদেশে—পরাধীন ভারতের সুপরিচিত আই-কানুনের জুড়িদার গুলজার দেখতে পাওয়া যায়। বল্কান-চক্র, বাল্টিক-চক্র, পোল্যাণ্ড, স্পেইন-পর্তুগাল, ল্যাটিন আমেরিকা, চীন, ইরাণ ইত্যাদি দেশের আর্থিক গড়ন সর্বদাই নজরে রাখা উচিত। তা-ছাড়া স্বাধীন দেশ-সমূহের জন্য কোনো তথা-কথিত মার্কামারা স্বতন্ত্র আইন-কানুন টুঁড়ে পাওয়া অনেক সময় কঠিন। এক-এক স্বাধীন দেশের এক-এক রেওয়াজ। অধিকন্তু এমন কি, বিলাতে, ফ্রান্সে আর জার্মাণিতেই নানা যুগে বা নানা দশকে ভিন্ন-ভিন্ন পরস্পর-বিরোধী আর্থিক আইন-কানুন জারি হ'য়েছে। কাজেই কথায়-কথায় স্বাধীনদেশের আর্থিক কর্ম-কৌশল হ'তে পরাধীন দেশের আর্থিক কর্ম-কৌশলকে পূরাপূরি পৃথক্ বা আলাদা ক'রে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। সোভিয়েট-রুশিয়ার কমিউনিস্ট অর্থনীতি বিলকুল আলাদা চিজ। তার আলোচনা এই আসরে অপ্রাসঙ্গিক।

লেখক—স্বাধীন আর পরাধীন জাতের আর্থিক ব্যবস্থায় কি কোনো প্রভেদ নাই?

সরকার—প্রভেদ আছে বিস্তর। প্রথম কথা—পরাধীন দেশের মাতব্বর-স্থানীয় লোক সব-কয়জনই বিদেশী থাকে। সুতরাং তাদের খোর-পোষ, রাহা-খরচ, পারিবারিক ভাতা, পেনশন ইত্যাদি দফায় প্রচুর টাকা বিদেশীর ট্যাঁকে যায়। বিদেশে রপ্তানি হয়। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য রূপচাঁদের মুখ বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর দেশকে জুতিয়ে চাবুক লাগিয়ে বড় ক'রে তোলা—স্বাধীন দেশগুলার দস্তুর। তাদের পক্ষে সম্ভবও বটে। কিন্তু পরাধীন জাতের জন্য এইরূপ স্বদেশসেবা-মূলক মোসাবিদা মাফিক আর্থিক কর্ম-কৌশল চালু করা অসম্ভব। এইজন্য বিদেশী বাদশাদের দরদ থাক্‌তেই পারে না। উল্টা দিকে তাদের দরদ থাকে। তাদের নজর থাকে পরাধীন দেশটাকে শিল্পে-যন্ত্রে-বিজ্ঞানে-শিক্ষায় নিজ দেশের অনেক নীচে চেপে রাখার দিকে। যাহ'ক,—এই সবই রাষ্ট্রনীতির কথা। খাঁটি অর্থনীতির ভেতর এই আলোচনা পড়ে না।

লেখক—স্বাধীন ভারতের অর্থনীতিতে আর পরাধীন ভারতের অর্থনীতিতে প্রভেদ তা হ'লে কিরূপ?

সরকার—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সকল আর্থিক আইন-কানুন জারি হ'য়েছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন থাক্‌লেও তার অনেককিছুই ভারতীয় নরনারী কায়েম কর্‌তে বাধ্য হ'তো। আজ যদি ভারতবর্ষ সত্যিকার স্বরাজ পায় বা স্বাধীনতা লাভ করে তা হ'লে কী দেখ্‌বো? দেখা যাবে যে, বর্তমান আর্থিক আইন-কানুনের বেশ-কিছু অংশ বজায় রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হ'চ্ছে। নতুনও কিছু-কিছু দেখা যাবে।

লেখক—নূতনত্বের ভিতর কী-কী থাক্‌বে?

সরকার—প্রথমতঃ, প্রত্যেক সরকারী আর বে-সরকারী কর্মক্ষেত্রের মাথায় বহুসংখ্যক ভারতীয় কৃতী ব্যক্তির দল। অধিকন্তু উঁচু কর্মচারীদের বেতন বর্তমান বেতনের পাঁচ ভাগের এক ভাগে নামানো হয়েছে। আর নিচু কর্মচারী-কেরাণীদের তঙ্‌খা বেশ-কিছু বাড়ানো হয়েছে।

লেখক—আর কিছু মনে হচ্ছে?

সরকার—আর দেখা যাবে যে, দেশকে রাতারাতি যন্ত্রনিষ্ঠায়, ব্যাঙ্ক-সম্পদে, কৃষি-গৌরবে আর বাণিজ্য-বহরে বাড়িয়ে তুল্‌বার জন্য সকল কর্মক্ষেত্রের সমবেত সাধনা। কোনো বিদেশীর চোখের আলো দেখে দেশের লোকেরা পুতুলের মতন আর নাচানাচি কর্‌ছে না।

রমেশ দত্ত'র পরবর্তী বাঙালী অর্থশাস্ত্র

২৪শে জানুয়ারি ১৯৪৪

মন্মথ—ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে আপনি যে-সব নতুন কথা বল্‌ছেন তার স্বপক্ষে অন্য কোনো ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীর মতিগতি দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি?

সরকার—মজার প্রশ্ন সন্দেহ নাই। "প্রায়-সার্ব-ভারতীয়" অর্থশাস্ত্র, "স্বদেশী-মার্কা" অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি অর্থশাস্ত্র ক্রমে-ক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। রমেশ দত্ত'র অর্থনৈতিক রচনাবলীকে আমি বঙ্গ-বিপ্লবের আর স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম বেদ-বাইবেল-কোরাণ ব'লে থাকি। কিন্তু তাঁর চিরস্থায়ী-জমিদারি-বন্দোবস্ত-বিষয়ক তারিফ একালে যুবক ভারতের কোন্-কোন্ মহলে কল্কে পায়? ১৯২১-২৪ সনে প্রথম বারকার ইয়োরোপ-প্রবাসের সময় জমি-জমার আধুনিক আইন-কানুন দেখ্‌তে পাই জার্মানি। বিস্‌মার্ক-প্রবর্তিত (১৮৮০-৯০) নয়া-ঢঙের জমিদারী দেখ্‌বামাত্র রমেশ দত্তকে বাতিল বিবেচনা কর্‌তে থাকি। "ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট" (১৯২৬) ইত্যাদি বইয়ে তার নজির আছে। আজ ফ্লাউড্ কমিশনের পাঁতিতে (১৯৪০) সেই বিস্‌মার্ক ঋষির জমি-কানুন ভারতে অনেকটা কায়েম হবার পথে এসেছে। তার স্বপক্ষে অর্থাৎ কংগ্রেস-নায়ক রমেশ দত্ত'র বিরুদ্ধেই চল্‌ছে একালের ভারতীয় স্বদেশ সেবকগণের অর্থনৈতিক মতিগতি।

লেখক—ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী-মহলে মতিগতি-পরিবর্তনের আর কোনো দৃষ্টান্তটা খুবই লক্ষ্য কর্‌তে পারা যাচ্ছে সন্দেহ নাই।

সরকার—স্বদেশী যুগে জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রেডরিক লিস্ট্-প্রবর্তিত (১৮৩০) সংরক্ষণ-

নীতির স্বপক্ষে মেজাজ খেল্তো রমেশ দত্ত'র আর মারাঠা স্বদেশ-সেবক রানাডের। কংগ্রেসের আবহাওয়ায় ষোলআনা "সংরক্ষণ-নীতি'ই ছিল তামাম ভারতের একমাত্র বাণিজ্য-নীতি'। আজ ১৯৪৪ সনে ভারতের সকল স্বদেশ-সেবকই অর্থশাস্ত্রী হিসাবে সংরক্ষণ নীতির এক-তরফা গুণ গাইতে রাজি কি? অনেকেই ভারতীয় আর্থিক উন্নতির জন্য নানা ক্ষেত্রে অশুল্ক (অবাধ বা স্বাধীন) বাণিজ্যের স্বপক্ষে পাঁতি দিতে অগ্রসর। কিষাণ-প্রধান বাঙালী জাত্ পুরাপুরি সংরক্ষণ-নীতি বরদাস্ত করতে পারে না।

লেখক—দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার দরুণ দেখ্তে পাচ্ছি যে, শুল্কনীতি সম্বন্ধে ভারতীয় স্বদেশ-সেবক আর অর্থশাস্ত্রীরা সকলেই একমত নন। ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের এই মত-পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য দিকে আপনি মোটের উপর ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের গতি কিরূপ দেখ্ছেন?

সরকার—স্বদেশী-মার্কা অর্থশাস্ত্রে ভাঙন লেগেছে। রোজ-রোজই দেশোন্নতি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখ্তে পাওয়া যাবে। ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণের অর্থনৈতিক মতামত যুগে-যুগে ব'দ্লেছে। ভবিষ্যতে আরও বদ্লাবে। আজই বলা চলে যে,—আর্থিক ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে একটা তথাকথিত "ন্যাশন্যালিস্ট" বা দাগ-দেওয়া জাতীয়তা-পন্থী মত নাই। স্বদেশী-মার্কা ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের যুগ লোপ পেয়েছে বলা যেতে পারে। অথবা সেই যুগটা লোপ পায়-পায় হ'য়েছে।

লেখক—ন্যাশন্যালিস্ট বা জাতীয়তা-পন্থী অর্থশাস্ত্র ছাড়া আর কোন্ অর্থশাস্ত্র ভারতে থাক্তে বা গজাতে পারে?

সরকার—কেন? ইতিমধ্যেই কিছু-কিছু ধারা চলেছে কিষাণ-পন্থী অর্থশাস্ত্রের। তার উপর আছে মজুরপন্থী অর্থশাস্ত্রের দিগ্‌বিজয়। এটাকে এক কথায় সোশ্যালিস্ট বা সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক মত ও পথ বল্তে পারি। অধিকন্তু রুশ-মেজাজি কমিউনিস্টপন্থী অর্থশাস্ত্রও অল্পবিস্তর উঁকি-ঝুঁকি মার্ছে। তাব প্রাণের কথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ-সাধন। তাতে পুঁজিপাটা হবে সরকারী চিজ, সুদ-মুনাফা-কারও হবে সরকারী ধনদৌলত।

লেখক—আপনি কি বল্তে চাচ্ছেন যে—জাতীয়তা-পন্থী স্বদেশীমার্কা অর্থশাস্ত্র একদম মারা বা চাপা প'ড়ে যাবে? তার জায়গায় হয় কিষাণ-পন্থী না হয় মজুর-পন্থী (সোশ্যালিস্ট) না হয় কমিউনিস্ট পন্থী অর্থশাস্ত্র ভারতে মাথা তুলে দাঁড়াবে?

সরকার—আমি অমন জোরের সঙ্গে মন্তব্যটা ঝাড়ছি না। বল্ছি একটা সহজ কথা। অন্যান্য কর্ম ও চিন্তার মতন ধনদৌলত আর অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধেও ভারতে আজ বহুত্বের জয়-জয়কার। রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতার স্বপক্ষে থেকেও বহু ভারতসন্তান কংগ্রেস-বিরোধী আর্থিক মতামত চালাচ্ছে। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার ধুরন্ধরেরাও ভারতীয় স্বদেশী বণিক-সমিতিসমূহের অপছন্দ-সই অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের ঝাণ্ডা খাড়া কর্ছে। রমেশ দত্ত'র পরবর্তী ভারতীয় ও অন্যান্য অর্থশাস্ত্রীরা ধনবিজ্ঞানের গবেষণায় তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের ইজ্জদ্ রক্ষা ক'রে চল্তে নারাজ। এই বহুত্ব বা অনৈক্যের উপর আমি জোর দিচ্ছি। কোনো "দাগী", দাগ-দেওয়া মত বা পথের স্বপক্ষে আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী কর্ছি না।

লেখক—"প্রায়-সর্বভারতীয়" অথবা স্বদেশী-মার্কা-ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের উল্টা অথবা সমালোচনা-মূলক রচনা আপনার কোন্-কোন্ বইয়ে পাওয়া যায়?

সরকার—প্রায়-সব বইয়েই,—এমন কি বোধহয় প্রায়-সব প্রবন্ধেই। ১৯২১ সনে আমি প্যারিসে। সেই সময়ে ফরাসী ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ আমাকে তাদের সভ্য করে নেয়। তার

পরবর্তী প্রত্যেক লেখারই স্বদেশী-মার্কা ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের কিছু-না-কিছু বিরোধী মন্তব্য ঝেড়েছি। একটা মজার কথা বল্‌ছি। "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি" নামে লিস্ট-প্রণীত জার্মাণ বইয়ের কিয়দংশ বাংলায় ঝেড়েছি বটে (১৯১৪-১৯৩২)। কিন্তু লিস্টের অর্থনৈতিক পাঁতির স্বপক্ষে পুরাপুরি উকিলি কর্‌তে পারিনি। তর্জমার ভূমিকায়ই আংশিকভাবে লিস্ট-বিরোধী কথা বল্‌তে হয়েছে।

লেখক—এই ধরণের আপনার আর দু-একটা সর্বভারত-বিরোধী মতামতের দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—বিলাতী ও অন্যান্য বিদেশী পুঁজি আমদানির স্বপক্ষে এই অধমের রায় চল্‌ছে অতি নির্দয়ভাবে। ভারতীয় সিক্কা ও বিনিময়ের হার সম্বন্ধে ভারতের প্রায়-সার্বজনিক মতের বিরুদ্ধেই মতি-গতি খেল্‌ছে ১৯২৫-২৬ সন হ'তে। এমন কি অটোওয়া-সম্মেলনে প্রবর্তিত শুল্কনীতি সম্বন্ধেও আমাকে প্রায়-সর্বভারতীয় মত বর্জন কর্‌তে হ'য়েছে (১৯৩৪)। তা ছাড়া বর্তমানে লড়াইয়ের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করার সময় প্রায়-সর্বভারতীয় বিচার-প্রণালী মেনে চল্‌তে পারছি না।

"ইকুয়েশন্‌স্ অব ওয়ার্লড্-ইকনমি" (বিশ্বদৌলতের সাম্য-সম্বন্ধে) বইয়ে (১৯৪৩ অক্টোবর) অতিমুদ্রা, অতিমূল্য, লড়াইয়ের খর্চা, কর্জ বনাম কর, মার্কিণ লেণ্ড-লীজ, বিলাতী "ব্যাঙ্কর", মার্কিণ "উনতাস" ইত্যাদি সমস্যার সমালোচনা আছে। এই সকল বিষয়ে প্রায়-সর্বভারতীয় মতের উজান চল্‌তে হ'য়েছে অনেক ক্ষেত্রে। অবশ্য প্রায়-সার্বজনিক পথের উল্টা পথই যে আগাগোড়া নির্ভুল পথ সে কথা বল্‌ছি না। সবই বিচারের সামগ্রী—তর্কাতর্কির বস্তু।

("দুনিয়া-নিষ্ঠ ও বস্তু-নিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র" ১লা নবেম্বর, ১৯৪২, "সবার বিরুদ্ধে একা", ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩১ ; "বিনয় সরকারের বৈঠকে" প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫, ২৯০)

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

গুরুদাসের "জ্ঞান ও কর্ম"

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

সুবোধ ঘোষাল—শুন্‌লাম আপনি সেদিন গুরুদাস-শতবার্ষিকীর সভায় (সেনেট হল, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৪৪) "জ্ঞান ও কর্ম" (১৯১০) বইয়ের জন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমর ব'লেছেন? এর মানে কী?

সরকার—মানে জটিল নয়। অতি সোজা। "জ্ঞান ও কর্ম" যে-ধরণের বই সে-ধরণের বই বাংলা ভাষায় বেশী নাই। বইটা দার্শনিক-সাহিত্যের মাল। গুরুদাস দার্শনিক। কিন্তু একমাত্র এই হিসাবে এই বইয়ের বিশেষত্ব নয়।

লেখক—কেন, এই বইয়ের বিশেষত্ব কী? বাংলা গদ্য-সাহিত্য কি নেহাৎ দরিদ্র?

সরকার—এই বিচারে উপন্যাস-সাহিত্য বাদ দিতে ব'লেছি। তা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্য বাস্তবিক বেশ-কিছু দরিদ্র। আজ ১৯৪৪ সনেও। ১৯১০ সন পর্যন্ত আরও দরিদ্র ছিল।

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম" কোন্ জাতের বই?

সরকার—জাত্ ঠিক করা সম্ভব নানা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।

লেখক-—কোন্ দিকে এই বই সম্বন্ধে নজর বেশী দিচ্ছেন?

সরকার—কোনো-এক বিষয়ের বড়-বই।

লেখক—রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর ভেতর কি কোনো-এক বিষয়ে লেখা বড়-বই নাই?

সরকার—রাবীন্দ্রিক দর্শন-সাহিত্যের ভেতর কিছু-না-কিছু থাকা উচিত। খোঁজ চালিয়ে দ্যাখ্ না। সেদিনকার সভায়ও এই খোঁজ চালাতেই ব'লেছি। সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা থেকে শ্রোতাদের ভেতরকার চরম কমিউনিষ্ট ছোক্‌রা পর্যন্ত সকলের কাছেই এই খোঁজ চালাবার জন্য আর্জিটা পেশ ক'রেছি।

("হীরেন মুখোপাধ্যায়ের রুশ-প্রীতি" মে ১৯৪৪)

"প্রাবন্ধিক" রবীন্দ্রনাথ

সুবোধ ঘোষাল—রবীন্দ্র-সাহিত্যের গদ্য-বিভাগে বড়-আকারের বই পাওয়া যায় না কি? কত পৃষ্ঠাকে বড় বল্‌বেন?

সরকার—"জ্ঞান ও কর্ম" সাড়ে চার-শ' পৃষ্ঠা পেরিয়ে গেছে। যাক্, বইয়ে শ'তিনেক পৃষ্ঠা থাক্‌লেও সম্প্রতি কিছু-কালের জন্য আমি তাকে বড়-বহরের বই বল্‌তে অরাজি হবো না। সাহিত্য-পরিষৎ থেকে "রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়" বেরিয়েছে (ব্রজেন ব্যানার্জি -সম্পাদিত)। তাতে সজনী দাশের ভূমিকাও আছে। রবীন্দ্রনাথের "কালান্তর" দেখেছি ২৪৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বেরিয়েছে ১৯৩৭ সনে। "প্রাবন্ধিক" রবীন্দ্রনাথের হাতে "জ্ঞান ও কর্ম"র সমান বড়-বই বেরোয় নি।

লেখক—"কালান্তর"ও চল্‌বে না?

সরকার—না। এমন কি এর ভিতর পুরা শ'তিনেক পৃষ্ঠা থাক্‌লেও চল্‌বে না। কেননা এই বই হ'চ্ছে অনেকগুলা সাময়িক প্রবন্ধের সংগ্রহ। চাই এমন বই যে-টা খাপছাড়া বিবিধ-প্রবন্ধের সমষ্টি নয়। চাই নির্দিষ্ট কোনো-এক বিষয়ে চিন্তার ক্রম-বিকাশশীল রচনা। এমন বই যাতে আলোচ্য বিষয়ের কোনো-কিছু বাদ না পড়ে। সাজানো-গুছানো ভাবধারার বই।

লেখক—রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভেতর তা'হলে আপনার মাপকাঠিতে বড়-বই পাচ্ছে না।

সরকার—রবীন্দ্রের গদ্য বইগুলার বোধ হয় সবকটাই "বিচিত্র প্রবন্ধ" (১৯০৭) ছাড়া আর কিছু নয়। একালের "ছন্দ" (১৯৩৬) ও "সাহিত্যের পথে" (১৯৩৬) আর সেকালের "সাহিত্য" (১৯০৭), "স্বদেশ" (১৯০৮), "সমাজ" (১৯০৮) ও "শিক্ষা" (১৯০৮) ইত্যাদি সবই প্রকারান্তরে বিবিধ প্রবন্ধ। এক একটা প্রবন্ধের বহর দশ-বারো বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠা। ব্যস্। এতে প্রবন্ধের ভেতরকার আসল মাল সম্বন্ধে উনিশ-বিশ কিছু হয় না। নেহাৎ ছোট্ট প্রবন্ধেও অমূল্য কথা থাক্‌তে পারে। চিন্তার মূল্য বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। বল্‌ছি শুধু বইগুলার বহর বিষয়ক জাত্ সম্বন্ধে কথা। আমি চাই কোনো-এক বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তায় ভরা তথ্যপূর্ণ যুক্তিশীল ও সু- সম্বন্ধে বড়-কিছু।

লেখক—রবিবাবুর প্রবন্ধ-সাহিত্য তা হ'লে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত?

সরকার—রৈবিক প্রবন্ধগুলা এক-একটা সনেট্-গোছের। কোনো দুএকটা চিন্তা প্রচারের জন্য লেখা এই সব প্রবন্ধ। বেশী-কিছু তথ্য জোগানো এই সকল রচনার মতলব নয়। স্বপক্ষে-

বিপক্ষে যুক্তি-তর্কের বিশ্লেষণ এই সবের ভেতর আসে না। কোনো-কোনো মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু লেখকের মন্তব্যটা, বাণীটা কতকগুলা উপমার মারফৎ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই হ'লো রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের লক্ষ্য। এতে পাই শব্দের ফুলঝুরি আর তুলনার হাত-সাফাই। মাঝে-মাঝে হাসি-ঠাট্টার ছোঁআচও আছে। মগজের উপর ঘা লাগে মন্দ নয়। তবে হৃদয়ের উপর ঘা লাগে দস্তুরমতন। প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত মোটের উপর সর্বদা এক মন্তরই পাচ্ছি। যুক্তি এগুচ্ছে না, চিন্তা এগুচ্ছে না, এগুচ্ছে শুধু হৃদয়ের স্পন্দন। এই হ'লো রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধের সাধারণ কাঠামো।

লেখক—রবিবাবুর লেখা বড়-প্রবন্ধ কি নাই?

সরকার—যেগুলা পঁচিশ-ত্রিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সেগুলাও প্রধানতঃ এই উপমা-তুলনারই কারবার। তবে আকারে কিছু-বড় ব'লে সে-সবকে ব'ল্‌বো "সনেটের সারি"। এমন কি কাব্য-সাহিত্যের "ওড্"-জাতীয় রচনা যেরূপ, রাবীন্দ্রিক বড়-বড় প্রবন্ধগুলা ঠিক-যেন তাই।

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম" কোন্ জাতের বই?

সরকার—বইটা সনেটের ধারা বা ওডের সারি নয়। এ বই হচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিন্তার পর চিন্তা, যুক্তির পর যুক্তি। তর্কাতর্কি আছে বেশ-কিছু। মত-খণ্ডন আর মত-প্রতিষ্ঠা হ'লো বইটার প্রাণ। আর এই সবের সাহায্যে আগা-গোড়া একটা নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমন ভাবে যে, সে-সম্বন্ধে আর বেশী-কিছু বল্‌বার থাকে না। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ সেই-ধরণের লিখিয়ে নন।

বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর

সুবোধ ঘোষাল—বিবেকানন্দ-সাহিত্যের ভেতর "জ্ঞান ও কর্ম"-জাতীয় "বড়-বই" নাই কি?

সরকার—না। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বার-চৌদ্দ আনাই হ'লো পুরোণো সংস্কৃত চিন্তার তর্জমা বা চুম্বক ও সার-সংগ্রহ। অবশিষ্ট মাল স্বাধীন চিন্তার ফল। কিন্তু সে-সব বক্তৃতা বা প্রবন্ধ। "জ্ঞান ও কর্ম" পরকীয় চিন্তার তর্জমা বা সার-সংগ্রহ নয়। বক্তৃতা ও প্রবন্ধও নয়। "প্রাবন্ধিক" বিবেকানন্দ এই ধরণের বড়-বইয়ের লেখক নন।

লেখক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তো আপনি খুব গুণগ্রাহী ও ভক্ত। ইনি গদ্য ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি। "জ্ঞান ও কর্ম"-জাতীয় বই রামেন্দ্র-সাহিত্যে নাই কি?

সরকার—আলোচনার বস্তু। রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক বই-ই প্রবন্ধ-সংগ্রহ মাত্র। তবে "যজ্ঞ-কথা" বইটা (১৯২১) নির্দিষ্ট কোনো-এক বিষয়ের লেখা সন্দেহ নাই। কিন্তু বইটা প্রাচীন বৈদিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা। খানিকটা ঐতিহাসিক। তবে মোটের উপর বইটা দার্শনিক বটে। স্বাধীন চিন্তাও আছে নিশ্চয়। আকারে শ'-তিনেকের কাছাকাছি নয়। যা হ'ক একে "জ্ঞান ও কর্ম"-জাতীয় বইয়ের কোঠে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রেও ঠাঁই দেওয়া চলে।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

সুবোধ ঘোষাল—আপনি ইতিহাস-বিষয়ক বইকে আপনার মেজাজ-মাফিক বড়-বইয়ের কোঠে ঠাঁই দিতে রাজি নন?

সরকার—না। বাঙ্‌লায় ১৯১০ পর্যন্ত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের বই একপ্রকার ছিল না। আজকাল বাঙালীর হাতে ঐতিহাসিক ও প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণার ফল বেশ-মোটা আকারের ঢাউস্-ঢাউস্ বইয়ে বেরুচ্ছে। সে-সব খুবই তারিফ-যোগ্য। কিন্তু সে-সবের মাল "জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ের মালের জুড়িদার নয়। ঐতিহাসিক স্বাধীন চিন্তা এক শ্রেণীর জিনিষ। আর "জ্ঞান ও কর্ম"-বইয়ের স্বাধীন চিন্তা অন্য শ্রেণীর জিনিষ। ঐতিহাসিক বইয়ের আকার অনেক সময়ে অতি সহজেই বেড়ে যায়। মনে কর্ আউরাংজেবের বদ্‌না তৈরি হ'তো কোথায়—বিহারে না লক্ষ্ণৌয়ে? এই নিয়ে পঁচিশ পৃষ্ঠা গবেষণা চালানো বেশী-কিছু নয়। তেমনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বুট্ কোথ্‌থেকে আসতো? আফ্‌গানিস্থান থেকে? না পাটনায় তৈরী হ'তো: এই ধরণের খোঁজ চালাতে গিয়ে রামার সাক্ষ্য, শ্যামার সাক্ষ্য, আব্দুলের সাক্ষ্য, ইস্‌মাইলের সাক্ষ্য আনা চলে। তাতে পুঁথি বেড়ে যাওয়া অতি-স্বাভাবিক। জীবনচরিত-বিষয়ক বই এই কারণে বাদ দিচ্ছি। "জ্ঞান ও কর্ম"-শ্রেণীর বইয়ে প্রত্ন-তাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক ঢাউস্ সৃষ্টির সম্ভাবনা বা সুযোগ নাই।

লেখক—আপনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে ছোটদরের সাহিত্য বিবেচনা করেন?

সরকার—কোনো মতেই না। দর্শনের চেয়ে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব নীচু জাতের জিনিষ নয়। বিবেকানন্দ-সাহিত্য বাদ দিয়েছি। রামেন্দ্র-সাহিত্যের দর্শন-বিজ্ঞানও বাদ দিয়েছি। এই -।ব দর্শন-সাহিত্য গুরুদাসের দর্শন-সাহিত্যের চেয়ে ছোটদ্‌রের চিজ নয়। কিন্তু তবুও বাদ দিয়েছি প্রধানতঃ রচনাগুলা প্রবন্ধ মাত্র ব'লে। তা ছাড়া রচনাগুলা বহরে বড় নয় ব'লে। "জ্ঞান ও কর্ম"-বইয়ের জাত্ আলোচনায় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও জীবন-চরিত সম্প্রতি কিছু কালের জন্য বাদ দিতে চাই অন্য কারণে। কেননা ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও জীবন-চরিত সাহিত্যে বড়-বহরের বই দাঁড় করানো অনেকটা সহজেই সম্ভব। তবে এই জন্যে মাল হিসাবে এই দুই সাহিত্যকে নাক শিট্‌কাবার কারণ নাই।

মুসলমান প্রাবন্ধিকগণ

লেখক—মুসলমান লেখকদের ভেতর বড়-বহরের দার্শনিক-বইয়ের গ্রন্থকার নাই কি?

সরকার—১৯১০-এর আগে তো ছিলই না। আজও দেখ্‌ছি না।

লেখক—একলের কয়েকজন মুসলমান "প্রাবন্ধিকের" নাম কর্‌বেন?"

সরকার—আক্রাম খাঁ, আবদুল ওদুদ, ওআজেদ আলি, হুমায়ুন কবির, আবু সয়ীদ আইয়ুব ইত্যাদি কয়েকজনের লেখা প'ড়েছি।

লেখক—ওয়াজেদ আলির নাম তো শুনি নি?

সরকার—বোধ হয় তাঁর পেশা হাকিমী-জজিয়তি ব'লে লেখক হিসাবে তাঁকে অনেকে জানে না। ওআজেদ আলি কবি। পাঞ্জাবী ইকবালের উর্দু ও ফার্সী রচনা হ'তে বাংলা তর্জমা (সারসংগ্রহ) ও তাঁর হাতে বেরিয়েছে। "জীবনের শিল্প" (১৯৪১) হ'চ্ছে প্রাবন্ধিক ওআজেদ

আলির অন্যতম সাক্ষী। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে তাঁর দরদ আছে। "গুলিস্তাঁ"-মাসিক তাঁর তদ্‌বিরে বেরোয় সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলা "রক্তমাংসের মানুষের" চোখে দেখ্‌বার ও বুঝ্‌বার দিকে এঁর মেজাজ খেলে। এই মেজাজ সাধনা করা অনেক লেখকের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। তা হ'লে কথায়-কথায় হিন্দু-মুসলমান-ইহুদি-খৃষ্টিয়ান বা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বুলি বেরুবে না।

সমাজ-শাস্ত্রী অক্ষয় দত্ত

সুবোধ—এইবার তা হ'লে আপনি নিজেই বলুন, "জ্ঞান ও কর্ম"-জাতীয় বাংলা বই আর ক'খানা আপনি পেয়েছেন?

সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বেরিয়েছিল সমাজ-শাস্ত্রী অক্ষয় দত্ত'র "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" (১৮৫১), ১৮৫২)। সে বইটা বাঙালীর চিন্তা-সম্পদের বিপুল খুঁটা।

লেখক—কেন? এর বিশেষত্ব কী?

সরকার—তাতে ছিল বাঙালী মগজের বস্তু-নিষ্ঠা, যুক্তি-নিষ্ঠা, আর বিজ্ঞান-নিষ্ঠা। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই বইটা ইংরেজি বইয়ের চুম্বক বা সারসংগ্রহ। লেখক বা অনুবাদক অক্ষয় দত্ত।

লেখক—অক্ষয় দত্ত'র রচনাবলী সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—তাঁর গদ্য, সাহিত্য বাংলা ভাষার উপাদেয় সামগ্রী। তিনি ধর্ম-জীবন নিরেট বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কায়েম ক'রেছিলেন। এই বইটা তারই সাক্ষী।

লেখক—এই ধরণের বই কি সে যুগে আর ছিল না?

সরকার—মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন ইত্যাদি যুগের আর তার পরবর্তী বছর পঞ্চাশেকের ভেতর ঠিক এই দরের চিন্তামূলক এক-বিষয়ের বড়-বই বাংলায় আমাব নজরে পড়ে না। আগেই ব'লেছি খোঁজ লওয়া উচিত।

বঙ্কিমের "ধর্ম-তত্ত্ব"

সুবোধ ঘোষাল—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—এই সম্বন্ধে "জ্ঞান ও কর্ম"-জাতীয় মাত্র দু'খানা বই নজরে প'ড়েছে। দুই গ্রন্থকারের। প্রথম বঙ্কিমের "ধর্মতত্ত্ব" (১৮৮৮)। দ্বিতীয় ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ" (১৮৯২)। ব্যস। এইখানেই ফিরিস্তি শেষ। ১৯১০ সনে প্রকাশিত গুরুদাসের বইয়ের সময় পর্যন্ত আর কোনো বই এই শ্রেণীর ভেতর পড়্‌ছে না। বোধহয় প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রীক ও হিন্দু" এইখানে ফেলা চলে।

লেখক—বঙ্কিমের "ধর্ম-তত্ত্ব"কে কেন এই শ্রেণীতে ফেল্‌ছেন? এটা লম্বায়-চৌড়ায় শ'তিনেক পৃষ্ঠা যায় কি?

সরকার—বহরে কিছু ছোট বটে! দুঃখের কথা,—এই বিষয়ে আমাদের অবস্থা এত সঙ্গীন যে, মাত্র শ'তিনেক পৃষ্ঠার বইও বাংলা গদ্যে বেশী নাই। "জ্ঞান ও কর্ম"-শ্রেণীর কথাই ব'ল্ছি। যা হ'ক, "ধর্ম-তত্ত্ব" সাময়িক প্রবন্ধের সংগ্রহ নয়। এই বইয়ে প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট চিন্তার ধারা ফুটানো হ'য়েছে। অবশ্য একটু "কিন্তু"ও আছে।

লেখক—"কিন্তু"টা কী?

সরকার—বইটা প্রশ্নোত্তরের আকারে লেখা। "গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধে" হ'চ্ছে বইটার কাঠামো। অনেকটা "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" বিশেষ। তবে বঙ্কিম নিজে বক্তব্যগুলা সহজে প্রকাশ কর্বার জন্য এই কথোপকথনের প্রণালী কায়েম ক'রেছেন। প্রশ্নকর্তা নিজেই,—অপর কোনো লোক নয়। কোনো আল্টপ্কা বাজে কথা এর ভেতর ঢুকতে পারে নি। নিজেরই প্রশ্ন, নিজেরই জবাব। প্রশ্নগুলি যুক্তিপূর্ণভাবে ধারাবাহিক তর্কের প্রণালীতে সাজানো হ'য়েছে। বইটা সত্যিকার বঙ্কিম-দর্শন সন্দেহ নাই। এই দর্শনের মূর্ত দৃষ্টান্ত পাই "কৃষ্ণ-চরিত্র" বইয়ে (১৮৮৬)। বই-দুটা একসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "কৃষ্ণচরিত্র" হ'চ্ছে ধর্মতত্ত্ব" ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক মাল নয়। এই রচনা দার্শনিক। তবে বঙ্কিমের এই দর্শন-গ্রন্থ সম্বন্ধে বাংলা দেশে বোধহয় ভুল ধারণা আছে।

লেখক—কী ভুল ধারণা?

সরকার—বাঙালী আমরা মনে করি যে, "অনুশীলন-তত্ত্ব" বঙ্কিমের নিজ মগজ হ'তে বেরিয়েছে। এই বিশ্বাস ঠিক নয়। বঙ্কিম-দর্শন খাঁটি বঙ্কিমী মাল নয়,—খাঁটি হিন্দু মালও নয়,—খাঁটি ভারতীয় মালও নয়। "ধর্ম-তত্ত্ব" বিদেশী দর্শনের চুম্বক বা সার। একে পাশ্চাত্য দর্শনের বাঙালী সংস্করণ বলা উচিত।

লেখক—কেন?

সরকার—বঙ্কিম ছিলেন ফরাসী দার্শনিক কঁৎ-প্রবর্তিত ধর্মের অনুরাগী ও প্রচারক। কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) খৃষ্টধর্মের বিরোধী দর্শন ও ধর্ম খাড়া ক'রেছিলেন। তাতে দেবদেবী, পূজা-অর্চনা। ইত্যাদির ঠাঁই নাই। কঁৎ-ধর্মকে মানব-পূজা ও মানব-সেবার দর্শন বা ধর্ম বলে। এর পারিভাষিক নাম "পজিটিভিজম্" (সংসার-নিষ্ঠা বা জগৎ প্রীতি)। সমাজ-সেবা কঁৎ-ধর্মের আসল কাজ। সহজে এ হ'চ্ছে নিরীশ্বর-ধর্ম বা নাস্তিকতার অন্তর্গত।

লেখক—বঙ্কিম কি "ধর্মতত্ত্ব" বইয়ে সংসার-নিষ্ঠা, জগৎপ্রীতি, মানব-সেবা, সমাজ-সেবা ইত্যাদি ধর্মের প্রচারক?

সরকার—অবিকল তাই। এই বইয়ের আসল মুদ্দাই নাস্তিকতা। বঙ্কিম নাস্তিক। হিন্দুধর্মের প্রচলিত দেব-দেবী, যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চনার বালাই বঙ্কিম-দর্শনে নাই। "ধর্মতত্ত্ব" আগাগোড়া অহিন্দু, হিন্দু-বিরোধী। বস্তুতঃ "কৃষ্ণচরিত্র"ও তাই। বঙ্কিম-প্রবর্তিত কৃষ্ণ দেবতা নন। এই কৃষ্ণে হিন্দু সমাজের সুপরিচিত বস্তু পাই না। ইনি কঁৎ-প্রচারিত অসংখ্য বীর-মানব বা মানব-বীরের অন্যতম মহামানব বা অতিমানব। এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মানব-বীর আবিষ্কার করা বঙ্কিম-দর্শনের চরম কীর্তি। এতবড় কৃতিত্ব খুব কম বাঙালীর কপালে ঘ'টেছে। মনে রাখ্তে হবে যে, এই মানব-পূজক সমাজ-সেবক, কঁৎ-ধর্মী বঙ্কিমেরই মাথায় বেরিয়েছিল দেশ-পূজা, দেশ-সেবা।

লেখক—তাহ'লে দেশ-পূজাও অহিন্দু,—নাস্তিকতা?

সরকার—"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের দেবী মামুলি হিন্দু দেবদেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জলমাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদ-নদীর দেবী, দেশ-দেবী, বাঙলা দেশ। নয়া

আধ্যাত্মিকতার ফোআরা ছুট্‌ছে এই মন্তর থেকে। অথচ ইহার ভিতর বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের গন্ধমাত্র নাই। "বন্দ মাতরম্" অহিন্দু আধ্যাত্মিকতার মন্তর, ভক্তিমার্গী নস্তিকতার "সুরা"। এই মন্ত্রে কঁৎ-পন্থী বঙ্কিম-দর্শনের সমাজ-সেবা বা মানব-পূজা সরস মূর্ত্তি পেয়েছে। স্বদেশপূজা-প্রবর্তক বঙ্কিম নবীন অধ্যাত্মজীবনের ভগীরথ।

বাঙ্‌লায় কঁৎ-দর্শনের দিগ্‌বিজয়

৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

সুবোধ—বঙ্কিমের কঁৎ-প্রচার সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

সরকার—আসল প্রমাণ হচ্ছে বঙ্কিম-চিন্তার মোটামোটা খুঁটাগুলা। বঙ্কিমের বইয়ের ভেতর দু-একটা গীতার বচন থাক্‌তে পারে। আর শব্দগুলা বাংলা আর সংস্কৃত-ঘেঁশা। কৃষ্ণ নামটা মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্যের অতি-পরিচিত। তাছাড়া বঙ্কিম লোকটা জ'ন্মেছিলেন হিন্দু ও বামুনের বাচ্চা হিসাবে। এই সব কারণে আমরা সহজেই মেনে নিই যে, "ধর্মতত্ত্ব" আর "কৃষ্ণ-চরিত্র" হিন্দুর লেখা হিন্দু ধর্মনীতি-বিষয়ক বই। এই ধারণা মহাভুল। বঙ্কিমের মগজে অহিন্দু, অ-সনাতনী, অ-পৌরাণিক, অ-বৈদিক খেয়ালগুলা ঘর ক'রে ব'সেছিল। সেই খেয়ালগুলা এসেছিল বিদেশ থেকে। অ-খৃষ্টিয়ান, ক্যাথলিক-বিরোধী, যুক্তিপূজক, মানব-সেবক, নাস্তিক কঁৎ হচ্ছেন বঙ্কিমের আসল গুরু। কথাগুলা দার্শনিক ভাব জগতের তরফ্ থেকে বুঝ্‌তে হবে। লৌকিক ভাবে বুঝ্‌লে চল্‌বে না। লৌকিক হিসাবে বঙ্কিম হিন্দুও বটে, সনাতনী ও বোধ হয়, আর বামুন তো নিশ্চয়ই।

লেখক—কঁৎ আর বঙ্কিমের চিন্তার সাদৃশ্য বা সাম্য ছাড়া আর কোনো প্রমাণ আছে?

সরকার—আছে। চিন্তা সম্বন্ধীয় অর্থাৎ দার্শনিক প্রমাণটাকে আসল প্রমাণ ব'লেছি। কিন্তু ঘটনা-চক্রে বর্তমানে ঐতিহাসিক প্রমাণও দেওয়া সম্ভব। বঙ্কিমের অন্যতম রচনার নাম "ধর্ম-জিজ্ঞাসা"। এই রচনা প্রথমে বেরোয় অক্ষয় সরকার-সম্পাদিত "নব-জীবন" মাসিকে,—১৮৮৪ সনে। সেই রচনাই অনুশীলন-তত্ত্বের অর্থাৎ "ধর্ম-তত্ত্ব" বইয়ের গোড়া।

লেখক—"ধর্ম-জিজ্ঞাসা"'র ভেতর কী আছে?

সরকার—মোলাকাৎ বা কথোপকথনের আকারে এই রচনা লেখা। তাতে বঙ্কিম বুঝিয়েছেন যে, একালের কঁৎ-দর্শন বা সেকালের হিন্দুধর্মও তা। কঁৎ-ধর্মকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্‌ঝা হ'য়েছে। তারপর তার সমান খাড়া করা হ'য়েছে হিন্দু ধর্মকে। কিন্তু কোন্ হিন্দু ধর্ম? সে বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের সনাতন হিন্দু-ধর্ম নয়। তা বঙ্কিমের মনগড়া ধর্ম। অর্থাৎ এমন-কিছু যা কঁৎ-প্রচারিত দর্শনের ভেতর আছে আর তার সঙ্গে খাপ খায়। আসল কথা, বঙ্কিমের মেজাজে ধর্মের কষ্টিপাথর হচ্ছে কঁৎ-ধর্ম।

লেখক—বর্তমান প্রসঙ্গে "ধর্ম-জিজ্ঞাসা" রচনার কথা তুল্‌ছেন কেন?

সরকার—এই রচনার একটা ফরাসী নজির পাওয়া যায় মনে হ'চ্ছে। কঁৎ-প্রণীত প্রশ্নোত্তরের একটা বই আছে। নাম তার "কাতেশিস্‌ম্ পোজিতিভিস্ত্"। এটা বেরিয়েছিল ১৮৫২ সনে। একজন খৃষ্টিয়ান পুরুতঠাকুর তাঁর কোনো মেয়ে-শিষ্যের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন—এই ধরণে বইটা লেখা। তেরটা কথোপকথন আছে। আমার বিশ্বাস,—বঙ্কিমের "কথামৃত"কে পেছনদিকে ঠেকানো চলে কঁৎ-এর "কথামৃত"য়।

লেখক—এই ধরণের কথা আপনি কোনো বইয়ে আগে ব'লেছেন?

সরকার—ব'কেছি বোধ হয় অনেক জায়গায় সার্বজনিক বক্তৃতার আসরে। তবে "ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউন্‌স্ অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্নস্" (১৯৪১)। বইটার ভেতর বোধহয় সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

লেখক—বাঙলায় কঁৎ-দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে আর কিছু বলা চলে?

সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে (১৮৫০-৭৫) বহুসংখ্যক বাঙালী কঁৎ-প্রেমে অল্প-বিস্তর মশ্‌গুল ছিলেন। কঁৎ-দর্শনের প্রবর্তক ছিলেন জজ দ্বারকা মিত্র। তিনি ফরাসী ভাষা জান্‌তেন। খিদিরপুরের যোগেন ঘোষ ছিলেন কঁৎ-দর্শনের অন্যতম পাণ্ডা। বাঙালীরা বোধহয় তা আজও জানে। দেব-দেবী-যা-যজ্ঞের বিরোধ করা, মানব-পূজার গুণ গাওয়া আর সমাজ-সেবার ঝাণ্ডা খাড়া করা ছিল সেই আবেষ্টনের বড়-বড় দফা। বাঙলাদেশের সেই আবহাওয়ায়ই দেখা দেয় বিবেকানন্দ'র সমাজ-সেবা, দরিদ্র-নারায়ণের পূজা ইত্যাদি বস্তু। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও কঁৎ-মতে খানিকটা সায় দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে ফরাসী দার্শনিক কঁৎ বঙ্গসমাজে বেশ-কিছু দিগ্‌বিজয় ভোগ ক'রেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী মনীষীরা কঁৎকে এড়িয়ে চল্‌তে পারেন নি। ১৯১০ সনে প্রকাশিত গুরুদাসী চিন্তায় কঁৎ-প্রভাব র'য়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের "যজ্ঞকথা" বেরিয়েছে ১৯২১ সনে বইয়ের আকারে। এই বইয়ের চিন্তাগুলার ভেতর কঁৎ-প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সেবার জয়জয়কার দেখ্‌তে পাই।

লেখক—একালে কঁৎ বা পজিটিভিজ্‌ম্ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোনো আলোচনা চলে কি?

সরকার—একপ্রকার না বলা উচিত। কঁৎ-দর্শনের শাঁস হচ্ছে মানব-পূজা, লোক-হিত, সমাজ-সেবা। লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালীর মগজে এসব অনেকটা স্থায়ী ঘর ক'রে ব'সেছে বলা চলে। বিবেকানন্দ'র দরিদ্র-নারায়ণ-পূজায় কঁৎ অমর হ'য়ে র'য়েছে। যা হ'ক,—কিছুদিন হ'লো উকিল পতিতপাবন চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে কঁৎ সম্বন্ধে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখিয়েছিলাম,—তোর মনে আছে বোধ হয়?

লেখক—কোথায় বেরিয়েছে?

সরকার—বীরেন বসু-সম্পাদিত "ইণ্ডিয়া টু-মরো" মাসিকে (ডিসেম্বর ১৯৪১)। সেই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তোর একটা রচনাও তো প্রকাশ করানো হ'য়েছিল।

লেখক—"ধর্ম-তত্ত্ব" আর "কৃষ্ণচরিত্র" বই দু'টার বাণী বা মন্তব্যগুলা সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন?

সরকার—শুধু মনে রাখ্‌তে হবে যে, আমি "ধর্ম-তত্ত্ব" বইটাকে "জ্ঞান ও কর্ম" জাতের বই হিসাবে এখানে উল্লেখ ক'রেছি। এর ভেতর কঁৎ-দর্শন আছে বলে বইটা প'চে যাচ্ছে না। এই রচনা মামুলি তর্জমা নয়। কঁৎ-দর্শনের ষোল আনা বাঙালী-করণ বইয়ের ভেতর মূর্ত্তি পেয়েছে। গীতাধর্মী মহাভারত-প্রেমিক সংস্কৃত-গবেষক বাঙালীর মগজে "ধর্মতত্ত্ব" বেরিয়েছে। একমাত্র কঁৎ এই বইয়ের প্রেরণা-দাতা নয়। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে বইয়ের ভেতরকার মতামত আসল আলোচ্য বস্তু নয়। আসল আলোচ্যবস্তু বড়-বহরের বাংলা বই। এই হিসাবে "ধর্মতত্ত্ব" জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ের অন্যতম বড়্-দা। তারই প্রায় সম-সাময়িক, অর্থাৎ আর একখানা বড়্-দা হচ্ছে ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ।"

সমাজশাস্ত্রী ভূদেব

লেখক—আচ্ছা, এইবার "সামাজিক প্রবন্ধ" সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—এই বইটা বেশ-কিছু বড়-বইও বটে। তাছাড়া এটা সাময়িক ও অসংলগ্ন প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ-পুস্তক নয়। চিন্তাগুলা পর-পর গ'ড়ে উঠেছে। কোথাও আলোচ্য বিষয়ের ফাঁক চোখে পড়ে না। দশাননী চোখ নিয়ে ভূদেব এই বই রচনা ক'রেছিলেন। খাপ-ছাড়া ভাবে কতকগুলা ভালো-ভালো কথা ব'লে যাওয়া অথবা পরকীয় মতামত খণ্ডন করা ভূদেবের মতলব ছিল না। একখানা ষোল কলায় পরিপূর্ণ সমাজ-শাস্ত্রবিষয়ক বই খাড়া করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছেও। এই বইয়ের জুড়িদার বা পরিপূরক আর দুখানা বই তিনি লিখেছেন। একটা "পারিবারিক প্রবন্ধ" আর একটা "আচার প্রবন্ধ"। এই দুটাও সর্বাঙ্গসুন্দর ষোল কলায় পরিপূর্ণ বই। তিনখানা বই একত্রে দেখ্‌লে সমাজ-দার্শনিক ভূদেবকে দুনিয়ার সমাজশাস্ত্রীরা খুব উঁচু ঠাঁই দিতে বাধ্য হবে। বইগুলার ভেতরকার মতামত সম্প্রতি আলোচ্য নয়। প্রত্যেক বইয়ের গাঁথ্‌নি সম্বন্ধে এই সব কথা বল্‌ছি। বই হিসাবে "সামাজিক প্রবন্ধ" বাঙালী মগজের অপূর্ব সৃষ্টি। বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্নরূপে এর কিম্মৎ দিন-দিন বেড়ে চল্‌বে।

লেখক—বইটার ভেতর কিছু প্রবেশ করুন না?

সরকার—তাহ'লে মোলাকাতের বহর বেড়ে যাবে। অনেক বকা হ'য়ে গেছে।

লেখক—তবুও দু-এক কথা বলুন।

সরকার—ভূদেবকে কঁৎ-প্রেমে মশ্‌গুল ব'লেছি। কিন্তু সকল বিষয়ে নয়। কঁৎ-প্রচারিত শ্রেণী-বিন্যাসকে ভূদেব হিন্দু বর্ণাশ্রমের জুড়িদার বিবেচনা করেন। এই হিসাবে তিনি কঁৎ-ধর্মী। কিন্তু বঙ্কিমের মতন ভূদেব ষোল আনা কঁৎ-ভক্ত বা কঁৎ ধর্মী নাস্তিক মানব-পূজক নয়। "সামাজিক-প্রবন্ধ" বইয়ের আসল মুদ্দাগুলা কঁৎ-দর্শনের বিরোধী। কঁৎ-প্রচারিত মতগুলা খণ্ডন করা হ'য়েছে জোরের সহিত। তাছাড়া সেকালের লোকপ্রিয় বিলাতী সমাজ-দার্শনিক বাক্‌ল্‌কেও ভূদেব চরম ঘা লাগিয়েছেন। বাক্‌ল্ ছিলেন সমাজের উপর ভৌগোলিক প্রভাব সম্বন্ধে কট্টর অদ্বৈতবাদী। বাক্‌ল্‌কে ভূদেব জুতিয়েছেন জবরদস্ত ভাবে। এই জন্য আমি যার-পর-নাই খুশী।

লেখক—"সামাজিক প্রবন্ধ" বইয়ের আর কিছু বিশেষত্ব আছে?

সরকার—এখনও কিছুই বলিনি। "মহাভারত" বকাতে চাস্ দেখ্‌ছি? এক কথায় বলি, ভূদেব চৌকোস লোক। স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠায় তাঁর নজর ছিল। বিদেশে লোক পাঠিয়েছে আধুনিক কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতিতে আর কলা-বিজ্ঞানে ওস্তাদ তৈয়ারি করানো তাঁর পাঁতির অন্তর্গত। অথচ লোকটা চরমভাবে "সনাতনী" গোঁড়া হিন্দু। তাছাড়া তাঁর রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার দরদও মন্দ ছিল না। ডোজটা বোধ হয় হোমিওপ্যাথিক। কিন্তু বেশ উল্লেখযোগ্য বটে। "সামাজিক প্রবন্ধ" আজও যুবক বাঙলার পড়বার উপযুক্ত বই। এটাকে "ক্লাসিক" ভাবে ছিকে'য় তুলে রাখা উচিত নয়। মাঝে মাঝে পাতা-উল্টানো ভাল।

লেখক—ভূদেবের মতামতগুলা আপনি মেনে চল্‌তে প্রস্তুত আছেন?

সরকার—এই প্রশ্নের জবাবে এককথায় "হাঁ" বা "না" বলা সম্ভব নয়। ভূদেবের সঙ্গে আমার প্রাণে-প্রাণে মিল আছে। তাঁকে আমি খাঁটি স্বদেশ-সেবক, স্বাধীনতার পূজারী, স্বরাজ-সাধক বিবেচনা করি। ভূদের চিরকাল আমার প্রণম্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-দুই দশকে

কোনো বাঙালীর পক্ষে যতদূর চরমপন্থী হওয়া সম্ভব ভূদেব প্রায় ততদূর গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকেও আমি ভূদেবের কোঠেই ফেলি। সেই যুগের কোনো বঙ্গ-সন্তানকে এই দুজনের চেয়ে বড় বিবেচনা করা আজও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই দুইজনই আমার সমানভাবে পূজাস্থান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ভূদেব-বিবেকানন্দ'র অনেক-কিছুই বাতিল।

লেখক—কোন্ কোন্ বিষয়ে বাতিল?

সরকার—রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আর আর্থিক উন্নতিবিষয়ক মতামত আলোচনা কর্‌ছি না। বল্‌ছি যে, পারিবারিক ও সামাজিক পাঁতি সম্বন্ধে ভূদেবের কোনো-কোনো মতামত বর্তমানে আর চল্‌তে পারে না।

লেখক—কী চল্‌তে পারে না?

সরকার—ভূদেব প্রাচীন আচার-সংস্কারের ওপর "জোর" দিয়েছেন। আচার-সংস্কারের অনেক-কিছুই হয়ত ভাল—স্বাস্থ্য, শক্তি ইত্যাদি সুফলের জন্য জরুরি। কিন্তু এই অতি-জোরটা আমার পছন্দসই নয়। ভূদেব খানিকটা ভবিষ্যপন্থী সন্দেহ নাই। নয়া-কিছু আমদানি কর্‌তেও তিনি পেছপাও নন। কিন্তু যা র'য়েছে তা যথাসম্ভব আঁক্‌ড়ে ধরার দিকে মেজাজও তাঁর চরম। সেই মেজাজেরে বিরুদ্ধে চল্‌তে হয় এই অধমকে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালী—কমসে-কম বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক বাঙলার অনেকেই,—এই প্রাচীন-পন্থী, স্থিতি-ধর্মী, ঐতিহ্য-প্রেমিক মেজাজের বিরুদ্ধেই চল্‌ছে। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে নয়া-নয়া জিনিষ আমদানি করা। তার ফলে পুরাণা যতটুকু টেঁকসই থাকুক, যা টেঁকসই নয় তা মরুক। পুরাণাকে বাঁচিয়ে নয়া আমদানি করা এই অধমের মেজাজ নয়।

লেখক—কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণ কি আপনার মতের স্বপক্ষে আছে? সাম্প্রতিক যুবক বাঙলার চরমপন্থী সমাজ-দার্শনিকদেরকে শহর-মফঃস্বলের হিন্দুরা সম্মান করে কি? প্রাচীন-পন্থী ঐতিহ্যধর্মী আচার-সংস্কার বদলেছে কতটা?

সরকার—ঠিক বলেছিস্। এই অধম কল্‌কে পাই না। বাঙালী সমাজের আধ কাঁচ্চাও নয়া পথের পথিক হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। অতি সামান্য অংশ নয়া পথের পথিক। বর্ণাশ্রমের জাত-পাঁত এখনো প্রায় সে-কেলে অবস্থায়ই র'য়েছে। সামাজিক ভাঙা-গড়া বা রূপান্তরের দৌড় অতি-কম।

এই হিসাবে ভূদেবের "সামাজিক-প্রবন্ধ"ই আজ ১৯৪৪ সনেও বাঙালী সমাজের প্রায় পৌনে ষোল আনা অংশের খাঁটি সমাজ-দর্শন। এই জন্যই আমি ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ," "পারিবারিক প্রবন্ধ" আর "আচার প্রবন্ধ" আজও ফেলিতব্য বর্জনীয় মাল বিবেচনা করি না। এই বই তিনটার কিস্মৎ অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালী সমাজে অতি-উঁচু থাক্‌তে বাধ্য।

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম"-জাতীয় বইয়ের জুড়িদার আর কোনো বই দেখ্‌তে পাচ্ছেন ১৯১০ পর্যন্ত।

সরকার—আর ত চোখে পড়্‌ছে না। কিন্তু ব'লেছি, আবার বল্‌ছি, গবেষণা চালানো উচিত। বাঙালী জাতকে আর বাঙলা সাহিত্যকে "ভদ্রলোকের পাতে দেবার" উপযুক্ত ক'রে তুল্‌বার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রচনাগুলা খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ করা জরুরি সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৫ সনের পরবর্তী বছর চল্লিশেকের বাংলা সাহিত্যের খতিয়ান করাও যুক্তিসঙ্গত। গবেষকরা লাগুন এই সব দিকে।

দার্শনিক গুরুদাস

১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

সুবোধ—"জ্ঞান ও কর্ম" বইটার আলোচ্য বিষয় কী কী?

সরকার—বইটা দুই অংশে বিভক্ত—নামেই প্রকাশ। প্রথম অংশে আছে কর্মের কথা। জ্ঞানের আলোচনায় এসেছে জ্ঞাতা কী, জ্ঞেয় কী, অন্তর্জগৎ বা বহির্জগৎ কিরূপ, জ্ঞান লাভের উপায় বা কর্ম-কৌশল কী কী। তারই আনুষঙ্গিক রূপে আলোচিত হ'য়েছে শিক্ষাপ্রণালী। কর্মের অধ্যায়গুলার আসল আলোচ্য বস্তু হচ্ছে কর্তব্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম,—সকল বিষয়েই কর্তব্য-বিশ্লেষণ এই অংশের বিষয়বস্তু। এক কথায় বল্‌বো বইটার নাম "ব্যক্তি ও দুনিয়া"। একখানা সর্বাঙ্গীন দর্শনের ছোট-খাটো বিশ্বকোষ। গুরুদাস সারাজীবন লোকজনের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁশি ক'রে যে সকল অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন সেই সকল অভিজ্ঞতাই "জ্ঞান ও কর্ম"-বইয়ে সাজানো-গুছানো হ'য়েছে। রচনাটা যুক্তিনিষ্ঠ ও তর্কবহুল আর শৃঙ্খলা-জ্ঞানের নিদর্শন।

লেখক—সেকালে আপনার সঙ্গে ত গুরুদাসের যোগাযোগ ছিল। "জ্ঞান ও কর্ম" সম্বন্ধীয় দুএকটা ব্যক্তিগত কথা বলুন না?

সরকার—ডন সোসাইটিতে (১৯০২-০৬) সতীশবাবুর চেলা হিসাবে আর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মাষ্টার হিসাবে (১৯০৭-১৪) গুরুদাসকে আমরা পেতাম আসল গুরুরূপে। ঠিক যেন আমাদের প্রাইভেট টিউটর বা ঘরোয়া লোক গোছের। তাঁর বাড়ীতেও যাওয়া-আসা ছিল। তা-ছাড়া বউবাজারের ন্যাশন্যাল কলেজে আর ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের গলির বাসায় (সতীশবাবুর মেসে) আমরা তাঁকে পেতাম যখন-তখন। দুঘণ্টা আড়াই-ঘণ্টা ক'রে হপ্তায় বার-দুয়েক কথাবার্তার সুযোগ অনেক সময় জুটেছে। সেই সকল কথাবার্তায় যা পেয়েছি তার অনেক মাল দেখ্‌তে পাবি "জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ের নানা অধ্যায়ে।

লেখক—সেই সময়ে আপনার বই বেরুচ্ছিল তো? আপনার রচনাবলী তিনি দেখেছিলেন কি? কী বলতেন?

সরকার—নেহাৎ ব্যক্তিগত কথা। কী আর বল্‌তেন? "শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা", "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" আর "ভাষা-শিক্ষা" বেরোয় ১৯১০-১১ সনে—"জ্ঞান ও কর্ম" (১৯১০) প্রকাশের যুগে। একদিন ব'লেছিলেন ঃ—"তোর শিক্ষা-বিজ্ঞান বইগুলার কোনো-কোনো কথা দু তিনবার পড়্‌লে বুঝা যায়। এই রকম লেখাই উচিত। ভবিষ্যতেও এমন লিখ্‌বি যেন পাঠকেরা একবার প'ড়ে বুঝ্‌তে না পারে। কিছু-কিছু কাঠিন্য থাকা ভাল। সব-কিছুই উপন্যাসের মতন জলবৎ তরল হওয়া ঠিক নয়।" গুরুদাস ভাষায় কাঠিন্যের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকন্তু অল্পকথায় বেশী চিন্তা প্রকাশ তাঁর পছন্দসই ছিল।

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম"-বইয়ে গুরুদাসী কাঠিন্য আছে কি?

সরকার—কোনো কোনো বাক্য কঠিন বটে। বুঝ্‌তে একটু দেরি হয়। তা ছাড়া ফেনিয়ে-ফলিয়ে-বাড়িয়ে বল্‌বার অভ্যাস তাঁর নয়। রচনা-কৌশলটা সংক্ষেপ আর সংহতির দিকে।

লেখক—আপনি গুরুদাসী কায়দা মেনে চলেন?

সরকার—বোধহয় না। আগে বোধহয় সেইরূপই ছিল। হয় ত অক্ষয় সরকারের পাঁতিই আমি আজও মেনে চল্‌ছি। বাক্যগুলা যথাসম্ভব অ-জটিল করা আমার রেওয়াজ। ছোট-ছোট সরল বাক্য আমার পছন্দসই। শব্দগুলা চাই অতি সোজা। যে-কোনো লোকের আর

ছেলে-ছোকরার পড়বামাত্র বোধগম্য হওয়া চাই। "কিন্তু শেষ-পর্যন্ত কী দাঁড়িয়ে যায় বল্‌তে পারি না। অবশ্য সংক্ষিপ্ত আলোচনার দিকে এই অধমের নজর সর্বদাই থাকে।

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম"-বইয়ের রচনা-কৌশল সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌বেন?

সরকার—গুরুদাসের প্রকাণ্ড বাহাদুরি লক্ষ্য করা কর্তব্য। আগেই ব'লেছি। আবার বলি। বইটাকে যথাসম্ভব ছোট রাখা হ'য়েছে। হাজার দেড়েক পৃষ্ঠার মাল সাড়ে চার শ' পৃষ্ঠায় নামানো যারপর-নাই ওস্তাদি। খুব ক্ষমতাশালী অর্থাৎ জিনিষের উপর চরম দখলওয়ালা লোকের পক্ষে এত সংক্ষেপে লেখা সম্ভব। সেই জন্যই হয় ত কিছু কঠিন।

লেখক—দর্শন হিসাবে "জ্ঞান ও কর্ম" কোন্ শ্রেণীর বই?

সরকার—গ্রন্থটা জীবন-দর্শন। যার-পর-নাই কেজো লোকের দর্শন। অতিরিক্ত-নিরেট মগজওয়ালা সংসারনিষ্ঠ আর দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ঝুনো সমজদার ছাড়া আর কোনো লোকের পক্ষে এই বই লেখা সম্ভবপর নয়।

লেখক—দার্শনিক গুরুদাসকে বিদেশী কোনো দার্শনিক-দলে ফেলা সম্ভব?

সরকার—দার্শনিক গুরুদাস জবরদস্ত বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যপ্রিয়, ফলবাদী লেখক। আজকাল মার্কিণ মুল্লুকে যাকে বলে "প্রাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্" বা ফলতত্ত্ব সেই তত্ত্বের প্রতিনিধি গুরুদাস। মার্কিণ দার্শনিক ডুয়ী প্রণীত "হিউম্যান নেচার অ্যাণ্ড কন্‌ডাক্ট" (মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্র) বইটা "জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ের আবহাওয়ায় অনেক সময় মনে পড়ে। দু'এর তর্কপ্রণালী, আলোচ্য বিষয় আর সিদ্ধান্ত অবশ্য একরূপ নয়। খুব মোটা ও কোরা ভাবে গুরুদাসের রচনায় আর ডুয়ীর রচনায় সাম্য-সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য টানা গেল।

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম" সম্বন্ধে আর কিছু বলুন না?

সরকার—বইয়ের ভেতর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ আছে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আছে, সাংখ্য আছে, গীতা আছে, বেদান্ত আছে, মনু আছে, মহাভারত আছে একদিকে। অপর দিকে আছে আরিস্ততল, লক্, কাণ্ট, বেন্থাম্, স্পেন্সার, কঁৎ, মিল, সিজুইক ইত্যাদি পশ্চিমা মুড়োর মাল। প্রত্যেক দফায়ই গুরুদাস উকিলি মগজ খেলিয়েছেন। বাদী-প্রতিবাদীর উপর জেরা চালানো হ'য়েছে। তার উপর আছে জজিয়তির বিশ্লেষণ, বিচার ও রায়। অতএব এই বই পুরাপুরি স্বাধীন চিন্তার ফল। ভাষাটা কেঠো, অলঙ্কারহীন, আবেগশূন্য। কিন্তু সব-কিছুই গোঁজামিলহীন, হেঁয়ালিশূন্য, সহজে বুঝা যায়।

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ের মতামতের আপনার কতটা পছন্দসই?

সরকার—এর ভেতরকার চিত্ত-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাদ দিয়ে যাচ্ছি। সাধারণ নীতি-বিজ্ঞান বা কর্তব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছু বল্‌তে চাই না। বাকিটুকু হচ্ছে—অনেকটা ঠিক যেন ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" আর "আচার প্রবন্ধ" বই তিনটার পরবর্তী ধাপ। গুরুদাস আর ভূদেব মোটের উপর এক গোত্রের সমাজ-দার্শনিক। প্রাচীন সংস্কারের দরদ, আর ঐতিহ্যের সমাদর ভূদেব-দর্শন আর গুরুদাস-দর্শনের আসল খুঁটা। কাজেই দুই দর্শনই এই অধমের বঙ্গদর্শনে ঠাঁই পেতে পারে না। কিন্তু মজার কথাটা আগেই ব'লে চুকেছি। আজও বাঙলার নরনারী : ভূদেব-গুরুদাসের পথেই চল্‌ছে। অর্থাৎ ভূদেবের পরবর্তী বাঙালী সমাজ প্রায়-ঠিক-যেন ভূদেবের যুগেই র'য়েছে। ভাঙাগড়া, রূপান্তর বা পরিবর্তন যা-কিছু ঘটেছে তা হাজার কয়েক নরনারীর জীবন ছুঁয়েছে মাত্র। কোটি-কোটি লোক এখনও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পার হয় নি। এজন্য গুরুদাসকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের বাস্তব প্রতিনিধি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি। বিংশ শতাব্দীর আমরা

নয়া-নয়া আদর্শের বুলি আওড়াচ্ছি সন্দেহ নাই। এই সকল বুলি হয়ত লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে তারিফ-গোয্যও বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বাঙলার নরনারীর সমাজ-ব্যবস্থা আর পারিবারিক জীবন আজও চল্‌ছে জাতপাঁতের ধর্মমাফিক। কাজেই "জ্ঞান ও কর্ম" আজও সামাজিক হিসাবে অচল নয়। এটা এখনো অনেকদিন চল্‌বে। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে দুচার-দশ জন লোক হয় ত এই অধমের মতন চরমপন্থী লোকের পাঁতি মাফিক সংসার চালাবে।

গুরুদাস বনাম ভূদেব

লেখক—গোঁড়া হিন্দুয়ানির হিসাবে "সামাজিক প্রবন্ধ" আর "জ্ঞান ও কর্ম" এই দুই রচনায় প্রভেদ কিরূপ?

সরকার—সমাজ-ব্যবস্থার তরফ হ'তে প্রশ্ন চিত্তাকর্ষক। ভূদেব আর গুরুদাস দুইজনই এক কাঠামোর লোক। এঁদের মেজাজ সনাতনী হিন্দুত্বময়। প্রাচীনের আবহাওয়ায় দুজনেরই জীবন প্রধানতঃ চলে। দুইজনেই নিষ্ঠাবান বা আচারনিষ্ঠ হিন্দুয়ানির প্রতিনিধি। কিন্তু প্রভেদও লক্ষ্য করা সম্ভব। "সামাজিক প্রবন্ধ" ১৮৯২ সনে প্রকাশিত আর "জ্ঞান ও কর্ম" প্রকাশিত ১৯১০ সনে। কাল হিসাবে গুরুদাসের বই ভূদেবের বইয়ের পরবর্তী তো বটেই। এমন কি মাল হিসাবেও খানিকটা পরবর্তী

লেখক—ভূদেবে আর গুরুদাসে গোঁড়ামি-বিষয়ক পার্থক্য পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় কি?

সরকার—বোধ হয় কিছু-কিছু যায়। গুরুদাসের মগজে ঐতিহ্য প্রীতি চরম কথা নয়। আচার-নিষ্ঠা, প্রাচীনের দরদ, মুনি-ঋষিদের বিধান আর হিন্দু-সংস্কৃতির ধারা এই সব কথা গুরুদাসের চিন্তাশক্তিকে পুরাপুরি দখলে রাখ্‌তে পারে নি। এই হিসাবে গুরুদাসের বেশ কিছু স্বাধীনতা আছে। ভূদেবের চিন্তা-প্রণালীতে সনাতন, অতীত, ঐতিহ্য, হিন্দু-সংস্কার ইত্যাদি বস্তু খুব প্রবল। "জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ে এই সবের আওতা তত বেশী প্রবল নয়।

লেখক—গুরুদাসের চিন্তা-প্রণালীতে নতুন কোন্ শক্তি দেখা যায়?

সরকার—এই চিন্তা-প্রণালীতে অতীত আর ঐতিহ্যের ডোজ যতটা, বোধ হয় প্রায় ততটা দেখ্‌তে পাই বর্তমানের সু-কু-বিষয়ক চিন্তা। সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ফল মঙ্গলজনক না অমঙ্গলজনক? এই প্রশ্নটা "জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ের ভেতর মাঝে-মাঝে উকিঝুঁকি মারে। প্রথম কথা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল। দ্বিতীয় কথা বর্তমানের ইষ্টানিষ্ট। এই দুই দফায় গুরুদাসের মগজে বেশ-কিছু তোলাপাড়া চল্‌তো। কাজেই ভূদেবের পাঁতিতে আর গুরুদাসের পাঁতিতে খানিকটা ফারাক্ লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে ফারাক্ মোটের উপর অতি-কম। মাত্র চিন্তা-জগতের কথা, আলোচনা-প্রণালীর কথা, তর্কযুদ্ধের কথা বল্‌ছি। গোঁড়া হ'য়েও গুরুদাস ষোল আনা সনাতনীদের অন্যতম নন।

জাতিভেদহীন হিন্দুত্ব

লেখক—"জ্ঞান ও কর্ম" হ'তে দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

সরকার—"জাতিভেদ-নিবারণ" সম্বন্ধে গুরুদাসের তর্ক-প্রণালী নিম্নরূপ ঃ—"প্রাচীন

বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল কিনা এবং ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্ত (যাহাতে জাতিভেদের প্রমাণ আছে) প্রক্ষিপ্ত কিনা এ সকল প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা, এক্ষণে জাতিভেদ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এই সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না।' অনেকের মত তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহা নানাবিধ অনিষ্টের মূল।" ("জ্ঞান ও কর্ম" ১, ২৮, ৪৪৯ পৃঃ)

লেখক—এ থেকে কী বুঝা যায়?

সরকার—গুরুদাস বেশ-কিছু বর্তমান-নিষ্ঠ দার্শনিক। সেকেলে মুনি-ঋষিদের প্রতি-অতি-ভক্তি দেখানো তাঁর রেওয়াজ নয়। প্রত্নতত্ত্ব ছিকে'য় তুলে রাখা চল্‌তে পারে,—তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না,—এই হচ্ছে তাঁর মতিগতি। "প্রয়োজন", "অনিষ্ট" ইত্যাদি বস্তু তাঁর চিন্তায় ঠাঁই পায়। কাজেই এই দর্শন ফল-নিষ্ঠ, কর্মমূলক ও প্রত্যক্ষবাদী। লোকহিত হচ্ছে গুরুদাসী মেজাজের প্রধান লক্ষ্য।

লেখক—গুরুদাস নিজে জাতিভেদ প্রথার কোনো কুফল স্বীকার করেন কি?

সরকার—স্বীকার করেন। তাঁর বাণী নিম্নরূপ ঃ—"জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপনের পক্ষে বাধাজনক এবং তাহা কোনো কোনো স্থলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি করে।" এতখানি স্বীকার করা কট্টর ঐতিহ্যপন্থী, ষোল-আনা সনাতনী, গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে এখানে প্রগতির লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি। কাজেই গুরুদাসকে চরম হিন্দুয়ানির প্রতিনিধি সম্‌ঝে রাখা ঠিক নয়। তাঁর ভেতর আধুনিকতা প্রবেশ ক'রেছে।

লেখক—জাতিভেদ সম্বন্ধে গুরুদাসের শেষ সিদ্ধান্ত কিরূপ?

সরকার—"বিবাহ ও আচার এই দুই বিষয় বাদ রাখিয়া অপর সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর সদ্ভাব সংস্থাপন অবশ্য কর্তব্য এবং একজাতি অপর জাতিকে ঘৃণা বা অনাদর করা সর্বতোভাবে অকর্তব্য।" ব্যস্‌। এ'র বেশী নয়। দৌড় অতি সামান্য। যাকে বলে মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি!

লেখক—আপনি এই সম্বন্ধে কিরূপ পাঁতি দিতে প্রস্তুত?

সরকার—বিবাহ আর আহার এই দুই বিষয়েও জাতিভেদ তুলে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে-কোনো জাতের পুরুষ যে-কোনো জাতের স্ত্রীকে বিবাহ কর্‌তে অধিকারী। আর যে-কোনো জাতের লোক যে-কোনো জাতের লোকের হাতে রান্না খেতে অধিকারী। পংক্তি-ভোজনে জাত-বিচার অনাবশ্যক। ধর্মভেদের দরুণও বিবাহ বন্ধ হওয়া উচিত নয়। এই কারণে আহারে ও কোনো প্রকার বাদ বিচার রাখা চল্‌তে পারে না। এক কথায় বিংশ শতাব্দীর মনু হিসা'বে বাঙালী সমাজ-শাস্ত্রীকে বর্ণাশ্রমের অ হ'তে ক্ষ পর্যন্ত সবই বিসর্জন দিতে হবে। চাই বর্ণাশ্রমের আমুল ধ্বংস-সাধন। জাতিভেদহীন হিন্দুত্ব কায়েম কর্‌তে হবে। গুরুদাস জাতিভেদের কুফল দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। এটা তাঁর বাহাদুরি। কিন্তু সেই কুফল উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা তিনি করেন নি। সেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে জাত-পাঁত ভেঙে দিলে। জাত-পাঁত ভাঙার পাঁতি আছে একালের "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" বইয়ে (১৯৪০)। বইটা প্রফুল্ল সরকারের লেখা।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে গুরুদাসী প্রগতি

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

সুবোধ—গুরুদাসের হিন্দুয়ানিতে আর কোনো বিশেষত্ব লক্ষ্য করা সম্ভব? ভূদেবে আর গুরুদাসে পার্থক্য বুঝতে চাই।

সরকার—আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে "জ্ঞান ও কর্ম" বইয়ে (৪৪৭ পৃঃ) আছে নিম্নের মন্তব্য,—"বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে একেবারে নিষিদ্ধ কিনা এ কথার মীমাংসা নিতান্ত সোজা নহে। তবে তাহার বিচার এখন নিষ্প্রয়োজন। কারণ বিধবা-বিবাহ এক্ষণে আইনসিদ্ধ (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ আইন)। এবং যাঁহারা বিধবা-বিবাহ-সংসৃষ্ট, যদিও তাঁহারা সর্ববাদিসম্মতরূপে সমাজে চলিত নহেন, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহাদিগকে অহিন্দু বা ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী বলেন না।"

লেখক—এই দৃষ্টান্তে কী বুঝ্‌ছেন?

সরকার—আবার দেখ্‌ছি "নিষ্প্রয়োজন" শব্দটা। গুরুদাস বাজে আলোচনায় সময় দিতে রাজি নন্। মগজটা কেজো। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় মশ্‌গুল হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অপর দিকে ঝুনো উকিল বর্তমান আইন-কানুন সম্বন্ধে সজাগ, বস্তুনিষ্ঠ লোক, দুনিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল। সোজা কথায় দেখা যাচ্ছে যে, সতানতী, নিষ্ঠাবান্, গোঁড়া হিন্দু হ'য়ে ও তিনি গোঁড়া-বিরোধী বিধবা-বিবাহকে অহিন্দু বল্‌তে রাজি নন। চিন্তার এই অবস্থা খানিকটা প্রগতিপন্থীরই লক্ষণ।

লেখক—গুরুদাস নিজে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী কি?

সরকার—না। অন্যেরা যা ইচ্ছা করুক্। তাঁর পাতি সোজা। তিনি বল্‌ছেন্—"কোনো বিধবার অভিভাবক তাঁহার বিবাহ দেওয়া শ্রেয়ঃ স্থির করিলে তিনি অনায়াসেই তাঁহার বিবাহ দিতে পারেন। এবং আইন অনুসারে সে বিবাহ সিদ্ধ।" (পৃঃ ৭৩৩)। ব্যস। বিধবা-বিবাহে হিন্দুধর্মের বা হিন্দু সমাজের সর্বনাশ হচ্ছে এরূপ খেয়াল তাঁর নাই। কাজেই গুরুদাসের মুড়ো নেহাৎ সেকেলে মনুর মুড়ো নয়। হিন্দু সমাজের ভেতর পরিবর্তন এসেছে তা তিনি বেশ দেখেছেন। এই পরিবর্তনে ক্ষতি হচ্ছে না তাও তিনি বুঝেছেন। পরিবর্তনগুলা তাঁর রপ্ত হ'য়ে গেছে। অতএব তাঁকে কিঞ্চিৎ-কিছু প্রগতি-পন্থী বলতেই হবে।

লেখক—গুরুদাস সামাজিক পরিবর্তন কতটা চান?

সরকার—খুবই কম। প্রগতি-নিষ্ঠা, এমন কি পরিবর্তন-নিষ্ঠা অতি-সামান্য। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেই আরও কিছু দেখাচ্ছি। তাঁর অন্যতম মন্তব্য নিম্নরূপ:—"তাঁহারা (বিধবা-বিবাহ-সংসৃষ্ট ব্যক্তিরা) যদি বিধবার বিবাহ চিরবৈধব্য পালন অপেক্ষা ভাল কার্য্য এবং বিধবা-বিবাহ সমাজের ও দেশের মঙ্গল মিমিত্ত প্রচলিত হওয়া কর্তব্য ইত্যাদি কথা বলিয়া চিরবৈধব্য পালনের প্রতি হিন্দু সমাজের যে শ্রদ্ধা আছে তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহাদের বিরোধী হইতে ক্ষান্ত থাকিবে।"

লেখক—এই মন্তব্যের ভাবার্থ কি?

সরকার—গুরুদাস বলছেন—"বিধবা বিয়ে ক'রেছিস্। তোকে হিন্দু সমাজ খোলাখুলি নিন্দা কর্‌ছে না। বেঁচে গিয়েছিস্! কিন্তু হিন্দু সমাজের দিকেও তোর নজর রাখা উচিত। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে তোর প্রচার বা প্রপাগাণ্ডা চালানো ঠিক হবে না। কেননা তাতে হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোক মনে ঘা পাবে। অর্থাৎ তুইও স্বাধীনভাবে তোর জীবন চালিয়ে

যা। আর আমাদেরকেও স্বাধীনভাবে জীবন চালাতে দে। তোকে আমরা বাধা দিচ্ছি না। আইনটা তো র'য়েছে তোর স্বপক্ষেই। সুতরাং আমাদেরও তোর আইনটা তো র'য়েছে তোর স্বপক্ষেই। সুতরাং আমাদেরকেও তোর বাধা দেওয়া উচিত নয়। তুই বিধবা বিয়ে কর্। আমরা করবো না।" এই হ'লো গুরুদাসের তর্ক-প্রণালী। পারস্পরিক স্বাধীনতা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে তাঁর সমাজ-দর্শনের খুঁটা। এ যেন ঠিক "সামাজিক চুক্তি" বিশেষ।

লেখক—আপনি বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গুরুদাসী প্রগতি কিরূপ বিবেচনা করেন?

সরকার—সমাজের পক্ষে বা দেশের পক্ষে এইরূপ চিন্তাপ্রণালী প্রগতির লক্ষণ নয়। গুরুদাস অন্যান্য গোঁড়া বা সনাতনী হিন্দুর চেয়ে প্রগতিশীল বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু এতটুকু প্রগতিশীলতায় সমাজের বেশী উপকার হ'তে পারে না। গুরুদাস আর ভূদেব মোটের উপর প্রায় একস্তরেই অবস্থিত।

বিংশ শতাব্দীর মনু

সুবোধ—আপনাকে বিংশ শতাব্দীর মনু ক'রে দিলে আপনি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে পাঁতি দেবেন কিরূপ?

সরকার—পুরুষ যতবার বিবাহ করতে অধিকারী স্ত্রীও ততবার বিবাহ করতে অধিকারী। এই হবে বিংশ শতাব্দীর মনুর পাঁতি। প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই চাই স্ত্রীজাতির আইন-সম্মত পুরুষ-সাম্য। বিবাহের বেলায় ত বটেই। সম্পত্তির মালিকানা, ভোগ, ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদি দফা সম্বন্ধেও তাই চাই। মেয়েদের ক্ষমতা ও অধিকার পুরুষের ক্ষমতা ও অধিকারের সমান হওয়া আবশ্যক। এরই নাম "ম্যাস্কুলিনিজেশন অব উওম্যান",—এই অধমের চৌআড পারিভাষিকে। সোজা কথায় এ হচ্ছে নারীত্বের আদর্শ।

লেখক—"ম্যাস্কুলিনিজেশন" ঘট্‌লে মেয়েদেরকে পুরুষের মতন দেখাবে না কি?

সরকার—"মর্দানা" মেয়ে মানুষ আমি চাচ্ছি না। নারীত্বের ব্যবস্থায় আমি চাচ্ছি পুরুষের সমান করিৎকর্মা মেয়ে মানুষ। সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের সমান আয়ওয়ালা মেয়ে মানুষ, আর তার সঙ্গে পুরুষের সমান ক্ষমতাওয়ালা মেয়ে মানুষ। যে-সকল কাজ পুরুষ করতে পারে, সেই সকল কাজ মেয়েরাও করতে পারে। এই হচ্ছে আমার পুরুষ-সাম্যের প্রথম স্বীকার্য। মেয়েদের সন্তান জন্মে। কাজেই মেয়েতে-পুরুষে স্বাভাবিক তফাৎ কিছু-না-কিছু আছেই। তা সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে বলছি, পুরুষের প্রায় সব কাজই মেয়েরা হাত-পা-মাথার জোরে করতে সমর্থ। এই সামর্থ্য শুধু আদর্শ মাত্র নয়, নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। সত্যি কথা, মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত সকলদেশেই মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে হাটে-মাঠে-ঘাটে গতর খাটিয়ে চ'লেছে। ইতিহাস আর নৃতত্ত্বের প্রমাণে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য অ, আ, ক, খ বিশেষ।

লেখক—আপনার "ম্যাস্কুলিনিজেশন" পাঁতিতে নারীত্বের জন্য আর কী চাই?

সরকার—বিবাহ-ভঙ্গের অধিকার চাই। পুরুষের জন্য আর মেয়ের জন্য সমানভাবে থাকা আবশ্যক ডিভোর্সের ক্ষমতা। তা ছাড়া বিবাহ কারবারটাকে দেবদেবীর ছায়া আর মন্তর-আওড়ানোর আওতা থেকে খালাসে করতে হবে। চাই সোজাসুজি সরকারী আইন সঙ্গত ধর্মবর্জিত বিবাহ। কোনো পুরুষ বা স্ত্রী দেবদেবী আর মন্তর সহ বিবাহ পছন্দ করলে

তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তা হবে অতিরিক্ত। আসল বিবাহ হবে দেবদেবীহীন, মন্তরশূন্য, ধর্মের বহির্ভূত কারবার। সরকারী আইনমাফিক কাজ। ধর্মবর্জিত বিবাহের পর ধর্মমাফিক বিবাহ চল্‌তে পারে। তাতে আপত্তি করবো না।

লেখক—এই ফাঁকে আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নি। বিংশ শতাব্দীর মনু হিসাবে আপনি হিন্দুধর্মের দেবদেবী সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান? মূর্তিপূজার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কী?

সরকার—আমি আমাদের দেবদেবীগুলাকে সুকুমার শিল্পের আর কাব্য-সঙ্গীতের সামিল বিবেচনা করি। পূজার উৎসব-আমোদ মানুষের কিছু-না-কিছু চরিত্র গঠিত হয়। শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে এই সবের মূল্য আছে। মন্তরগুলা মেয়ে-পুরুষ ও ছেলে-পিলেদের কানে শুনায় ভাল। ঢাক-ঢোলে হৈ-হৈ রৈ-রৈ জমে বেশ-কিছু। পূজাবাড়ী-যজ্ঞিবাড়ীতে নাচ-গান-বাজনার হর্‌রা চলে, লোকগুলার মাংসপেশীর চলাচল হয়। ঘরোআ ব্রতকথা, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদি উৎসবের সামাজিক কিম্মৎ লাখ টাকা। তাতে ছোট-বড়-মাঝারি লোক, নানা বয়সের পুরুষ-নারী, রকমারি জাতের বারভূত এক সঙ্গে গা-ঘেঁশা-ঘেঁশি করে। আন্তর্মানুষিক যোগাযোগে কিঞ্চিৎ-কিছু সদ্ভাব পায়দা হ'তে পারে। এ সবই ভাল। এই হিসাবে ভূদেবের "আচার-প্রবন্ধ" মাফিক বারমাসে তের পার্ব্বণ আমার পছন্দসই। তবে "অতিমাত্রায়" আচার-নিষ্ঠা বর্জনীয়।

লেখক—মূর্তিহীন ধর্ম আপনি চান না? বিংশ শতাব্দীর মনু মাফিক পাঁতি চাই।

সরকার—সকলের জন্য দেবদেবীর প্রয়োজন নাই, পূজা-অর্চনারও প্রয়োজন নাই, ছবি-মূর্তিরও প্রয়োজন নাই। কিন্তু লাখ-লাখ, কোটি-কোটি নরনারীর জন্য এই সবের প্রয়োজন আছে। কাজেই ধর্ম-সংস্কারের কোঠে দাঁড়িয়েও এই সমুদয়ের বয়কট সম্বন্ধে আমি পাঁতি জারি করি না। আসল জরুরি সমাজ-সংস্কার। দেবদেবী-সংস্কার অথবা মূর্তিপূজার বিলোপ-সাধন বড়-বেশী জরুরি নয়। সর্বাগ্রে চাই জাতিভেদহীন হিন্দু-সমাজ। এই হ'লো বিশ শতাব্দীর মনুসংহিতা।

"(মেয়েদের পুরুষসাম্য", "নয়া পারিবারিক নীতি" ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২, "যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দু-ব্রহ্ম" ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪২)

লেখক—এইবার দু'-এক কথায় কয়েকটা বিষয়ে জবাব চাই। কত বছর বয়সে বিবাহ যুক্তিসঙ্গত?

সরকার—বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে আর পঁচিশ-আটাশ বছরের ছেলে।

লেখক—পরিবারে ছেলেমেয়ে থাকা উচিত কতজন?

সরকার—প্রত্যেকের পক্ষে দশ ছেলেমেয়ের মা-বাপ হওয়া চল্‌তে পারে। মারা যাবে হয়ত গোটা তিন-চারেক। বেঁচে থাক্‌বে ছ-সাতটা।

লেখক—জন্ম-নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে আপনার মত কী?

সরকার—জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বাঙ্‌লা দেশের পক্ষে "সার্বজনিক" পাঁতি হ'তে পারে না। বস্তুতঃ কোনো দেশের পক্ষেই এটা সার্বজনিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। কোনো-কোনো বাঙালী পরিবারের জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়। তার জন্য আগে দেখ্‌তে হবে মা-বাপের স্বাস্থ্য। কবিরাজ-ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে কার্য-প্রণালী ঠিক করা উচিত। তারপর আলোচ্য আর্থিক অবস্থা, রোজগারের পথ।

লেখক—দেশের লোক-সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে চল্‌ছে নাকি?

সরকার—বাংলা দেশে অথবা সমগ্র ভারতেও লোক-সংখ্যার "অতিবৃদ্ধি" ঘট্‌ছে না। অতিবৃদ্ধি ঘট্‌লে দেশের দারিদ্র্য মাথা পিছু আরও বেড়ে চল্‌তো। বাঙালী (আর ভারত-সন্তান) গরীব বটে। কিন্তু দারিদ্র্য ফি দশ-দশ বছরে বাড়্‌তির দিকে নয়। বাড়তির দিকে দেখা যাচ্ছে মাথা-পিছু রোজগার,—সুখ-স্বচ্ছন্দতা আর সম্পদ্‌। অবশ্য সম্পদ্‌-বৃদ্ধির হারটা নেহাৎ সামান্য। কিন্তু বাড়্‌তি বটে।

লেখক—তাহ'লে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে দেশের ভেতর মত ছড়িয়ে পড়্‌লো কেন?

সরকার—বিশ-বাইশ-পঁচিশ বয়সের ছেলেমেয়েরা এই হুজুগে কুনীতি চালাবার সুযোগ পায় ব'লে। তা ছাড়া কোনো-কোনো লিখিয়ে-পড়িয়ে পণ্ডিত ত্রিশ বছর আগেকার ইয়োরামেকান লোক-শাস্ত্রীদির পুঁথিগুলা আওড়াতে শিখেছে। কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ায় চল্‌ছে জন্মবৃদ্ধির আন্দোলন। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, বড়-পরিবারের স্বপক্ষে চল্‌ছে ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মাণ—মায় ইংরেজ জাতগুলা। সোভিয়েট রুশিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না। রুশ মুল্লুকে লোক বৃদ্ধি জবরদস্তভাবে ঘটছে।

খাদ্য-সংস্কার

লেখক—বিংশ শতাব্দীর মনুর মতে বাঙালী জাতের পক্ষে খাদ্য সংস্কার আবশ্যক কি?

সরকার—কিছু-কিছু সংস্কার চল্‌তে পারে। তবে বাঙালীরা শাক-শুক্‌তানি খায়, ডাল-তরকারি খায়, মাছ-মাংস-ডিম খায়, অম্বল-পায়েস খায়, ঘী-দুধ খায়। তা ছাড়া বছরে বারমাসের তের ফল খায়। আমার বিবেচনায় বিভিন্ন রকমের খাদ্য-গুণ-ওয়ালা জিনিষ বাঙালীর পেটে পড়ে। মামুলি চোখে খাদ্য-সংস্কারের প্রয়োজন দেখা যায় না। জিনিষগুলার বৈচিত্র্যও আছে, আর সামঞ্জস্যও আছে। রকমারি ধাতুর আর ভিটামিনের যথোচিত সমাবেশ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে খাদ্য-দ্রব্যের নামে।

লেখক—তবে খাদ্য-সংস্কারের প্রয়োজন কোথায়?

সরকার—আমার বিশ্বাস,—এই সকল জিনিষ প্রত্যেক পরিবারের লোক মাথা পিছু যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। এই খানেই গলদ। ছয় কোটি নরনারীর প্রত্যেকের কথা ভাব্‌তে হবে। প্রত্যেক জরুরি জিনিষের যথেষ্ট পরিমাণ খাওয়া হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে জরুরি। তার জন্যে আবশ্যক রোজগার-বৃদ্ধি। কাজেই খাদ্য-সংস্কারের মামলা খাদ্য-বিষয়ক নয়, টাকাকড়ি-বিষয়ক। তারই নাম অন্ন-সংস্থান।

লেখক—কোনো-কোনো নতুন খাদ্য ঢুকাবার দিকে আপনার মাথা খেলে না?

সরকার—তত বেশী নয়। তবে আমি প্রত্যেক বাঙালীকে এক বেলা গমের রুটি খাওয়াতে চাই। কমসে-কম ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদেরকে প্রতিদিন বিকালে দুখানা ক'রে ফুলকা রুটি খাওয়াবার ব্যবস্থা কর্‌তে চাই। এই দিকে আমি অনেকদিন ধ'রেই পাঁতি দিয়ে আস্‌ছি। কিন্তু বাঙালী জাত রুটি বরদাস্ত কর্‌তে পারছে না। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বাঙালীকে রুটি খাওয়ানো অসাধ্য। তবে বর্তমানে লড়াইয়ের হিড়িকের আবহাওয়ায় চাউল হয়েছে লোপাট (১৯৪৩)। "মন্বন্তর" দেখা দিয়েছে। খাদ্য-রেশন এই শুরু হলো (১৯৪৪ ফেব্রুয়ারি)। এই আবহাওয়ায় হয়ত হাজার কয়েক পরিবার কিছু-কিছু রুটিতে রপ্ত হ'য়ে যাবে। এই ব্যবস্থা কয়েক বছর চল্‌লে লোকজনের স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়তে পারে। আজকাল

মার্কিণ মল্লুকে জাপানী "সোয়া"-ডালের স্বপক্ষে প্রচার চ'লেছে জোর্‌সে। বোধহয় বাঙ্‌লা দেশেও তার আন্দোলন লাগানো উচিত। সোয়ার দুধ খুব পুষ্টিকর।

লেখক—খাদ্য সম্বন্ধে আর কোনো-কিছু বল্‌বার আছে?

সরকার—রান্না-সংস্কারের ওপর জোর দিতে চাই।

লেখক—সে কী করম?

সরকার—প্রথমতঃ তাড়াতে চাই ভাজাভাজির,—বিশেষতঃ কড়া ভাজার—কারবার। তার বদলে চাই ইয়োরামেরিকান "স্টু"। তরকারিটা নিজের রসে নিজে সিদ্ধ হবে। দ্বিতীয়তঃ মশলা তাড়াতে চাই। তৃতীয়তঃ চাই ফেনসহ ভাত খাওয়াতে। এই তৃতীয় পাঁতি সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই বকাবকি কর্‌ছে। ভাল কথা। তবে বেশী লোকের কানে ঢুকছে না। অধিকন্তু এমনভাবে ভাত রাঁধা যেতে পারে যাতে ফেন জম্‌বেই না। ভাতও কাদা-কাদা হবে না। চাই "ডবল-বয়লার" নামক হাঁড়ির ব্যবস্থা। চতুর্থ করা হচ্ছে, জল "ফুটিয়ে" খাওয়া আবশ্যক।

গুরুদাস ও কেশব সেন

সুবোধ—আপনি মেয়েদের জন্য যে-ধরণের পুরুষ-সাম্য চাচ্ছেন, তার স্বপক্ষে বাঙালী ক'জন পাবেন? ভূদেব-গুরুদাসের চিন্তা-প্রণালী বঙ্গসমাজে প্রায় পৌণে-ষোল আনা লোকের প্রতিনিধি ব'লেছেন। সেই সমাজে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য কায়েম করা সম্ভব কি?

সরকার—নিশ্চয়ই না। মজার কথা জেনে রাখা ভাল। মেয়েদের পুরুষ সাম্য সম্বন্ধে এমন কি কেশব সেনও ফেল মেরেছিলেন। স্বপক্ষে পাঁতি দিতে পারেন নি। প্রতাপ মজুমদার লিখিত "লাইফ্ অ্যাণ্ড টীচিংস অব কেশবচন্দ্র সেন" (১৮৮৭, পৃঃ ২৬৫-২৬৬) বইটা দেখ্‌তে পারিস্। তাতে বলা আছে যে, কেশব সেন (১৮১৮-৮৪) মেয়েদেরকে ছেলেদের মতন শেখাবার বিরোধী ছিলেন। মেয়েদের উচ্চতম (বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে) শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁর মেজাজ মাফিক ছিল না। বালিকা-বিধবার বিবাহে তাঁর আপত্তি দেখা যেত না। কিন্তু বেশী বয়সের বিধবাদের বিবাহ তাঁর পছন্দসই হ'তো না। বিবাহের লেন-দেনে তিনি জাত্ ভাঙ্‌বার পক্ষপাতী ছিলেন না। জাত্-ভাঙার উৎসাহ দিতেন।

লেখক—কেশব সেনের নাম কর্‌লেন কেন?

সরকার—কেশব সেনকে আমরা সেকালের সমাজ-বিপ্লবী চিন্তাবীর ও কর্মবীর ব'লে জানি। সমাজক্ষেত্রের সেই বোলশেভিক কেশবের দৌড় কতটা ছিল, আজ একবার জরীপ ক'রে দেখা ভাল। দেখা যাচ্ছে যে, কেশবের মাপে ১৯৪৪ সনের অনেক মামুলি বাঙালী নেহাৎ পেছপাও নয়। বেশ-কিছু প্রগতি-পন্থী ও বিপ্লবী তো বটেই। আর বোধহয় এক-আধ ধাপ অগ্রবর্তী। কম-সে-কম আজকের কোঠ থেকে ব'ল্‌তে হবে যে, যাঁহা কেশব, প্রায়-তাঁহা ভূদেব আর প্রায়-তাঁহা গুরুদাস। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মানুষ বিচারে এঁরা সকলেই প্রায় একাকার ও বাতিল। এই হ'লো ভাব-জগতের কথা।

লেখক—ভাব-জগতের কথা বল্‌ছেন কেন?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর মনুরা আদর্শনিষ্ঠ ভবিষ্য-পন্থী বিপ্লবমুখো দার্শনিক। আসল সংসারে এদের ঠাঁই নাই। এদের সম্বন্ধে বলা চলতে পারে, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।"

প্রকৃত কর্ম-জগতে এই অধম আর এই অধমের মতন অন্যান্য লোকের চিন্তা বাতিল ও তলিয়ে যাচ্ছে। অনেকবার ব'লেছি,—আজও অধিকাংশ বাঙালীর সংসারে গুরুদাসের "জ্ঞান ও কর্ম" সত্যি-সত্যি বেশী-কিছু এগোয়নি। ভাঙা-গড়া বা রূপান্তর অতি-সামান্য মাত্র ঘটেছে। শরৎ, বিভূতি, তারাশঙ্কর ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ গাল্পিকদের উপন্যাসে পল্লী-শহরের মধ্যবিত্ত ও চাষী সমাজের খাঁটি অবস্থা আঁকা আছে। সেই অবস্থা মাফিক ব্যবস্থাকারই গুরুদাস। তবে এ সবের বিরুদ্ধে বকাবকি চল্‌বেই। বাধা দেবার কেউ নাই। প্রফুল্ল সরকারের "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু", রাধাকমলের "বাঙালী ও বাঙলা", আর শান্তিসুধা ঘোষের "নারী" ইত্যাদি বইয়ে গুরুদাস-বিরোধী পাঁতি বেশ্‌-কিছু মালুম হয়। বই তিনটা ১৯৪০ সনের মাল। এই সবই বেশ-কিছু বিপ্লবের পথে নিয়ে যাচ্ছে বাঙালী মেয়েকে। তবে প্রকৃত বিপ্লবের টিকি দেখা যাচ্ছে না কোথাও আজ পর্যন্ত।

"গিরিশের যুগ"

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

সুবোধ ঘোষাল—গিরিশ ঘোষের শত-বার্ষিকীতে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪) আপনার নাম দেখলাম না তো?

সরকার—এই অধমের নাম কি সব মহোচ্ছবেই দেখা যাবে?

লেখক—যা হ'ক গিরিশ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?

সরকার—দেখ্‌ছি, যখন যার শ্রাদ্ধ হবে তখন তার সম্বন্ধে কিছু তর্পণ আমাকে কর্‌তেই হবে? এই আমার আর এক পেশা!

লেখক—বলুন তবুও কিছু।

সরকার—গিরিশ (১৮৩৪-১৯১২) নং ১ শ্রেণীর সাহিত্যবীর। গ্যেটে, ভিক্তর হুগো ইত্যাদি লেখকদের দরের লোক। গিরিশের নামে একটা যুগ চল্‌তে পারতো, এখনও পারে।

লেখক—কিন্তু বাংলা সাহিত্যে গিরিশের যুগ বলে কোনো যুগ আছে কি?

সরকার—থাকা উচিত। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ-পাদের মস্তবড় বঙ্গ-স্রষ্টা গিরিশ ঘোষ। সাহিত্য-রস আর নাট্য-রস দুইই একসঙ্গে বাঙালী জাতের পেটে প'ড়েছে গিরিশের দৌলতে। এই দুই রসে চরিত্র গঠিত হ'য়েছে কম নয়। বাঙলার নর-নারী গিরিশ ঘোষের নিকট যার-পর-নাই ঋণী। সেকালের পুরাণ-তন্ত্র-বেদ সব-কিছুই গিরিশ-নাট্যে মজুদ্‌ র'য়েছে। পুরাণ-তন্ত্র-বেদের আধুনিক বাংলা সংস্করণ হচ্ছে গিরিশ গ্রন্থাবলী। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসন্তান একমাত্র শেকস্‌পীয়ার স্পেন্সার খেয়ে মানুষ নয়। বাঙালীর বাচ্চা বেদ-পুরাণ-তন্ত্র খেয়েও একালে মানুষ হ'য়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সেই খোরাক জুটেছিল ব'লেই যুবক বাঙলা একটা "রেণেসাঁস", নবযুগ বা নবাভ্যুদয় কায়েম কর্‌তে পেরেছে। আধুনিক ভারতীয় রেণেসাঁসের অন্যতম বিপুল খুঁটা গিরিশ ঘোষ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্ম্মাণ নাট্যশিল্পী হেব্‌বেল আর সঙ্গীত-শিল্পী ভাগ্‌নার সেকেলে নিবেলুঙ-গাথার নয়া গড়ন দিয়েছিলেন। গিরিশের হাতেও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ নয়া বাঙলা গড়বার জন্য নয়ারূপ পেয়েছে। এই রেণেসাঁসের প্রকাণ্ড ও নিরেট স্তম্ভ গিরিশের "চৈতন্যলীলা" (১৮৮৪)।

লেখক—তাহ'লে গিরিশকে বাংলা সাহিত্যে উঁচু-ঠাঁই দেওয়া হয় নি কেন?

সরকার—গিরিশের ঠাঁই উঁচুই বটে। দেশের লোক তাঁকে চরম সম্বর্দ্ধনাই করতে অভ্যস্ত। তবে কিন্তু আছে। গিরিশ আর বঙ্কিম (১৮৩৮-৯৪) সমসাময়িক। যে-সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলা বেরুচ্ছে সেই সময়ে গিরিশের নাটকও বেরুচ্ছে। দুইই সমাজে জবরদস্ত শক্তিশালী লোক। কার প্রভাব সত্যি-সত্যি বেশী বলা কঠিন। বঙ্কিমের অনেক উপন্যাস আবার গিরিশের হাতে নাটকের গড়ন পেয়েছে।

লেখক—পুরানো কাহিনীর ভেতর নতুন তেজ, প্রাণ বা আদর্শ ঢুকানো কি সম্ভব?

সরকার—কেন সম্ভব নয়? সর্বদাই তো ঘট্‌ছে। একই গল্প নানা লেখকের হাতে নানা গড়ন পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের "রেণেসাঁস" যুগটা আগা-গোড়াই পুরাণার ওপর নয়া দৃষ্টিভঙ্গীর খেলায় ভরপুর'। প্রত্নতত্ত্বের মালে প্রাণতত্ত্বের ব্যাখ্যা চড়ানোই হচ্ছে নবাভ্যুদয়, নব-যুগ বা যুগান্তর-সাধন।

লেখক—এই ধরণের একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

সরকার—গোটের "ফাউস্ট"—নাটকের কথা জানিস্ তো? এর গল্পটা মধ্যযুগের সর্বজনিক কাহিনী! শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক নাট্যশিল্পী মার্লো ফাউস্টের গল্প নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। সেটা ইংরেজি সাহিত্যে নামজাদা।

লেখক—গোটের "ফাউস্ট" আর মার্লোর "ফাউস্ট" কি এক জিনিস?

সরকার—না তাই তো বল্‌ছি। মামুলি গল্পের কাঠামো প্রায় একরূপ। কিন্তু আসল মাল বা প্রাণ বিলকুল আলাদা। মার্লো ষোড়শ শতাব্দীর সুপরিচিত লোকরীতি বা কুসংস্কার মাফিক নাটক খাড়া ক'রেছিলেন। আর গ্যেটের হাতে সেটা হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক্‌কার ইয়োরোপীয় নর-নারীর নতুন জীবন-দ্বন্দ্বের বাহন। ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সমস্যা মূর্তি পেয়েছে গ্যেটের আখ্যায়িকায়। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনীও গিরিশের মারফৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-দর্শনরূপে দেখা দিয়েছে।

লেখক—গিরিশের আর কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—গিরিশ-সাহিত্য বিশ্বকোষ। তার ভেতর ধর্ম আছে, হাসি আছে, ইতিহাস আছে, রাজনীতি আছে। প্রবন্ধ-লেখক আর সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও গিরিশকে বাজিয়ে দেখা যেতে পারে। গিরিশের কোনো-কোনো কথা বাঙালীর মুখে-মুখে আজও চল্‌ছে—অনেক দিন চল্‌বে। বাঙালী জাতের অন্যতম গঠনকর্তা গিরিশ। জগৎ-স্রষ্টাদের যে-শড়কে শেক্‌স্‌পীয়ার, মোলিয়েয়ার, গ্যেটে আর ভিক্তর হুগোর ঠিকানা সেই শড়কেই গিরিশেরও ঠিকানা। আর কী বল্‌বো?

বঙ্কিম, গিরিশ ও রবি

লেখক—আমরা বঙ্কিমকে নিয়ে যত মাতি গিরিশকে ততটা পুছিনা কেন?

সরকার—উপন্যাসগুলা কল্‌কাতায় ছাপা হয়। কিন্তু পড়ে মফস্বলের লোকও। অপর দিকে নাটক দেখ্‌তে হ'লে আসতে হয় কল্‌কাতায়। মফঃস্বলে নাটকের প্রভাব জম্‌তে পারে না। কাজেই বাঙালী সমাজে গাল্পিকের নামডাক যত শীগগির অথবা যতটা বেড়ে যেতে পারে নাট্যকারের নাম তত শীগগির আর ততটা বেড়ে যেতে পারে না। অবশ্য সখের যাত্রা আর থিয়েটারের দল মফঃস্বলে নাটক প্রচার ক'রেছে মন্দ নয়। মালদহে ছেলেবেলায়

গিরিশের "বিল্ব-মঙ্গল" দেখেছি সখের থিয়েটারে।

লেখক—বঙ্কিম-গিরিশে এই কি একমাত্র প্রভেদ?

সরকার—এই জন্য বেঁচে থাক্‌তে-থাক্‌তে বঙ্কিম বোধ হয় গিরিশকে কানা ক'রে ছেড়েছিলেন। ঘটনাচক্রে আমরা "বঙ্কিমের যুগ" দেখ্‌তে পাই। কিন্তু "গিরিশের যুগ" আজও কেহ্‌ বলে না। আমার বিবেচনায় "গিরিশের যুগ"ও বঙ্কিমের যুগের সঙ্গে-সঙ্গেই বলা উচিত ছিল।

লেখক—নাটকে আর নভেলে আপনি সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে এত তফাৎ করেন?

সরকার—নভেলগুলা কিনে পড়্‌লে তার সোআদ পাওয়া যায় দস্তুর মতন। কিন্তু নাটকগুলা "দেখ্‌তে" হয়। প'ড়ে রস পাওয়া কঠিন। কিন্তু গিরিশের নাটক যারা নিজ চোখে থিয়েটারে দেখেছে তারা গিরিশ-ময় হয়ে যেত,—এইরূপেই আমার বিশ্বাস। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, অমরেন্দ্রনাথ রায় ইত্যাদি সাহিত্য-সেবীরাও ব'লেছেন। থিয়েটার খোরদের চিন্তায় বঙ্কিমের-খোরদের চিন্তায় বঙ্কিমের চেয়ে গিরিশ বড়। মনে হচ্ছে যে, কলকাতার লোকেরা গিরিশকে যত প্রভাবশালী ভাব্‌তো, বঙ্কিমকে হয়ত তত প্রভাবশালী ভাব্‌তো না।

লেখক—"গিরিশের যুগ" কোনোদিন আস্‌তে পারে?

সরকার—পারে। বর্তমানে দেশের লোক রবিকে নিয়ে প'ড়েছে। এখনো কিছুকাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখাপড়া, বক্তৃতা, বাদানুবাদ, পূজা-সম্বর্দ্ধনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের স্রোত অবশ্যম্ভাবী। বঙ্কিম আর রবি বাঙালীর হাড়-মাসে পাকা-পাকি বসুক। এই দুজন বস্‌তে-না-বস্‌তেই নয়া-নয়া যাচাই, দর-কষাকষি, সমালোচনা সুরু হ'তে বাধ্য। সেই সমালোচনার ঢেউয়ে বঙ্কিম আর রবি দুজনেরই আসন বেশ-কিছু টল্‌তে থাক্‌বে। অবশ্য এদের দর কম্‌বে না। তবে রকম-ফের হবে। মানুষ মুখ বদ্‌লাতে ভালবাসে। নয়া-নয়া সাহিত্য-বীরকে নিয়ে লেখক-পাঠক-সমালোচকরা নাচা-নাচি সুরু করবে। নয়া-নয়াদের ভেতর কেউ-কেউ ছোক্‌রা, তরুণ, নবীন লেখকও থাক্‌তে বাধ্য। তবে কোনো-কোনো "প্রাচীন" অর্থাৎ বঙ্কিম-রবির সমসাময়িকও মাথা চেঁড়ে উঠবে। সেই হিড়িকে আমি দেখছি গিরিশের মূর্তি অতি উজ্জ্বল। সাহিত্যের দুনিয়ায় ওঠানামা লেগেই আছে।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, বঙ্কিম আর রবি বেঁচে থাক্‌তে গিরিশ মাথা খাড়া কর্‌বার উপযুক্ত ছিলেন না?

সরকার—আগেই ব'লেছি যে, আমার বিবেচনায় বঙ্কিম-রবির মতনই গিরিশও পূজাস্থান। কিন্তু এক গর্তে দুই সিংহ থাকে না। এইজন্যই বঙ্কিমের সময়েই যোড়শোপচারে গিরিশ-পূজা সম্ভব হয় নি। ঘটনাচক্রে বঙ্কিমের পর রবি-পূজায় আমরা মেতে গিয়েছিলাম। কাজেই রবির যুগেও গিরিশের যুগ কায়েম হয় নি। ব্যস্‌।

"বঙ্গ-বিপ্লব" ও গিরিশ ঘোষ

লেখক—আচ্ছা, স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় অনেক বাঙালী তো নামজাদা হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে-ধাক্কায় বঙ্গবীর হ'লেন, বঙ্কিম যে-ধাক্কায় বঙ্গ-বীর হ'লেন, সেই ধাক্কায় গিরিশের নাম-ডাক বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সমান হ'লো না কেন?

সরকার—মজার প্রশ্ন। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) যুবক বাঙলা বহুসংখ্যক

বাঙালীকে বঙ্গ-বিখ্যাত আর জগদ্বিখ্যাত ক'রে ছেড়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক বঙ্গ-বীরের পেছনে বাজ্‌তো ঢাক। রামানন্দবাবুর "প্রবাসী" আর "মডার্ণ রিভিউ" ছিল বাঙালীর পক্ষে অনেকটা সার্বজনীন ঢাক বিশেষ। কিন্তু এই ঢাকে গিরিশের স্বপক্ষে কাঠি পড়া সম্ভব ছিল না। ঘটনাচক্রে গিরিশের পেছনে এই ধরণের কোনো নিজস্ব ঢাউস মাফিকও কাজ করে নি। দৈনিকও ছিল না। বস্তুতঃ কোনো দৈনিক সেকালে রবীন্দ্র-ভক্তও ছিল না, বঙ্কিম-ভক্তও ছিল না।

লেখক—রামানন্দবাবু কাদের জন্য ঢাক পিটিয়েছেন?

সরকার—অনেকের জন্যে। মাত্র দু'জন-একজনের জন্যে নয়। তবে কম-বেশী আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের প্রধান ঢাকই ছিল "প্রবাসী" আর "মডার্ণ-রিভিউ।"

("রামানন্দ'র চার বাঙালী", ১৯ জুলাই ১৯৪৩)

লেখক—গিরিশের জন্য "প্রবাসী" আর "মডার্ণ-রিভিউ" বাজে নি কেন?

সরকার—রামানন্দবাবু ব্রাহ্ম। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রাহ্মরা ছিল অনেকটা হিন্দু (সনাতনী)-বিদ্বেষী। সনাতনীরাও ছিল ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী। গিরিশ-সাহিত্য বিশ্বকোষ বটে। কিন্তু এর একটা মস্ত হিস্যা হচ্ছে পৌরাণিক-তান্ত্রিক দেব-দেবীর সাহিত্য। দেবদেবী-পূজক, সনাতনপন্থী, রামকৃষ্ণ-ভক্ত গিরিশের স্বপক্ষে ব্রহ্ম-সম্পাদিত পত্রিকা দরদী হবে কী ক'রে? তা ছাড়া নাট্য-শিল্পী গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে-থিয়েটারে মেয়ে নিয়ে কারবারী। ব্রাহ্ম'র নাকে থিয়েটারের গন্ধ অসহ্য। সত্যি কথা,—সেকালের ইস্কুল-কলেজের "ভাল ছেলে" মাত্রই থিয়েটারকে দুর্নীতির বাথান সম্‌ঝে চল্‌তো। একমাত্র ব্রাহ্মদের দোষ কী? ১৯০১-১৪ সনের ভেতর আমার বন্ধুরা এই অধমকে মাত্র দু-বার থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিল। একবার দেখেছিলাম "ভ্রমর" ("কৃষ্ণকান্তের উইল")। আর একবার "দোললীলা"। দুইই ১৯০১ সনে। আজও,—চোদ্দ বছর বিদেশে নাচানাচির পরও,—নিজে গিয়ে থিয়েটার দেখি না। একবার নিয়ে গিয়েছিল শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখাবার জন্য একালের কাউন্সিলার নলিন পাল। পালা ছিল "আলমগীর" (১৯২৬)। আর সেদিন দেখ্‌লাম প্রতাপ চন্দ্র'র "সহরতলী" (২২ নবেম্বর ১৯৪৪)। এটা অবশ্য পেশাদারদের অভিনয় নয়।

লেখক—বঙ্কিমও তো সনাতনপন্থী, অন্ততঃপক্ষে অ-ব্রাহ্ম। তার জন্যে রামানন্দবাবুর ঢাক বাজ্‌লো কী ক'রে?

সরকার—বন্দেমাতরম্‌-মন্ত্রের ঋষিকে বয়কট করা কোনো ব্রাহ্ম'র পক্ষে পুরাপুরি সম্ভবপর ছিল না। বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের জোরে বঙ্কিম বঙ্গবীর, ভারতবীর, জগদ্‌বীর হ'য়ে পড়েন। বন্দেমাতরম্‌ হচ্ছে বঙ্কিমের "পাঁচজুতা"। তাঁর কথা "প্রবাসী"-"মডার্ণ-রিভিউ"তে অল্পবিস্তর আলোচনা না কর্‌লে, পত্রিকা দু'টার ইজ্জদ্‌ রক্ষা করা কঠিন হ'তো। তা'ছাড়া সে-যুগে বঙ্কিমের মৃত্যু হ'য়েছে অনেককাল। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা-কওয়া খানিকটা প্রাচীন-ভারতীয় বা "সেকেলে" বঙ্গ-সংস্কৃতির স্বপক্ষে বলা-কওয়ার সমান বিবেচিত হ'তো। ঠিক যেন পুরাণ-পন্থা কালিদাস আর কি? অধিকন্তু বঙ্কিম-চর্চা "প্রবাসী" "মডার্ণ রিভিউ"য়ে বেশী হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং গিরিশ প্রায় পুরাপুরি বাদ গেছে শুনে আশ্চর্য হ্‌বার কিছু নেই।

লেখক—দেখ্‌ছি বিনা ঢাকে বঙ্গবীর, ভারতবীর, জগদ্‌বীর হওয়া অসম্ভব?

সরকার—ভায়া, কী করা যাবে? দুনিয়ার দস্তুরই তাই। "গিরিশের যুগ" আসলে ব'লেছি।

তাও ঢাকের জোরে। কোনো প্রকার তুক্-মুক্ এখানে চল্‌বে না। চাই ঢাক, চাই ঢাকী। হেমেন দাশগুপ্তর "গিরিশচন্দ্র" (১৯১৮) প'ড়েছিস্? ছোট্ট রচনা,—কিন্তু বেশ ঢাক। এই ঢাকীর হাতে ঢাকের বাজ্‌নাটা শুনাচ্ছে মিঠে। এঁর "গিরিশ-প্রতিভা" ও আছে। এই ধরণের অনেক বই অন্যান্য হাতে অদূর ভবিষ্যতে বেরুতে থাক্‌বে সন্দেহ নাই।

হিংসার প্রভাব

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

সুবোধ—আপনি কি মনে করেন যে, আজ যাদের নাম বেশী নয় মর্‌বার পর তাদের নাম বাড়্‌বে?

সরকার—যথার্থ গুণী লোকের নাম বাড়্‌তে বাধ্য। যে-কোনো রামা-শ্যামার নাম, যে-কোনো আবদুল-ইসমাইলের নাম বেড়ে যাবে এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়।

লেখক—বেঁচে থাক্‌বার সময় অনেকের নাম চাপা থাকে কেন?

সরকার—কাণ্ড আর কিছুই নয়। অনেক ক্ষেত্রেই হিংসার খেলা। প্রায় প্র[illegible] লোকেরই থাকে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী। এক-আধজন বন্ধুও সকলেরই থাকে। কারু কপালে জুটে ঢাক। কেউ হয়ত ঢাক পেলো না। কারু বিরুদ্ধে হয়ত চলে ষড়যন্ত্র। তাকে চেপে রাখ্‌বার জন্যেই হয়ত কয়েকজন উঠে-পড়ে লাগে। এসব হ'চ্ছে সংসারের আটপৌরে চিজ। পরের উন্নতি দেখে বুক কড়-কড় করে কারু-কারু। এই জন্য চোখ-টাটানোর কষ্ট অনেকেই ভোগ করে। অপর দিকে কেউ-কেউ নিজের স্বপক্ষে প্রচারকের সাহায্যও পায়।

লেখক—কোনো গুণী লোককে চেপে রাখা সম্ভব হয় কেন?

সরকার—দেশের ভেতর অনেকগুলা আখ্‌ড়া, মজলিশ, বৈঠক, আড্ডা, সমিতি, সঙ্ঘ, পাঠাগার, পত্রিকা ইত্যাদির ব্যবস্থা না থাক্‌লে একসঙ্গে অনেকগুলা গুণীর পশার রক্ষা করা অসম্ভব। দু'-একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান থাক্‌লে তার মালিক বা কর্ম-কর্তারা নিজ মতলব মাফিক জবাই হবার বা চাপা পড়্‌বার সম্ভাবনা। হিংসার প্রভাবে অথবা বন্ধুত্বের অভাবে অনেক গুণী সহজেই কবরপ্রাপ্ত হয়। চাই রকমারি আড্ডা, রকমারি দল, রকমারি পত্রিকা। টক্করে বিজয়ী হওয়া কপালের জোর। বরাতে "বন্ধুভাগ্য" না থাকলে গুণী বেচারা কী কর্‌বে?

লেখক—গিরিশের সম্বন্ধে এই কথা খাটে কি?

সরকার—গিরিশের নাম-ডাক ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আরও বেশী হ'তে পার্‌তো যদি দেশের ভেতর অনেকগুলা বড়-বড় পত্রিকা ও সমিতি থাক্‌তো। তাহ'লে গিরিশের স্বপক্ষেও হয়ত অন্যতম ঢাউস পত্রিকা দাঁড়িয়ে যেতো। তখন জোর-সে ঢাক পেটাবার ব্যবস্থা সহজেই হ'তে পার্‌তো। কিন্তু তা ঘটে নি, অথবা বোধহয় যথোচিত ঘটে নি।

লেখক—ভবিষ্যতে ঘট্‌বে কেন?

সরকার—কারণ অতি সোজা। বঙ্কিম আর রবি এই দুইজনের নাম ক্রমশঃ তেতো হ'য়ে আস্‌বে। দুনিয়ার নরনারী বৈচিত্র্য চায়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবিরা, গাল্পিকেরা, নাট্যকারেরা রোজ-রোজ এক ধরণের গল্প লিখে সুখী হয় কি? নিত্যি-নতুন ঘটনা সৃষ্টি কর্‌বার দিকে তাদের মাথা খেলে। নয়া-নয়া চরিত্র খাড়া না কর্‌তে পার্‌লে তাদের পেট ভরে না। সমালোচকদেরও দস্তুর তাই। তারা সাহিত্যের বা শিল্পের কোনো একজন বীর, মহাবীর, পাঁড়

বা অবতার নিয়ে জীবন কাটাতে পারে না। বিরক্ত লেগে যায়। শিল্প-সাহিত্য-মণ্ডলের নতুন-নতুন নক্ষত্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ আবিষ্কার কর্‌বার জন্য তারা দূরবীণ লাগিয়ে ব'সে থাকে। সমালোচনা-প্রণালীটাই ক্রমশঃ বদ্‌লে যায়। সু-কু'র কষ্টিপাথর নয়া-নয়া আকারে দেখা দেয়। তখন নামজাদা মহাবীরদেরকে ছিকে'য় তুলে রাখ্‌বার রেওয়াজ কায়েম হয়। তখন তারা হয় "ক্লাসিক" বা অমর, অর্থাৎ অ-পাঠ্য অথবা সার্বজনিক শিশু-পাঠ্য। আর হয়ত চাপা-পড়া নামগুলা আশ্‌মানে জ্বল্‌-জ্বল্‌ কর্‌তে থাকে।

লেখক—আবার জিজ্ঞেস কর্‌ছি—আপনি কি বল্‌তে চান যে, কোনো-কোনো গুণী লোককে চেপে রাখ্‌বার জন্য সাহিত্য-সংসারে স্বজ্ঞানে চেষ্টা করা হ'য়ে থাকে?

সরকার—কোনো-কোনো গুণী লোককে চেপে রাখ্‌বার ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। সে-কালেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাক্‌বে। যোগ্য লোককে অপদস্থ করা, স্বদেশ-সেবককে বে-ইজ্জদ করা কুচুটে মানুষের অন্যতম স্বধর্ম। অযোগ্য লোকেরা দলাদলির দৌলতে দেশের লোকের সাংসারিক ইজ্জদ পায়। অনেক গুণী লোককে ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করা হয়। দলের দৌরাত্ম্যে না খেতে পেয়ে মারা যায় খাঁটি করিৎকর্মা লোকেরা।

লেখক—স্বদেশ-সেবকেরাও সাহিত্যবীরদের মতনই চাপা প'ড়ে যায়?

সরকার—স্বার্থত্যাগীদের কাজে বাধা দেওয়া কোনো-কোনো লোকের একমাত্র কাজ। এই ধরণের শত্রুতার দরুণ খাঁটি স্বদেশ-সেবকদের কেউ-কেউ দেশকে এগিয়ে দেবার কাজে চরম বাধা পায়। প্রকারান্তরে হিংসুটেরা দেশেরই শত্রুতা করে।

লেখক—দেশের উন্নতি বাধা পাচ্ছে একথা কি হিংসুটেরা বুঝে না?

সরকার—বেশ বুঝে। হিংসুটেরা দেশের উন্নতি চায় না। তারা চায় নিজের টাকাপয়সা, নিজ পরিবারের সম্মান, নিজেদের ক্ষমতা-বৃদ্ধি। স্বদেশ-সেবকেরা দেশের উন্নতি কর্‌ছে আর করতে পারে,—হিংসুটেরা তা দেখ্‌তে পাচ্ছে। কিন্তু তাতে হিংসুটেদের ব্যক্তিগত লাভ নাই। ব্যক্তিগত আর পারিবারিক লাভের জন্য তারা স্বদেশ-সেবকদেরকে কুপোকষা ও কোন্‌ঠেশা ক'রে রাখ্‌বেই রাখ্‌বে। তাতে দেশের ক্ষতি হ'লেও তারা সুখী। প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুরা দেশকে ঠেলে তুল্‌বে,—দেশের উন্নতি কর্‌বে,—নিজেদের মাথা খাড়া রেখে চলাফেরা কর্‌বে,—এই দৃশ্য হিংসুটেদের রক্তে বরদাস্ত হয় না। এরি নাম হিংসা, হিংসুটে-চরিত্র, ব্যক্তিগত রেষারেষি অথবা দলগত খাওয়া-খাওয়ি।

লেখক—হিংসার প্রভাব এত সার্বজনিক?

সরকার—হিংসা, চুক্‌লি, টক্কর ইত্যাদি চিজ শুধু সাহিত্য-সংসারের মাল নয়। কি রাষ্ট্রিক, কি আর্থিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি সামাজিক, সকল কর্মক্ষেত্রে অনেক সময়েই গুণী লোকেরা চাপা পড়ে, জবাই হয়, প্রাণ হারায়। আবার ঘটনাচক্রে পরবর্তীকালে তারাই মাথা চেঁড়ে উঠে, দেশ-মান্য হয়, জগদ্‌বরেণ্যরূপে পূজা পায়। যাই হোক,—হিংসাহীন দুনিয়া নাই। কাজেই চাপাপড়া গুণী লোকেরও অভাব হয় না। কোন্‌ গুণীটা চাপা পড়্‌বে, আর কোন্‌ গুণীটা চেঁড়ে উঠ্‌বে, সে-সব হচ্ছে বরাতের কথা। বুঝ্‌লি?

লেখক—ব্যক্তিগত হিংসা, টক্কর, আক্রোশ কি গুণী লোকদের চাপা পড়্‌বার একমাত্র কারণ?

সরকার—একমাত্র কারণ নয়। তবে ব্যক্তিগত হিংসা, পারস্পরিক আক্রোশ ইত্যাদি শক্তি ধনীমহলে আর গুণিমহলে সর্বত্রই অতি জবর। এজন্য খুনোখুনি পর্যন্ত হয়। একজন আর একজনকে চেপে রেখেই সন্তুষ্ট থাকে না। তার "দু-বেলা আঁচানো" বন্ধ কর্‌তে চায়,

তাকে সবংশে নিধন ক'রে শান্ত হয়। অহিংসার গুণ গাওয়া মন্দ নয়। তবে হিংসার প্রভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

লেখক—এতদূর গড়ায় কেন?

সরকার—পৃথিবীতে অমর হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের রক্তে মাখানো র'য়েছে। টাকা-পয়সায় বড় হ'য়েও লোকের শোআস্তি নাই। চায় সবাই সংসারে চিরকাল বেঁচে থাক্‌তে, অমরতা লাভ কর্‌তে। "লোকে যারে নাহি ভুলে" সেই অবস্থা পাবার জন্যে মানুষ কর্‌তে পারে না এমন কিছু নাই।

লেখক—ম'রে যাবার পর অমর হবে কিনা, কোনো লোক তার আন্দাজ কর্‌তে পারে কি?

সরকার—আন্দাজ করা অতি-কঠিন। সেইজন্য বেঁচে থাক্‌তে-থাক্‌তেই মানুষ চায় দেখ্‌তে যে, তার সমান আর কেউ নাই, সে সকলকে ঠেলে দেশের ভেতর একমেবাদ্বিতীয়ম্ হ'য়ে র'য়েছে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপে সম্বর্দ্ধনা বা পূজা পাবার জন্য যে-কোনো লোক অসংখ্য রকমের অকথ্য কাজ কর্‌তে পারে। দু-চার-দশজনকে মাথা খাড়া কর্‌তে না দেওয়া তো সামান্য কথা।

দশাননী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব

লেখক—সামাজিক নাম-ডাকের ক্ষেত্রে পারস্পরিক হিংসা ছাড়া আর কোনো শক্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

সরকার—সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, অর্থ, সমাজ বা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের সমজদারেরা নানা দলে বিভক্ত। প্রত্যেক দলের এক-একজন পীর, পাঁড়, অবতার থাকে। সেই সব মহাবীরদেরকে কেন্দ্র ক'রেই দুনিয়ার সু-কু, উন্নতি-অবনতি জরীপ করা দস্তুর। কোনো সমালোচক বা সমজদারের পক্ষে একসঙ্গে অনেকদিন নজর ফেলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক সমজদারেরই কোনো-না-কোনো সঙ্কীর্ণতা আছে। দশাননী বিশ-চোখো দৃষ্টিভঙ্গী রেখে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি বা সমাজ জরীপ করা প্রত্যেক লোকের পক্ষেই কঠিন। প্রায়-সব মানুষই এক-চোখো ও একপেশে সমজদার বা সমালোচক। আগে ব'লেছি যে, হিংসার দৌরাত্ম্যে একগর্তে দুই সিংহ থাকে না। এখন বল্‌ছি আর এক কথা। কোনো হিংসাহীন সমালোচকের পক্ষেও এক সঙ্গে দুই সিংহের তারিফ করা সাধারণতঃ অসাধ্য। একটাকে বড় কর্‌তে গিয়ে আরেকটাকে খানিকটা ছোট করা প্রায় সর্বজনিক দস্তুর।

লেখক—আপনি কি মনে করেন, ভবিষ্যতের গিরিশ আরও বড় হ'লে বঙ্কিম ও রবির দর ক'মে আস্‌বে?

সরকার—না। দিন যতই যেতে থাক্‌বে ততই ব্যক্তিগত হিংসার প্রভাব ক'মে আস্‌বে। দলাদলির দৌরাত্ম্য দেখা যাবে কম। নতুন-নতুন দল দাঁড়িয়ে যাবে। বহুত্বের যুগে লোকেরা একাধিক পীর বা অবতারকে একসঙ্গে পূজা কর্‌তে আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌বে না।

লেখক—দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে পারেন?

সরকার—বিলাতে আজকাল যাঁহা মার্লো আর বেন জন্‌সন্ তাঁহা শেক্‌স্‌পীয়ার। কিন্তু বিগত শ' চারেক বছরের ভেতর এই তিনজন সমসাময়িক এক পংক্তিতে বস্‌তে পেরেছে

কতবার? উনবিংশ শতাব্দীর টেনিসন আর ব্রাউনিঙ্ আজও বোধহয় এক আসরে ঠাঁই পায় না। হয় ত টেনিসনের দলে আর ব্রাউনিঙের দলে ঝগড়া পুরাপুরি মেটেনি। কিন্তু মোটের উপর বলা চলে যে, চসার হ'তে গল্‌সোআর্থি পর্যন্ত সবাই দাঁড়িয়ে গেছে,—"ক্লাসিক", পাঁড়, অবতার ইত্যাদি। হিন্দু দেব দেবীদের ভেতর ব্রহ্মায়-বিষ্ণুতে-মহেশ্বরে লড়াই কম ছিল কি? একালে কী দেখতে পাচ্ছি? তিন দেবতাকেই গৃহস্থ-ঘরে একসঙ্গে দুধ-কলা দেওয়া হচ্ছে। মায় এমন কি "যেই কৃষ্ণ সেই কালী"।

লেখক—আপনি রবির যুগে গিরিশকেও বড় ভাব্‌তেন?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) শুধু গিরিশ কেন, ক্ষীরোদ, দ্বিজেন, সকলকেই আমি পূজাস্থান ভেবেছি। মধু-হেম-নবীন তো ছিলই। ছোক্‌রা সত্যেন দত্তকেও মুখস্থ ক'রেছি। অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী"তে (১৯১৩-১৪) রবিকে কালিদাসের সমান (তার চেয়ে বড়) বল্‌তেও ভয় পাই নি।

লেখক—একালেও তো আপনাকে চরম রৈবিক ব'লে লোকেরা জানে।

সরকার—ঠিকই জানে। তবে আমি আজও রৈবিক "দলস্থ" কেউ নই। যাহ'ক ১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিনে তাঁকে "দি গ্রেটেস্ট্ ইন্‌ডিয়ান অব হিস্ট্রি" (ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তান) ব'লেছি। এই মত আমার কোনো দিনই বদ্‌লাবে না। তা সত্ত্বেও গিরিশের যুগ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

লেখক—এসব সম্ভব হয় কী ক'রে?

সরকার—এই অধম সর্বভুক্। কেউ রুই-কাতলা দিলে তাও খাই। আবার পুঁঠি-ট্যাংরায়ও আপত্তি নাই। আর একালে হেরিং-স্যামন-হাডক্-ম্যাক্‌রেল ইত্যাদিতেও মেজাজ শরীফ্ হয় দস্তুরমতন। বয়কট আমি জানি না।

লেখক—কিন্তু প্রায় লোকই সাহিত্য-চর্চায় বাদ-বিচার চালায় না কি?

সরকার—চালাতে পারে। কিন্তু আমি গরীব মানুষ। পেটে আমার সবই সয়। সব সোআদেই জিহ্বা তৈয়ের। আসল কথা, নানা কবির নানা সোআদ। সুতরাং এক থালায় রকমারি কাব্য-গল্প-নাট্য পরখ্ করতে বসা অতি-পেটুকের লক্ষণ নয়! বরং সুবিবেচকেরই লক্ষণ। আজকাল সামঞ্জস্যশীল খাদ্য-সামগ্রী রকমারি ভিটামিনওয়ালা "ব্যালান্স্‌ড্ ডায়েটে"র যুগ চল্‌ছে। এইজন্য বঙ্কিম, রবি, গিরিশ সবই একসঙ্গে উদরস্থ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। অন্যের পক্ষেও এই পথ্য জারি কর্‌তে রাজি আছি। শিল্প-সাহিত্যের বেলায় দশাননী বিশ-চোখো সমজদারি বা সমালোচনা যা, খাওয়া-দাওয়ার বেলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈচিত্র্যশীল খাদ্য-প্রাণের ব্যবস্থা করাও তা।

লেখক—দশাননী সমালোচনার যুগ কতদিনে আসে? অর্থাৎ ব্যক্তিগত হিংসা, আক্রোশ, শত্রুতা ইত্যাদি শক্তির প্রভাব কতদিন পর্যন্ত থাকে? চাপাপড়া গুণীরা কতদিন পর মাথা খাড়া কর্‌তে পারে?

সরকার—গজকাঠি দিয়ে জরীপ ক'রে কঠিন। তবে লোকগুলার মর্‌বার অন্ততঃ একপুরুষ কাল পরে ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রভাব বোধ হয় পুরাপুরি না হোক খানিকটা কেটে যেতে পারে। তার আগে চাপা-পড়া গুণীদের ইজ্জদ-বৃদ্ধি সম্ভব নয় মনে হচ্ছে। অর্থাৎ বচ্ছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশেক না গেলে নতুন-কিছু আশা করা কঠিন।

লেখক—তখন কী নতুন অবস্থা ঘটে যাতে চাপা-পড়াদের মাথা খাড়া করা সম্ভব হয়?

সরকার—চাপা-পড়াদের ব্যক্তিগত শত্রু-প্রতিদ্বন্দ্বীরা বোধহয় তখন মারা গেছে।

শত্রুপক্ষে পরিবারের ভেতর পয়সাওয়ালা ক্ষমতাশালী দুঁদে লোক হয়ত আর থাকে না। চাপাপড়াদের পরিবারেই হয়ত তখন দুঁদে লোকের আবির্ভাব হয়। অধিকন্তু নতুন-নতুন ছোকরাদের দল সমাজে নয়া-নয়া মাপকাঠি কায়েম কর্‌তে থাকে। পুরাণো ষড়যন্ত্রের বাথানগুলা কাহিল হ'য়ে পড়ে। তার ফলে নবীন-প্রবীণ সব-কিছুরই ঝাড়া-বাছা সুরু হয়। স্বাধীনভাবে সমালোচনা চালানো কঠিন হয় না। দেশের অতীত সম্বন্ধে মূল্য-পরিবর্তন দেখা দেয়। বোধহয় বছর পঞ্চাশেকের কমে সত্যিকার ওলট-পালট, ইজ্জদের রূপান্তর, নাম-জাদাদের পুনর্গঠন সম্ভব হয় না। একশ' বছর পার হয়ে গেলে "যেই কৃষ্ণ সেই কালী"। ফ্রান্সে আজ কর্নেই ও ক্লাসিক, রাসিন ও ক্লাসিক। আগে খাওয়া-খাওয়ি ছিল দস্তুর-মতন।

লেখক—এতদিন লাগে?

সরকার—রামমোহনের আসল যাচাই আজও হ'লো না। মর্‌বার (১৮৩৩) পর শতাব্দী পার হ'য়ে গেছে। এখনো চ'লেছে দলাদলি। দুনিয়ার পরীক্ষায় পাশ হওয়া বড়ই কঠিন। মর্‌বার পরবর্তী একশ' বছরও বেশী-কিছু নয়।

অ-রৈবিক শক্তি ও সঙ্ঘ

সুবোধ—রবীন্দ্র-বিরোধী আড্ডা, মজলিশ, সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বাড়্‌তে থাক্‌লে "গিরিশ-যুগ" আস্‌তে থাক্‌বে কি?

সরকার—আমি তা বলি নি। "রবীন্দ্র-বিরোধী" শক্তি বা সঙ্ঘের বাড়্‌তি আমার বক্তব্যের অন্তর্গত নয়। আমি বল্‌বো যে, অ-রৈবিক বা অ-রাবীন্দ্রিক ব্যক্তি, সঙ্ঘ ও শক্তির বাড়তির সঙ্গে-সঙ্গে গিরিশ ইত্যাদি অন্যান্য ইজ্জদবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। "গিরিশের-যুগ' রবীন্দ্র-বিরোধী যুগ নয়। রবীন্দ্র-যুগের সঙ্গে-সঙ্গেই গিরিশের যুগ এবং অন্যান্য যুগও চল্‌তে পারে। অ-রৈবিক আর রবীন্দ্র-বিরোধী এক চিজ নয়। আমি দশাননী সমালোচকদের সংসার দেখ্‌ছি।

লেখক—অ-রৈবিক শক্তি ও সঙ্ঘের সূত্রপাত অথবা ক্রমবিকাশ আজকালকার বাঙালী সমাজে দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—হ্যাঁ, পাচ্ছি।

লেখক—কয়েকটার নাম কর্‌বেন্?

সরকার—প্রথমেই ব'ল্‌বো নাট্য-সাহিত্যের আসর। এই আসরটা জোরের সহিত অ-রৈবিক। গিরিশ ত বটেই, ক্ষীরোদ আর দ্বিজেন্দ্রলালও নাট্যশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়। একথা যে-কোনো নাট্য-রসিক ব'লে থাকে, ব'লেছে ও বল্‌বে। অনেকে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলাকেও খুব তারিফ করে। বাজারের থিয়েটার-প্রেমিকেরা নাট্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের খবর রাখে না। সত্যি কথা, থিয়েটার-খোররা যে-ধরণের ঘটনা-বহুল নাটকের খদ্দের সে-ধরণের নাটক রবির হাতে বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। নীহার রায় প্রণীত "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা"য় (১৯৪১, পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৬৭) এই বিষয়ে বড়-গোছের আলোচনা আছে। বিশ্লেষণটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হ'য়েছে। প'ড়ে দেখ্‌বি।

লেখক—আর কোনো অ-রৈবিক আসর আছে?

সরকার—কয়েকটার নাম ক'রে যাচ্ছি। এই সব মহলে একসঙ্গে বহু বীরের সম্বর্দ্ধনা চলে ও চ'ল্‌বে।

(১) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র গৃহস্থ ভক্তদের দল। এদেরকে আটপৌরে লিখিয়ে-পড়িয়ে "ভদ্রলোক" মধ্যবিত্ত বাঙালী বল্‌তে পারি। শহরে-মফস্বলে এই দল নাক-গুণ্‌তিতে বেশ পুরু। এই সকল নরনারীর বিচারে সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ "একমেবাদ্বিতীয়ং" বীর নন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র হ'তে করুণানিধান, যতীন বাগ্‌চি, কালিদাস রায়, মোহিত মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনী, দিলীপ রায় ইত্যাদি সকলেরই ঠাঁই এই আসরে আছে। অতএব এই আসরটা অ-রৈবিক। অবশ্য এদেরকে রবির চেয়ে বড় বিবেচনা করা এই আসরের দস্তুর নয়। কোনো-কোনো মার্কামারা গর্তে এই সকল লোক পড়্‌তে রাজি নয়।

(২) মজুর-পন্থী, সমাজ-তন্ত্রী, আর কমিউনিষ্ট-ধর্মী বা সাম্যবাদী লিখিয়ে-পড়িয়েদের দল। এই আসরে রবীন্দ্রনাথের ইজ্জদ বোধ হয় বেশী নয়। এমন কি এদের অনেকে হয়ত রবীন্দ্র-বিরোধী। অ-রৈবিক শক্তিগুলার ভেতর এই দলের লোকেরা বেশ-কিছু জেঁকে ব'সেছে। এরা "বস্তি"-সাহিত্যের দরদী। "কাস্তে"-কাব্যের সমজদার এই সব লোক। রবি গন্ধ এরা সইতে পারে অতি-সামান্য। প্রেমেন, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, সমর, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি কবিদেরকে এই দলে ফেলা যেতে পারে।

(৩) মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান-মাফিক যারা তথাকথিত নিম্নজাতের নর-নারী তাদের অনেকেই অ-রৈবিক আসর গ'ড়ে তুল্‌ছে। রবির সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য অনেকে এদের ইজ্জদ পায়। এই আসরও বাড়তির দিকে যাবে।

(৪) মুসলমান মস্তিষ্ক-জীবীদের ভেতর অনেকে অ-রৈবিক আসরের চাঁই র'য়েছে ও থাক্‌বে।

লেখক—মুসলমানদের ভেতর-অরৈবিক দল বুঝা যায় কী ক'রে?

সরকার—এই মহলের কেহ-কেহ নজরুলকে রবির সমান (এমন কি বড়) দরের কবি সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত! কিন্তু স্বদেশী-যুগের সত্যেন দত্তকে রবির সমান ভাবা যা, সত্যেনের পরবর্তী নজরুলকে রবির সমান ভাবা ও তা। যা হোক,—দর-কষাকষিটা যুক্তিসঙ্গত কিনা সে-কথা আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, অ-রৈবিক মতিগতি মুসলমান সাহিত্য-সেবীদের সমাজে বেশ স্পষ্ট।

লেখক—নজরুল সম্বন্ধে আপনার কী মত? মুসলমান কবিদের রচনা কিরূপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—এক কথায় ব'লে রাখ্‌ছি যে, ১৯২১-২২ সনে, প্রথমবারকার বিদেশ-প্রবাসের সময়, নজরুলকে আমি বীর ব'লে সম্বর্দ্ধনা ক'রেছি। তখন মাত্র 'বিদ্রোহী' কবিতাটা নজরে প'ড়েছিল। একালের মোহিত মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনী দাস ইত্যাদি কবিদের সঙ্গে নজরুলের ঠাঁই? আজকাল মুসলমান কবিদের কেহ-কেহ রৈবিক, কেহ-কেহ অ-রৈবিক। অ-রৈবিকদের ভেতর আবার কেউ বা সাম্যবাদী "বস্তি"-শিল্পী। আবদুল কাদির, জসিমুদ্দিন ইত্যাদি কবির সমালোচনা "বাড়তির *পথে* বাঙালী" (১৯৩৪) বইয়ে আছে। কবিদের ভেতর হিন্দু-মুসলমান ফারাক করা আমার ধাতে সয় না। কবিদের ধর্ম নাই, জাত্‌ নাই, দেশ নাই। তারা সৃষ্টি করে দুনিয়া,—অর্থাৎ ব্যক্তি, অবস্থা ও ঘটনা। কেউ বড় "কবি", কেউ ছোট "কবি"।

লেখক—আর কোনো অ-রৈবিক ব্যক্তি বা সঙ্ঘ দেখ্‌ছেন?

সরকার—(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের আর ইস্কুল-কলেজের মাষ্টার-জাতীয় মস্তিষ্কজীবীরা চোপর দিনরাত "রবি" "রবি" "রবি" ক'রে আসর জাঁকাতে পারে না। ভবিষ্যতেও পার্‌বে না। একঘেয়ে গান গাইলে কোনো আসরেই কল্কে পাওয়া কঠিন। অ-রৈবিক শক্তির অন্যতম

শক্তির এই সব পড়ুয়ার দল। নতুন-নতুন সাহিত্য-বীরদের ঢুঁড়ে বের করা গবেষকদের দস্তুর। ছোক্‌রারাও চায় নয়া-নয়া বীর। দূরবীন লাগিয়ে তারা ব'সে র'য়েছে। চালাকি নয়।

(৬) কোনো-কোনো পাঠক-সমালোচক-পণ্ডিত নতুন-নতুন মাল,—ভাবে আর ভাষায়—আমদানি কর্‌তে চায় না। তারা অ-রৈবিক মাত্র নয়, বেশ-কিছু রবীন্দ্র-বিরোধীও বটে। ঘটনাচক্রে এই স্থিতি-নিষ্ঠ দলের নামজাদা প্রতিনিধি মোহিত মজুমদার। ইনি বোধ হয় একমাত্র "বলাকা"র (১৯১৬) পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যকে "রৈবিক" সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। এঁর বিচারে মনে হচ্ছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল বেলাটা (১৯১৬-৪১) না থাক্‌লেই যেন চল্‌তো। তাতে রবিরও জাত্‌ যেত না, বাঙালীর ও ক্ষতি হ'তো না, আর দুনিয়াও দরিদ্র হতো না। অনেকটা প্রায় এই রূপই যেন মোহিতলালের মেজাজ। বুঝা যাচ্ছে যে, জাতীয়তা-পন্থী স্বাদেশিকতার প্রচারক কবি এবং সমালোচকও বেশ-কিছু রবীন্দ্র-বিরোধী আর অ-রৈবিক ধারার অন্যতম স্রষ্টা। কিছু আশ্চর্যের কথা বটে।

লেখক—মোহিত মজুমদারকে অ-রৈবিক রূপে দেখা যায় কি?

সরকার—হাঁ খানিকটা। তাঁর "বিচিত্র কথা"র (১৯৪১, পৃষ্ঠা ১৮৫-১৯৩) প'ড়ে দেখিস। এই প্রবন্ধগুলার ভেতর "শেষের কবিতা" উপন্যাসের (১৯২৯) জন্য রবির ওপর চাবুক লাগানো আছে দস্তুর-মতন। "এই একখানা বই রসাতল-যাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" এই হচ্ছে একবাণী। আর একবাণী নিম্নরূপ ঃ—"রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বাংলা-সাহিত্য বড়।"

লেখক—এতো রীতিমত রবি-বিরোধী, অ-রৈবিক মাত্র নয়?

সরকার—তা ব'লে মোহিতলাল রাবীন্দ্রিক রসে কম মাতোআরা নন। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে খাটো বা খেলো করা তাঁর মতলব নয়। রবি সম্বন্ধে তাঁর অনেক প্রবন্ধ আছে। ঐ বইয়েই আছে, "বিবিধ কথা"য় (১৯৪১) আছে, অন্যান্য জায়গায়ও পাবি। "জয়ন্তী-উৎসর্গ"- বইয়ে (১৯৩১) মোহিতলালের "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য" প্রবন্ধ খুবই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-রসিকে রবীন্দ্র-রসিকে তফাৎ দেখ্‌তে চাস্‌?

লেখক—কেন, কী কর্‌তে বল্‌ছেন?

সরকার—নীহারের বইয়ে "শেষের কবিতা" বিষয়ক পৃষ্ঠাগুলো (৪৬৩-৪৭৮) পড়্‌বি। মোহিতে-নীহারে আকাশ-পাতাল ফারাক দেখ্‌তে পাবি। যাই হ'ক, মোহিতকে অ-রৈবিক ধারার প্রতিনিধি সম্‌ঝে রাখা আবশ্যক।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, এই সাত শ্রেণীর ব্যক্তি, দল, সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান হ'তে "গিরিশের যুগ" সম্বন্ধে মতামত গ'ড়ে উঠ্‌বে?

সরকার—ঠিক তাই। এরা অবশ্য সকলে মিলে ষড়যন্ত্র ক'রে রবিকে বয়কট কর্‌তে লেগে যাবে না। অ-রৈবিক চোখে বাঙালী জাত, বঙ্গ-সংস্কৃতি ও দুনিয়াকে দেখ্‌তে এরা কিছু-কিছু অভ্যস্ত। কাজেই রবীন্দ্র-যুগ ছাড়াও বহুসংখ্যক কৃতী বাঙালীর যুগ এদের চোখে ভেসে উঠ্‌তে বাধ্য। দশাননী সমালোচনার আবহাওয়া গ'ড়ে উঠ্‌ছে। এইটেই আসল কথা।

প্রমথ বিশীর হাসি-রাশি

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

সুবোধ ঘোষাল—আপনি প্রমথ বিশীর নাটক দেখেছেন?

সরকার—"ঋণং কৃত্বা" দেখেছি। "বন্ধু"ও দেখেছি।

লেখক—কেমন লাগে?

সরকার—কথোপকথনগুলা বেশ চটক্‌দার। হাসাতে পারে। পেট ভ'রে হাসা যায়। একালের বাঙালী চরিত্র নিয়ে নক্সা চালাবার ক্ষমতা দেখা গেল। হাসিতে দাঁত, ছোরা বা বিষ নাই। কাউকে নিন্দা করার দরকার হয় না। গিরিশ ঘোষের হাসি আর প্রমথ বিশীর হাসি এক জিনিষ নয়। কোনো-না-কোনো ব্যক্তি বা সমাজ বা দল গিরিশের অট্টহাসিতে বেশ-কিছু ক্ষেপে উঠ্‌তে পারে। কিন্তু প্রমথ বিশী বোধ হয় কাউকে কামড়ায় চটায় না। নির্মল হাসির স্রষ্টা হিসাবে প্রমথ বিশী বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষত্বশীল সন্দেহ নাই।

লেখক—এক-আধটা দৃশ্য মনে আছে?

সরকার—"ঋণং কৃত্বা" দেখ্‌বার সময় আমার মেয়ে (ইন্দিরা) ব'সেছিল দূরে তার বন্ধুদের সঙ্গে। আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লে—"বাবা, শেক্‌স্‌পীয়ারের টুয়েলভ্‌থ নাইট যে!"

লেখক—তার মানে?

সরকার—কতকগুলা দৃশ্য শেক্‌স্‌পীয়ারের ঐ নাটকের নকল। দৃশ্যগুলা নকল ত বটেই। মায় মনে হবে,—লাইনে-লাইনে তর্জমা কোনো-কোনো জায়গায়।

লেখক—এতটা নকল ভাল কি?

সরকার—ভাল নয় কেন? এক হিসাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য আগা-গোড়া প্রায় সবই পাশ্চাত্য (বিশেষতঃ বিলাতী) সাহিত্যের নকল। যেখানে নকল দেখা যায় না, সেখানে আছে প্রভাব। একমাত্র কালিদাস, চণ্ডীদাস আর কবিকঙ্কণ খেয়ে বাঙালীর বাচ্চা মধু, রঙ্গলাল, বঙ্কিম, হেম, নবীন, বিহারী, দ্বিজেন, ক্ষীরোদ, রবি, শরৎ হ'তে পার্‌তো না। পাশ্চাত্য খোরাক সকলের পেটেই র'য়েছে প্রচুর পরিমাণে। একালের "সাম্প্রতিক" গাল্পিক-নাট্যকার-কবিরা সেই ধারাই চালিয়ে যাচ্ছে।

("ভারতে ইয়োরামেরিকার চোরাই মাল", ১৭ নবেম্বর ১৯৪৩)

লেখক—প্রথম বিশীর সঙ্গে আলাপ আছে?

সরকার—না, তাঁকে চিনি না। দেখিও নি।

লেখক—নকল বা প্রভাব আপনি পছন্দ করেন?

সরকার—অপছন্দ কর্‌বার কারণ নাই। ঝাড়া তর্জমাও আমি অ-পছন্দ করি না। অধিকন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য আগাগোড়া তর্জমা নয়। পাশ্চাত্যের নকল করাকে বা প্রভাবে পড়াকে তর্জমা করা বল্‌বো না। বাংলা ভাষার মারফৎ নয়া অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র খাড়া করা হচ্ছে। অনেক সময়ে নকল মনেই হয় না। প্রভাবও ধর্‌তে পারা যায় না। লেখকদের কৃতিত্ব যথেষ্ট।

লেখক—'ঋণং কৃত্বা'য় শেকস্‌পীয়ারের নকল ও প্রভাব কতটা ধর্‌তে পারা যায়?

সরকার—যারা শেক্‌স্‌পীয়ার পড়েনি তারা নকল তো বুঝ্‌তে পার্‌বেই না। প্রভাবও ধর্‌তে পার্‌বে না। যারা শেক্‌স্‌পীয়ার-খোর তারাও দেখ্‌বে যে গল্পটার ভেতর শেক্‌স্‌পীয়ার

ছাড়া আরও অন্যান্য মাল আছে। কাজেই নাটকটা প্রমথ বিশীরই সৃষ্টি। এইখানে আর একটা কথা বল্‌তে চাই। প্রমথ বিশী উঁচুদরের সাহিত্য-সমালোচক। তাঁর "রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ" (১৯৩৯) প'ড়ে আমি চরম আনন্দ লাভ ক'রেছি। বইটা আগাগোড়া চিন্তায়-ভরা, গাম্ভীর্য-পূর্ণ বিশ্লেষণের স্তম্ভ বিশেষ। তাতে হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি-রগড়ের চিহ্নমাত্র নাই। যারপরনাই শিক্ষাপ্রদ রচনা। আগে একবার এসব বিষয়ে ব'কেছি।

লেখক—আচ্ছা, এইবার একটা প'ড়ে শুনাচ্ছি। শুনুন ;—

"অধ্যাপকের প্রবেশ ; বয়স পঞ্চাশ ; পার্শী ধরণের কোট গায়ে ; দীর্ঘাকৃতি, মুখে সপ্রতিভ হাসি।

"অধ্যাপক—চাই বে-আদপি, চাই আহাম্মুকি। * * * বাঙালী কি ডরায়? "বাড়তির পথে" চ'লেছে বাঙালী! এতে কিছু হবে না। মার পাঁয়জোর, পাঁচ-পাঁচ জুতি ; ইয়োরামেরিকার বাজারে ছাড়ো নয়া-নয়া বুলি, দেখ্‌তে পাবে বাপের বেটা বাংলা দেশ উঠ্‌ছে জেগে। শালা!"

সরকার—ব্যাপার কী? এযে স্বয়ং এই অধম? বুখনিগুলা সব এক জায়গায় জড়ো হ'য়েছে দেখ্‌ছি কিন্তু "শালা"টা পেলে কোথায়? ও তো আমার বুলি নয়।

লেখক—আরও শুনুন্‌ ঃ—

"অধ্যাপক—১৯০৫! ১৯০৫! * * * ওটা একটা তারিখ। * * * তারিখ-ই পাঁয়জোর, * * * ওই তারিখটা হচ্ছে হিন্দুস্থানের বুকে বাংলা দেশের ভৃগুপদচিহ্ন। এই পদাঘাতের অপমানের গৌরবে হিন্দুস্থান একদিন জেগে উঠেছিল।"

সরকার—লেখকটা কে হে? বেড়ে মজা ক'রেছে তো? কী বই?

লেখক—এই দেখুন "পরিহাস-বিজল্পিতম্‌"। নাট্যকার প্রথম বিশী। যার এই মাত্র প্রশংসা ক'র্‌লেন। থিয়েটারে নিজের চরিত্র দেখ্‌তে চান? তাহ'লে শুনুন আরও কিছু ঃ—

"অধ্যাপক—আপত্তি থাকে তো এগিয়ে আয়! দেখি কেমন বাপের বেটা। আমি নয়া, আমি বে-আদপ, আমি বে-ইজ্জৎ, জুতাপেটা-করা, দুনিয়ার মতামতকে আমি কলা দেখাতে পারি। আমি বেয়াড়া রকমের তাজা-তাজা কর্মের কাজী। এক কথায় আমি ত্যাঁদড়, সাহস থাকে ত এগিয়ে আয়।"

সরকার—আমার বিশ্বাস,—থিয়েটারে এই চরিত্রটা চরম হাসির ফোআরা ছুটিয়ে ছাড়ে। অধ্যাপকটাকে পালোআন খাড়া ক'রেছে। এই অধমের বোলচালগুলোতে পাঞ্জা-কষাকষির বুখ্‌নি থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু একদম সত্যিকার শারীরিক হাতাহাতিতে এই বেচারা কোনোদিন এগোয় নি,—আজ পর্যন্ত। কিন্তু প্রথম বিশীর অধ্যাপক আস্তেন গুটিয়ে লড়্‌তে নামে দেখ্‌ছি। রঙ্গমঞ্চে নিশ্চয়ই অধ্যাপকের ভঙ্গীটা জবরদস্ত হাসিরাশির কারণ হয়। অন্যান্য চরিত্রগুলা কী-কী?

লেখক—আপনি নিজের চোখেই দেখুন একটু প'ড়ে।

সরকার—দেখ্‌ছি,—মেয়র, রাজনীতিক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, প্রকাশক, সিনেমা-ডিরেক্টার, সম্পাদক, রিপোর্টার, কৃটিক, আধুনিক নারী, মিস্‌-বেঙ্গল ইত্যাদি চরিত্র। বাঃ মেয়রের মুখে বেশ কথা দেওয়া হয়েছে তো?

লেখক---কোন্‌টা?

সরকার—এই যে, মেয়র বল্‌ছেন ঃ—"না মশায়! বাংলা দেশে কেউ গ্রেট কিছু হ'য়েছে কি আমার দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এইবার সবাই বল্‌বে তার নামে একটা রাস্তার নামকরণ

ক'রে দাও। এখন বাংলা দেশে প্রতি বছর ডজন খানেক গ্রেট্‌ম্যান বেরুচ্ছে—এত রাস্তা আমি পাই কোথায়? হায়, হায়, সামনে আবার ইলেক্‌শন আস্‌ছে।" অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

লেখক—এই ধরণের নাটক সম্বন্ধে আপনি কী বল্‌তে চান?

সরকার—নাট্যকার বস্তুনিষ্ঠ দিল্‌দেরিয়া মেজাজের লেখক। অতি-গম্ভীর কড়া-পাকের সমাজ-সমালোচক ইনি নন। এঁর ভেতর গোঁড়া লোক-শিক্ষক, পাঁড় দেশ-সংস্কারক ইত্যাদি শ্রেণীর ধরণ-ধারণ নাই। সেকালের ফরাসী নাট্যকার মোলিয়েয়ার এই ধরণের সামাজিক নাটকের দুনিয়ায় নং ১।

লেখক—এই জাতের নাটকের দৃষ্টান্ত ইংরেজি সাহিত্য হ'তে দেবেন?

সরকার—শ্রেষ্ঠ বিলাতী নজির হবে সেকালের বেন্ জন্‌সন্ আর একালের বার্ণার্ড শ'। তবে প্রমথ বিশীর চরিত্রগুলা শহুরে লোক। আর ঘটনা ও অবস্থাসমূহ আসে একমাত্র লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজনের সমাজ হ'তে। এর "বন্ধু" নাটকেও দেখেছি তাই।

লেখক—একমাত্র লিখিয়ে-পড়িয়ে সমাজ ছাড়া অন্য সমাজ না থাক্‌লে নাট্যকার সম্বর্দ্ধনার যোগ্য কি?

সরকার—কেন নয়? এই নাট্যকার লিখিয়ে-পড়িয়ে সমাজের গলি-ঘোঁচ সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল। যা জানে না সেদিকে পথ মাড়ায় না। নাটকগুলার সবই বস্তুনিষ্ঠ অথচ রসাল। না বুঝে-শুনে পল্লীয়ানা, চাষীপনা অথবা মজুর-প্রীতি দেখাতে গেলে মালও দাঁড়িয়ে যাবে হাল্কা, ভাসা-ভাসা বা ফ্যাকাসে। আর রসও জম্‌বে না। তাতে পেটভরা হাসি সৃষ্টি করা কঠিন।

লেখক—কেন? শহুরে বা শিক্ষিত লোকই কি আধুনিক নাটকের একমাত্র চরিত্র হবার উপযুক্ত?

সরকার—তা তো বলি নি। বল্‌ছি যে প্রমথ বিশী শহুরে চরিত্র নিয়ে হাসি সৃষ্টি ক'র্‌তে ওস্তাদ। তারাশঙ্করের লেখা "গণ-দেবতা"র মাল বা ঐ ধরণের অন্য-কোনো পাড়াগেঁয়ে কথা-বস্তু নিয়ে হাসির ফোআরা ছুটানো প্রথম বিশীর পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না।

মার্চ ১৯৪৪

বাড়্‌তির পথে বাঙালী (১৯৩৪-৪৪)

৯ই মার্চ ১৯৪৪

মন্মথ—আপনার "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) বেরিয়েছিল বছর দশেক হ'লো। এই দশ বছরে বাঙালী জাতের বাড়্‌তি কেমন লক্ষ্য করছেন?

("১৯৮০ সনের বাঙালী" ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪২)

সরকার—বেশ-কিছু বেড়েছে। বল্‌তে গেলে আবার একখানা হাজার পৃষ্ঠার বই বেরিয়ে আস্‌বে। যেদিকে ইচ্ছা জরীপ সুরু করো। গুণ্‌তিতে, বহরে, ওজনে, লম্বা-চওড়ায় সকল কর্মক্ষেত্রেই দেখ্‌তে পাবে বাড়্‌তি, প্রগতি, চড়াই। দশাননী দৃষ্টিভঙ্গী চাই। আর চাই সংখ্যা-শাস্ত্রের মাপজোক। নতুন বই লিখ্‌বার খেয়াল বর্তমানে নাই।

লেখক—তবুও দু'-এক দিক্‌কার ফলাফল বলুন কিছু।

সরকার—মেয়ে মহলের খবর নিতে পারো। নানা কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের ঠাঁই বেড়ে চ'লেছে। ১৯৩৪ সনে যা দেখেছি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি আজকাল।

লেখক—মেয়ে-চাক্‌রের সংখ্যা কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—কড়ায়-ক্রান্তিতে হিসাব পাওয়া অসম্ভব। খোলা চোখে দেখার ফল বাংলাতে পারি। তুমি নিজেই দেখ্‌ছো কম কি? মেয়েদের "পুরুষ-সাম্য" বাঙালী সমাজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। একে আমি ইংরেজিতে বলি "ম্যাস্‌কুলিনিজেশন অব উওম্যান"। মেয়েরা "আমাজন" বা "মর্দানা" হ'য়ে পড়্‌ছে না। হচ্ছে পুরুষের সমান করিৎকর্মা।

লেখক—লোকেরা যে বলে মেয়েরা "মর্দানা" হ'য়ে যাচ্ছে। মর্দনা মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধি কোনো দেশের পক্ষে ভাল কি?

সরকার—মেয়েদের পুরুষ-সাম্য বল্‌লে আমি মর্দানা ("আমাজন") মেয়ের যুগ বুঝি না। "ম্যাসকুলিনিজেশন" শব্দে আমি বুঝি যে, মেয়েরা পুরুষেরই মতন, পুরুষের সমান কাজ কর্‌তে সমর্থ। কোনো তথাকথিত পুরুষোচিত কাজ নাই, আর তথাকথিত মেয়েলি কাজও নাই। দুই ধরণের বা দুই জাতের কাজ আমার বিশ্বকোষে টুঁড়ে পাবে না। যাকে লোকেরা পুরুষের কাজ বলে তার অনেক-কিছুই মেয়েরাও কর্‌তে পারে। দক্ষতার সহিতই পারে। লিখিয়ে-পড়িয়ে সমাজের বাঙালী মেয়েরা তথাকথিত পুরুষোচিত কাজের দুনিয়ায় পেকে উঠ্‌ছে। এতদিন সুযোগ পায় নি। অথবা সামান্য সুযোগ ছিল। এ-কয় বছরে দেখ্‌ছি সুযোগ বেড়ে চ'লেছে।

হেমেন ঘোষের ওষুধের কারখানা

লেখক—মেয়েদের জন্য কাজকর্মের সুযোগ বেড়েছে কোন্‌-কোন্‌ দিকে?

সরকার—ডাক্তার হেমেন ঘোষের ওষুধের কারখানা দেখেছো?

লেখক—কৈ, নাম শুনিনি তো? সেখানে দেখ্‌বার কী আছে?

সরকার—কারখানার নাম "স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্‌"। ভ্যাকসিন, সিরাম ইত্যাদি ইনজেক্‌শনের ওষুধ তৈরী হয়। অন্যান্য ডাক্তারি ওষুধও আছে। এমন কি কবিরাজি চ্যবনপ্রাশ তৈয়ারীর ব্যবস্থাও দেখেছি। সেকালে ছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা "সবে ধন নীলমণি"। আর বিগত লড়াইয়ের পর মাথা খাড়া ক'রেছে ডাক্তার নরেন দত্ত'র বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং। এখন দেখ্‌ছি যে, বর্তমান লড়াইয়ের পর বাঙালীর কারবার হিসাবে অন্যতম নামজাদা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে যাবে—হেমেন ঘোষের স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল। বর্তমানে বাহাল আছে শ' সাতেক মজুর ও কর্মচারী।

লেখক—ডাক্তার হেমেন আপনি আগে চিন্‌তেন?

সরকার—হাঁ, প্রথম আলাপ হয় প্যারিসে ১৯২১ সনে। তখন তাঁকে প্যাস্তায়র ইন্‌স্টিটিউটে বায়অ-কেমিক্যাল গবেষণায় মোতায়েন দেখি। পরে জার্মাণিতেও দেখা হ'য়েছে। হেমেন ঘোষের বৈজ্ঞানিক গবেষণার খবর আমার "ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া" বইয়ে (বার্লিন ১৯২২) পাবে। গবেষণার কাজে আজ পর্য্যন্ত বাহাল আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় গবেষণার ফলাফল ছাপা হয়।

লেখক—হেমেন ঘোষের কারখানার মতন আর কোনো বাঙালী কারবারের কথা বল্‌তে পারেন যা হালে মাথা তুলেছে বা তুল্‌ছে?

সরকার—টাটানগরের নগেন রক্ষিতকে হালের লোক ব'ল্‌বো না। কুমিল্লার মহেশ ভট্টাচার্য আর কল্‌কাতায় কমলালয় স্টোর্সের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন চক্রবর্তী ও প্রবীণদের অন্তর্গত। একালে সুরেন বসুর বেঙ্গল ওআটার প্রুফ কোম্পানী-অন্যতম। যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সুরেন রায় প্রবর্তিত বিজলির বাতি ও অন্যান্য কারখানা উল্লেখযোগ্য। এইরূপ উল্লেখযোগ্য যতীশ দাশের বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, নরেন দত্ত'র কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, শান্তি দত্ত'র কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, শচীন ভট্টাচার্যের ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ক্ষেত্র দালালের নাথ ব্যাঙ্ক আর সুরেশ রায়ের আর্যস্থান ইন্‌শিওর্‌্যান্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। আলামোহন দাশ আমাকে দিয়ে ১৯২৭ সনে কল্‌কাতায় "ফরোআর্ড" ব্যাঙ্ক খুলিয়েছিল। সেটা পটল তুলেছে। কিন্তু একালের আলামোহন বছর দশেকের ভেতর যন্ত্রপাতির কারখানা দাঁড় করিয়েছে, ব্যাঙ্ক খাড়া ক'রেছে, বীমা চালিয়েছে, পাটের কলও কায়েম ক'রেছে। হাব্‌ড়ার কাছে দাশনগর মাথা তুলেছে। প্রফুল্লচন্দ্রের ফতোআয় সে আজ "কর্মবীর"। এই ধরণের আরও অনেক কর্মবীরের নাম করা সম্ভব। বঙ্গ-বিপ্লবের (১৯০৫) পরবর্তী বঙ্গ-সমাজে বহুসংখ্যক কর্মবীর নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান লড়াইয়ের হিড়িকে রামা-শ্যামা-আবদুল-ইস্‌মাইল ইত্যাদি অনেক লোক কারবারী হ'য়ে প'ড়েছে। তবে এই সকল লড়াইয়ের কারবারীদের অনেকেই লড়াইয়ের পর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। অথবা পার্‌বে কিনা সন্দেহ।

লেখক—দাঁড়াতে পার্‌বে না কেন বল্‌ছেন?

সরকার—দুনিয়ায় দাঁড়াতে হ'লে চাই টক্করে জেতা। উঠ্‌তে-বস্‌তে টক্কর চালানো আবশ্যক। টক্কর চালিয়ে যে-সকল কারবারী বাজার দখল কর্‌তে পারে তারাই হয় টেঁকসই। কিন্তু লড়াইয়ের কারবারীরা মোটের উপর গবর্মেণ্টের পোষ্যপুত্র বিশেষ। গবর্মেণ্ট অর্ডার দেয়, গবর্মেণ্ট রসদ ও কুদরত্তি মাল জোগায়, গবর্মেণ্ট যানবাহনের ব্যবস্থা করে, গবর্মেণ্ট পুঁজি জোগায়, গবর্মেণ্ট মাল খরিদ করে, গবর্মেণ্ট মাল চালান দেয়। কোনো দফায়ই টক্কর নাই, ভাবনা নাই। একে ব্যবসা বলে না।

("শ' পাঁচেক আলামোহন", জুন ১৯৪৪)

মেয়ে-চাক্‌রে

লেখক—আপনি মেয়েদের পুরুষ-সাম্য বুঝাতে গিয়ে হেমেন ঘোষের স্ট্যাণ্ডার্ডের নাম ক'র্‌লেন কেন?

সরকার—কারখানা-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হেমেন ঘোষকে কর্মবীর বল্‌ছি সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কারখানার অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে মেয়ে-চাক্‌রে। কয়েক বৎসরের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক মেয়েকে কারখানায় বাহাল ক'রে এই কোম্পানী একটা জবরদস্ত কাজে হাত দেখিয়েছে।

লেখক—অন্যান্য বাঙালী কারখানায় কি মেয়েরা কাজ করে না?

সরকার—বেশী কারখানায় করে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এই দিকে মেয়ে-

চাক্‌রেদের ভাত-কাপড় জুট্‌ছে। ভবিষ্যতে আরও বেশী জুট্‌বে। হেমেন ঘোষ রাসায়নিক কারখানায় মেয়েদের জন্য চাক্‌রী খুলে বাঙালী জাতের অন্যতম পথ-প্রদর্শক হ'তে পেরেছে। এই বাহাদুরী তারিফযোগ্য। ডাক্তার নবজীবন ব্যানার্জিও তাঁর ওষুধের কারখানায় গোটা-কয়েক মেয়ে বাহাল ক'রেছেন। কারখানার নাম ক্যালকাটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন। তার কর্মকর্তা নবজীবনের ছেলে কেম্ব্রিজ-ফেরৎ গৌতম। এই সব কারবার নয়া বাঙ্‌লার চিহ্নোৎ।

লেখক—স্ট্যাণ্ডার্ডের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-করা মেয়ে কি?

সরকার—কেহ ম্যাট্রিক পাশ-ফেল, কেহ আই-এ বা আই-এস্ সি পাশ-ফেল, দু-একজন বোধহয় বি-এস্ সি। এরা রাসায়নিক পরীক্ষায় বাহাল আছে, জীবজন্তুর রস-রক্ত পরীক্ষায় বাহাল আছে। তাছাড়া আপিসের নানা বিভাগেও মেয়েদের বাহাল দেখেছি। টাকা পঁয়ত্রিশের কম কেহ মাইনে পায় না। গোটা ষাটেক পায় অনেকে। দু-একজন একশ' পর্যন্ত উঠেছে।

লেখক—যে-সকল বিভাগে পুরুষেরা কাজ করে সেই সকল বিভাগেই মেয়েরাও কাজ করে কি? না, মেয়েদের বিভাগ আলাদা?

সরকার—না। পুরুষের পাশে-পাশে মেয়েরাও কাজ করে। গ্লাস-ব্লোইং বিভাগে মেয়েদের জন্য বোধহয় আলাদা বিভাগও দেখেছি।

লেখক—আজকাল আর কোন্-কোন্ জায়গায় মেয়ে-চাক্‌রেদের জন্য ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—ইস্কুলে তো আছেই। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগে মেয়েরা চাক্‌রি পাচ্ছে। এই কাজে মেয়েদেরকে শিখিয়ে নেবার জন্য কল্‌কাতায় অ্যাণ্ডার্সন হেল্‌থ্-স্কুল (স্বাস্থ্য-পাঠশালা) কায়েম হ'য়েছে। এখানকার পাশকরা মেয়েরা মফঃস্বলে চাক্‌রি পেয়েছে। মাইনে পায় টাকা পঁচাত্তর বা শ'। ১৯৩৪ সনের আগে এসব ছিল না। টেলিফোন আফিসেও বাঙালী মেয়েরা চাক্‌রিতে ঢুক্‌ছে।

লেখক—তাছাড়া মেয়েদেরকে চাক্‌রে ভাবে আর কোথায় দেখা যায়?

সরকার—অধিকন্তু লড়াইয়ের হিড়িকে মেয়েরা চাক্‌রি পাচ্ছে অনেকে। প্রথমতঃ আছে উড়ো জাহাজের আক্রমণ হ'তে শহর-রক্ষা কর্‌বার বিভাগ। এই বিভাগের তদ্‌বিরে মেয়েরা ছোট-বড়-মাঝারি চাক্‌রি পেয়েছে। লড়াইয়ের ব্যবস্থা-সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের চাক্‌রি জুটেছে বোধহয় শ'-পাঁচেক। তাছাড়া আছে লড়াইয়ের সাপ্লাই (বা মাল-যোগান) বিভাগ। এই আপিসে অনেক মেয়ে কাজে বাহাল আছে।

লেখক—এই সকল মেয়ে-চাক্‌রেদের জীবনযাত্রা কিরূপ বিবেচনা করেন?

সরকার—এরা কেউ বিবাহিত, কেউ অবিবাহিত। এদের ভেতর বিধবাও আছে। তাছাড়া ডিভোর্সওয়ালী, ঘর-বাড়ী-ভাঙা অথবা বহিষ্কৃতাও দেখা যায়। বাঙালী মেয়েরা মজবুদ হচ্ছে। নয়া ঢঙের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র গ'ড়ে উঠ্‌ছে। সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালী পুরুষেরাও নতুন সামাজিক গড়ন চাখ্‌তে অভ্যস্ত হচ্ছে। বাপ-মাদের স্বভাব, ভাই-বোনদের স্বভাব, স্বামী-পত্নীদের স্বভাব,—সবাই নতুন কাঠামে মেরামত হ'য়ে যাচ্ছে। বাঙালী পরিবার, বঙ্গ-সমাজ একটা জবরদস্ত পুনর্গঠনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দস্তুর-মতন চল্‌ছে সামাজিক রূপান্তর।

লেখক—নয়া ঢঙের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন কাকে বল্‌ছেন?

সরকার—রামায়ণ-মহাভারতের সীতা-সাবিত্রী বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সমাজে অচল। বাইশ-পঁচিশ-আঠাশ বছরের মেয়ে-চাক্‌রেরা সেকালের সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী মাফিক জীবন চালাতে পারে না। বাপ-মারা আর ভাই-দাদারা বুঝেছে। স্বামীরা, স্বশুরেরাও বুঝেছে। আর মেয়েরা ত বুঝেছেই। বঙ্গ-সমাজে এ এক বিপুল যুগান্তর। ভূদেব-বিবেকানন্দ-রামেন্দ্র-গুরুদাসের পরবর্তী ধর্মনীতি চল্‌ছে। তবে ডোজ বা মাত্রা এখনো নেহাৎ কম। মাত্র কয়েক শ' বা হাজার মেয়ের জীবনে নয়া গড়ন দেখা যাচ্ছে। একে সত্যিকার সমাজ-বিপ্লব বলে না। এইসব চাই আরও বেশী-বেশী

সমাজতন্ত্র ও "বৃহত্তর ভারত"

লেখক—বিগত বছর দশেকের মধ্যে বাঙালী জাতের বাড়্‌তি আর কোন্ দিকে দেখ্‌ছেন? দু-একটা কথা বলুন।

সরকার—বক্‌তে সুরু কর্‌লে অনেক-কিছু বলা হ'য়ে যাবে। যাক্, মাত্র একটা দিকে আঙুল দেখাবো। সে হচ্ছে সমাজতন্ত্র (সোশ্যালিজ্‌ম্) আর কমিউনিজ্‌ম্ (ব্যক্তিগত ধন-দৌলতের বিলোপ-সাধন) এই দুই দিকে বাঙালী মগজের অভিযান। ১৯৩৪ সন পর্যন্ত এই দুই শব্দ দেখা যেত অনেকটা ভাসা-ভাসা ভাবে বাঙালী জাতের আবহাওয়ায় আজ-কালকার বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজনের মুড়ো এই বোল দুটার অন্তর্গত মাল সম্বন্ধে খানিকটা পেকে উঠেছে। এই নতুন লক্ষণের দাম ঢের। ব্যক্তিগত ধন-দৌলতের বিলোপ-সাধন চিজটা বাঙালী জাতের মাথায় আর বোলচালে বস্‌তে থাকুক। যথাসময়ে উপকার হবে। যাহ'ক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

লেখক—আপনি ত অনেকদিন ধ'রে বর্তমান যুগের "বৃহত্তর ভারতের" জীবনবৃত্তান্ত বা ইতিহাস শুনিয়ে চ'লেছেন। এই দশ বৎসরে বৃহত্তর ভারত এগুলো কতখানি? বাঙালীরা হালে দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু কর্‌তে পেরেছে কি?

সরকার—১৯১৪ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত বিশ বছরে বাঙালীর বাচ্চা বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার ক'রেছিল প্রচুর পরিমাণে। তাতেই ইয়োরামেরিকায় আর এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত বাড়্‌তির পথে চ'লেছিল। ১৯০৫ সনের ধারা টেনে আনা হ'য়েছিল অনেক দূর। সেই বাড়তির ধারা ১৯৪৪ সনেও বজায় আছে। হালের দশ বছরে বাঙালীর লিখিয়ে-পড়িয়ে আর করিৎকর্মা লোকের দেশ-বিদেশে যুবক ভারতের কর্মক্ষেত্র বাড়িয়ে তুলেছে। আজও দুনিয়ায় বাঙালীর বাচ্চা বিশ্বশক্তির দস্ব্যবহার করবার জন্য নানা ডিহিতে মোতায়েন র'য়েছে।

"জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী" (১৯৪৩)

১৪ই মার্চ ১৯৪৪

মন্মথ—লড়াইয়ের যুগে, —১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বরের পরবর্তীকালে,—বাঙালী লেখকদের চিন্তার গতি কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—আবার বিশ্বকোষ ঝাড়্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে নাকি?

লেখক—না, মাত্র একটা কি দুটা কথা শুন্‌তে চাচ্ছি?

সরকার—আচ্ছা তাহ'লে মাত্র একটা বইয়ের নাম করি। কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী"। ১৯৪৩ সনে বেরিয়েছে। বইটা পড়্‌বামাত্রই বুঝ্‌লাম "বাড়তির পথে বাঙালী"।

লেখক—কেন? বইটার ভেতর বাঙালী জাতের উন্নতি কী দেখ্‌তে পেলেন?

সরকার—দেখ্‌লাম, বাঙালীর মগজ পেকে উঠছে।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—গ্রন্থকারকে লিখেছিলাম ধাঁ ক'রে একটা আনন্দে-ভরা চিঠি। সেই চিঠি তাঁর সম্পাদিত "যুগান্তর" দৈনিকে ছাপা হ'য়েছে। এই দ্যাখো।

লেখক—দেখি? পড়্‌তে পারি?

সরকার—তাহ'লে দিচ্ছি কী জন্যে?

লেখক—আচ্ছা, তাহ'লে জোরেই পড়ছি ঃ—"জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী" বাঙালীর চিন্তায় ও বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিবে। তথ্যকে তথ্য, ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা,—দুই-ই মজুত আছে প্রচুর। বিশেষ কথা একালের দুনিয়া-বিশ্লেষণ। সংবাদ মাত্র নয়—খতাইয়া দেখা, তলাইয়া-মজাইয়া বুঝা আর বুঝানো।

"বর্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী লিখিবার অন্যতম মতলবই ছিল বাঙালী গবেষকদেরকে বর্তমান-নিষ্ঠায় তাতাইয়া তোলা। বাঙালী লেখকেরা আজকাল সম-সাময়িক দেশ ও দুনিয়ার গবেষণায় কিঞ্চিৎ-কিছু সময় দিতে ঝুঁকিয়াছেন। "জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী" তাঁহাদেরকে নিজেদের জীবনকালের ঘটনাবলীর ভিতর মাথা খেলাইতে আরও বেশী উৎসাহিত করিবে। নয়া ঢঙের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক লেখক বাঙ্‌লায় দেখা দিতে বাধ্য।

"আর একটা কথা বলিতে চাই। ১৯১৪ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতে বসিয়া লিখিয়াছিলাম "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র"। সে নেহাৎ ছোট বই। "জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী"র নিকট সেই পুস্তিকা আকারে-প্রকারে পরাস্ত হইল,—এইজন্য আমি যারপর-নাই আনন্দিত আবার "বাড়তির পথে বাঙালী।"

("যুগান্তর", ১৩ জুন ৪৩)

লেখক—"জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী" বই হিসাবে আপনার "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র"কে হারিয়েছে ব'লে আপনি খুসী? আপনাকে কি আর কোনো বাঙালী কোথাও হারায় নি?

সরকার—নিশ্চয়ই হারিয়েছে। যতবারই কোনো বাঙালী আমাকে হারিয়েছে ততবারই আমি আনন্দে ব'লেছি ঃ—"বাড়্‌তির পথে বাঙালী"। একবার-দুবার নয়, হাজার বার। অর্থাৎ হাজার বার হাজার জায়গায় হাজার বাঙালী দেশটাকে হিড়্‌-হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে চ'লেছে। আর অধম আমি তা' রাস্তায় দাঁড়িয়ে অথবা জানালার খড়খড়ি দিয়ে দেখেছি আর প্রাণে-প্রাণে ভেবেছি,—"বিধাতার কাজ সাধিছে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে"। আমি লোকটা সামান্য। এইজন্য চোপরদিন-রাত জরীপ করি দেশের উন্নতি, প্রগতি, বাড়্‌তি।

লেখক—বাড়্‌তি মাপ্‌বার একমাত্র কৌশল কি আপনাকে হারিয়ে দেওয়া?

সরকার—কে বল্‌লে? তাতো কখনো বলিনি। ১৯৩৪ সনের বইটাতে বাড়্‌তি-জরীপ-কৌশল বাৎলানো আছে বিস্তৃতভাবে। আমাকে হারিয়ে দেওয়াটাই বাড়্‌তি-জরীপের একমাত্র বা প্রধান মাপকাঠি নয়। এ একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। আসল কথা সংখ্যা-মাফিক বিচার। ফি দশকে প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে বাঙলার নরনারী নয়া-নয়া জীবন-স্পন্দন দেখাচ্ছে,—নানা

ঢঙের জীবন-গড়ন প্রকাশ ক'র্‌ছে। এই সব জীবন-স্পন্দনের বাড়্‌তি আর জীবন-গড়নের বৈচিত্র্য ফুটে উঠ্‌ছে ১৯৩৪-৪৪ সনর যুগেও। এইটেই আসল কথা।

বিনয় ঘোষের "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" (১৯৪০)

লেখক—বাঙালী মগজের বাড়্‌তি বৈচিত্র্য-বৃদ্ধি লড়াইয়ের যুগের আর কোনো বইয়ে দেখ্‌তে পেয়েছেন?

সরকার—দেখ্‌ছি আবার বকিয়ে ছাড়্‌বে?

লেখক—বলুন এক-আধটা নাম।

সরকার—বিনয় ঘোষের "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" প্রথম খণ্ড (১৯৪০, পৃঃ ১৫৭) হ'তে খানিকটা প'ড়ে শোনাচ্ছি ঃ—

"শান্তি, সৌন্দর্য স্বাধীনতা, বিশ্বাস,—সকলের কাম্য। এ যুগে সে কামনা পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা নেই বলে কেউ ক্যাথলিক গির্জায় কেউ মধ্যযুগে কেউ মৃত্যুতে কেউ কল্পনার আইভরি মিনারে তার সার্থকতা সন্ধান করেন। এ যুগেই সে কামনা চরিতার্থ কর্‌বার জন্য যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র প'ড়ে রয়েছে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে—আজ শিল্পীর দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হয় নি ব'লেই এই মানসিক বিপর্যয়। অর্থাৎ শিল্পীর অন্তরে সুপ্ত প্রাণশক্তি যে বাইরে পৃথিবীর বুকে ক্রিয়াশীল, তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি যে-শান্তি চান, যে-সৌন্দর্য, যে-স্বাধীনতা, যে-বিশ্বাস, যে-নিরাপত্তা কামনা করেন, এ যুগের সঙ্কটের মধ্যে আজ তারই জন্য সংগ্রাম সুরু হ'য়েছে, এ যুগের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী শ্রমজীবী শ্রেণী আজ সেই একই দাবী নিয়ে সমাজতন্ত্রের মধ্যে তার পরিতৃপ্তির জন্য বিপুল বিশ্বাসে অগ্রসর হয়েছে। মধ্যযুগে, ক্যাথলিক গির্জায় বা আইভরি-মিনারে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন কী?"

লেখক—এর ভেতর আপনি কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—বিশ্বাসে-ভরা, সাহসে-ভরা, কর্মমূলক, লক্ষ্য-মাফিক গতিশীল, বলিষ্ঠ ভাবুকতা। "না" এখানে নাই—আছে "হাঁ।" লেখক সজোরে পাকড়াও ক'রেছে জীবনের কর্তব্য। সঙ্গে-সঙ্গে তার দখলে আছে কর্তব্য-সাধনের কর্ম-কৌশল। এইরূপ চিন্তায়ই মানুষ গ'ড়ে ওঠে, এই জীবন দর্শনের কিম্মৎ লাখ টাকা। জিনিষটা "সমাজতন্ত্র", "সাম্যবাদ", "সোশ্যালিজ্‌ম্", "কমিউনিজ্‌ম্" মার্কস্-লেনিনের দর্শন ইত্যাদি চিজের অন্তর্গত কিনা দেখ্‌বার দরকার নাই। সোজা চোখে দেখ্‌ছি,—এ হচ্ছে "জীবন, জীবন ভাই আনন্দ জীবন"। আর "আগে চল্, আগে চল্ ভাই।"

লেখক—বিনয় ঘোষের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

সরকার—নামও শুনিনি আগে। চেহারাও দেখিনি। কেবল বইগুলা প'ড়েছি। বয়েসে বোধ হয় আমার অনেক ছোট। প্রায় বছর পঁচিশ-ত্রিশেক ছোট হবে মনে হচ্ছে।

লেখক—"শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" বইয়ের ভেতরকার মতামত-গুলার সম্বন্ধে আপনি কী বিবেচনা করেন?

সরকার—হরেক কোণ থেকে মার্ক্‌স্-পন্থী "সামাজিক" ও "সাম্যবাদী" শিল্প-সমালোচনা দেখানো হ'য়েছে। খুবই চিত্তাকর্ষক,—তবে অনেক মন্তব্যই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রায়

প্রত্যেক দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে আমার অমিল। এই অমিলটা হচ্ছে আসলে মার্ক্স্-দর্শনের অদ্বৈতনিষ্ঠার সঙ্গে। অদ্বৈতহীন সাম্যবাদ আর বহুত্বশীল সামাজিক ও আর্থিক ব্যাখ্যা আমার মেজাজ-মাফিক দর্শনের অন্তর্গত।

লেখক—তবুও আপনি এর মধ্যে একটা কর্মমূলক জীবন-দর্শন পাচ্ছেন?

সরকার—ইজ্জৎ দিচ্ছি লেখকের "দশাননী" দৃষ্টিভঙ্গীকে। কট্টর কমিউনিজ্‌ম মাফিক সমালোচনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে। খুবই তারিফ কর্‌বার উপযুক্ত কাজ। শুধু তাই নয়? আরও কিছু গভীরতর কথা আছে। ১৯০৫ সনের বঙ্গ-বিপ্লবের জন্য যুবক বাঙলার উপযোগী একটা জীবন-দর্শন কায়েম ক'রেছিলাম। তার ভেতরও ছিল কার্যকরী ভাবুকতা। এই অধমের "সাধনা" বইয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলার (১৯০৭-১১) ভেতর সেই ভাবুকতার দম্ভল ছড়ানো র'য়েছে। ১৯৪০ সনে প্রকাশিত "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" বইয়ে "সাধনা"র জীবন-দর্শনেরই ঠিক যেন পরবর্তী ধাপ দেখ্‌তে পাচ্ছি। ধাপটা সুস্পষ্ট, সুবিস্তৃত আর সুচিন্তিতও বটে। জীবনের আখড়ায় লেখক আন্তরিকতাময় দরদশীল নিপুণ বাস্তু-শিল্পী। এই সব দেখে আবার "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে"। সুতরাং "শিল্প, সংস্কৃতিও সমাজ" যে-মেজাজ থেকে বেরিয়েছে সেই মেজাজ আপনা-আপনি আমার সম্বর্দ্ধনা টেনে নিচ্ছে। লেখককে সেলাম জানাচ্ছি। লেখক কোন্ ঢঙের বা কোন্ রঙের কমিউনিস্ট্ সে-সব আমার নজরে আসে না। আমি দেখ্‌ছি,—লেখক লাখ-লাখ গরীব ও পারিয়ার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুল্‌তে চায়।

লেখক—আপনার "সাধনা" বইয়ে কার্যকরী ভাবুকতার এক-আধ ফোঁটা পেতে পারি?

সরকার—তাহ'লে শোনো। "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" (১৯১৪) বইয়ে (পৃঃ ৮৯) "সাধনা" হ'তে খানিকটা উদ্ধৃত করা আছে। এই অংশটা ১৯১০ সনে প্রকাশিত "সাহিত্যসেবী" প্রবন্ধের অন্তর্গত। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মালদহ অধিবেশনে পড়া হ'য়েছিল।

লেখক—দেখি?

সরকার—প'ড়ে চলো।

লেখক—আচ্ছা বেশ।—"যে-ভাবুকতায় লোকে ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি ধ্যান করিয়া বর্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয় ; যে ভাবুকতার অনুপ্রেরণায় বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নিজের গৌরব-বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা-লাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিদ্যা-প্রচারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, স্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা খর্ব করিয়া দশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা-সৃষ্টির জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন ; যে ভাবুকতার ধনবান্ স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া সমগ্র সমাজকে বিদ্যায় ধনে ধর্মে উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বর্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন ; যে ভাবুকতার প্রভাবে ভগবান্ যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য-মোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম বিবেচনা করেন, সেইরূপ বৈরাগ্য-প্রসূতি ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোনো দিন কোনো সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের

উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংস্কারের উন্নতি বিধানের জন্য মানব স্থির-সংযত ভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবুকতাময় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।"

লেখক—এর ভেতর আপনি একালের সাম্যবাদী জীবন-দর্শনের পূর্ববর্তী ধাপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—না। এর ভেতর সাম্যবাদও নাই, মার্ক্‌স্‌-দর্শনও নাই। আছে জীবন-দর্শন,—কোনো-না-কোনো ঢঙের জীবন-দর্শন। "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" বইয়ের যে-অংশ উদ্ধৃত ক'রেছি তার ভেতর কমিউনিজ্‌ম্‌ থাক্‌লে আছে, না থাক্‌লে ব'য়ে গেল। কিন্তু আছে বিপুল আন্তরিকতা, কর্মনিষ্ঠা ও নয়া-দুনিয়া গড়্‌বার সতেজ ভাবুকতা। এই ভাবুকতাটা "সাধনা"র ভাবুকতারই ঠিক-যেন জুড়িদার বা ছোট ভাই। হরপে-হরপে ফারাক আছে ঢের। চামড়ার চোখে সহজেই তা মালুম হয়। কিন্তু দুইয়ে আত্মিক ফারাক এক আঙুলও নয়। প্রাণে-প্রাণে মিল আছে।

লেখক—১৯৪০ সনের "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" বইয়ের ভাবুকতাকে "সাধনা"র পরবর্তী ধাপ বল্‌ছেন কেন?

সরকার—১৯০৫-১০ সনের ভাবুকতা লাগিয়েছিলাম এক কর্মক্ষেত্রে। তার নাম স্বদেশ, স্বজাতি, স্বরাষ্ট্র, স্বরাজ। আজও তা বাদ দিবার দরকার নাই। ১৯৪০ সনের ভাবুকতাটা খাটানো হচ্ছে অন্য এক কর্মক্ষেত্রে। এই কর্মক্ষেত্রকে বলে গরীব লোক, ছোট লোক, অস্পৃশ্য, পারিয়া। কর্মক্ষেত্রে ফারাক আছে দস্তুর মাফিক। ১৯৪০ সনের আবিষ্কৃত কর্মক্ষেত্রটা নয়া চিজ। সে-যুগে ছিল না। এই জন্যেই এটা "পরবর্তী ধাপ,"—কাল হিসাবে মাত্র নয়, মাল হিসাবেও। ১৯০৫ সনের জোরে আমি আজও জীবন চালাচ্ছি। তাই আমার প্রধান সম্বল। ১৯৪০ সনের জোরে এই লেখক কম-সে-কম বছর ত্রিশেক জীবন চালাতে পার্‌বে। বাঙালী জাত বেড়ে চল্‌তে বাধ্য। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আন্দোলনের ভেতর এসে জুটেছে গরীব নর-নারীর সমাজ-বিপ্লব বা শ্রেণী-লড়াই। এই ধরণের শ্রেণী-বিরোধেও দেশোন্নতির নতুন-নতুন পথ খুলে যাচ্ছে।

গরীব বনাম পয়সাওয়ালা

১৮ই মার্চ ১৯৪৪

মন্মথ—বাঙালী জাত যে আজও বাড়তির পথে সাধারণতঃ লোকেরা তা বিশ্বাস কর্‌তে পারে না কেন?

সরকার—কারণগুলা অতি সোজা। লোকেরা পয়সা-ওয়ালা লোকজনের কাজকর্মের হিসাব রাখে। লোকেরা পয়সা-ওয়ালা লোকজনের চিন্তা-খেয়ালের খবর রাখে। যারা গরীব তাদের মগজের ভাবধারা সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের একদম নির্বিকার। যারা গরীব তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে জনসাধারণ একদম কাণা। যারা গরীব তাদের বুখ্‌নি-বাণী-বোলচাল সম্বন্ধে জনসাধারণ একদম কালা।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, যারা গরীব তাদের কাজ কর্ম, চিন্তা-খেয়াল আর

বুখ্‌নি-বাণীর ভেতর বাড়্‌তি বা উন্নতি লক্ষণ দেখা যায়? আর পয়সাওয়ালা মানুষের কাজ-কর্ম ইত্যাদির ভেতর প্রগতির চিহ্ন পাওয়া যায় না?

সরকার—অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যিকার কথাই তাই। নতুন কাজ, নতুন চিন্তা, নতুন বাণী, ঢুঁড়তে হবে গরীবের বৈঠকে, গরীবের আড্ডায়, গরীবের মজলিশে। কিন্তু দুনিয়ার দস্তুর হচ্ছে পয়সাওয়ালা লোকগুলার পেছন-পেছন ছোটা। পয়সাওয়ালাদের নাম আর ছবি কাগজে ছাপা হয় হামেশা। তাদেরকে সকল প্রকার সার্বজনিক জল্‌সায় ডেকে আনা হয় মূলগায়েন ক'রে। তারা মোড়ল, কর্মকর্তা, সভাপতি না হ'লে সমিতি, সম্মেলন, প্রতিষ্ঠান, পরিষৎ, সবই যেন না থাকার সামিল। কোনোদিন কোনো গরীব লোক কোনো সমিতি-সম্মেলন পরিষদের কর্মকর্তা বা মোড়ল বা মোল্লা হ'তে পারে নি।

লেখক—পয়সাওয়ালা লোকদের পেছন-পেছন ছুট্‌লে ক্ষতি কী?

সরকার—দেশটা এগুচ্ছে কিনা বুঝ্‌তে পারা যায় না। উন্নতি প্রগতি-বাড়্‌তি জরীপের যন্ত্রপাতি বেশ-কিছু বিচিত্র।

লেখক—কেন যাবে না? উন্নতি জরীপের কল-কব্জা কিরূপ?

সরকার—পয়সাওয়ালা লোকেরা নতুন কাজ কর্‌তে অক্ষম, নতুন চিন্তা দেখাতে অক্ষম, নতুন বোল আওড়াতে অক্ষম। তাদের মারফৎ যে-সকল কাজ-চিন্তা-বোল দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয় সে-সব তাদের নিজের তৈরি কাজ-চিন্তা-বোল নয়। সেই সব জিনিষ তাদের ভাড়াকরা লোকজনের মেহনতে তৈরী হয়। টাকাটা-সিকিটা-দোয়ানিটা দিতে তারা কয়েকজন লিখিয়ে-পড়িয়ে লোককে "কেরাণী" বহাল করে। কেরাণীরা পয়সাওয়ালাদের ফরমায়েস মাফিক কাজ-চিন্তা-বোল তৈরী ক'রে দেয়। এই সব কাজ-চিন্তা-বোল দেখে ভাড়াটিয়াদের মগজ বুঝা সম্ভব। পয়সাওয়ালা মনিবদের মগজ্‌ এতে নাই।

লেখক—বাঙলা দেশ কি এই হিসাবে খুব নিন্দনীয়?

সরকার—নিন্দা-প্রশংসার কথা বল্‌ছি না। একমাত্র বাঙলাদেশের হাল্‌ত্‌ এইরূপ নয়। তামাম দুনিয়ায় ঘট্‌ছে এই কাণ্ড। পয়সাওয়ালারা জগৎখানাকে পয়সার জোরে জুতোবেই জুতোবে। গরীব বেচারাদের কী দোষ? কোনোমতে দুবেলা না হ'ক, দেড়বেলা আঁচাবার ব্যবস্থা করা তো চাই। তার জন্য পয়সাওয়ালাদের কেরাণী বা ভাড়াটিয়া না হ'য়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে কেন? কাজেই অবস্থাটা নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় জানি না। ব'লে যাচ্ছি দুনিয়ার দস্তুর কি তাই।

ছোক্‌রা বনাম বুড়ো

লেখক—আর কোনো কারণে দেশের বাড়্‌তি সম্বন্ধে লোকেরা অনভিজ্ঞ থাকে কি?

সরকার—জনসাধারণ কোনো নতুন লোকের নাম সহজে মনে রাখ্‌তে পারে না। খবরের কাগজে যে-সব লোকের নাম ছাপা হয় তারা প্রধানতঃ প্রৌঢ়, প্রবীণ, বুড়ো। ভুঁড়ি যাদের পুরু নয়—এমন লোককে দেশের কোনো সমিতি-সম্মেলন-পরিষদে মাত্‌বরি ক'র্‌তে দেওয়া হয় না। জনসাধারণের বাতিক বুড়োগুলোর পেছন-পেছন ছোটা।

লেখক—এতে কী ক্ষতি হয়?

সরকার—দেশের বাড়্‌তি জরীপ করা অসম্ভব বা কঠিন হয়। বাড়্‌তি-উন্নতি-প্রগতির

আসল কথাই হচ্ছে নতুনের দরদ। যা-নাই তার স্বপ্ন দেখা,—যা-নাই তা কর্‌তে চেষ্টা করা,—যা-নাই তার জন্য পাগল হওয়া,—এই সবে বুঝা যায় নতুনের দরদ। বর্তমানকে ভাঙা হ্‌লো তার গোড়ার কথা। যা র'য়েছে তাহ'তে ফারাক-কিছু দাঁড় করানো তার দ্বিতীয় কথা। বাঁধা পথের পথিক না হওয়া উন্নতির একমাত্র কথা। কঠিন বোলচালে বোল্‌বো যে, অসাধ্য-সাধন ছাড়া উন্নতির আর কোনো লক্ষণ নাই। চাই অসন্তোষ, চাই অশান্তি।

("প্রবীণের অর্থ উন্নতির দুস্‌মন্‌", ২৫শে অক্টোবর ১৯৪২)

লেখক—প্রবীণদের দ্বারা কি অসাধ্য-সাধন সম্ভব নয়?

সরকার—কোনো বুড়ো বা প্রবীণ কোনোদিন কোথাও অসাধ্য সাধন ক'রেছে কিনা সন্দেহ। নয়া পথের পথিক হ'তে পারে প্রধানতঃ যারা ছোকরা। নতুনের দরদী হওয়া সম্ভব জোআনদের পক্ষে। কিন্তু সেই জোআনদেরকে আমল দেয় কোন্ পরিষৎ, কোন্ প্রতিষ্ঠান, কোন্ দৈনিক, কোন্ মাসিক? আগে নামজাদা হও তারপর সকলেই তোমার পা চাট্‌বে। এই এ'লো দুনিয়ার দস্তুর। কিন্তু কেউ তোমাকে পারিৎ-পক্ষে নাম-জাদা হ'তে সাহায্য কর্‌বে না।

লেখক—তা'হলে ছোক্‌রারা আর জোআনেরা দেশটাকে বাড়িয়ে তোলে কী ক'রে?

সরকার—অতি কষ্টে। চরম স্বার্থত্যাগ স্বীকার ক'র্‌তে হয়। না খেয়ে মর্‌তে হয়। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ছোক্‌রাদের দল চব্বিশ ঘণ্টা হাহুতাশ ক'র্‌ছে। প্রবীণেরা তাদের ঘাড় মট্‌কে দিচ্ছে চোপর দিনরাত। কোনোমতে তাদেরকে উঠ্‌তে দেবে না। যান্ত্রিক কারখানায় ছোক্‌রাদের কোনো ইজ্জদ আছে? বিলকুল নাই। মুরুব্বিদেরকে কুর্নিশ ক'রে কারখানায় চলাফেরা করা হচ্ছে তাদের নিত্যকর্ম-পদ্ধতি। মাথা হেঁট ক'রে সকাল-বিকাল হাজিরা দেওয়া হ'লো প্রধান কাজ। মাস-মাস তঙ্খা নিয়ে এসে কষ্টে-সৃষ্টে পরিবার প্রতিপালন করা দাঁড়িয়ে যায় ছোক্‌রা যান্ত্রিকদের স্বধর্ম। রাষ্ট্রিক-মহলে, শিল্পী-মহলে, কবি-মহলে, গাল্পিক-মহলে, সকল মহলেই এই হালচাল। বুড়োরা দুনিয়াখানাকে জুতোচ্ছে। কাজেই নতুনের দরদ বা উন্নতির লক্ষণ সমাজের আবহাওয়ায় বড়-একটা দেখা যায় না।

চাই চোঁথা আড্ডা ও পত্রিকার সঙ্গে দহরম-মহরম

লেখক—তাহ'লে আদৌ উন্নতি ঘট্‌ছে কী করে?

সরকার—প্রথমতঃ গরীবেরা নিজেদের জন্য নিজেদের তাঁবে ছোট-খাটো মজলিশে, আড্ডা, বৈঠক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, ছোকরারাও নিজেদের জন্যে নিজেদের তাঁবে এই ধরণের মজলিশ, আড্ডা, বৈঠক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলে।

লেখক—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পরিষদের সঙ্গে গরীবদের আর উদীয়মানদের যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—বল্‌তে আর কী বাকী আছে? দেশের ভেতরকার গণ্যমান্য, নামজাদা বা কুলীন মজলিশ-আড্ডা-বৈঠকে গরীবেরও ঠাঁই নাই, ছোক্‌রারও ঠাঁই না। গরীব-উদীয়মান ছোকরা-জোআন,—সকলেই আপন-আপন ঝুঁকিতে চ'রে বেড়াতে বাধ্য। জনসাধারণ চোঁথা, নগণ্য, নামহীন মজলিশ-আড্ডা-বৈঠকের ধার ধারে না। কোনো পাঠক চোঁথা, নগণ্য,

নামহীন দৈনিক মাসিক-সাপ্তাহিকের পাতা উল্টাতে রাজি হয় না। কিন্তু দেশের বাড়্তি জরীপ করার জন্য জরুরি এই সব চোঁথা-নগণ্য-নামহীন আড্ডায়-আড্ডায় ঘুরে বেড়ানো—আর চোঁথা-নগণ্য-নামহীন কাগজ-পুস্তিকা-বই ঘাঁটা-ঘাঁটি করা।

লেখক—আপনার মতগুলা নিষ্ঠুর নয় কি?

সরকার—ঠিক বুঝেছো এইবার দুনিয়ার হাল-চাল। তোমরা নামজাদা লোকের, নামজাদা পরিষদের, নামজাদা দলের, নামজাদা পত্রিকার, কুলীন ব্যক্তি-সঙ্ঘের পেছনে-পেছনে ছুট্‌তে অভ্যস্ত। কাজেই নয়া-নয়া কাজ ও চিন্তা নয়া-নয়া আন্দোলন ও বোল-চাল তোমাদের নজরে পড়ে না। উন্নতি-জরীপের যন্ত্রপাতি হচ্ছে অজ্ঞাত-কুলশীলদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালানো।

লেখক—ছোকরা-জোআন বল্‌ছেন আপনি কাদেরকে? কত বয়সের লোক আপনার মতে নতুন কাজ-চিন্তা-বোলের সৃষ্টিকর্তা হ'তে পারে?

সরকার—এ সব কথা কি আগে কখনো বলিনি? বোধহয় অনেক উপলক্ষ্যেই ব'লেছি যে, নতুনের দরদী হ'তে পারে সাধারণতঃ যোল হ'তে ত্রিশ বছর বয়সের লোক। যোল-ত্রিশ বছর বয়সের ছোকরা জোআনরাই দুনিয়ার কাজ-কর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি চিজ নতুন-নতুন পথে আর নতুন-নতুন গড়নে এগিয়ে দিচ্ছে। এরাই হচ্ছে জগতের উন্নতি-প্রবর্তক। সংসারের প্রগতির জন্যে দায়ী এই বয়সের লোকজন। "উন্নতির চাবী কাহার হাতে"? প্রবন্ধটা প'ড়ে দেখ্‌তে পারো। "সুবর্ণভূমি"তে বেরিয়েছিল প্রথম (জানুয়ারি ১৯৪১)। রেঙ্গুনের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তদবিরে এই পত্রিকা বেরুতো। পরে নানা কাগজে আর পুস্তিকার আকারেও প্রবন্ধটা জারি হ'য়েছে। দেখছো বোধ হয়?

("বাচ্চা, ছোকরা, যুবা," মে ১৯৪৪)

লেখক—বাঙালী লেখকদের সম্বন্ধে আপনার কথা খাট্‌বে কি?

সরকার—পরবর্তীকালে যারা নামজাদা বা কুলীন কবি, গাল্পিক, নাট্যকার হ'য়েছে তাদের অনেকের প্রথম রচনাগুলা বেরিয়েছিল চোঁথা পত্রিকায়। অজ্ঞাতকুলশীল কাগজেই অজ্ঞাতকুলশীল লেখকদের মাল বিকোয়। রবি যে রবি তাঁর শৈশব আর কৈশোরের লেখা-লেখিও ঠাকুরবাড়ীর প্রায়-ঘরোআ কাগজেই বেরিয়েছিল। সার্বজনিক ঢাউস-ঢাউস, বাজারী পত্রিকায় রবির উদয় ঘ'টেছিল অনেক দেরিতে। শরৎসাহিত্যের জন্মকথাও এইরূপই। একালের নজরুল, বিভূতি, তারা, প্রেমেন, বুদ্ধদেব, মাণিক, সজনী, বিষ্ণু আর সমর, সুভাষ, কামাক্ষী, চঞ্চলকুমার ইত্যাদি লেখকদের কোষ্ঠিতেও অন্য-কিছু মালুম হয় না। অনেক সময় চোঁথা-কাগজগুলাই সেরা সাহিত্য-বীরদের সূতিকাগার।

চোঁথা বনাম কুলীন

লেখক—আপনি চোঁথা কাগজ কাকে বলেন?

সরকার—"চোঁথা-লক্ষণং" শুন্‌বে? আচ্ছা, বাৎলাচ্ছি।

প্রথম লক্ষণ—কাগজটা নেহাৎ কচি, অর্থাৎ বয়সে বড় নয়।

দ্বিতীয় লক্ষণ—কাগজের সম্পাদক ব্যবসাক্ষেত্রে অথবা টাকা-পয়সায় নামজাদা নয়।

তৃতীয় লক্ষণ—কাগজটার কাট্‌তি একদম নাই ব'ল্‌লেই চলে। গতিয়ে-গতিয়ে শ'দেড়-

দুই বেচা হয়।

চতুর্থ লক্ষণ—কাগজে সাধারণতঃ কোনো বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। চেয়ে-মেগে কয়েকটা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ্ করা হয় মাত্র।

পঞ্চম লক্ষণ—কাগজটার ব্যবসা চালিয়ে সম্পাদক বা প্রকাশক এক-আধ-বেলা রোজ আঁচাবার ব্যবস্থাও কর্‌তে পারে না।

ষষ্ঠ লক্ষণ—কাগজটা বেরোয় কোনো সাহিত্য-রসিক, শিল্প-সমজদার, বা রাষ্ট্র-পাগ্‌লা ছোকরা-জোআনের খেয়াল পুষ্ট কর্‌বার জন্য। তার আড্ডায় বসে ঐ-ধরণের আর ঐ-বয়সের গোটা তিন-চারেক মাথায় পোকাওয়ালা লোক।

সপ্তম লক্ষণ—কাগজটার আয়ু বছর দেড়-দুই।

অষ্টম লক্ষণ—কাগজটা বহরে বেশ পুরু অর্থাৎ ঢাউস নয়।

নবম লক্ষণ—কাগজটার কোনো-কোনো লেখক পরবর্তীকালে কুলীন, নামজাদা বা হোমরা-চোমরাদের ভেতর ঠাঁই পায়।

এই হচ্ছে "নবধা চোঁথা-লক্ষণম্"। চোঁথা হ'তে কুলীনে পদোন্নতি ঘটা অতি-স্বাভাবিক।

লেখক—চোঁথা কাগজগুলা আপনার মতে তাহ'লে নিকৃষ্ট নয়?

সরকার—চোঁথার অর্থ ঠিক উল্টা। তাজা-তাজা, সবুজ, কাঁচা, জোআন, তেজী, ভিটামিনওয়ালা, ঝাঁঝাল, শাঁশাল, রসাল মাল ব'য়ে নিয়ে চলে চোঁথারা। চোঁথা কাগজ না থাক্‌লে দুনিয়া প'চে যেতো। চোঁথাদেরই দৌলতে কুলীনের আবির্ভাব। কুলীনের বাবারা আর বাবার বাবারা সাধারণতঃ খাঁটি ছোটলোক। কাজেই ছোটলোকেরা আমার পূজাস্থান।

লেখক—আপনি কখনো অজ্ঞাতকুলশীলদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালিয়েছেন?

সরকার—এই অধমের বোধ হয় একমাত্র পেশাই তাই। অজ্ঞাত-কুলশীল পেলে আমি আর কোনো-কিছুই খবরই রাখি না। যে-সকল পত্রিকার আয়ু বছর দেড়-দুই সেইসব পত্রিকা আমার চিন্তায় খুবই মূল্যবান, তাজা-তাজা চিন্তার বাহন।

লেখক—বড়ই আশ্চর্যের কথা। সর্বদাই দেখা যায় যে, নাম-জাদা কুলীন লোকজনের সঙ্গে আপনার মেলা-মেশা। তা ছাড়া আপনার বিদেশী অভিজ্ঞতাগুলার সাক্ষী র'য়েছে বার-তেরখণ্ডে সম্পূর্ণ "বর্তমান জগৎ" (হাজার পাঁচেক পৃষ্ঠা)। তার সবই তো মনে হয় নামজাদা কুলীন নর-নারীর কাহিনী। অধিকন্তু আপনার রচনাবলী বেরোয় দেশ-বিদেশের কুলীন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়।

সরকার—বুঝ্‌তে গোল বাঁধ্‌ছে। অজ্ঞাত-কুলশীলরাই আমার আসল ও প্রধান আত্মীয়। আটপৌরে ভাবে দহরম-মহরম চালিয়ে থাকি তাদের সঙ্গে। পয়সাওয়ালারা আমার মতন গরীবের সঙ্গে মাখা-মাখি ক'র্‌বে কেন? নামজাদা কুলীন নর-নারীদের সঙ্গে গা ঘেঁশা-ঘেঁশি যে ঘটেনি বা ঘটে না তা নয়। তবে এ সব মামুলি ডাল-ভাত নয়। ঘটনাচক্রে মহোচ্ছবের সময় এই ধরণের মেলামেশার সুযোগ জুটে। তা ছাড়া পয়সাওয়ালাদের বাদ দিয়ে কোনো কাজ চল্‌তে পারে না। কাজেই তাদের কাছে যেতে হ'য়েছে অনেক দিনই নানা কাজে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। গরীব মানেই পয়সাওয়ালাদের দ্বারস্থ আদ্‌মি। কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক যোগাযোগ যা-কিছু তার অধিকাংশই অজ্ঞাত-কুলশীলদের সঙ্গে। তার জোরেই বেঁচে র'য়েছি।

লেখক—আপনি কখনো চোঁথা কাগজ পড়েন?

সরকার—চোঁথা কাগজ পড়া আমার মস্ত নেশা। তাতেই পাই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। নামজাদা কাগজের ভেতরও আগে পড়ি সেই সব লোকের লেখা যাদের নাম জানা নাই।

অর্থাৎ যারা কুলীন বা বয়সে প্রবীণ নয়। দেশী-বিদেশী সকল পত্রিকা পড়াই এই আমার দস্তুর। এই কারণে রবির প্রবন্ধগুলা পড়্‌তাম অন্যান্য সকলের রচনা শেষ হবার পর। অজানা-অচেনা-অবিখ্যাত লোকজনের সঙ্গে দহরম-মহরম চালানো আমার রক্তের সঙ্গে গাঁথা। আর এক দস্তুর হচ্ছে মোটা বই আর পুস্তিকার ভেতর আগে পড়ি পুস্তিকা। সাধারণ লিখিয়ে-পড়িয়ের বিচারে এই সব অতি হাস্যাস্পদ কাণ্ড। এই অধমের গরুমি আবার ধরা প'ড়েছে।

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দ্রসূর্য" (১৯৪৪)

২২শে মার্চ ১৯৪৪

মন্মথ—আজকালকার বাঙালী কবিদের ভেতর বাঙালীজাতের বাড়্‌তির লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছেন? নতুন-নতুন পথে কবিদের গতি লক্ষ্য করা সম্ভব কি?

সরকার—এই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে—সেদিন—বেরিয়েছে "চন্দ্র সূর্য্য"। হঠাৎ কে যেন আমাকে দিয়ে গেল। লেখক নয়। তবে বইয়ে লেখকের সই আছে। পাতা উল্‌টিয়ে দেখ্‌ছি খেলো মাল নয়। গম্ভীর আছে। ঝঙ্কারওয়ালা রচনা, ছন্দের ঘা লাগে প্রাণে। মালটা বেশ-কিছু ঝাঁঝালও বটে,—কিছু-কিছু অস্পষ্টতা যদিও মালুম হয়।

লেখক—কবির নাম কী?

সরকার—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক—আগে নাম কখনো শুনেছেন?

সরকার—কস্মিন্ কালেও না। বিজ্ঞাপনে দেখ্‌ছি আর একটা বই বেরুবে। নাম "রাত্রির আকাশে সূর্য"। বইটা প্রকাশ ক'রেছে হাওড়ার অভিবাদন প্রকাশালয়।

লেখক—দু'একটা নমুনা চাখ্‌তে দিন না?

সরকার—শোনো "ইশ্‌তেহার" কবিতার কয়েক লাইন ঃ—

"স্পন্দিত প্রাণে কাঁপছে আগামী
সূর্যোদয় ;
স্বর্ণ প্রসবে আমার পৃথিবীর
বন্ধ্যা নয়।"

আর একটা শ্লোক নিম্নরূপ ঃ—

"জানি তোমারো দৌড়
বড় জোর মোল্লার দ্বার ;
বিড়ালের ভিক্ষাবৃত্তি অধ্যাত্মের
শেষ পুরস্কার।"

লেখক—এর ভেতর কী পাচ্ছেন?

সরকার—দুই শ্লোকে দুই ধরণের রস। লোকটা ঠুক্‌তে পারে। কিন্তু খিট-খিটে মেজাজের নয়,—দাঁত খিঁচোয় না। গঠনমূলক আশাবাদী কবি। জানে যে,—"পৃথিবী বন্ধ্যা নয়।" তাই চেয়েছে ঃ—"আমার কবিতা হোক সংগ্রামের ধারালো সঙ্গীন।" ধুআটা শেলীর "সেন্সিটিভ্ প্ল্যান্ট" আর "ওয়েষ্ট উইণ্ড"-মাফিক জীবনানন্দের ধুআ।

লেখক—নতুন ছন্দের আওয়াজ কিছু শুনিয়ে দিন না?

সরকার—"বিশ্লেষণ" কবিতাটা "দুই চক্ষু" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করা হ'য়েছে। ছন্দের আর মালে নমুনা দেখাচ্ছি। শোনো একটা ঃ—

"একদা-সোনালি-স্বপ্ন জনান্তিকে
শুধু জেগে রয়,
শুধু স্বপ্ন—আর কিছু নয়।"

আর একটা ঃ—

"ওপারে উজান ঠেলে সারি সারি
নাও চলে যায় ;
ফতুর বন্দর কাঁদে ফেরারী হাওয়ায়,
মাটির সন্তান কাঁদে
রুধিরে গাহন করি রোধ করে জঠরের ক্ষুধা,
কাটা ফসলের ক্ষেতে বিষণ্ণ বিষাদে
মৃতবৎস ব্যর্থতায় সর্বজয়ী জননী বসুধা।"

লেখক—বেশ তো? কবিতাটার ভেতর আছে কী কী জিনিষ?

সরকার—রসও পাবে জোরও পাবে। এর ভেতর রকমারি সোআদ আছে। চেখে দ্যাখো আবার এক ফোঁটা ঃ—

"একদার আদিম স্বাক্ষর
অজন্তা ইলোরা আর মহেঞ্জোদারোর
সব রেখা সব ছবি শাদা হয়ে আসে,
তাজমহলের তটে যমুনার ঢেউ পড়ে ভেঙে
ফাটলে ফাটলে তার আর্তনাদ করে আর্তস্বর।
কালের চাবুকে আজ হয়েছে জর্জর
স্মৃতির মিনার
আর
অরণ্য ও আশ্রমের শ্যামল স্বপ্নেরা।"

অতীতের পচামালে কবির প্রাণ চাঙ্গা হয় না। শান্তিরঞ্জন চরম বর্তমাননিষ্ঠ। কর্মমূলক ভাবুকতায় তার হৃদয় গঠিত। কবিতার ভবিষ্য-পন্থীর মেজাজ বেশ পরিস্ফুট। কী বল্‌ছে শোনো ঃ—

"সম্মুখে বালুর ঝড়ে
খণ্ড খণ্ড অগ্নিকণা ওড়ে ;
দৃষ্টি ফিরায়ে নেবো, ওরে মরা মন?
স্থির হয়ে রবো নাকি মিশরের মমির মতন?"

লেখক—খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে। বেশ প্রশ্ন দু'টা তো?

সরকার—লোকটা প্রশ্ন তুলছে,—পেছপাও হবার জন্যে? তেমন বাচ্চাই নয়। ভবিষ্য-পন্থী কবির বাণী নিম্নরূপ ঃ—

"আপাতত হাহাকার শুনি,
ক্লীব মন তাই রচে উত্তর-ফাল্গুনী।

তবুও মুহূর্তগুলি যাজ্ঞিকের মূর্ত অভিপ্রায় ;
সঙ্কট বিজিত হবে সংগ্রামের ঘায়।
অমৃতের পুত্র মোরা অজেয় অমর ;
ঘুমন্ত প্রহরে তাই বাম চক্ষু জাগে অপলক।
পেশী দিয়ে পথ করি, মেধা তার নেপথ্যচালক।"

কলমের জোর আছে, আকাঙ্ক্ষাও জবরদস্ত। একটা হাঁ-ধর্মী কবির কল্পনা দেখ্ছো? সেকালের উপনিষদ্ এসে জুটেছে একালের "কমরেড"-ধর্মীয় গীতায়। গঠনমূলক কবিতার এক কাঁচ্চা এখানে পাওয়া গেল। মন্দ কি? বাসি-মরা-পচা মালের আবহাওয়ায়ও কবি নির্ভয়। তার ভেতরও নয়া জীবন, নয়া-নয়া আনন্দের আশা রাখে।

লেখক—অন্যান্য রসের এক-আধ ফোঁটা পরিবেষণ করুন।

সরকার—বইটার "ক্রোড়পত্র" অংশ পারুল দেবী সুরচিতাসু উৎর্গীকৃত। এই অংশের শেষ কবিতার অন্যতম শ্লোক নিম্নরূপ ঃ—

"মুমূর্ষু পৃথিবী এই ; আমাদের চোখে তবু জ্বলে
আশ্চর্য নতুন এক ; রাখি তার মিলিত স্বাক্ষর।
এ যুগ ব্যর্থ জানি ; ব্যর্থ তবু এই পরস্পর,
আমরা অরণি হবো যুগান্তিক জৈব যজ্ঞানলে।"

এই অংশের আর একটা কবিতার ভেতর নিম্নলিখিত লাইন দুটা আছে ঃ—

"ছিন্ন ইতিহাস ওড়ে চৈত্র-রিক্ত বাতাসের ঘায়
আগামী বৈশাখ চোখে সবুজ বিছায়।"

অন্য কবিতায় পড়্ছি ঃ—

"মাটির সন্তান তবু পক্ষ মেলি শূন্য বায়ুস্তরে।"

লেখক—"চন্দ্র-সূর্য্য"র মতন কবিতার বই প'ড়ে আপনার কী মনে হয়?

সরকার—আবার বাড়্তির পথে বাঙালী। এই ধরণের মাল, বোল্ ও ছন্দ যে-জাত্ সৃষ্টি ক'র্তে পারে তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। সে-জাত্ ও সে-যুগ প্রগতি-নিষ্ঠ। শান্তিরঞ্জন ব'ল্ছেন ঃ—

"নতুন দিগন্ত আছে
"মনের স্বর্গ এসে যেখানে-নেমেছে
পৃথিবীর 'পরে,
আমি তারে ক'রেছি নিরিখ্,
পদক্ষেপে ছন্দ তুলি পাথরে পাথরে
আগামীর এক পদাতিক।"

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, এই ধরণের লেখক বাঙ্লা সাহিত্যে অনেক?

সরকার—হাঁ। শুধু সাহিত্যে কেন, জীবনের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই "আগামীর এক পদাতিক" বাঙালী জাত্কে বাড়্তির পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯০৫-১৪ সনের বঙ্গ-সাহিত্যের অ-রৈবিক অংশ ১৯৩৫-৪৪ সনের বঙ্গ-সাহিত্যের চেয়ে মহত্তর ছিল না। যে-কোনো পঁচিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরোণো যুগকে অতিমাত্রায় স্বর্ণ-যুগ সম্ঝে রাখা জনসাধারণের বাতিক। পণ্ডিত মুখ্খুগুলারও বাতিক এইরূপ। এইজন্যে বর্তমান যুগকে বুঝ্তে গোল বাঁধে।

লেখক—শান্তিরঞ্জন দুনিয়াকে কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চায়?

সরকার—"উপনায়ন" কবিতায় হদিশ দেওয়া আছে। কবির আকাঙ্ক্ষা নিম্নরূপ ঃ—

"আমারে কমরেড করো, হে মজুর হে কিষাণদল।
কাঁধে কাঁধ রাখো মোর। তোমাদের চলার সঙ্গীত
আমার উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হোক।"

আবার শুন্‌ছি ঃ—

"ব্যর্থ আমি ব্যর্থ আমি তোমাদের বিনা
হে মজুর হে কিষাণ হাত ধরো তোমরা যদি না।"

লেখক—এই হদিশ বাঙালী জাতের পক্ষে কতকটা কাজের?

সরকার—কোন্ হদিশটা কত কাজের তা কি নিক্তির ওজনে মাপা সম্ভব? দেখ্‌ছি ভাবুকতা, বলিষ্ঠ ভাবুকতা, আশা-নিষ্ঠা, কর্ম-নিষ্ঠা, জীবনের আনন্দ। কানে আসছে আর প্রাণে ঘা লাগাচ্ছে চলার সঙ্গীত। তাতেই বাড়্‌তি-প্রগতি-উন্নতি।

বাঙ্‌লামির ধারা-বৃদ্ধি

লেখক—আপনি বাঙলা সাহিত্যে কোনো অবনতির লক্ষণ দেখ্‌তে পান না?

সরকার—না,—কোনো মতেই না। সম্প্রতি বিংশ শতাব্দীর কথা বল্‌ছি। এই চুয়াল্লিশ বছরের ভেতর এমন কোনো বছর পাঁচ-সাতেক দেখ্‌ছি না, যে-সময়টা সম্বন্ধে বলা চলে খানিকটা অবনতি যেন দেখা যাচ্ছে। কাব্য, নাট্য, গল্প, উপন্যাস, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদি সবই সাহিত্য-সৃষ্টির ভেতরে ঠাই দিয়ে এই কথা বল্‌ছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধ সম্বন্ধেও ক্রমাগত উন্নতির সাক্ষ্যই পাই।

লেখক—শান্তিরঞ্জনের "চন্দ্র-সূর্য" বইটা সম্বন্ধে কিছু অত্যুক্তি কর্‌লেন না কি?

সরকার—একদম না। বইটা সেদিন বেরিয়েছে। হাতের কাছে র'য়েছে। এই জন্য এটার নাম ক'রেছি। বিষ্ণু দে'র "বাইশে জুন" বইটা নিয়ে এসো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "পদাতিক"টা খোলো, বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা" বিশ্লেষণ করো, সজনী দাসের "রাজ-হংস" পড়্‌তে লেগে যাও। অধিকন্তু চঞ্চল আছে, কামাক্ষী আছে। কোনো ছোকরা কবিকে বাদ দিও না। তারপর গাল্পিকদের ভেতর শৈলজা মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর, বিভূতি, মনোজ বসু, নজরুল, প্রেমেন মিত্র, তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল ইত্যাদি ডজন দেড়েকের রচনা নাড়াচাড়া কর্‌তে সুরু করো। অধিকন্তু সিনেমা আছে, থিয়েটারও আছে। নাট্য-মজলিশে মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য ইত্যাদি শিল্পীর নাম শুনেছো তো? দেখ্‌তে পাবে যে শেক্‌স্‌পীয়ার-হীন এলিজাবেথ-যুগ যা রবিহীন' বাঙালীর এমন কি ১৯৪১-৪৪ এর বছর আড়াইও তা। এটা বড় যুগ। অনেক-কিছু ঘট্‌ছে,—আরও ঘট্‌বে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী চালাচ্ছে দিগ্‌বিজয়,—১৯৪৩-এর মন্বন্তর সত্ত্বেও।

লেখক—যে-সব লেখকদের নাম কর্‌লেন, তারা পরস্পর খাওয়া-খাওয়ি করে না কি?

সরকার—সেই জন্যেই তো আরও জোরের সহিতই বল্‌ছি যে, বাঙালী জাতের বর্তমান অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। অনেকগুলা স্রষ্টা রকমারি পথে পরস্পরের সঙ্গে টক্কর দিতে-

দিতে একত্রে এগিয়ে চ'লেছে। দেশটাও দিগ্‌বিজয়ী হচ্ছে। এরি নাম প্রগতি-উন্নতি-বাড়তি। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) বাঙালী জাত আজকের চেয়ে বড় ছিল না।

লেখক—এই সব রকমারি লেখকদের ভেতর প্রভেদ নাই কি?

সরকার—আলবৎ প্রভেদ আছে। তা সত্ত্বেও ঐক্য আছে বিস্তর। পরস্পরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা একটা মস্ত ঐক্যের লক্ষণ। দলাদলি আছে যথেষ্ট, মায় সমালোচকদের আড্ডায়ও। দেশের লোকজনকে গরু-আহাম্মুক-ম্যাড়াকান্ত বল্‌তে এরা প্রায় সকলেই সমান সিদ্ধহস্ত। বস্তু-নিষ্ঠা, সমাজ-নিষ্ঠা, পল্লী-নিষ্ঠা, মজুর-নিষ্ঠা, কিষাণ-নিষ্ঠা, কাস্তে-নিষ্ঠা, আর কমরেড-নিষ্ঠা মাত্রা হিসাবে প্রায় প্রত্যেক কবি-গাল্পিক-নাট্যকারের অন্যতম লক্ষণ। নয়া-নয়া ছন্দের পরীক্ষা চায় না এই কবিদের ভেতর এমন একজনও নাই। গদ্য-কাব্যের ভেতরও রকমারি ছন্দের যাচাই চল্‌ছে। সকলেই চায় রবীন্দ্র-সাহিত্য হ'তে মুক্তি অতি-সজ্ঞানে ও অতি সজোরে। কিন্তু মজার কথা, সকলেই আবার (অজ্ঞানে বা এমন কি সজ্ঞানেও) রবীন্দ্র-সাহিত্যের গর্তে কম-বেশী প'ড়েছে। তাদেরকে এই কথা ব'লে দ্যাখো। চ'টে সব লাল হ'য়ে যাবে। সকলের বিশ্বাস তারা প্রত্যেক রবিকে হারিয়ে ছেড়েছে! চালাকি?

লেখক—সাম্প্রতিক কবি-গাল্পিকেরা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে এড়াতে পারে নি?

সরকার—সকলেই মনে করে যে, এড়িয়েছে। খেয়ালটা খুবই লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ। অতি-সাম্প্রতিক লেখকদের ভেতর এইরূপ খেয়াল হচ্ছে একটা সার্বজনিক লক্ষণ। কিন্তু সত্যিকার কথা, রবির খেয়ে সবাই মানুষ। রবিকে বাদ দিয়ে চলা এখানো অনেকদিন ধ'রে বাঙালীর পক্ষে সম্ভপর হবে না। কথাটা লিখে রাখো, গরীবের কথা বাসি হ'লে কাজে লাগ্‌বে। মাটির গান, চাষীপনা, পল্লীয়ানা, "শৌখিন মজদুরি" ইত্যাদি বিষয়ক বোল-বুখ্‌নি-বাণী রাবীন্দ্রিক। বুঝ্‌লে?

লেখক—তাহ'লে আপনি আজই ১৯৪১-৪৪ সনের ভেতরও বাঙালীর বাড়্‌তি দেখছেন কোথ্‌থেকে?

সরকার—তুমি, আমি রামা, শ্যামা, আবদুল, ইসমাইল ইত্যাদি সকলেই আমরা বাঙালী। কিন্তু যে-আড্ডায়ই মৌতাত চালাই না কেন,—আমরা সবাই জানি যে আমরা আলাদা-আলাদা লোক। আগে সার্বজনিক কথাগুলা বুঝা যাক। আমাদের ভেতর অনেকগুলা সার্বজনিক হাবভাব, বোলচাল, আচার-ইঙ্গিত ও রং-রূপ আছেই-আছে। সেই ধরণ-ধারণগুলাকে বল্‌বো বাঙালী-লক্ষণ, বাঙালীত্ব বা বাঙলামি।

লেখক—দু একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "পল্লী-ব্যথা" (১৯২১) স্বদেশী যুগের অন্যতম শেষ কাব্য। তার দশ বছর পরে বেরিয়েছে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শতনরী" (১৯৩১)। এই কাব্যগ্রন্থও "সেকালের" মালে ভরা। এই সবের পাশে একালের প্রফুল্ল সরকার প্রণীত "অনাগত" (১৯২৮), রবীন্দ্র মৈত্র প্রণীত "থার্ডক্লাস" (১৯২৯), অন্নদাশঙ্করের "অসমাপিকা" বা "আগুন নিয়ে খেলা" (১৯৩০), মন্মথ রায়ের "কারাগার" নাটক (১৯৩০), ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত নাটক "দেশের ডাক" (১৯৩০), বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "সব-হারাদের গান" (১৯৩০), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "সাঁওতালী গল্প" (১৯৩২), আবদুল রউফ প্রণীত "পথের ডাকে" (১৯৩৩), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জননী" (১৯৩৪), দিলীপ রায়ের "দোলা" (১৯৩৫) আর শান্তি ঘোষাল প্রণীত "নীচের সমাজ" (১৯৩৫) ইত্যাদি রচনা সমূহ রেখে বিশ্লেষণ করো। দেখ্‌বে বাঙালী মুদ্রাদোষ কাকে বলে।

শব্দগুলা দ্যাখো, ক্রিয়াগুলার কায়দা দ্যাখো, বাক্যের গড়ন দ্যাখো, বাঙালী জাত্‌টাকে ঠেলে তুল্‌বার মেজাজ দ্যাখো, ভবিষ্যনিষ্ঠার প্রভাব দ্যাখো।

লেখক—এই সবের ভেতর বাঙলামি বা বাঙালী জাতের সাধারণ লক্ষণগুলা কোথায়?

সরকার—বছর পনের'র (১৯২১-৩৫) দু-তিন যুগের ভাবধারা এইগুলার ভেতর র'য়েছে কবিতায়, গল্পে, নাটকে। লেখকেরা রকমারি মেজাজের লোক। তা সত্ত্বেও বাঙলামির ছোঁআচ সর্বত্র। বাঙলামির ধারা বেড়ে চ'লেছে রকমারি ভাবে। সকলেই বঙ্গ-প্রেমিক, বঙ্গ-সেবক, বঙ্গ-গৌরবে গৌরবান্বিত। এরি নাম বাঙলামি। সজ্ঞানে আমরা সকলেই বাঙালী জাত্‌তে চাই আকারে-প্রকারে, বহরে-গভীরতায় বাড়িয়ে তুল্‌তে। বঙ্গ-জননীকে জগদ্‌-বরেণ্য করা বাঙালীর বাচ্চার প্রধান বা একমাত্র স্বধর্ম।

লেখক—প্রভেদ কি একদম নাই?

সরকার—তাই তো বল্‌ছি। আল্‌বৎ আছে। সার্বজনিক বাঙলামি সত্ত্বেও আমরা প্রত্যেকেই হাঁচি নিজ-কায়দায়, হাসি নিজ-কায়দায়, হাঁটি নিজ-কায়দায়, বসি নিজ-কায়দায়। এমন-কোনো গরু নাই দুনিয়ায় যে বলবে যে, ইস্‌মাইলকে জানা থাকলেই আবদুলকেও দেখা হ'য়ে গেল। একটা বাঙালীকে দেখ্‌লেই সব-কটা বাঙালীকে জানা হ'য়ে রইলো। বস্তুতঃ কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের "মৈনাক" বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "পদাতিক" পড়া থাক্‌লেও শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দ্র-সূর্য" পড়া উচিত। তাজা ছোক্‌রাদের ভেতরেই পরস্পর ফারাক র'য়েছে এত।

লেখক—আপনি কি বল্‌ছেন যে, মোহিত মজুমদার, সজনী দাস, প্রেমেন মিত্র আর বুদ্ধদেব বসু হ'তে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর শান্তিরঞ্জন পর্যন্ত লেখকদের ভেতর ঠিক এই রকম সার্বজনিক লক্ষণ আছে?

সরকার—সার্বজনিক লক্ষণ তো আছেই। শব্দ, বাক্য, বুখ্‌নি, লক্ষ্য,—সর্বত্রই মালুম হবে যে এরা বাঙালীর বাচ্চা,—বঙ্কিম-রবির বাচ্চা, হয়ত ছেলে নয়,—হয়ত বা নাতী। সকলেই রবি-খেকো, রবির পরবর্তী ধাপ। কাজেই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যও আছে। সবাই একালের লেখক সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেকের চেহারা আলাদা, গড়ন আলাদা মেজাজ আলাদা। বঙ্কিম-রবির নাতীগুলা খায়-দায়-চলে-ফিরে আপ্‌সে-আপ্‌ নিজ-নিজ ঢঙে। এইজন্যেই তো বাড়তি প্রগতি-উন্নতির নয়া-নয়া প্রমাণ হাতে-হাতে ধরা পড়ে।

রবিহীন বাঙালী (১৯৪১-৪৪)

২৬শে মার্চ ১৯৪৪

মন্মথ—"রবিহীন বাঙালী' শব্দে কি আপনি রবির মৃত্যুর পরবর্তী বছর আড়াই-তিনেকের (১৯৪১-৪৪) বাঙালী জাতের কথা ব'ল্‌ছেন?

সরকার—সহজে তাই মনে হবে। তাতে আমার আপত্তিও নাই। কিন্তু আমি রবিহীন বাঙালী বল্‌লে নানা উপলক্ষে অন্যান্য কিছুও সম্‌ঝে থাকি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের যুগ কাল-হিসাবে ১৮৭৮ হ'তে ১৯৪১ পর্যন্ত তেষট্টি-চৌষট্টি বছর। এই সময়টাকে প্রধানতঃ কয়েক খণ্ড-যুগে ভাগ করা চলে ঃ—

(১) ১৯৭৮-১৮৮২। "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" পর্যন্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকাল বেলা।

(২) ১৮৮২-১৯১৬। "বলাকা" পর্যন্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুপুর বেলা। পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌বার জন্য এই চৌত্রিশ বৎসর দুই-তিন অংশে ভাগ করা উচিত। ১৯০৪-এর 'স্বদেশী সমাজ" একটা স্তম্ভ।

(৩) ১৯১৬-৪১। "শেষ লেখা" পর্যন্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল বেলার বছর পঁচিশেক।

লেখক—তাতো বুঝা গেল। কিন্তু রবিহীন বাঙালী বল্‌লে কী বুঝা যাবে?

সরকার—মনে করো—রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙলাদেশে একদম গজায় নি। তাহ'লে বাঙলা সাহিত্য কিরূপ দাঁড়ায়? ১৮৭৮ হ'তে ১৯৪১ পর্যন্ত তেষট্টি-চৌষট্টি বছরের বাঙলা কাব্য-নাট্য-গল্পের খ'তেন কর্‌তে বল্‌ছি। আবার মনে হয় এই তিন যুগের কোনোটাই রবিহীন অবস্থায়ও নিন্দনীয় নয়। রবিহীন বাঙালী ১৮৭৮ হ'তে ১৯৪১ পর্যন্ত ধাপে-ধাপে বেড়ে চ'লেছে। সেই বাড়্‌তির ধাপ আজ ১৯৪৪ সনেও বজায় আছে। এই হ'লো আমার উন্নতি-দর্শনের আসল ব'নেদ।

লেখক—আজকের আলোচনায় রবিহীন বাঙালীর অবস্থা সম্বন্ধে কি আপনি এত লম্বা-মেয়াদের অবস্থা বিশ্লেষণ ক'র্‌ছেন?

সরকার—না। অবশ্য তাতেও আপত্তি নাই। সম্প্রতি আমি প্রধানতঃ দুটা যুগের কথা ধর্‌ছি ঃ—

(১) ১৯১৬-৪১। "বলাকা"র (১৯১৬) পরবর্তী বা এমন কি "পুনশ্চ"র (১৯৩২) পরবর্তী অ-রাবীন্দ্রিক বাঙলা সাহিত্যের আকার প্রকার বাঙালী জাতের পক্ষে উন্নতিরই সাক্ষী। ১৯৩০-৪৪-এর অরৈবিক বঙ্গ-সাহিত্য ১৯০৫-২০-এর অরৈবিক বঙ্গ-সাহিত্যের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। বরং উল্টা,—অর্থাৎ বৃহত্তর ও মহত্তর।

(২) ১৯৪১-৪৪। রবির মৃত্যুর পরবর্তী বাঙলা কাব্য-নাট্য-গল্প ও বাঙালী জাত্‌কে বাড়্‌তির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। মাত্র আড়াই বছরের হিসাব-নিকাশ সোজা নয়। তবে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ঘাঁট্‌তে লেগে যাও।

লেখক—শেক্‌স্‌পীয়ার-হীন এলিজাবেথ্‌-যুগ শব্দে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

সরকার—মনে করো ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে আর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলি (১৫৯০-১৬১৫) পায়দা হয় নি। তা হ'লে সেই সময়কার (বছর পঁচিশেকের) ইংরেজি সাহিত্য ছোট-দরের দাঁড়াবে কি? আমি বল্‌ছি,—ছোট দরের দাঁড়াবে না। শেক্‌স্‌পীয়ার ছাড়াও সেকালে অনেক কবি, নাট্যকার, গাল্পিক ও প্রবন্ধ-লেখক ছিল। তারা অনেকেই উঁচু দরের মাল সৃষ্টি ক'রে গেছে। একথা জানে না কোন্‌ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক?

লেখক—তবুও দু'একজনের নাম করুন। কাকে-কাকে আপনি আপনার পারিভাষিক অনুসারে "ভদ্রলোকের পাতে দিতে" চান দেখি?

সরকার—নাট্যকার ছিল ডজন-ডজন। মার্লো আর বেন্‌ জনসন্‌ শুধু এই দুইজনের নাম কর্‌ছি। কবির ভেতর স্পেন্সারকে জবরদস্ত ইজ্জদ দিতে রাজি হবে যে-কোনো লোক। নাট্যকারদের ভেতর গদ্য-লেখক ছিল অনেকে। নাট্যকার লিলির যশ গল্পে বা উপন্যাসেও কম নয়। তার "ইউফুয়েস"কে বিলাতী উপন্যাস-সাহিত্যের গোড়ার দিকে নাম ক'র্‌তেই হয়। সিড্‌নি কবিও বটে, গাল্পিকও বটে, প্রাবন্ধিকও বটে। বেশ উঁচু দরের লোক। অন্যান্য গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেকন আর হুকার জাঁদ্‌রেল সন্দেহ নাই। কিন্তু মজার-কথা

শেক্‌স্‌পীয়ার লোকটা এত নামজাদা হ'য়ে প'ড়েছে যে, এই সব দিক্‌-পালেরাও ঠিক-যেন নকড়া-ছকড়া। খাঁটি সমালোচনার কষ্টি-পাথরে শেক্‌স্‌পীয়ারহীন এলিজাবেথান সাহিত্য উচ্চতম শ্রেণীর সামগ্রী বিবেচিত হওয়া উচিত। সেই ধরণের কথাই ব'ল্‌ছি রবিহীন বাঙলা সাহিত্য আর বাঙালী জাত সম্বন্ধে।

এপ্রিল ১৯৪৪

সৌরীন-চারু-নরেশ আর অনুরূপা-নিরুপমা-প্রভাবতী

২রা এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—স্বদেশী-যুগের রবিহীন বাঙালীর উপন্যাস-সাহিত্য কিরূপ?

সরকার—সেই যুগের (১৯০৫-১৪) অরৈবিক গাল্পিকদের ভেতর প্রধান বিবেচনা ক'র্‌তাম প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে। "জলধর দা"ও সেকালে সুপরিচিত। কিন্তু তার বিশ বৎসরের ভেতর (১৯১৪-৩৪) গল্প-সাহিত্য খুব-বেশী ফুলে' উঠেছে। "ছোট-গল্পের" আসর জরীপ ক'রে দ্যাখো। প্রভাতকে বোধ হয় অন্যতম পথ-প্রদর্শক বলা যেতে পারে।

লেখক—পরবর্তী সময় সম্বন্ধে আপনি শরৎ-সাহিত্যের কথা বল্‌ছেন?

সরকার—শুধু শরৎ-সাহিত্যের কথা বল্‌ছি না। বাঙালী আমরা আজকাল কথায়-কথায় রবি আর শরৎ অথবা বঙ্কিম আর শরৎ ব'কে থাকি। কিন্তু এই নাম-কয়টা বাদ দিলেও বাঙালীর গল্প-সাহিত্য আকারে-প্রকারে খুবই বিশাল। মাল হিসাবেও এ চিজ ভদ্রলোকের পাতে দেবার উপযুক্ত।

লেখক—কাকে-কাকে মনে রেখে এই মত জারি ক'র্‌লেন?

সরকার—সৌরীন মুখোপাধ্যায় আর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দুইজনের রচনা সুরু হয় স্বদেশী যুগে। দুজনেই শেষ পর্যন্ত ডজন-ডজন গল্পের গ্রন্থকার। এই হিসাবে এঁরা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জুড়িদার। সৌরীন বেশী বুড়ো নন। লেখা-লেখি চল্‌ছে। সেকালের ফরাসী গাল্পিক দোদের রচনা বাংলায় হাজির করেছিলেন "মাতৃঋণ" ও "নবাব" নামে। নরেশ সেনগুপ্তের গল্প-রচনা সুরু হয় বোধ হয় ১৯২০-এর কাছাকাছি। এঁর বইগুলা গুণতিতে আর ওজনে বেশ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই সমাজ-সচেতনও বটে। মজা দেখ্‌ছি,—একালের সাহিত্য-সমালোচকেরা সৌরীন, চারু আর নরেশের নাম করে না। খেয়ালের বলিহারি যাই।

লেখক—কেন বল্‌তে পারেন?

সরকার—সোজা জবাব,—বোধ হয় সমালোচকদের সময়াভাব। বইগুলা ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'র্‌তে হ'লে মেহনৎ দরকার হয়। নামজাদা বঙ্কিম, নামজাদা রবি, আর নামজাদা শরৎ। ব্যস্‌। আর কী চাই? বিনা মেহনতে এই ক'-জনের সম্বন্ধে নমো-নমঃ ক'রে সারা চলে। তার পরেই চালাও প্রপাগাণ্ডা "সমাজ-সচেতন" মানসওয়ালা কাস্তে-সাহিত্যের প্রবর্তকদের স্বপক্ষে। ঠিক-যেন এইরূপ মেজাজ নিয়েই অনেক সমালোচক কাজে নেমেছেন। এই জন্যই এমন কি ১৯০৫-২০ যুগের সাহিত্যও এঁদের নজরে পড়ে না। তার পূর্ববর্তী সাহিত্য তো অতি বুর্জোআ পাপিষ্ঠ বটেই।

লেখক—একালের সোশ্যালিস্ট গল্প ও কাব্য-সাহিত্য সমালোচনার সময় স্বদেশীযুগের

বঙ্গ-সাহিত্য বিশ্লেষণ করা আবশ্যক কি?

সরকার—কেন আবশ্যক নয়? যারা সমাজ-সচেতন সমালোচক তাদের পক্ষে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশটা বিশ্লেষণ করা আলবৎ জরুরি। উন্নতি-অবনতির আলোচনায় গোড়ার কথাগুলা বাদ দেওয়া চলে না। অধিকন্তু একালের কাস্তে-সাহিত্যের আর সমাজ-চেতনার কুচো-কাচা বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে বেশ-কিছু পাওয়া যায়। প্রভাত, জলধর, চারু সৌরীন ইত্যাদি লেখকেরা সকলেই সমাজ-সচেতন। সেকালের মেয়ে-গাল্পিকেরাও সমাজ-সচেতন। আরে, বাবা, লোকজনের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি, সু-কু বাদ দিয়ে কোনো মিঞা কোনো দিন গল্প-কাব্য-নাট্য লিখ্‌তে পারে কি? সমাজ-সচেতন নয় দুনিয়ায় কোন্ লেখক?

লেখক—মেয়ে-গাল্পিকদেরকেও এর ভেতর টেনে আন্‌ছেন?

সরকার—কেন আন্‌বো না? বাঙলা গল্প-সাহিত্যে মহিলা লেখকদের দাম বহরে আর বাণীতে বেশ উঁচু দরের জিনিষ। বাঙালী জাতের চিন্তা এই সকল লেখকদের রচনার মারফৎ অনেকটা খোলশা হ'য়ে এসেছে। বঙ্গ-সংস্কৃতির বিংশ শতাব্দী মেয়ে-গাল্পিকদের সৃষ্টি-সম্পদে বেশ-কিছু দৌলত-মন্দ্ ও গৌরবময়।

লেখক—কোন্-কোন্ মহিলা-গাল্পিকদের নাম কর্‌ছেন?

সরকার—স্বদেশী যুগের মনে প'ড়্‌ছে অনুরূপা ও নিরুপমা। তাঁদের হাত চ'লেছে অনেক দিন। তারপর দেখছি প্রভাবতী, রাধারাণী ইত্যাদি লেখিকা। এঁদের প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক গল্পের মালিক। ইতি-মধ্যেই বাংলাভাষার উপর মহিলা-লেখকদের দাগ চিরস্থায়ী হ'য়ে রইলো। মেয়ে-লেখকদের সংখ্যা বাড়তির দিকে।

লেখক—মহিলা-লেখকদের কথাবস্তু কিরূপ?

সরকার—পরিবার, দেশ, শহর, কেরাণী, পল্লী-জীবন ইত্যাদি বস্তুর বিশ্লেষণ। এই গল্প-সাহিত্য দস্তুর-মতন সমাজ-সচেতন। এই সবের বাণী সকলের পক্ষে যথেষ্ট বর্তমান-নিষ্ঠ কিনা সে-কথা আলাদা। কোন্ পুরুষ-লেখকের রচনাই বা দস্তুর-মাফিক বর্তমাননিষ্ঠ? গল্প প'ড়্‌তে ব'সে একমাত্র নিজের পছন্দসই বোলচালওয়ালা লেখকদের তারিফ করা ঠিক নয়।

"সাম্প্রতিক" সাহিত্যের সুরু কবে?

লেখক—আজকালকার যে-কয়জন গাল্পিক নাম ক'রেছেন তাঁদের সুরু আন্দাজ কবে?

সরকার—প্রত্যেকের সুরু এক তারিখে নয়। সকলেই বয়সে সমানও নয়। মনে হচ্ছে যে সৌরীন, চারু, নরেশ, অনুরূপা, নিরুপমা ইত্যাদি "সেকালের" লেখকেরা ১৯২৫-৩০ এর সম-সমকালে অনেকটা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। তখন শরৎ-সাহিত্যের দৌলতে বাজার গরম। সেই সময়ে বলা যেতে পারে "একালের" লব্ধ-প্রতিষ্ঠদের সূত্রপাত। "সাম্প্রতিক" সাহিত্যের সুরু সেইখানে।

লেখক—একটু খোলশা করে বলুন না?

সরকার—প্রথমেই উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল সরকারের "অনাগত" (১৯২৮) ও রবীন্দ্র মৈত্র প্রণীত "থার্ডক্লাস" (১৯২৯)। "মনের পরশ"-ওয়ালা দিলীপ রায়ের "দুধারা" ও "দ্বিধা" বেরোয় ১৯২৯-৩০ সনে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" ১৯৩০ সনে প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরেই দেখা দিয়েছে 'কয়লার কুঠী'"ওয়ালা শৈলজা মুখোপাধ্যায়ের "পৌষ-

পার্বণ" আর অন্নদাশঙ্করের "আগুন নিয়ে খেলা"। ১৯৩২ সনে "বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ঝেড়েছেন "মেঘ-মল্লার" ও "অপরাজিতা" সেই মরশুমেই পাই "চৈতালী-ঘূর্ণী" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। "বিবাহের চেয়ে বড়" প্রচার করেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ১৯৩৩ সনে। আজ ১৯৪৪ সনে এই সব ধরণ-ধারণকে আধুনিক ও সাম্প্রতিক রসের সুরু বলা চল্‌তে পারে।

লেখক—তাহ'লে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বল্‌বেন না?

সরকার—ভায়া, নাচ-গান-বাজনার আর গল্প-নাট্য-কাব্যের যুগ-বিভাগে অত জোর-জবরদস্তি চল্‌বে না। যাক্, গল্পের তরফ হ'তে বল্‌বো যে, ১৯৩৫ সনে "সাম্প্রতিক" সাহিত্য বেশ-পাকাপাকি দাঁড়িয়ে গেছে। ধারাটা তারপর জোরের সহিতই বেড়ে চ'লেছে। এই ধারার প্রধান আলোচ্য লক্ষণ তিন ঃ—মজুর, মেয়ে ও মুসলমান। এই তিন শক্তি বাঙালী চিন্তার ওপর সজোরে ঘা লাগাচ্ছে। বাঙলামির ধারা-বৃদ্ধি আর বঙ্গ-সাহিত্যের বাড়্‌তি নিজ-নিজ কব্‌জায় আন্‌বার জন্য সন-তারিখ লাগিয়ে বই-গুলার যুগ-বিভাগ করা যারপর নাই জরুরি। তাহ'লে বুঝা যাবে কতধানে কত চাল। (পৃঃ ৫৭২)

সাহিত্য-স্রষ্টাদের পংক্তি-ভোজন

মন্মথ—অন্য ধরণের কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি। স্বদেশী যুগের কবি, গাল্পিক, নাট্যকার ও সিনেমা-লেখকদের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় ছিল?

সরকার—প্রথমেই ব'লে রাখি যে, স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৪) সিনেমা ছিল না। তারপর এই অধম রস-কসহীন, কেঠো লোক। রস-স্রষ্টারা আমার মতন লোককে অস্পৃশ্য, পারিয়া সম্‌ঝে চলে। কাজেই এঁদের সঙ্গে ছোঁআ-ছুঁয়ি আর গা-ঘেঁশাঘেঁশি ঘটে না বলা যেতে পারে। তার ওপর আর এক বিপদ।

লেখক—এর ভেতর বিপদ্‌টা জুট্‌লো কোথ্ থেকে?

সরকার—রস-স্রষ্টাদের জাত-পাত নিয়ে গণ্ডগোল আছে। এঁরা যে-সে লোকের সঙ্গে পংক্তি-ভোজনে বসেন না। জাত যাবার ভয়ে অনেকে অস্থির। দলা-দলি বড্ড-বেশী। আমি বেচারা গরীব মানুষ। কোনো দলে ভিড়্‌তে পারিনি। কাজেই কবি, গাল্পিক, নাট্যকার আর সিনেমা-লেখকদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালানো এই হাড়ে আর ঘ'টে উঠ্‌লো না। সারা জীবনটা নীরস ভাবেই কেটে গেল। কী করা যায়?

লেখক—সাহিত্য-স্রষ্টাদের জাত-পাঁত্, দলাদলি কিরূপ বল্‌ছেন?

সরকার—স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৪) দলাদলি ছিল বোধ হয় হিন্দু বনাম ব্রাহ্মসংক্রান্ত। (১৯১৪-২৫)-এর যুগে সুনীতি-কুনীতির দলাদলি ছিল মনে হ'চ্ছে। স্বচক্ষে দেখিনি। কেন না, সেই বছর বার ছিলাম বিদেশে,—"বর্তমান জগৎ" চেখে বেড়াবার জন্য। তারপর ১৯২৫-হ'তে, বিশেষতঃ ১৯৩৫ সন হ'তে, দেখ্‌তে পাচ্ছি দল প্রধানতঃ দুই রকমের। প্রথম দল হ'লো স্বদেশনিষ্ঠ, স্বজাতিধর্মী, জাতীয়তা-প্রেমিক। নয়া দলের নাম, শ্রেণী-সচেতন, শ্রেণী-লড়ুয়া, সমাজ-তন্ত্রী, সোশ্যালিস্ট্, কমিউনিস্ট্, সাম্যবাদী ইত্যাদি। এই দুই দলের খাওয়া-খাওয়ি বেশ জবরদস্ত। দ্বিতীয় দলকে কখনো-কখনো "প্রগতি"-পন্থী বা এমন কি "ফাশিস্ত-বিরোধী" দল বলা হয়।

লেখক—১৯৩৫ সনের ওপর জোর দিলেন কেন?

সরকার—সন-তারিখগুলা সবই ঠারে-ঠোরে বুঝা উচিত। তবে ১৯৩৫-এর একটা বিশেষত্ব আছে। এই তারিখে নয়া শাসন-ব্যবস্থা (গবর্মেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট) জারি হয়। এই রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সামাজিক প্রভাব খুব বেশী। "সাম্প্রতিক" রস-বিশ্লেষণের সময় এই কানুনটার কথা মনে রাখা চাই-ই-চাই।

লেখক—এই কানুনের নূতনত্ব কী?

সরকার—এই কানুন বাঙলায় তিনটা নয়া শক্তি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রথম শক্তি মজুর, দ্বিতীয় শক্তি মেয়ে, তৃতীয় শক্তি মুসলমান। (পৃঃ ৫৭২)

লেখক—এই সকল দলাদলির প্রভাবে আপনার সঙ্গে সাহিত্য স্রষ্টাদের যোগাযোগে অসুবিধা কিছু ঘ'টেছে কি?

সরকার—বলা কঠিন। বোধ হয় না। মনে হচ্ছে যে, এই বেচারাকে সাহিত্য-স্রষ্টারা দয়া ক'রে সকল প্রকার দলের বহির্ভূত জানোআর বা অপদার্থ বস্তু স'ম্‌ঝে থাকেন। এঁরা আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রায় ষোলআনা নির্বিকার বা উদাসীন। আমার হাতে কারুর ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা নাই,—সকলেই জানেন। আর কারুর উপকার করা এ গরীবের পক্ষে তো অসাধ্য বটেই।

স্বদেশী যুগের কবি, গাল্পিক ও নাট্যকার

লেখক—এইবার তাহ'লে বলুন স্বদেশী যুগে ব্যক্তিগতভাবে চেনা-শুনা আপনার সঙ্গে কোন্-কোন্ সাহিত্য-স্রষ্টার ছিল?

সরকার—রবির নাম বাদ দিয়ে যাচ্ছি। তাঁর বাড়ীতে টুঁ মেরেছি অনেকদিন। তা ছাড়া "ডন সোসাইটি"র আবহাওয়ায় (১৯০২-০৬) শুধু রবি কেন, সেকালের প্রায় প্রত্যেক কেষ্ট-বিষ্টুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জম্‌তে পেরেছিল। এই সকল যোগাযোগের জন্য রাধাকুমুদ, রবি ঘোষ ইত্যাদির মতন এই অধমও আমাদের গুরু সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী।

লেখক—তারপর?

সরকার—নাট্যকার ক্ষীরোদ ছিলেন ন্যাশন্যাল কলেজে আমাদের সহকর্মী (১৯০৭-০৮)। কাজেই অন্তরঙ্গের ভেতর গণ্য। বয়সে অবশ্য তখন আমি নেহাৎ চ্যাংড়া, বিশ-একুশ মাত্র। সেই যুগে "বঙ্গ আমার"-স্রষ্টা নাট্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল আর হরেন্দ্রলাল ইত্যাদি তাঁর ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা মাখামাখি হ'য়েছিল। সংবাদপত্রসেবী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃতত্ত্বশাস্ত্রী বিজয় মজুমদার আর বরিশালের কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী ছিলেন দ্বিজু কবির অনেকটা "হরিহর এক-আত্মা।" এঁদের সঙ্গে কবির বৈঠকখানায় ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ কায়েম হয় (১৯০৯-১২)। দিলীপ (মণ্টু) তখন বাচ্চা, বোধহয় বছর সাত-আটেকের হবে। রাধাকুমুদ আর আমি থাক্‌তাম ২৬নং সুকিয়া স্ট্রীটে। দ্বিজেন্দ্র-ভবন (সুরধাম) ছিল নন্দলাল চৌধুরী লেনে—মিনিট তিন-চার দূরে)।

লেখক—আপনাদের কোন বাড়ীটার কথা বল্‌ছেন?

সরকার—আমাদের বসত্ বাড়ী। সুকিয়া স্ট্রীটের এই অংশ (কর্ণওয়ালিস—আম্‌হার্স্ট স্ট্রীটের ভেতরকার হিস্যা) আজকাল কৈলাস বোস ষ্ট্রীট নামে চলে। আমরা ছিলাম সত্যচরণ

ও বিমলাচরণের বাবা অম্বিকারচরণ লাহার ভাড়া-খাটা বাড়ীতে। এই অধমের ১৯১০-১৪ সনের অনেক-কিছু এই বাড়ীর এক ছোট্ট ঘরে ঘ'টেছে।

লেখক—এই বাড়ীতে যারা-যারা আস্‌তো তাদের কারু-কারু নাম কর্‌বেন?

সরকার—অম্বিকা উকিল, মনোমোহন ভট্টাচার্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদের বামনদাস বসু, সুরেশ সমাজপতি, হায়দ্রাবাদেব অঘোর চট্টোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, ব্যোমকেশ মুস্তফি, কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, মালদহের বিপিনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণচরণ সরকার ও বিধুশেখর শাস্ত্রী ইত্যাদি অনেকের নাম করা চলে। জাপানী কিমুরা আর মার্কিণ মায়রণ ফেল্‌প্‌স্‌ এই দুই বিদেশীর আনাগোনাও মনে প'ড়্‌ছে। কিমুরা বাংলা বড়্‌তো। ফেল্‌প্‌স্‌ ছিল "যোগ"-ভক্ত, দার্শনিক-ঘেঁষা লোক।

লেখক—এই বাড়ীর আর কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচার চালাতে এসে এলাহাবাদের মদনমোহন মালবীয় এই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে অনেকবার অনেক আড্ডা মেরেছেন। মাঝে-মাঝে নরেন লাহাকে এই অধমের বৈঠকে ব'সে বাক্‌-বিতণ্ডা শুন্‌তে হ'য়েছে। তখনকার দিনে "গৃহস্থ" মাসিক সম্পাদিত হ'তো এই হাতে আর এই ঘরে। তা ছাড়া "সাধনা", "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" "শিক্ষা সমালোচনা" আর "বিশ্বশক্তি"র অধ্যায়গুলা তৈয়ারি হ'য়েছিল এই বাড়ীতেই। কাজেই বচসা, বকাবকি, হাতাহাতি আর চেঁচিয়ে প'ড়ে শোনাবার সুযোগ হাজির হ'তো হামেশা। "গৃহস্থ"'য় প্রকাশিত "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" (১৯১৩-১৪) হ'তে গলা ফাটিয়ে লোককে শুনিয়েছি কতবার তার ঠিক নাই। এই ঠিকানা হ'তেই এই অধমের প্রথম-বারকার বিদেশ পর্যটনের (১৯১৪-২৫) ব্যবস্থা।

লেখক—আপনি তো গিরিশ ঘোষের ভক্ত। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় নি?

সরকার—মনে পড়্‌ছে না। হয়ত দেখা-শুনা হ'য়ে থাক্‌বে। সতীশ বাবুর মারফৎ রামকৃষ্ণ-সেবক আর বিবেকানন্দ-সুহৃৎ হিসাবে গিরিশের সঙ্গে সতীশের আনাগোনা স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ মণ্ডলেরই নিবেদিতাও ছিলেন আমাদের পোষাকী "ভগ্নী" মাত্র নন, শিক্ষা-দীক্ষার জবরদস্ত মন্ত্রদাত্রী।

লেখক—অন্যান্য কবি ও গাল্পিকদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলুন।

সরকার—১৯০৫-১৪ সনের যুগে আমার বয়সের কাছাকাছি, অর্থাৎ বছর পাঁচ-সাতেক বড় ছিলেন সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলি, আর "নামিকা"-লেখক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই "চার-ইয়ার" দলে চল্‌তো। এঁরা ছিলেন রামানন্দবাবুর "প্রবাসী" ঘেঁষা। এঁদের সঙ্গে বোধ হয় "মডার্ণ-রিভিউ"-"প্রবাসী"র লেখক হিসাবে অথবা রামানন্দ'র মারফৎ গা ঘেঁষা-ঘেঁষি ঘট্‌তো। সে কালের রামানন্দ আমাদেরকে সু-নজরে দেখ্‌তেন। তাঁর সঙ্গে অনেক ঘরোআ কথাবার্তা চল্‌তো। "প্রবাসী"-"মডার্ণ রিভিউ"র আবেষ্টনেই হয়তো "ভারতী"র সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম মুখ-চেনাচিনি। মণি গাঙ্গুলিকে "ভূতুড়ে" নামে ডাক্‌তাম। শিশু-সাহিত্যে ভূত-পেত্নীর কাহিনী আমদানি ছিল তাঁর কাজ। তাঁর সঙ্গে একটা কেজো যোগাযোগও কায়েম হ'য়েছিল।

লেখক—কী সেটা?

সরকার—১৯১০ সনে আমার "শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা" প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউসের কর্মকর্তা মণি গঙ্গোপাধ্যায়। আজকালের আর্য-সমাজ-ভবনের নীচ

তলায় তখন ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসের আপিস। এই ঘরেই তার কিছুদিন আগে (১৯০৬-০৭) সুরেশ মজুমদার "বঙ্গ-দর্শন" মাসিকের শেষ অবস্থাটা চালিয়েছিলেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আর শিবনারায়ণ দাসের গলির মোড়ে ছিল এই আপিস।

লেখক—স্বদেশী-যুগের আর কোন্-কোন্ সাহিত্য-স্রষ্টাকে চিনতেন।

সরকার—গয়ার ব্যারিস্টার প্রবাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁকে বাঙালী মো-পাসাঁ বল্তাম। ১৯১০-১১ সনে মনে প'ড়্ছে দু'একবার গয়া বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতার যোগাযোগ কায়েম হ'য়েছিল। লোকটা গল্প-রসিক বটে—কিন্তু বিচক্ষণ সমালোচক। দেশ, সমাজ, পরিবার এই তিন বিষয়েই তাঁর নজর ছিল কড়া। ঠোঁট-কাটা সমালোচনা তাঁর কাছে পাওয়া যেত। জলধর সেনকে সেকালেই "দাদা" বলা হ'তো বোধ হয়। তাঁকে কোনো দলে দেখিনি মনে হচ্ছে।

লেখক—আর কোনো কবি ও গাল্পিককে চিন্তেন?

সরকার—যতীন বাগ্চি, কুমুদ মল্লিক আর কালিদাস রায়—এঁদের সঙ্গে ভাব ছিল। কবে, কোথায়, কি সূত্রে আলাপ হয় মনে প'ড়্ছে না। কুমুদ মল্লিক হচ্ছেন মালদহ জেলা স্কুলের সহপাঠী আশুর দাদা। কালিদাসের সঙ্গে যোগাযোগ বোধহয় কুমুদ লাহিড়ীর বা রাধাকমলের মারফৎ। এঁার মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার-বহরমপুরের লোক। মনে প'ড়্ছে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের "নবরত্ন"। অন্যান্য অনেকের মতন এই অধমও মনীন্দ্র-মণ্ডলের" অন্তর্গত ছিল। লেখক—যতীন বাগচিকে কি সূত্রে চিন্তেন?

সরকার—যতীনকে দেখ্তে পাচ্ছি "মানসী"-চক্রে। কিন্তু কবে প্রথম দেখা, কোন্ উপলক্ষ্যে মনে নাই। গুলিয়ে যাচ্ছে। ২৬ সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে ও দেখছি। "মানসী" তখন বোধহয় নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়ের হাতে ছিল। মহারাজার ভাগ্নে ব্রজেন রায়চৌধুরীকে বাড়ীতে এম-এ পড়াতাম (১৯১০-১২)। ব্রজেন রংপুরের জমিদার। বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম প্রবর্তক ময়মনসিংহে গৌরীপুরের দানবীর জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জামাই ছিল ব্রজেন। বোধহয় ব্রজেনের মারফৎ মহারাজার সঙ্গে আলাপ। আর সেই সূত্রে (?) যতীন বাগচি। যতীনের "অপরাজিতা" বের হয় ১৯১৪ সনে।

লেখক—কাশিমবাজার, নাটোর, ময়মনসিংহ,—দেখ্ছি সেকালের জমিদারেরা স্বদেশ-সেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ চালাতেন? সাহিত্যসেবার দিকেও তাঁদের নজর ছিল?

সরকার—তখনকার দিনে "আধুনিক" শিল্পে-বাণিজ্যে বাঙালী জাত্ তে-রে-কা-টা সাধ্ছে মাত্র। বঙ্গ-বিপ্লবের স্বদেশী আন্দোলনে জমিদারেরাই জোগাতেন "রূপচাঁদ"। নাটোরের মহারাজা ছিলেন সুলেখক আর খোল্তাই মেজাজের লোক। সকলকে "ভাই" বলে ডাক্বার রেওয়াজ ছিল। সেকালের অনেক জমিদার এই অধমের সঙ্গে সত্যিকার ভাইয়ের মতনই, বোধহয় বা ছেলের মতনই, ব্যবহার ক'রেছে। এও একটা উল্লেখযোগ্য কথা।

লেখক—আজকালকার মতন সে-যুগে ক্লাব, সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ছিল না?

সরকার—গুণ্তিতে অনেকগুলা ছিল না। কিন্তু সে-কালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক মহোচ্ছব অনুষ্ঠিত হ'তো খুব ধুমধামের সহিত। সেই মহোচ্ছবের অনেকগুলায় আমি হাজির ছিলাম ;—ভাগলপুরে (১৯০৯), ময়মনসিংহে (১৯১১), চুঁচুড়ায় (১৯১২), চট্টগ্রামে (১৯১৩)। তা ছাড়া ছিল উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। সেই উপলক্ষে গিয়েছিলাম মালদহে (১৯১১), গৌহাটিতে (১৯১২), দিনাজপুরে (১৯১৩) ইত্যাদি। কাজেই কবি, গাল্পিক আর

নাট্যকারদের সঙ্গে মাখামাখির অভাব হ'তো না। সুযোগ জুট্‌তো অনেক।

কুমুদ লাহিড়ী ও শরৎ চট্টোপাধ্যায়

লেখক—আপনি অনেকবার কবি কুমুদ লাহিড়ীর কথা ব'লেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কিরূপ ছিল?

সরকার—কুমুদ লাহিড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘরোআ আত্মীয়তা। মালদহের বন্ধু যতীন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ীর ভগ্নীপতি কুমুদ লাহিড়ী। যতীনের মৃত্যুর পরের দিন (১৯০৭ ফেব্রুয়ারি) কুমুদের সহিত আমার প্রথম আলাপ মালদহে। কুমুদ তখন রেঙ্গুনে ডাকঘরের কর্মচারী। তারপর আত্মীয়তা আরও বেড়ে যায়। কুমুদ সরকারী চাক্‌রী ছেড়ে আসেন। তাঁকে দিনাজপুরের ন্যাশনাল ইস্কুলে সেখানকার জননায়ক যোগীন চক্রবর্তীর মারফৎ প্রধান শিক্ষক ক'রে পাঠিয়েছিলাম। শেষে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির বিদ্যাদান আর সাহিত্য-বিভাগের সঙ্গে কুমুদকে গেঁথে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করি (১৯১০)। এই সূত্রে হরিদাস পালিতের গম্ভীরা-সংক্রান্ত লোক-নৃত্য, লোক-গীত, লোক-বাদ্য ইত্যাদি গবেষণায় কুমুদের যোগযোগ। বিপিন ঘোষ, রাধেশ শেঠ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নগেন চৌধুরী, কৃষ্ণচরণ সরকার ইত্যাদি আরও অনেকের সঙ্গে মাখামাখি।

লেখক—দেখ্‌ছি কুমুদ লাহিড়ীর সঙ্গে কারবার অনেক রকমের ছিল?

সরকার—আরও রকমারি আছে। কিছু গল্প শোনাচ্ছি। ময়মন-সিংহ-মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর দুই ছেলে ও নাতী (নসু, ননী ও জীবন) এই পাপিষ্ঠের হাতে আসে (১৯১১)। তাদের ভাল নাম নৃসিংহকিশোর, ভূপেন্দ্রকিশোর আর জীবেন্দ্রকিশোর। নসুর বয়স তখন বছর দশ-এগার। সম্প্রতি নসু বেচারা হঠাৎ মারা গেছে (১৯৪২)। তার ছেলে নবযুগ ইংরেজিতে এম্‌-এ পড়্‌ছে। আমাদের বাড়ীতে বোধ হয় কয়েকবার দেখেছো। জগৎকিশোরের বড় ছেলে জিতেন্দ্রকিশোর এই ব্যবস্থায় উৎসাহী ছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজা ফণীন্দ্রচন্দ্রর সাম্‌নে—মুক্তাগাছায়,—সকলপ্রকার কথাবার্তা হ'য়েছিল। ময়মনসিংহের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে আমরা মুক্তাগাছায় গিয়েছিলাম (১৯১১)। যাহ'ক নসু-ননী-জীবনের জন্য কল্‌কাতায় ২৬ সুকিয়া স্ট্রীটের নিজ বসতবাড়ির উল্টাদিকে ঘরোআ পাঠশালা কায়েম করি।

লেখক—এসবের সঙ্গে কুমুদ লাহিড়ীর যোগাযোগ কোথায়?

সরকার—গল্পটাই তো তাই এই পাঠশালার জন্যে নিজ তদ্‌বিরে গোটা পাঁচ-সাতেক শিক্ষক মোতায়েন রেখেছিলাম। তাঁদের পরিচালক ক'রে দিই কুমুদ লাহিড়ীকে (১৯১১)। পাঠশালাটা নিয়ে যেতাম অথবা পাঠাতাম কখনো পুরীতে, কখনো দার্জিলিঙে। দীঘা-পাতিয়ার রাজা প্রমদা রায়চৌধুরী বল্‌তেন—"এটা পেরিপ্যাটেটিক পাঠশালা"। আমার পারিভাষিক ছিল ভবঘুরে-পাঠশালা। একালের সুপরিচিত সুধীবর্গের ভেতর জীবনী-লেখক ও গাল্পিক বিনোদ চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস-গবেষক মণীন্দ্র বসু, গম্ভীরা-গবেষক হরিদাস পালিত আর মহামহোপাধ্যায় যোগীন্দ্রনাথ তর্ক-সংখ্যা-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ এই পর্যটক-পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাজ ক'রেছেন। তা ছাড়া খুলনা-বিদ্যানন্দকাঠির ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতা সুরেন ঘোষ ইত্যাদি আরও কয়েক জন ছিল। এঁদের কাছে খবর নিতে পারো।

আমার "শিক্ষাবিজ্ঞান"-গ্রন্থাবলীর অন্যতম পরীক্ষালয় বা ল্যাবেরটরি ছিল এই পাঠশালা।

লেখক—কুমুদ লাহিড়ীর সাহিত্য-চর্চা কিরূপ ছিল?

সরকার—"পাপ ও পুণ্য" আর "বিল্বদল" নামে দুই কবিতার বই বেরিয়েছিল (১৯১০-১১) আমার বিদেশ যাবার অর্থাৎ ১৯১৪ এপ্রিলের আগে। ১৯১৬ সনে বেরোয় "সাগরের ডাক" (নাটিকা)। এই অধমের "গৃহস্থ" মাসিকে তাঁর কবিতা আর গদ্য রচনা বেরিয়েছে ১৯১২-১৬ সনে। রাধাকমলের "উপাসনা"য়ও বেরিয়েছে কোনো কোনো লেখা। তা ছাড়া কলিগ্রাম (মালদহ) হ'তে কৃষ্ণচরণ সরকার কর্তক প্রকাশিত "গম্ভীরা"-দ্বৈমাসিকেও কুমুদে রচনা পাওয়া যায় (১৯১৪-১৭)। সুরেশ সমাজপতি-সম্পাদিত "সাহিত্য" আর দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-সম্পাদিত "নব্য ভারত" মাসিকেও বোধ হয় কুমুদের কয়েকটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল (১৯০৮-১০)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কুমুদের চেনা-জানা ছিল। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল।

লেখক—একালে কুমুদ লাহিড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—১৯২৫ সনের শেষে দেশে ফিরে আস্‌বার পর নরেন লাহার আনুকূল্যে "আর্থিক-উন্নতি" মাসিক বাহির করি। সেটা আজও চল্‌ছে। কুমুদের রচনা এই পত্রিকার "বাঙলার সম্পদ", "আর্থিক ভারত", "দুনিয়ার ধনদৌলত", "ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" আর "সমালোচনা" অধ্যায়ে বেরিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর "কুমুদনাথ" নামে এঁর বন্ধুরা একখানা বই প্রকাশ ক'রেছেন (১৯৩৪)। উত্তরপাড়ার অধ্যাপক সত্যেন গাঙ্গুলী উদ্যোগী ছিলেন। বইটা লিখেছেন। সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিতা সরলাবালা সরকার। ইনি ফ্রয়েড-প্রচারক ডাক্তার সরসীলাল সরকার বোন আর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রফুল্ল সরকারের শ্বাশুড়ী। নারীত্বের অর্থাৎ মেয়েদের পুরুষ-সাম্যের আন্দোলনে সরলা সরকারের মেজাজ খেলে।

লেখক—শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে আপনি স্বদেশী যুগে চিন্‌তেন?

সরকার—না। বোধ হয় দুএকবার দেখা হ'য়ে থাক্‌বে। কিছু মনে পড়্‌ছে না। রেঙ্গুনে কুমুদ লাহিড়ীকে সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। কল্‌কাতায় এসে কুমুদের সঙ্গে শরৎ কয়েকবার দেখা ক'রেছিলেন। তখন কুমুদ থাকতেন নসু-ননী-জীবনের জন্য কায়েম-করা পাঠশালায়। আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীর সম্মুখে সেই পাঠশালার জন্য বাড়ী ভাড়া করা হ'য়েছিল। সে ১৯১১-১৪ সনের কথা। শরৎকে কল্‌কাতার বাজারে তখন বোধ হয় বেশী লোকে চিন্‌তো না। কুমুদের বন্ধু হিসাবে তাঁর সঙ্গে হয়ত কথাবার্তা হ'য়েছিল। নিউইয়র্কে থাক্‌বার সময়ই প্রথম শরতের নামডাক শুনতে পাই (১৯১৮-২০)। তখন এই শরৎ যে কুমুদের বন্ধু শরৎ তা ভাব্‌তে পারিনি। ১৯২৬ সনে দেশে ফিরবার পর টের পেয়েছিলাম। ১৯১১-১৪ সনের কথা হয়তো রাধাকুমুদও কিছু-কিছু বল্‌তে সমর্থ। আমরা একত্র এক বাড়ীতেই ছিলাম।

লেখক—কোথায় তখন আপনারা থাক্‌তেন? মেসে ছিলেন বুঝি?

সরকার—বাড়ীটা (২৬ সুকিয়া স্ট্রীট) আমাদের অন্যতম লাহা-বন্ধু সতু-লাহার (ডক্টর সত্যচরণের) বাবার। এই বাড়ীতে রাধাকুমুদের মায়ের সাম্‌নে ব'সে আমরা দুজনে বহুদিন সকাল-বিকালে ভাত খেয়েছি। এই বাড়ীতেই ছিলাম,—এলাহাবাদ হ'য়ে বিদেশ-যাত্রার দিন পর্যন্ত (১৯১৪ এপ্রিল)। অবশ্য আমি যে "বিদেশ"-যাত্রী তা লোকেরা জানতো না। এমন কি কুমুদ লাহিড়ী ও জান্‌তো না। মুক্তাগাছার বাচ্চারা তো জানতোই না। কুমার জিতেন্দ্রকিশোরকেও বলা হয় নি। জান্‌তো একমাত্র রাধাকুমুদ আর রাধাকমল। লোকেরা

জান্‌তো যে, আমি অন্যান্য বারের মতন এবারেও এলাহাবাদ বা আর কোথাও পশ্চিম-যাত্রী। শুনেছি,—পরে লোকেরা খবর পায় "ইংলিশম্যান" (কলিকাতা) দৈনিকে বোম্বাইয়ের জাহাজের বিদেশ-যাত্রীদের নাম-ধাম দেখে। তখনকার দিনে "পাশ পোর্ট্‌" লাগ্‌তো না।

অজিত চক্রবর্ত্তী

৫ই এপ্রিল ১৯৪৪

লেখক—রবীন্দ্র-শিষ্য অজিত চক্রবর্তীকে চিন্‌তেন?

সরকার—হাঁ। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে অজিত ডন সোসাইটিতে এসে আমাদেরকে কয়েকটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখিয়ে গিয়েছিলেন। সে ১৯০৫ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। প্রথমে ডন সোসাইটিতে রবি একটা বক্তৃতার ফাঁকে-ফাঁকে গান গেয়ে শোনালেন। সেই সঙ্গেই অজিতকে আমাদের মাষ্টার বাহাল ক'রে দিয়েছিলেন।

লেখক—তা ছাড়া অজিতের সঙ্গে আর কখনো যোগাযোগ ঘটে নি?

সরকার—তারপর অন্য উপলক্ষ্যে বোলপুরে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। ১৯০৭ সনের মাঝামাঝি। তখনকার দিনে বোধ হয় বিশ্বভারতীর স্বপ্ন পর্যন্ত রবীন্দ্র-হৃদয়ে জাগে নি। সে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের বিলকুল আদিম অবস্থা। গোটা দেড়-দুই চালার ঘর মাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে আমার খুড়তুতো ভাই খগেনকে ভর্তি ক'রে দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠানে কয়েকবার যাওয়া-আসা ক'রেছি। বেচারা মারা যায় কয়েক বছর পর।

লেখক—আপনি তা ছাড়া বোলপুরের শান্তিনিকেতনে আর কতবার গেছেন?

সরকার—মাত্র একবার। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য টাকা তোলার মতলবে কাশিমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে ধর্ণা দেবার প্রস্তাব হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযানের নায়ক হ'তে রাজি হ'য়েছিলেন। সাব্যস্ত হয় যে, রবিকে দলের ভেতর পূরে, কাশিমবাজারে হাজির হ'তে হবে। ব্যারিস্টার-জজ আশুতোষ চৌধুরী সতীশ বাবুর মারফৎ রবির কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। এই চিঠির বাহক হিসাবে রাধাকুমুদ আর এই অধম বোলপুরে হাজির হ'য়েছিল রবীন্দ্র-তীর্থে। সে বোধ হয় ১৯০৮ সনের কথা।

লেখক—তারপর আপনি আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন দেখেন নি?

সরকার—না। বিশ্বভারতীর গৌরব-যুগ আমার চোখে দেখা নাই।

লেখক—তথাপি আপনি রবিকে "ভারতীয় ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান"রূপে দুনিয়ায় প্রচার ক'রে গর্ব কর্‌ছেন?

সরকার—দুনিয়া বড়ই বিচিত্র। মক্কায় গিয়ে মুসলমান হ'য়েছে পৃথিবীর কয়টা লোক?

নলিনী পণ্ডিত

লেখক—সত্যেন দত্ত'র সঙ্গে-সঙ্গে আপনি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ক'রে থাকেন। করুণার সঙ্গে আপনার আলাপ হ'লো কী ক'রে?

সরকার—"ঝরাফুল"-বইয়ের লেখক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। বোধ হয় সাহিত্য-

সুহৃৎ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে প্রথম দেখা হ'য়েছিল। ঠিক মনে পড়ছে না। সাহিত্য-পরিষদের কর্মী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের (১৮৮৩-১৯৩৯) মারফৎ যোগাযোগটা ঘটে। "ঝরাফুল" বেরোয় ১৯১২ সনে। মারফৎ যোগাযোগটা ঘটে। "ঝরাফুল" বেরোয় ১৯১২ সনে। "পণ্ডিতজী"র মারফৎ অনেক সাহিত্য-স্রষ্টা ও সাহিত্য-বন্ধুর সঙ্গে এই অধমের যোগাযোগ হ'তো। "পণ্ডিতজী" উপাধিটা এই অধমের দেওয়া। অব্যশ্য আর কেউ তাকে "পণ্ডিতজী" বল্‌তো কিনা সন্দেহ। বোধ হয় নরেন লাহার মুখে "পণ্ডিতজী" শব্দটা শুনেছি নলিনীর সম্বন্ধে। কমিউনিস্ট সৌম্যেনের বাবা সুধী ঠাকুর।

লেখক—নলিনী পণ্ডিতের সাহিত্য-সেবা সম্বন্ধে কিছু খবর দেবেন?

সরকার—লোকটা খুব দরদী। অসংখ্য সাহিত্য-সেবীর গুণগ্রাহী। অনেকে তাঁকে বন্ধু বল্‌তো। "কান্ত কবি রজনীকান্ত" (১৯২২) বইয়ের লেখক। বইটা লেখা হ'য়েছিল ১৯১৪ সনের আগে। "বাউল" সম্বন্ধে তার একটা সুবিস্তৃত প্রবন্ধ দেখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা ছাপা হয় নি। নলিনী "রামেন্দ্রসুন্দর" (১৯২১) নামে একখানা প্রশস্তি-বইয়ের সঙ্কলন-কর্তা। একালে "শরতের ফুল", "পূজারিণী" ইত্যাদি সংগ্রহ সম্পাদক। স্বদেশী যুগে "যমুনা" আর "জাহ্নবী" পত্রিকার সম্পাদক-ভার তাঁর হাতে ছিল (১৯০৬-০৮)। বোধ হয় যেন পণ্ডিতজীর সঙ্গে স্বদেশী যুগের প্রায় প্রত্যেক লোকের বন্ধুত্ব ছিল। যে-কোনো সাহিত্যসেবীর আর রাষ্ট্রনায়কের হেঁসেল-ঘরেও তিনি ঢুক্‌তে পার্‌তেন। কোনো "বুড়ো" তো বাদ যেতোই না—এমন কি যে-কোনো "প্রবীণ"ও পণ্ডিতজীর এলাকার বাইরে ছিল না। ১৯২৫ এর পরবর্তী যুগেও তাঁর এইরূপ যোগাযোগ খানিকটা দেখেছি,—দেশে ফিরে আস্‌বার পর।

লেখক—পণ্ডিতজীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—বহুসংখ্যক নবীন-প্রবীণ কবি-গাল্পিক-নাট্যকার-প্রবন্ধিক পণ্ডিতজীর মারফৎ এই অধমের গোআলে (২৬ সুকিয়া স্ট্রীটে) আসতেন। কার নাম কর্‌বো? কাকেই বা বাদ দিই? "নায়ক"-সম্পাদক পাঁচকড়ি, 'আর্যাবর্ত-সম্পাদক ও গাল্পিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ, "পথিক"-লেখক সার্বজনিক "জলধর-দা" ইত্যাদি প্রবীণের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় বোধহয় নলিনীর মারফৎ। সেকালের "ছোকরা" ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পেয়েছিলাম নলিনীর সঙ্গী হিসাবে। তখন অবশ্য আমিও ছোক্‌রা।

অন্যান্য অনেক কথার ভেতর মনে পড়ছে একটা বিশেষ ঘটনা। বুড়ো সাহিত্যবীর অক্ষয় সরকারের চুঁচড়ার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পণ্ডিতজী (১৯১১-১২)। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম মালদহ-কলিগ্রামের কৃষ্ণচরণ সরকারকে। এই অধম লোকটা চিরকালই যৌবনধর্মী। ছেলেবেলায় ত বটেই তথাপি সেকালেও আমি বুড়োদের সঙ্গে যোগাযোগ পছন্দ কর্‌তাম।

অক্ষয় সরকার

লেখক—অক্ষয় সরকারের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়ে দেবার জন্য পণ্ডিতজীর তারিফ কর্‌ছেন কেন?

সরকার—সেকালে চুঁচ্‌ড়ার ঐ বুড়োকে আমরা "বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্ক" ব'লে সম্বর্দ্ধনা কর্‌তাম। বঙ্কিমের জন্ম ১৮৩৮-এর আর অক্ষয়ের ১৮৪৬-এ।

লেখক—তা ছাড়া তাঁর আর কোনো কীর্তি ছিল না?

সরকার—"কবি হেমচন্দ্র" (১৯১২) বইয়ের লেখক। "সাধারণী" ব'লে মাসিক তাঁর হাতে বেরুতো। সে ১৮৭৪ সনের কথা। গোচারণের মাঠ তাঁর অন্যতম ধান্ধার অন্তর্গত ছিল তা। ছাড়া আর একটা বড় কথা আছে। তার সঙ্গে আবার বঙ্কিমের যোগাযোগ।

লেখক—কী সেটা?

সরকার—অক্ষয় সরকারের মাসিক ছিল "নবজীবন"। এই পত্রিকায় বঙ্কিম লেখেন "ধর্ম-জিজ্ঞাসা"। তাঁর ভেতর প্রচার করা হয় যে,—সনাতন হিন্দুত্ব যা, কঁৎ-দর্শনও তা। বুঝা যাচ্ছে যে, বঙ্কিম, অক্ষয় ইত্যাদি সেকালের সাহিত্যবীরেরা কঁৎ-মণ্ডলের লোক। সে হচ্ছে ১৮৮৪ সনের ভাবধারা। তখনও এই অধমের জন্ম হ'তে বছর দু-তিনেক বাকী।

লেখক—আপনি ছেলেবেলায় বুড়োদের সম্বর্দ্ধনা কর্‌তেন। একালে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কেন?

সরকার—বুঝ্‌তে ভুল হচ্ছে। বুড়োদের সম্মান আজও করি, আগে যেমন কর্‌তাম। এ বিষয়ে কোনো রদ্‌-বদল হয় নি।

লেখক—কিন্তু প্রবীণরা নবীনের শত্রু এই কথা আপনার মুখে লেগেই আছে না কি?

সরকার—ঠিক তো। প্রবীণরাও একদিন নবীন ছিল। সেই ছোকরা বা জোআন বয়সের বুড়োরাই দুনিয়ায় নয়া-নয়া মাল সৃষ্টি ক'রেছে। আমার বয়সে আজ আমি বিশ-পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে ছোকরা বা জোআনদের সঙ্গে দহরম-মহরম চাই। তারাই তাজা-তাজা জিনিষ গড়্‌ছে বা আমদানি কর্‌ছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের স্ত্রী-পুরুষকে আমি মানুষই বিবেচনা করি না। পঞ্চান্ন বছরের লোকেরা তো ম'রে ভূত হ'য়ে র'য়েছে। তারা পরপারের লোক। এই হচ্ছে আমার বর্তমান মতিগতি। আমি পঞ্চান্ন পেরিয়ে গিয়েছি ছাপ্পান্ন-সাতান্ন'য় চ'লেছি ; অর্থাৎ আজ আমি নিজেই পরপার থেকে ব'ক্‌ছি।

লেখক—তা হ'লে পরপারের লোক অক্ষম সরকারকে সম্মান ক'র্‌তেন কী করে?

সরকার—তাঁর যৌবনের কাজকর্মগুলা মূল্যবান ছিল ব'লে। যে-বাঙালীর বাচ্চা বাঙালী জাত্‌কে একচুলও বাড়িয়ে দেয়, আমি তার ভক্ত। পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছরের অক্ষয় সরকারের মারফৎ পেয়েছিলাম পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের "বঙ্গ-দর্শন', "সাধারণী" আর "নবজীবন"-ধর্মী চ্যাংড়া অক্ষয় সরকারকে। যৌবন-পূজাই চালিয়েছি, প্রবীণ-পূজা নয়। বঙ্কিমী "বঙ্গ-দর্শনের"'র প্রথম সংখ্যায় (১৮৭৩) অক্ষয়ের "উদ্দীপনা" প্রকাশিত হ'য়েছিল। তাঁর বয়স তখন বছর ছাব্বিশেক। বুঝ্‌লে? পূজা ক'রেছি ছাব্বিশকে, পঁয়ষট্টিকে নয়।

লেখক—অক্ষয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—চুঁচ্‌ড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন বসে (১৯১২)। তাতে অক্ষয় সরকার ছিলেন অভ্যর্থনা-সভাপতি। মহারাজ মণীন্দ্রকে করা হ'য়েছিল সম্মেলনের সভাপতি। অক্ষয় তাঁর ভাষণে এই অধমের বাংলা রচনা-কৌশলের খুব নিন্দা ক'রেছিলেন।

লেখক—সে কী? সোজাসুজি নাম ক'রে?

সরকার—শুধু নাম ক'রে নয়। আমার "সংস্কৃত-শিক্ষা" (চার ভাগে সম্পূর্ণ) বইয়ের ভেতর থেকে কতকগুলা বাক্য উদ্ধৃত পর্যন্ত ক'রেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে,—এই অধম বাংলা লিখ্‌তে পারে না। ভাষাটা কট-মট ইত্যাদি। এই গালাগালিই শেষ নয়।

লেখক—অধিকন্তু কী ছিল?

সরকার—পরের দিন আমার প্রবন্ধ ছিল। সভায় "বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা" প'ড়ে মঞ্চ

থেকে নেমে বেরিয়ে আস্‌ছি, এমন সময় বুড়ো হেঁকে বল্‌লেন ঃ—"দাঁড়াও"।

লেখক—কেন? কাণ্ড কী?

সরকার—একদম হাতে হাত-কড়ি। আমাকে হাতে ধ'রে মঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে সভায় লোকজনকে জানিয়ে দিলেন ঃ—"এই লোকটার ভাষাকেই কাল্‌কের ভাষণে গাল দিয়েছি। আজকে এর গলার আওয়াজ শুন্‌লেন্ তো? এই ছোক্‌রার ভাষা আরও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত।"

লেখক—তারপর কী হ'লো?

সরকার—সেই বছরই আমার "সাধনা" বই বেরুলো। তাতে ভূমিকা ছিল অক্ষয় সরকারের।

লেখক—ভূমিকায়ও বুড়োর গালাগালি ছিল নিশ্চয়?

সরকার—এই দ্যাখো না।

লেখক—আচ্ছা, পড়্‌ছি। অক্ষয় সরকার "সাধনা" সম্বন্ধে লিখ্‌ছেন ঃ—

"এমন গুরুতর বিষয়ে, এমন সর্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে এমন আড়ম্বর-শূন্য, অলঙ্কার-শূন্য নিরেট ভাষায় এত কথার আলোচনা বোধহয় বাঙলায় আর নাই। "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে" নাই, "অনুশীলন-তত্ত্বে" নাই, "ভক্তিযোগে" নাই। বোধকরি আর কোথাও নাই।"

এ তো সম্বর্দ্ধনার চরম দেখ্‌ছি। আপনার বয়স তখন কত হবে?

সরকার—বছর পাঁচিশেক। আগেই ব'লেছি,—চ্যাংড়া মাত্র।

লেখক—অক্ষয় সরকার সম্বন্ধে কোনো বই পাওয়া যায়?

সরকার—"সাহিত্য-সাধনা" বইয়ের (১৯২৪) ভূনমকায় একালের প্রবীণ "বসুমতী"-সম্পাদক, আর সেকালের "আর্যাবর্ত"-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অক্ষয়ের জীবনকথা ও সাহিত্য-সেবার বিশ্লেষণ ক'রেছেন। এই বইটা অক্ষয়েরই বিভিন্ন রচনার সংগ্রহ-পুস্তক। প'ড়ে দেখা ভাল। হেমেন ঘোষ সুলেখক। গল্প-রচনায়ও হাত আছে। যা'হোক 'রূপক ও রহস্য" (১৯২০) নামেও অক্ষয়ের রচনাসংগ্রহ পাওয়া যায়। তাতে তাঁর ছেলে অজয়ের ভূমিকা আছে।

মেয়ে গাল্পিকের ও কবির দল

৭ই এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—লেখা-লেখির পরিমাণে মহিলারা বাস্তবিকই বাড়্‌তির পথে কি?

সরকার—এই দ্যাখো আমার "পণ্ডিতজী" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বেঁচে থাক্‌তে-থাক্‌তে একটা গল্প-সংগ্রহের বই সঙ্কলন ক'রে গেছে। তার লেখকেরা সবাই মেয়ে। বইটার ভেতর সবই গল্প। শেষ রচনাটা নাটিকা।

লেখক—বইয়ের নাম কী? কটা লেখা আছে?

সরকার—"পূজারিণী" (১৯৩৭)। বাইশটা রচনার সংগ্রহ-বই।

লেখক—লেখিকা আর রচনাগুলার নাম পড়্‌তে পারি?

সরকার—নিশ্চয়। জোরে পড়ো।

লেখক—"পূজারিণী"র মহিলা-লেখকগণের নাম ও রচনা নিম্নরূপ ঃ—

লেখিকা	রচনা
১। নিরুপমা দেবী	পূজারিণী
২। কল্পনা দেবী	প্রীতি-ভোজন
৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	পাষাণের মায়া
৪। বিমলা দেবী	ব্যথার ব্যথী
৫। হাসিরাশি দেবী	স্বপন যদি সত্য হ'তো
৬। জ্যোৎস্না দেবী	গতি
৭। প্রতিমা দেবী	একটি কাহিনী
৮। ঊর্মিলা ঠাকুর	পাছে লোকে বলে
৯। প্রতিমা ঘোষ	মা-হারা মেয়ে
১০। পুষ্প দেবী	লভিবে মরণ চরণে তোমার সুন্দর অনুপম
১১। রমা দেবী	মুক্তির পথ
১২। গৌরীরাণী দেবী	দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ
১৩। সুষমা দেবী	শেষ সুর
১৪। ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী	ফাঁকীর খেলা
১৫। যূথিকাদেবী চট্টোপাধ্যায়	ত্যজ্য পুত্র
১৬। আমোদিনী ঘোষ	মিট্‌মিটে ডান্‌
১৭। লতিকা ঘোষজায়া	ওরা কি কিছু বোঝে না?
১৮। রিজিয়া বেগম	হরিবাবু
১৯। রুচিরা দেবী	প্রাসাদ
২০। আশালতা	বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত যন্ত্রালয়
২১। মেহের উন্নেসা বেগম	শিকার
২২। অনুরূপা দেবী	বিজয়িনী (নাটিকা)

সরকার— দেখ্‌ছো তো মহিলাদের একাল-সেকাল দুই-ই এই বাইশটা রচনার ভেতর ধরা প'ড়েছে। কোনো-কোনোটার রচনা-কৌশল চমৎকার, আর ভাষা প্রায়ই সরস। কিঞ্চিৎ-কিছু হাসি ছড়াবার ক্ষমতাও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আজ ১৯৪৪। জিজ্ঞাসা করছি, ১৯১৪ বা ১৯২৪ সনে এই ধরণের একখানা মেয়ে-লেখকদের গল্প-গুচ্ছ প্রকাশ করা সম্ভব হ'তো কি? কাজেই বলছি আবার, বাড়্‌তির পথে বাঙালী।

লেখক—মেয়ে-কবিদের রচনা কোথাও সংগৃহীত হ'য়েছে কি?

সরকার—বল্‌তে পারি না। তবে রাধারাণী ও নরেন্দ্র দেব কর্তৃক সম্পাদিত "কাব্য-দীপালি" (১৯২৮) বইয়ে পুরুষদের ফাঁকে-ফাঁকে মেয়েরা ঠাঁই পেয়েছে। এই ধরণের সংগ্রহ আমার পছন্দসই। অনেক স্ত্রী-কবির রচনা একত্রে পাওয়া যায়। সেকাল-একাল দু-কালের প্রতিনিধি আছে।

লেখক—দু-একজন একালের স্ত্রী-কবিদের নাম করবেন?

সরকার—লীলাবতী দেবী, উমা দেবী, অপরাজিতা দেবী ইত্যাদি কবিকে একালের লোকই মনে হচ্ছে। কারু নামের সঙ্গে জন্মমৃত্যুর তারিখ দেওয়া নাই। রচনার সন তারিখও ছাপা হয় নি। "কাব্য-দীপালি" বইটা বহরে বড়। বিংশ-শতাব্দীর বঙ্গকাব্য এর ভেতর

সরসভাবে পাকড়াও করা সম্ভব। নেহাৎ নমো-নমঃ ক'রে সার্‌বার চেষ্টা নাই। বেশ পেট ভরে। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" (১৯৪০) মেয়েদের সঙ্গে অসহযোগ চালিয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। দুই বই হ'তেই বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর সজনী দাস ইত্যাদি কবিরা বয়কট হ'য়েছে। কেন জানি না।

বুদ্ধদেব ও প্রেমেন

লেখক—রাবীন্দ্রিক "মহুয়া" (১৯২৯) বা "পুনশ্চ"র (১৯৩২) পরবর্তী বার-চোদ্দ বছরের দু-একটা অ-রৈবিক কবিতা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য ঝাড়ুন না? "রাবীন্দ্রিক বিকাল-বেলার" অরৈবিক কাব্য সম্বন্ধে চাচ্ছি আপনার মতামত।

সরকার—বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা" (১৯৩০) বইয়ের ভেতর এসে মিশেছে দুই রাধা, রাবীন্দ্রিক আর নজরুলি। তবে বুদ্ধদেবের মেজাজ নজরুলি "অগ্নিবীণা"র চেয়ে বেশ-কিছু কম-কড়া আর রৈবিক "কড়ি ও কোমল"এর চেয়ে বেশ-কিছু বেশী-কোমল। বুদ্ধদেবের বন্দনা কিরূপ শোনো ঃ—

"আমি কবি, এ-সঙ্গীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত
উল্লাসে,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন
আনন্দ উচ্ছাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ
গেলো হানি তোমার সকাশে।"

বন্দনার মুদ্দাটা আমিত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব ব্যক্তিত্বের কবি। কিন্তু নজরুলি "বিদ্রোহী" আর "ধূমকেতু"র কাছে এটা বেশ নরম। তা হ'লেও এই বন্দনার কিম্মৎ বাঙালী সমাজে ঢের। এই সুরের দরকার আছে।

লেখক—রৈবিক "কড়ি ও কোমল" উল্লেখ ক'রেছেন কেন?

সরকার—বুদ্ধদেব অতিমাত্রায় বস্তুনিষ্ঠ। শোনো "মোহমুক্ত"র বাণী ঃ—

"ক্ষণিকের উত্তেজনা—সেই জীর্ণ, পুরাতন
চুম্বন-আশ্লেষ
তা-ই, তা-ই দাও মোরে আপনারে করিয়া
নিঃশেষ,
জানি তব আর-কছু নাই,
শরীর সর্বস্ব তব—দাও তবে, দাও মোর তা-ই
বুঝিয়াছি কিছুই থাকে না।"

এতো নিষ্ঠুর দেহ-নিষ্ঠা মানুষের কলিজায় অসহ্য। কেন না সত্যের অন্যতম দিক্ মাত্র এখানে খোলা হ'য়েছে। অন্যান্য দিকের কথা বুদ্ধদেবের মেজাজে উঠে নি,—কম্‌সে-কম এই জায়গায়। এক-চোখো সত্যনিষ্ঠার চরম দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। রাবীন্দ্রিক ভালোবাসায় দেহ-নিষ্ঠা আছে কিন্তু এক-চোখোমি নাই। বছর পঞ্চাশেক আগে বিক্রমপুরের গোবিন্দদাস "আমার

ভালবাসা" কবিতায় বুদ্ধদেবের দেহনিষ্ঠা মূর্তি দিয়েছিলেন। বোধ হয় "মোহমুক্ত" বুদ্ধদেব গোবিন্দদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

লেখক—গোবিন্দদাশের কবিতাটা কোথায় পাওয়া যায়?

সরকার—"কস্তুরী" বইয়ে। কয়েক লাইনে ধুআটা শোনাচ্ছি। গোবিন্দদাসের উক্তি হচ্ছে ঃ—

"আমি তারে ভালবাসি অস্থিরমাংস সহ
অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ!"

লেখক—প্রেমের মিত্র'র রচনাবলীও তো এই বার-চোদ্দ বছরের ভেতরই পড়বে?

সরকার—হাঁ, বুদ্ধদেব আর প্রেমেন এই দুইজনকে মোটের উপর দুই পথের পথিক বল্‌তে পারি। বুদ্ধদেবের দুই ধারা হ'তে প্রেমেনের ধারা বেশ-কিছু পৃথক। প্রেমেন মিত্র'র "প্রথমা" (১৯৩২) বই হচ্ছে কুমার-ছুতার-কামারের স্তুতি-বিষয়ক। বাঙ্‌লা কাব্যে বস্তি আর কাস্তে আর কমরেড্ ইত্যাদির অন্যতম প্রবর্তক প্রেমেন। নজরুলি "সর্বহারা" আর প্রেমেনের "প্রথমা" অনেকটা এক গোত্রের মাল। তবে নজরুল মনুষ্যত্বের আর মানবিকতার কবি। প্রেমেন কবি "কর্মের আর ঘর্মের।"

লেখক—দিন তো প্রেমেনের একটুকু নমুনা?

সরকার—প্রেমেন মিত্র'র কয়েক লাইন নিম্নরূপ ঃ—

"মাটি মাগো ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল।
দুরন্ত নদী সেতু-বন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়।"

সুর, আর ধুআ দুইই নয়া, তাজা, সজীব। যে-কোনো পাঠকই বুঝ্‌তে পার্‌বে। নয়া ছন্দের দিকে নজরও দুজনেরই।

জসীম-উদ্দীন ও বন্দে আলি মিয়া

৯ই এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—সাম্প্রতিক বা আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের সকল রচনাই কি বাণীমূলক?

সরকার—নজরুলি বিদ্রোহ অথবা শান্তিরঞ্জনের কমরেড্-নিষ্ঠা এই দশ-বিশ বৎসরের একমাত্র কাব্য-লক্ষণ নয়। অন্যান্য কাব্যও বেরুচ্ছে। তাতেও বাঙালীর বাড়্‌তি প্রমাণিত হচ্ছে। স্বদেশী যুগের প্রবীণ প্রতিনিধি কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক, মোহিত মজুমদার ইত্যাদি কবির রচনা একালেও বেরোয়। এই কবিরা বিপ্লবপন্থীও নন, সোশ্যালিস্ট্-কমিউনিস্ট্ও নন। অপর দিকে একালের প্রতিনিধি সজনী দাশেরও সে বালাই নাই। অধিকন্তু "নক্‌সী-কাঁথার মাঠ"-লেখক জসীম-উদ্দীনের কাব্য-পথ স্বতন্ত্র। এঁর সৃষ্টিশক্তি আছে। গল্প খাড়া কর্‌বার ক্ষমতা দেখ্‌ছি। বন্দে আলি মিয়ার প্রেরণায়ও স্বাধীনতা আছে। দিলীপ রায়ের মতিগতির

সঙ্গে প্রেমেন-শান্তি-রঞ্জনের মতিগতির মিল নাই। সুতরাং অনেকগুলা ধারা একই সময়ে চল্‌ছে। এই কথা বিশেষ চিন্তাযোগ্য।

লেখক—জসীম-উদ্দীনের একাল সম্বন্ধে কিছু নমুনা দেবেন?

সরকার—"বালুচর" বেরিয়েছে ১৯৩১ সনে। এতে জসীম-উদ্দীন নয়া সুরতে দেখা দিয়েছেন। গ্রাম্য চাষীর হাসিকান্না নিয়ে ব্যক্তি ও ঘটনা সৃষ্টি করা ছিল তাঁর আগেকার রচনাবলীর বিশেষত্ব। সে সব বাঙলী সাহিত্যে টিকে যাবে। "বালুচর"টা ভালোবাসার কবিতা। কাল্পনিক নায়ক ও নায়িকা আমদানি করা হ'য়েছে। অবশ্য পাড়াগেঁয়ে চরিত্র। বোলচাল খুবই সহজ ও সরল। খেয়ালেও জটিলতা নাই। ছন্দের গড়ন যার-পর-নাই সোজা। সবই মোলায়েম।

লেখক—কয়েক লাইন দেখাতে পারেন?

সরকার—"পরাজয়" হ'তে শোনাচ্ছি ঃ—

"কাঁটার পথেও চলিয়া দেখেছি
কাঁটা লাগে নাই পায়,
ফুলের পথেতে চলিতে আজিকে
আঘাত সহন দায়।
পাহাড় ভেঙ্গেছি, কানন কেটেছি
বাজেরে লয়েছি শিরে ;
ফুলের আঘাতে আজিকে সজনী
হারানু পরাণটিরে।"

ভাবধারা, শব্দ আর ছন্দ আগাগোড়া প্রায় এইরূপ। কোনো-কিছুই অতি-করুণও নয়, অতি-হাড়ভাঙা কঠোরও নয়। সবই আটপৌরে সাদাসিধে চিত্তবৃত্তির খেলা।

লেখক—বন্দে আলি মিয়ার সৃষ্টি কিরূপ?

সরকার—এই কবি বিলকুল বস্তুনিষ্ঠ পল্লী-দৃশ্যের স্রষ্টা,—যেন একদম ফটো-শিল্পী। বন্দে আলি মিয়ার "ময়নামতীর চর" বেরিয়েছে ১৯৩৩ সনে।

লেখক—দেখি এঁর আঁকা দৃশ্যের দু-একটা?

সরকার—শোনো একটা ঃ—

"শূকরেরা আসি কচু খুঁড়ে খায়
যবের ক্ষেতের কাছে,
বেজীর পালেরা ইঁদুরের সাথে
বাসা বেঁধে সেথা আছে।"

আর একটা নমুনা নিম্নরূপ ঃ

"ছোট বোন যায় বড়ো বু'র বাড়ী
রসভরা পিঠা নিয়া,
নানি চলে পাছে কুসিরা গুড়ের
ভাঁড় তার আগুলিয়া।
মেয়ের জননী এইগুলো দিতে
কত কথা দেছে বলে,

সব স্নেহ তার ওরি মাঝে যেন
ওই গাঁয়ে যায় চ'লে।"

বন্দে আলি মিয়ার চিন্তা সরস ও আন্তরিক। মধ্যযুগের "মঙ্গল"-কাব্যের ঘরোআ কথা, গৃহস্থালীর কথা যেন এই কবির মগজে আধুনিক গড়ন পেয়েছে। এঁর আড়ম্বরহীন প্রকৃতি-নিষ্ঠায় বাঙালী পাঠকের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। স্বদেশী যুগের যতীন বাগ্চি, কুমুদ মল্লিক, কালিদাস রায়, আর তাঁদের পরবর্তী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি কবিরা অনেকাংশে এই গোত্রের পল্লী-কবি। কুমুদ মল্লিকের "অজয়" (১৯২৮) আর জসীম-উদ্দীনের "রাখালী" (১৯৩১) পাশাপাশি রাখা চ'ল্তে পারে। জসীম-উদ্দীনের "ধানখেত" (১৯৩৩) পূর্ববঙ্গকে বাংলা কাব্যে স্থায়ী রূপ দিয়েছে। মনে পড়্ছে,—কুমুদ মল্লিকের "উজানি" পশ্চিম বঙ্গের ছবি দিয়েছিল স্বদেশী যুগে।

লেখক—একালের কবিরা যে আগেকার কবিদের চেয়ে খাটো নয়, তা লোকেরা বুঝ্বে কী ক'রে?

সরকার—সাধারণতঃ লোকজনের বাতিক হচ্ছে বছর পঁচিশ-ত্রিশেক আগেকার—এমন কি তারও আগেকার—কবিদেরকে নিয়ে মাতামাতি করা। সমসাময়িক কবিদের রচনা দেখে নাক শিঁট্কানো হচ্ছে আরেক বাতিক। দুনিয়া শুদ্ধু নর-নারীর মতি-গতি এইরূপ। এই মতি-গতির দাওয়াই আবিষ্কার করা কঠিন। প্রত্যেক যুগেই সমসাময়িক লেখকদের বিরুদ্ধে নালিশ দেখা যায়। আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাক্বে। এই সব নালিশের ফলে পুরাণাগুলা মহা-কিছু প্রমাণিত হয় না। আধুনিকগুলাও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হয় না। তবে একটা লাভ আছে। জনসাধারণ যে উন্নতি চায় তার প্রমাণ হাতে-হাতে ধরা পড়ে। কেউই বর্তমানের কবি-গাল্পিক-নাট্যকার নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। সকলেই নতুন-কিছু চায়। এই অসন্তোষ বাড়তি-উন্নতি-প্রগতির আসল লক্ষণ?

লেখক—আমাদের দেশ সম্বন্ধে কী বল্ছেন?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগটা (১৯০৫-১৪) তলিয়ে-মজিয়ে বুঝ্তে শেখো। কি সাংস্কৃতিক, কি আর্থিক, কি রাষ্ট্রিক, সকল কর্মক্ষেত্রের আর চিন্তাক্ষেত্রের পীর, মহাপীর, পাঁড়, অবতার ইত্যাদি লোকগুলার ক্যার্দানি, অবদান, আবিষ্কার ইত্যাদি চিজ বিশ্লেষণ কর্তে লেগে যাও। দেখ্বে সেই সবের মাপকাঠিতে ১৯৩৫-৪৪-এর বাঙালীর বাচ্চা প্রত্যেক কোঠেই ঢের বড়ো, ঢের উঁচু,—ঢের-বেশী বাপ্কা বেটা। চালাও ক'ষে বিশ্লেষণ, সমালোচনা আর তুলনায় জরীপ।

সজনী-কাব্য

লেখক—সজনী দাসের স্থান এই বার-চোদ্দ বৎসরের কবিদের ভেতর কিরূপ?

সরকার—সজনী-কাব্যের মুদ্দা প্রধানতঃ হাসি-ঠাট্টা। দেশ ও দুনিয়া সম্বন্ধে সমালোচনা চালানো এই কবির মেজাজে বড় ঠাঁই পেয়েছে। বহুসংখ্যক বাঙালীকে নাম ধ'রে নরম-গরম ঠাট্টা করা এঁর দস্তুর। ব্যঙ্গগুলা উপভোগ করা কঠিন নয়। ছন্দ ও শব্দের বাছাই বেশ সরস। রকমারি ছন্দে হাত খেলে। বাহাদুরির কথা। সত্যেন আর নজরুলের মতই সজনীও ছন্দশিল্পী। ব্যক্তিগত গালাগালি কবিতাগুলার ভেতর বড়-একটা পাওয়া যায় না। বিলাতি ড্রাইডেন-

পোপের নির্দয় তিরস্কার ও কুৎসা-প্রচার সজনী-কাব্যে চোখে পড়েনি। দুএকটা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

লেখক—কোন্-কোন্ বইয়ের কথা বল্‌ছেন?

সরকার—'পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল" বেরিয়েছিল ১৯৩০ সনে। "বঙ্গ-রণ-ভূমে" ও "অঙ্গুষ্ঠ" বোধ হয় তারই কয়েক বছর পরে বেরোয়। সবই কবিতার বই। বাঙালী জাত পরিহাস-শিল্পে গরীব। সজনী-কাব্যে এই দারিদ্র্য কিঞ্চিৎ-কিছু ঘুচ্‌তে পারে। রচনাগুলা মোলায়েম। লিখ্‌বার ক্ষমতা আছে। সৃষ্টিগুলা তারিফ-যোগ্য। একালে বেরিয়েছে "কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল" (১৯৪১)। এই বইয়ের "প্রাইভেট টিউটর" আর "শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী" প'ড়ে দেখো। কবি অবস্থা-সৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়েছে। বইটার হাসি-ঠাট্টাও বেশ উপভোগ্য। একখানা মজার বই "মনোদর্পণ"।

লেখক—"মনোদর্পণ" বইয়ের বিশেষত্ব কী?

সরকার—এটাও হাসিঠাট্টার বই। কোনো-কোনো কবিতার সঙ্গে গদ্যে ব্যাখ্যা বা বৃত্তান্ত আছে। তা ছাড়া দু-একটাকে গীতি-নাট্য বলা হ'য়েছে। একটাতে এই অধমেরও উল্লেখ আছে।

লেখক—প্রমথ বিশীর "পরিহাস-বিজল্পিতম্" নাটকের ভেতর আপনার যেরূপ উল্লেখ আছে সেইরূপ কিছু নাকি? (পৃষ্ঠা ১১২)

সরকার—প্রায় তা-ই। "আধুনিক কাম্‌স্কাট্‌কীয় কবিতা" অধ্যায়ের গৌরচন্দ্রিকা শোনো।

লেখক—দেখি? পড়্‌বো?

সরকার—নিশ্চয়।

লেখক—সজনী দাস লিখেছেন ঃ—

"কামস্কাট্‌কার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক আমার অকৃত্রিম সুহৃদ বিথলো-তেলাচুংভিস্কী মহোদয় সম্প্রতি একটি পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি তথাকার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি ধারাবাহিক পরিচয় প্রকাশ করিতেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও জানাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও দিলীপ কুমার রায়ের কবিতা কামস্কাট্‌কায় সবিশেষ আদৃত হইতেছে। "রায়-সরকার" ক্লাব নামক একটি সাহিত্যিক সঙ্ঘও তথায় গঠিত হইয়াছে; তাঁহারা সরকার ও রায় মহাশয়দ্বয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছেন, এবং ঐ বিষয়ে আমাকেও সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। অচিন্ত্যবাবু ও বুদ্ধদেব বাবুর কবিতা তাঁহাদের ভাল লাগিলেও তাঁহারা বিস্মিত হন নাই; কারণ তাঁহাদের ধরণের কবিতা কামস্কাট্‌কীয় সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।"

সরকার—কেমন মনে হ'লো?

লেখক—মজার জিনিষই বটে। হাসি-ঠাট্টা ছাড়া সজনী দাসের কাব্যে আর কোনো জিনিষ পাওয়া যায় নাকি?

সরকার—"রাজহংসে" বইটা ১৯৩৬ সনে বেরিয়েছে। এর বিষয়-বস্তু ব্যঙ্গ-পরিহাস ইত্যাদি রসের জিনিষ নয়। তবে বাণী ছড়ানোর দিকে সজনী-কাব্যের ঝোঁক নাই। জায়গায়-জায়গায় হাঁ-ধর্মী চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির শক্তি আছে। এই বইয়ের গদ্যছন্দ সতেজ ও গম্ভীর। কবি রবীন্দ্র মৈত্র সম্বন্ধে প্রশস্তি অন্যতম কবিতার মাল। নজরুল, বুদ্ধদেব ইত্যাদি কবির মাল নিয়ে সজনী দাসের সওদাগরি চলে না। তবে কোনো-কোনো ছন্দে আর শব্দে দুএকটা মিল র'য়েছে। এই ঐক্যের অন্যতম কারণ রাবীন্দ্রিক প্রভাব।

লেখক—সজনী দাস সম্বন্ধে আপনার রায় কী?

সরকার—"রাজহংস"'র মতন বই বাঙলার কাব্য-শিল্প বাড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯০৫-১৪ সনের যে-কোনো অ-রৈবিক কাব্য-গ্রন্থের মাপে "রাজহংস"কে বঙ্গীয় বাড়তির চিহ্নৎই বল্‌তে হবে। তা ছাড়া হাসি-ঠাট্টামূলক কবিতার বইগুলাও বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্।

লেখক—হাসি-ঠাট্টার দাম এত বেশী দিচ্ছেন?

সরকার—সজনী দাসের হাসি-ঠাট্টাগুলা কবিতা হিসাবে তো চোস্তো বটেই। এই সবের আর একটা দাম আছে।

লেখক—কী সেই দাম?

সরকার—এই সবের ভেতর সেকালের নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া রবির ওপর ঘা লাগানোও আছে। আবার চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বসু, নজরুল, শরৎ, বুদ্ধদেব ইত্যাদি বহুসংখ্যক একেলে লোকজনের কাজ-কর্মও পরিহাসের বস্তুরূপে দেখা দিয়েছে।

লেখক—এরি জন্যে এত তারিফ?

সরকার—১৯১৯-৩৫ সনের বঙ্গ-সমাজ ও বঙ্গ-সংস্কৃতির অনেক খুঁটি-নাটি সম্বন্ধে এমন সরস ও সজীব সমালোচনা আর কোথাও যাবে না। একমাত্র এই কারণেই বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর পর "অঙ্গুষ্ঠ", "বঙ্গ-রণ-ভূমে", "পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল" আর "মনোদর্পণ" বাঙালী পাঠকের কাছে উপাদেয় খাদ্য দাঁড়িয়ে যাবে। চমৎকার রচনা-কৌশল। কবিতাকে কবিতা, আর হাসিকে হাসি, অথবা সমালোচনাকে সমালোচনা।

সাহিত্য-স্রষ্টার দল বনাম সমাজপতির দল

১১ই এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—যে-সব কবিদের নাম কর্‌লেন, এঁদের মতন আর কতজন আছে?

সরকার—মাত্র দু-চার জনের নাম ক'রেছি। একমাত্র এই কয়জনই রবিহীন বাঙালী জাতের বাড়তির প্রতিমূর্তি নয়। গুন্‌তিতে এই দল বেশ পুরু। আবার বল্‌ছি যে, সাহিত্য-স্রষ্টাদের ভেতর কবি, গাল্পিক, নাট্যকার, সিনেমা-লেখক এই চার শ্রেণীর কৃতী মেয়ে-পুরুষ গুন্‌তে হবে। বর্তমানে তাদের সংখ্যা কম-সে-কম সত্তর-আশী-শ। আমি এতগুলা লেখক নজরে রেখে অরৈবিক বা রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের বাড়্‌তি দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু নয়া দৃষ্টিভঙ্গী আছে অথবা নয়া বোল্ আছে।

লেখক—এই সত্তর-আশী-শ'র বয়স কত?

সরকার—চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের ওপরে খুব কম লেখকের বয়স। অধিকাংশই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের ভেতর। পঁচিশ-ত্রিশের কোঠায় র'য়েছে অনেকে। বছর বিশেকেরও কেহ-কেহ।

লেখক—এত সব নয়া দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা কবি, গাল্পিক, নাট্যকার ও সিনেমা-লেখক থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে বঙ্গ-সাহিত্যের অবনতি, দুর্গতি, সর্বনাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে রব উঠেছে কেন?

সরকার—ন্যাকামি ছাড়া আর কী বল্‌বো? রব উঠিয়েছে কোন্ শ্রেণীর লোক? কোন্ বয়সের লোক? কোন্ পেশার লোক? কোন্ আয়ের লোক?

লেখক—বলুন না? এতগুলা প্রশ্নের জবাব দেওয়া সোজা কি?

সরকার—দেখ্‌তে পাবে যে, দেশের ভেতর যারা গণ্যমান্য, কুলীন, নামজাদা, পয়সাওয়ালা, প্রবীণ, তারা হচ্ছে "বাঙালী গেলো", "বাঙালী গেলো", "রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গ-সাহিত্য মর্‌তে ব'সেছে, কেওড়াতলায় যাচ্ছে" ইত্যাদি সমালোচনার জন্য দায়ী। এই ধরণের সমঝ্‌দারেরা বাঙালী জাতের সর্বনাশ দেখ্‌তে সুপটু।

লেখক—কেন?

সরকার—কতবার ব'ল্‌বো? আগেই তো ব'লেছি বোধ হয়। সমাজে কর্তামি করে বুড়োরা, প্রবীণেরা, পয়সাওয়ালারা, উচ্চপদস্থ লোকেরা। তাদের মতামতগুলা বাজারে ছড়িয়ে পড়ে খুব বেশী, খুব জোরের সহিত, আর খুব সহজে। তারাই সমাজের মাতব্বর, মুরুব্বি, মোড়ল। খবরের কাগজে আর সভা-সমিতিতে নেতৃত্ব করা হচ্ছে তাদের কারবার। এই শ্রেণীর লোককে সমাজপতি বল্‌তে পারি। (পৃঃ ৫৫৮-৫৫৯)

লেখক—প্রবীণ, বুড়ো মাতব্বর ইত্যাদি কাদেরকে বল্‌ছেন?

সরকার—বছর পঁয়তাল্লিশ- পঞ্চাশ পেরিয়ে যারা গেছে তারা হ'লো আমার পারিভাষিকে প্রবীণ-বুড়ো-মাতব্বর। এই দলের ভেতর পড়্‌বে পঁয়ষট্টি-সত্তর পর্যন্ত বয়সের লোক।

লেখক—এঁরা কি দেশের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে উপযুক্ত নন?

সরকার—অনেক সময়েই নন। এই বয়সের লোকেরা কোনো-কিছু নতুন জিনিষ সৃষ্টি কর্‌তে অসমর্থ। একথা আগে ব'লেছি। সৃষ্টি সম্বন্ধে অক্ষমতাই এঁদের একমাত্র অক্ষমতা নয়। নতুন জিনিষের দর-কষার কাজেও এই বয়সের লোক অনেক সময়েই অপটু। মালের দোষগুণ বিচার করা, সমঝদারি করা, সমালোচনা করা এঁদের পক্ষে বহুক্ষেত্রেই অসম্ভব। দুএকজনের পক্ষে অসম্ভব না হ'তেও পারে।

লেখক—কেন অসম্ভব?

সরকার—স্রষ্টাদের বয়স হ'লো বিশ-পঁচিশ-পঁয়তাল্লিশ। অপরদিকে সমালোচকেরা হ'লো পঁয়তাল্লিশ-ষাট-সত্তরের কোঠার লোক। দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে আকাশ-পাতাল ফারাক। ছোকরাদের সঙ্গে প্রবীণদের পংক্তি-ভোজন প্রায়ই ঘ'টে উঠে না। ঘট্‌লেও অনর্থ সৃষ্ট হওয়াই সম্ভব।

লেখক—বয়সের ফারাকটাকে আপনি এত বড় ক'রে দেখ্‌ছেন?

সরকার—হ্যাঁ। এই কথা আগেই ব'লেছি। কাব্য-নাট্য-গল্পের চরিত্র, ঘটনা ও অবস্থা সৃষ্টি করা সম্বন্ধে ব'লেছি। যে, এ সব কাঁচা-তাজা বয়সের কারচুপি। পাকা হাড়ে এসব চিজ ভিটামিনওয়ালা ঝাঁঝালভাবে দেখা দেয় না। দুনিয়ার গতি-প্রগতি-বাড়্‌তি অথবা ক্ষতি-ধ্বংস-অবনতি যাচাই করার কারবারেও বুড়োদের হাড়মাস বড়-বেশী কাজে লাগে না। পেকে যারা ঝুনো হ'য়ে গেছে, তারা ছোকরাদের চ্যাংড়ামি সইতে পারে না। কাজেই চ্যাংড়াদের হাতে দুনিয়া যে বেড়ে যাচ্ছে একথা স্বপ্নেও তারা ভাব্‌তে অসমর্থ।

হাজারি-চারহাজারির দল

লেখক—বুড়োদের পক্ষে এতটা অসমর্থ হবার কারণ কী?

সরকার—ভায়া, প্রবীণেরা একমাত্র বয়সে পাকা নয়। আমি প্রবীণ বল্‌লে বুঝি সঙ্গে-সঙ্গে টাকা-কড়ির বড় লোক। তাছাড়া সামাজিক, আফিসিক বা শাহরিক পদ হিসাবেও

বেশ উঁচু লোক। সমাজের পতি হতে হ'লে রূপচাঁদের মালিক হওয়া চাই। আর পদেও ভারী হওয়া চাই।

লেখক—টাকাকড়ি আর পদ হিসাবে উঁচু-বড় কাদেরকে বল্‌ছেন?

সরকার—আজকালকার বাঙালীর "সামাজিক" মেজাজে শ'-আড়াই-তিনেক টাকার কম যাদের মাসিক আয় তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। মাসিক হাজার বা দেড় হাজার যাদের তঙ্খা, তারা সামাজিক কাজকর্মে নেতা, কর্মকর্তা, সভাপতি হবার উপযুক্ত। হাজার দু-আড়াইয়ের কথা বল্‌ছি না। তার কারণ, এই আয়ের লোক বাঙলা দেশে বেশী নাই। যে-কজন দেখা যায় তারা তো সমাজের হর্তা-কর্তা বিধাতা বটেই।

লেখক—আপনি কোনো নির্দিষ্ট পেশার লোকের কথা বল্‌ছেন কি?

সরকার—না। সরকারী চাক্‌রেদের কথা প্রথমে বল্‌ছি। ভারতে আজও সরকারী চাক্‌রেরাই সমাজের নেতা—সার্বজনিক সভায় যদিও তারা সাধারণতঃ বক্তৃতা করে না। টাকার আর পদের ক্ষমতায় তারা সমাজপতি। হাজারখানেক বা হাজার দেড়েক মাইনেওয়ালা সরকারী লোকেরা সর্বত্রই কর্তৃত্ব ক'রে থাকে। স্বাধীন ব্যবসার লোকের ভেতর উকিল আর ডাক্তারেরা সমাজে কর্তৃত্ব কর্‌বার উপযুক্ত বিবেচিত হয় কখন? যখন তাদের মাসিক রোজগার কম্‌-সে-কম হাজার বা হাজার দেড়েকের কাছাকাছি যায়। চার-হাজারি হাইকোর্টের জজেরা অনেকদিন ধ'রে বাঙালীজাতের সমাজপতি। ব্যারিস্টার মহলে যারা চার-হাজারি নয়, তারা সাধারণতঃ বাঙালীর চিন্তায় সমাজপতি বিবেচিত হয় না। বড়-বড় পরিষদে, কংগ্রেসে, মজ্‌লিশে নেতৃত্ব করা তাদের কপালে লেখা নাই,—বলা চলে। ব্যতিরেক হয়ত এক-আধটা দেখা যায়।

লেখক—যারা স্বাধীনভাবে শিল্পে-বাণিজ্যে লেগে টাকা রোজগার করে, তাদের সম্বন্ধে কী ব'ল্‌ছেন?

সরকার—শিল্পী, বেপারী, ব্যাঙ্কার, বীমাদার, বণিক ইত্যাদি আর্থিক পেশায় হাজারখানেক বা হাজার দেড়েক মাসিক রোজগার এমন বেশী-কিছু নয়। বাঙালী জাত এই পেশার লোককে সমাজপতি বল্‌তে রাজি হ'তে পারে,—যদি তার রোজগার মাসিক হাজর-তিন-চারেকের কাছাকাছি হয়। কল্‌কাতার "সমাজে" হাজারদেড়-দুই-রোজগারওয়ালা বেপারী-ব্যাঙ্কার-বীমাদারেরা ক'ল্‌কে পায় না। তারা নগণ্য।

লেখক—এই সব আয়ের কথা বল্‌ছেন কেন?

সরকার—বুড়ো বা প্রবীণ বল্‌লে একমাত্র বয়সে পাকা বুঝ্‌তে হবে না। পঁয়তাল্লিশ-ষাট্‌-সত্তর বয়সের লোক মাত্রই সমাজপতি হয় না। এই বয়সের সঙ্গে মাসিক হাজার-চার-হাজারের যোগ থাকা চাই। বছর পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়স আর হাজার দেড়-আড়াই-চার মাসিক রোজগার। তাহ'লে হয় সোনায় সোহাগা। এই ধরণের লোককে বাঙালী জাত্‌ বল্‌বে নেতা, কর্মকর্তা, সমাজ-পতি, মাতব্বর, একটা হাতী-ঘোড়া কিছু। এই দরের লোকের মত অনুসারেই দেশের বাড়্‌তি-ঘাট্‌তি আলোচিত হ'য়ে থাকে।

লেখক—তাতে অসুবিধা কী হয়?

সরকার—একে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সের লোক পরীক্ষক আর সমালোচক দাঁড়ায় বিশ-পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ছোকরা-জোআনের কাজকর্ম সম্বন্ধে। তার ওপর হাজারি-আড়াই-হাজারি-চার হাজারি লোক পরীক্ষা আর সমালোচনা কর্‌তে বসে মাত্র ত্রিশ-পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-দেড়শ' টাকাওয়ালার কাজকর্মকে। কাজেই অবিচার অবশ্যম্ভাবী প্রায় পৌনে ষোল

আনা ক্ষেত্রে। "শ-আড়াই তিনেকের বা শ' পাঁচেকের নীচে যাদের আয় তাদের আবার কাজ? তাদের আবার মগজ? তাদের আবার ভাবধারা? তাদের আবার কাব্য? তাদের আবার গল্প? তাদের আবার নাট্য?"—এই হচ্ছে হাজারি, দেড়-হাজারি, চার-হাজারিদের অতি-স্বাভাবিক মনোভাব। ঠিক যেন "পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী?"

টাকার গরম ও সাহিত্য-সমালোচনা

লেখক—কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের রোজগার সাধারণতঃ কত?

সরকার—প্রায়ই পঁচাত্তর-শ'য়ের কোঠার ওপরে নয়। এই আয়ের সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাস কর্‌বার মতন লোক হাজারি-দেড়হাজারি বাঙালী মহলে বোধহয় দেখা যায় না। অধিকন্তু সংবাদপত্রসেবীর দল আর ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টারগুলাকে মানুষ বিবেচনা করে এমন কোনো হাজারি-আড়াইহাজারি-চারহাজারি ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, বেপারী আছে কি না বলা কঠিন। কবি-গাল্পিক-মাষ্টার-সাংবাদিক ইত্যাদি লোক হাজারি-চার হাজারিদের মেজাজে রাঁধুনি-বামুন, চাকর, চাপরাশি ইত্যাদি দরের নরনারী ছাড়া আর কিছু নয়। এর নাম টাকার গরম। খুবই কড়া ও নির্দয় কথা। আমাদের টাকা নাই ব'লে বুঝি না টাকার গরম কী চিজ্। বুঝ্‌লে?

লেখক—হাজারি-চার-হাজারির সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ যাট্-সত্তর বছরের কোনো যোগাযোগ আপনি দেখ্‌তে পান কি?

সরকার—হাঁ। উচ্চপদের সরকারী চাক্‌রেরা সাধারণতঃ পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে হাজারি-দেড়হাজারি-দুহাজারির কোঠায় ওঠে। আর উকিল-ডাক্তারেরাও নিজ-নিজ ব্যবসায় হাজার-দেড়-হাজার পর্যন্ত উঠ্‌তে-উঠ্‌তে পঞ্চাশ-পঁয়তাল্লিশের দলস্থ হয়। রোজগার আর বয়স দুই তরফ থেকেই বাঙালীর বাচ্চা পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের কোঠায় বুড়ো মেরে যায়। অর্থাৎ একদম ভাবুকতাহীন, কেঠো, নীরস তেতো-মেজাজী, পরশ্রীকাতর, হিংসুটে লোক গ'ড়ে ওঠে এই বয়সে। তাদের কাছে ছোকরা-জোআনদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সুপারিশ পাওয়া কল্পনার অতীত কাণ্ড। টাকার গরম যখন খুব-বেশী সেই সময়ে তাদের মগজ হচ্ছে চরম-ভোঁতা। দু-এক ক্ষেত্রে হয়ত এ নিয়ম না খাট্‌তেও পারে।

লেখক—তা হ'লে রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের অবস্থা সম্বন্ধে খাঁটি বিচার কি সম্ভব নয়?

সরকার—না। পয়সাওয়ালারা আর প্রবীণেরা বল্‌বে যে, বাঙলা দেশ এগুচ্ছে না, পেছিয়ে যাচ্ছে। তাদের পেছন-পেছন ছোটা যে-সকল পত্রিকার আর পরিষদের কারবার তারাও বল্‌বে তাই। টাকার গরম আর পদের প্রভাব এই মতের জন্য দায়ী। এই মতই বাজার ছেয়ে ফেল্‌তে বাধ্য। (পৃঃ ৫৬০-৫৬৩)

লেখক—খুব দুঃখের কথা নয় কি?

সরকার—সকল দেশেই সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে এই ধরণের অবিচার ঘ'টে থাকে। যাঁহা বিলাত, তাঁহা ফ্রান্স, তাঁহা জার্মানি, তাঁহা ভারত। পয়সাওয়ালাদের আর বুড়োদের কষ্টিপাথর এড়িয়ে অর্থাৎ টাকার গরমকে কলা দেখিয়ে,—দেশের লোকেরা সাধারণতঃ সমসাময়িক ছোকরা-জোআনদের সৃষ্টিগুলা যাচাই কর্‌তে অসমর্থ হয়। বাঙালীর বাচ্চা এই সম্বন্ধে অতি-পাপী নয়। দুনিয়ার দস্তুর যা তাই বাৎলিয়ে যাচ্ছি। সু-কুর বিচার চালাচ্ছি না।

নীতিবাগীশেরা বিচারে বসুন।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, পয়সাওয়ালারা আর প্রবীণেরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথার্থ গুণগ্রাহী?

সরকার—রাধামাধব। অনেক সময়েই এই সকল লোক রবির নাম করে গুরুগম্ভীর একটা-কিছুর নাম করা চাই এই ভেবে। রবির ঘাড়ে চ'ড়ে এঁরা নিজকে বড় কর্‌তে বা লোকসমাজে বড় দেখাতে চান। রবির নাম এঁদের পক্ষে আত্ম-প্রচারের মোলায়েম চাপরাশ বিশেষ। এই মহলের রবীন্দ্র-প্রীতি লোক-দেখানো চিজ্‌। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনেক বুখ্‌নি-বাণী-বয়েতের সঙ্গেই পয়সাওয়ালাদের আর প্রবীণদের সম্বন্ধ আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধের সমান। রাবীন্দ্রিক কাব্য-নাট্য-গল্প-হাস্য-প্রবন্ধ বরদাস্ত কর্‌তে পারে এমন লোক এই শ্রেণীর বাঙালীর ভেতর খুব কম আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মোটা-মোটা বাণীগুলা এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে যমস্বরূপ। এই বাণীর বিরুদ্ধে জীবন চালিয়েই এই সব লোক বুড়িয়ে এসেছে আর টাকা রোজগার কর্‌ছে.

ক'-থান রেশমী কাপড় আর ক'-ভরী সোনার গয়না?

১৪ই এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—টাকার গরম থাক্‌লে নতুন-নতুন কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির লেখকদেরকে সম্বর্দ্ধনা করা সম্ভব হয় না কেন? দেশের বাড়্‌তি বুঝ্‌তে গোল বাঁধে কেন?

সরকার—জবাব অতি সোজা। যে-পেশায় পয়সা রোজগার হয় না, অথবা কোনো রকমে কষ্টে-সৃষ্টে গেরস্থালী চালানো যায়, সেই পেশাকে পয়সাওয়ালা লোকেরা সম্মান-যোগ্য সম্‌ঝিতে পারে না। কাজেই সেই পেশার লোকজন হাজারি-চারহাজারিদের নজরে নেহাৎ তুচ্ছ। মামুলি চাকর-চাপরাশি-চোপদারকে এঁরা যে-চোখে দেখেন কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদেরকে এঁরা সেই চোখে দেখ্‌তে অভ্যস্ত। তার চেয়ে বেশী-কিছু ভাবতে পারেন না। পয়সা-রোজগারই পয়সাওয়ালাদের বিচারে উন্নতি-প্রগতি-বাড়তির সেরা বা একমাত্র কষ্টিপাথর। পয়সাওয়ালাদের ভেতর পুরুষেরা তবুও ক্বচিৎ-কখনো গরীব সাহিত্য-স্রষ্টাদের একটু-আধটু তারিফ কর্‌তে সমর্থ হয়। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা প্রায় একদম ষোল আনা অসমর্থ। সার্বজনিক কথা ব'ল্‌ছি। এক-আধটা অন্য ধরণের স্ত্রী-পুরুষ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দিন না?

সরকার—মনে করো রামা এক ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের বাড়ীতে দ্বারোআনি করে। তঙ্খা পায় মাসিক আঠার-বাইশ টাকা। কিন্তু ঠুংরি গেয়ে মাত্‌ ক'রে দিচ্ছে রোজ সন্ধ্যায় পাড়ার লোককে। লোকেরা দলে-দলে তাকে ওস্তাদ্‌জি ব'লে কুর্ণিশ করে। কিন্তু তার মনিবের মেজাজে সে আঠার-বাইশ রূপেয়ার দ্বারোআন ছাড়া আর কিছু নয়। এই হ'লো রামার সাংসারিক ও সামাজিক ইজ্জদের দৌড়। অন্দরের মা-ঠাক্‌রুণরাই কি রামাকে ঠুংরি-বীর ব'লে সম্বর্দ্ধনা ক'র্‌বেন? অসম্ভব। ডজন-ডজন দৃষ্টান্ত পাবে যেখানে-সেখানে। দ্বারোআনি করা যার পেশা তার ইজ্জদ পয়সাওয়ালী মেয়ে-মহলে শূন্য। দু-একটা অন্য ঢঙের দৃষ্টান্ত পাওয়া হয়ত অসম্ভব নয়।

লেখক—পয়সাওয়ালা লোকের স্ত্রীদের সম্বন্ধে এই ধরণের মত যুক্তিসঙ্গত কি?

সরকার—হাজারি-চারহাজারি বা ঐ-শ্রেণীর পুরুষের স্ত্রীরা কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের স্ত্রীকে ঝী-চাকরাণী-মেথরাণীর দরের লোক ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তে পারে না। কারণ অতি-স্পষ্ট। মেয়েদের চোখে আসল চিজ হচ্ছে গায়ের আর পেঁট্‌রার ভেতরকার সোনার তাল বা গয়না। ইয়োরামেরিকান মেয়েদের বেলা এই ধরণেরই বা এরি জুড়িদার অবস্থা বুঝ্‌তে হবে। শ্বেতাঙ্গিনীরাও বাঙালীর মেয়েদেরই মাস্‌তুতো বোন্। থান-থান রেশমী কাপড় আর ভরী-ভরী সোনার গয়না,—এর নাম মেয়ে জাত। এই সবের চাপ দেখে যাচাই হয় কোন্ মেয়েটা কী দরের, অর্থাৎ কোন্ মেয়ের স্বামী কতটা তারিফযোগ্য। ক'-থান রেশমী কাপড় আর ক'-ভরী সোনার গয়না?—এই হচ্ছে মেয়ে-মহলের প্রথম, প্রধান বা একমাত্র প্রশ্ন। আবার সার্বজনিক কথা বল্‌ছি। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যাতিরেক হয়ত সম্ভব।

লেখক—মেয়েরা আর কোনো জিনিষের ধার ধারে না?

সরকার—তার ওপর তাদের বিচার্য—কোন্ বাড়ীতে বসবাস করা হয়? বাড়ীটা কোন্ পাড়ায় অবস্থিত? ঘরের আসবাবপত্র কিরূপ? অধিকন্তু চরণ-বাবুর জুড়িতে চলাফেরা করা দস্তুর? না ট্যাক্‌সিতে? না থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ীতে? না রিক্‌শাতে? যদি নিজের মোটরকার থাকে সেটা ক'-বছরের পুরোনো? হাল-ফ্যাশনের চড়াদামী গাড়ী কিনা? এই সব দেখে মেয়েরা মেয়েদের দর ঠিক করে। আসল কথা,—পুরুষদের নজরও এই সকল দিকেই থাকে। কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের পৌনে ষোল আনাই এই সব পরীক্ষায় ফেল। দুনিয়ার সাংসারিক মাপে যারা ফেল, তাদের চিন্তায় ও কাজকর্মে দেশ এগুচ্ছে,—এরূপ কল্পনা করা সাংসারিক হিসাবে সার্থক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। যদি কোনো পয়সাওয়ালা স্ত্রী-পুরুষের মেজাজে এরূপ কল্পনা করা সম্ভব হয় তাহ'লে তারা অ-সাধারণ লোক সন্দেহ নাই।

লেখক—আপনি তো হাজার বার "ম্যাস্কুলিনিজেশন অব উয়োম্যান"—মেয়েদের পুরুষ-সাম্য প্রচার ক'রেছেন। এই পুরুষ-সাম্য আপনি পছন্দ করেন আর ভারতে আমদানি কর্‌তে চান। তাহ'লে পয়সাওয়ালা মেয়েরা কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের কৃতিত্ব বুঝ্‌তে অসমর্থ বল্‌ছেন কেন?

সরকার—কেন, ঠিকই তো ব'লেছি? যাঁহা পুরুষ, তাঁহা মেয়ে। মেয়েদের পুরুষ-সাম্য আরও জোর্‌সে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে চরিত্র হিসাবে উন্নত শ্রেণীর জীব নয়। টাকার গরমে পুরুষেরা যতটা আর যত-রকমে কাণ্ড-জ্ঞানহীন হ'তে পারে, মেয়েরও টাকার গরমে ঠিক-ততটা আর তত-রকমে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়। পুরুষের মতন মেয়েরাও গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদেরকে উন্নতি-প্রগতি-বাড়্‌তির স্রষ্টা হিসাবে দেখ্‌তে অসমর্থ। এতে মেয়েদেরকে খাটো করিনি। ব'লেছি,—মেয়ে আর পুরুষ টাকার গরমে এ-পিঠ আর ও-পিঠ মাত্র। "আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্মম আমি আজি।"

পয়সাওয়ালা স্ত্রী-পুরুষের সমাজ-সেবা

লেখক—টাকার গরম সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির পুরুষ-সাম্য বিষয়ক একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—এর আবার নজির আবশ্যক হয় না কি? পয়সার ইজ্জদ দুনিয়ার সর্বত্র। পয়সাওয়ালা পুরুষেরা কোনো লোকের খাঁটি স্বদেশ-সেবা দেখ্‌লে ভয় পায়। তাদের স্ত্রীরাও

স্বার্থ-ত্যাগী স্বদেশ-সেবকের নাম শুন্‌বামাত্র আঁৎকে উঠে। আবার স্ত্রী-জাতির পুরুষ-সাম্য।

লেখক—পয়সাওয়ালারা কি দেশ-সেবার কাজ করে না?

সরকার—সমাজ-সেবা, নারীমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেবাসদন, হাসপাতাল, অনাথ-আশ্রম, সঙ্কটত্রাণ ইত্যাদি লোকহিতবিষয়ক কারবারে একালের কোনো-কোনো পয়সাওয়ালা পুরুষ মোতায়েন হ'য়েছে। তাদের স্ত্রী বোন্‌-মেয়েরা কি এই সেবা-কার্যে পেছপাও? না। এই ক্ষেত্রেও মেয়েদের পুরুষ-সাম্য বেশ পরিস্ফুট।

লেখক—এ সব তো ভাল কথা। এই দিকে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য বাঞ্ছনীয় নয় কি?

সরকার—নিশ্চয়। পুরুষ-সাম্যের আরও দৃষ্টান্ত আছে। হাজারি-চার-হাজারি স্ত্রী-পুরুষেরা কী ধরণের সমাজ-সেবায় বা লোকহিতের কাজে মোতায়েন হয়? যে-সকল সমাজ-সেবার কাজে সরকারী যোগাযোগ থাকে একমাত্র বা প্রধানতঃ সেই সকল কাজে হাজারি-চার-হাজারিদের দরদ দেখা যায়।

লেখক—কেন?

সরকার—সেই সকল কাজে সরকারী বড়-বড় চাক্‌রেদের সঙ্গে হস্তমর্দন সম্ভব। শাদা-চামড়াওয়ালা নরনারীদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মুচ্‌কে হেসে চলাফেরার সুযোগ ঘটে। তা ছাড়া কালে-ভদ্রে লাট সাহেব বা লাটপত্নী বা ঐ-দরের কোনো-কোনো শাদা পুরুষ-স্ত্রী তার ছায়া মাড়াবে এরূপ হয়ত কোষ্ঠীতে লেখা থাকে। পয়সাওয়ালা স্ত্রী-পুরুষেরা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর সমাজ-সেবায়ই সিদ্ধহস্ত। অন্যত্র এদের আগ্রহ বড়-একটা মালুম হয় না। এই হ'চ্ছে আটপৌরে কথা। কচিৎ-কখনো পয়সাওয়ালাদের ভেতর অন্য মেজাজের সমাজ-সেবক হয়তো দেখা যায়।

লেখক—মেয়েদের সম্বন্ধে কী বল্‌ছেন?

সরকার—আগেই ব'লেছি মেয়েদের পুরুষ-সাম্য এই হিসাবেও যারপর নাই গুলজার। হাজারি-চার-হাজারিদের স্ত্রীরা-মেয়েরা-বোনেরা-শালীরা এই ধরণের সমাজসেবা ছাড়া অন্য কোনো সমাজসেবার ব্যবস্থাকে অস্পৃশ্য বিবেচনা ক'রে চলেন। কালে-ভদ্রে কখনো এঁরা হয়ত মামুলি গরীবদের প্রবর্তিত লোকহিত-কেন্দ্রে পা ফেল্‌তে আসেন। কিন্তু সেটা হচ্ছে গরীবদেরকে "রাজা ক'রে দিয়ে যাওয়া"র মেজাজ। টাকার গরমে মেয়ে আর পুরুষ সমান। চরিত্রবত্তায় অথবা চরিত্রহীনতায় মেয়েদেরকে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচনা করা আহাম্মুকি। পরীক্ষার ফলে মেয়ে দাঁড়িয়ে যাবে পুরুষেরই সমান।

পয়সাওয়ালার স্ত্রী

লেখক—আপনি একবার ব'লেছেন যে, হাজারি-চার-হাজারি পুরুষেরা হয়ত বা গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদেরকে তারিফযোগ্য ভাব্‌তে পারে, কিন্তু মেয়েরা একদম পারে না। তার মানে কী?

সরকার—হাজারি-চার হাজারি পুরুষেরা অনেক সময়ে গরীবদের ছেলে। বাপের পয়সা ছিল না। লেখাপড়ার জোরে উকিল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ হয়েছে। এরূপ দৃষ্টান্ত যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেখা যায়। কাজেই হাজারি-চার-হাজারি হবার পরও দু'একজন হয়ত তাদের বাপ-দাদার দারিদ্র্য, নিজ ছেলেবেলার দারিদ্র্য কিছু-

কিছু মনে রাখে। নিজ হাত-পার জোরে, নিজে মাথার জোরে সে বড় হ'য়েছে,—টাকার মুখ দেখেছে, পদে উঠেছে, উপাধি-পদবী-খেতাব পেয়েছে। কাজেই পুরুষেরা সকল সময়েই হয়ত দারিদ্র্যকে নিন্দনীয় বিবেচনা করে না। তাদের পক্ষে গরীবরাও যে দেশের সত্যিকার বড়লোক এরূপ কল্পনা করা মাঝে-মাঝে অসম্ভব না হ'তেও পারে। (পৃঃ ৫৯২)

লেখক—হাজারি-চারহাজারিদের স্ত্রীরা কিরূপ?

সরকার—তাদের স্ত্রীরা কিসের জোরে হাজারি-চার-হাজারির স্ত্রী হ'য়েছে? একমাত্র বরাতের জোরে। এজন্য মেয়েদের চরিত্র সাধারণতঃ এবং বহুক্ষেত্রেই গ'ড়ে উঠে না। তারা গজ দিয়ে মাপে রেশমের থান আর নিক্তির ওজনে দেখে সোনার ভরী। অনেকবার ব'লেছি,—এই সব হচ্ছে সার্বজনিক কথা। কালে-ভদ্রে ক্বচিৎ-কখনো উল্টাও দেখা সম্ভব। হাজারি-চারহাজারি মেয়েদের ভেতর হয়তো এক-আধটা মনুষ্যত্বওয়ালা মেয়ে উৎরে গেলেও যেতে পারে। তা হচ্ছে ব্যতিরেক।

লেখক—আপনি টাকার গরমের এই সব লক্ষণকে নিন্দনীয় বিবেচনা করেন না কি?

সরকার—নিন্দনীয় কিনা বলা কঠিন। দুনিয়ার কোনো-কিছুই বোধ হয় আমি নিন্দা করি না। টাকার গরম হচ্ছে টাকার স্বধর্ম। টাকা যার নাই সে এই স্বধর্ম বুঝ্‌বে না। পয়সাওয়ালা পুরুষেরা পয়সার স্বধর্ম বুঝে। তাদের স্ত্রীরাও পয়সার স্বধর্ম ছাড়া আর কিছু বুঝে না। স্বদেশ-সেবা, সমাজ-সেবা, দেশের উন্নতি, সাহিত্যের প্রগতি, ইত্যাদি চিজ টাকার স্বধর্মে বুঝে উঠা অসম্ভব। কি ভারতে, কি ইয়োরামেরিকায়, দুনিয়ার সর্বত্র এই দৃশ্য। এতে আমার মেজাজ বিচলিত হয় না। কোনো পয়সাওয়ালা স্ত্রীপুরুষকে আমি নিন্দনীয় বিবেচনা করি না। ঘটনাচক্রে অনেক পয়সাওয়ালা-পয়সাওয়ালীর সঙ্গে এই গরীব-অধমের সত্যিকার সদ্ভাব আছে। আমার বক্তব্য অতি সহজ-সরল। টাকা-পয়সা থাক্‌লে মানুষের চরিত্র একটা বিশিষ্ট ঢঙ পায়। কোনো নির্দিষ্ট গড়নে এই ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে? তা ব'লে বেচারা পয়সাওয়ালাকে আমি নিন্দা কর্‌বো কেন?

লেখক—আপনার এই মত লোকের পছন্দসই কি?

সরকার—আমার মতন আহাম্মুকের মতামতে কিছু যায়-আসে না। দেশের লোক টাকার গরমকে নিন্দনীয় বিবেচনা কর্‌বেই কর্‌বে। আমি গরীব ব'লে একমাত্র গরীবকেই প্রশংসা করি না। গরীবেরাও কখনো-কখনো বেশ-কিছু নিন্দাযোগ্য। আবার কোনো-কোনো পয়সাওয়ালাও প্রশংসাযোগ্য। এই আমার পাঁতি।

লেখক—এই সকল বিষয়ে আপনি কোনো বইয়ে বিস্তৃতভাবে কিছু লিখেছেন?

সরকার—"ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ্ সোশ্যাল্ প্যাটার্নস" (১৯৪১) বইটা দেখ্‌তে পারো। তার ভেতর "ক্লাস-কনশাস্‌নেস্" (শ্রেণী-চেতনা), "বুর্জোআ" ইতাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ আছে।

("মেজাজে-মেজাজে লড়াই"; "শরৎ-সাহিত্যে ব্যবসাদারি" মে ১৯৪৪)

লেখক—এই বইয়ের তথ্যগুলা আপনার কোনো বাংলা বইয়ে পাওয়া যায় না?

সরকার—এখনো বাংলায় লিখ্‌বার সময় জুটেনি।

এপ্রিল ১৯৪৪

"যুদ্ধ যখন থাম্‌বে"র ভূমিকা*

১৭ই এপ্রিল ১৯৪৪

বিশ-বাইশ বছরের যুবক বাঙলার মুড়োর ভিতর কিরূপ ঘী কিল্‌বিল্ করে? এই প্রশ্নের কিছু-কিছু জবাব পাওয়া যাইবে বর্তমান প্রবন্ধ-সংগ্রহের বইয়ে।

এই মগজ-সঙ্ঘে দেখিতে পাওয়া যায় বিলাতী মেজাজের "ব্যাঙ্কর"-মুদ্রা, ফরাসী "দাদা"-সাহিত্যের ধ্বংস-নিষ্ঠা আর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা। আর্থিক দুনিয়ার বিলাতী-মার্কিণ বিরোধ সম্বন্ধে যুবক বাঙলা বেশ-কিছু সজাগ। প্রোলেটারিয়ান বনাম বুর্জোআ সাহিত্যের কোঁদলে ইতর-কুলীন বিশ্লেষণ করিতে এই মুড়োর আগ্রহ প্রচুর। তাহা ছাড়া বিজ্ঞানের আর ধর্মের লড়াইটা খতাইয়া দেখিবার খেয়ালও এই চিন্তাধারার অন্যতম লক্ষণ।

এই বৈঠকে মার্ক্‌স্‌কে ঠাঁই দেওয়া তো হইয়াছেই। লেনিন, ট্রট্‌স্‌কি আর স্তালিনকেও ডাকিয়া আনা হইয়াছে। ফ্রয়েড বাদ পড়িবার নয়। জার্মাণ স্পেংলার আছে, ফরাসী রলাঁ আছে, বিলাতী জীন্‌স্ আছে আর তর্-তাজা রুশ গাল্পিক এরেনবুর্গ আছে। অধিকন্তু দুনিয়ার আর্থিক মেরামতের কাজে বাহাল করা হইয়াছে জাপানী, জার্মাণ, রুশ, মার্কিণ, ইংরেজ সকল প্রকার ঘরামী-মিস্ত্রীকে। একালের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব-কিছুই ধরা দিয়াছে এই মগজ-সঙেঘর চৌবাচ্চায়।

আজ ১৯৪৪ সন। গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের পর আটত্রিশ-উনচল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেছি,—১৯০৫ সনের বিশ-বাইশ বছরের বাঙালী ছোক্‌রাদের মগজ এতটা তাজা ছিল কি? এতটা সজাগ ছিল কি? এতটা বর্তমান-নিষ্ঠ ছিল কি? দুনিয়া সম্বন্ধে এতটা ওয়াকিব্‌হাল ছিল কি? বর্তমান বইয়ের পাঠকদের ভিতর হয়ত কেহ-কেহ পঞ্চান্ন-ষাট পার হইয়াছেন। তাঁহারা বুকে হাত দিয়া আপন-আপন মনে এই সওয়ালগুলার জবাব দিতে থাকুন। দেখিবেন যে, বাঙালীর বাচ্চা স্বদেশী যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত বাড়তির পর বাড়্‌তি চাখিতে-চাখিতে অগ্রসর হইতেছে। সেকালটা একাল হইতে বড়, উন্নত বা মহত্তর ছিল না। মনে পড়িতেছে নাকি যে, সেকালের যুবক বাঙলার দৌড় ছিল প্যাল্‌গ্রেভ-সম্পাদিত 'গোল্ড্‌ন ট্রেজারি" বইয়ের ওয়ার্ড্‌সোআর্থ, মার্শ্যালের "ইকনমিক্‌স্ অব ইণ্ডাস্ট্রি" আর মিলের "লজিক" পর্যন্ত? সেকলের ছোক্‌রারা একালের ছোক্‌রাদের সঙ্গে টক্করে হারিয়া যাইতে বাধ্য। কোনো-কোনো অতি-পণ্ডিত বাঙালী জাতের ক্রমিক অবনতি ও ধ্বংস দেখিতেছেন! তাঁহারা বিচিত্র চোখের অধিকারী। দৃষ্টিভঙ্গী রকমারি।

দুনিয়ার হালচাল সুবিমল মুখোপাধ্যায় সত্য চট্টোপাধ্যায় আর অমলেন্দু দাশগুপ্ত'র মগজে ও হৃদয়ে জোর্‌সে ধাক্কা লাগাইতেছে। অপর দিকে স্বদেশের বর্তমান আর ভবিষ্যৎও এই তিন ব্যক্তিত্বের ভিতর যারপরনাই প্রভাবশীল। দেশ ও দুনিয়া এক সঙ্গে যুবক বাঙলার এই তিন প্রতিনিধিকে তাতাইতে পারিয়াছে। পরের কথা কপ্‌চানো এই ছোক্‌রাদের ব্যবসা নয়। ইহাদের হাত-পা বেশ মজবুদ। হজম-শক্তিতেও ইহারা পালোআন। ফলতঃ বিশ্বশক্তির

* সুবিমল মুখোপাধ্যায়, সত্য চট্টোপাধ্যায় ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক লিখিত বইয়ের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিনয় সরকার। সেই ভূমিকা এইখানে উদ্ধৃত হইল।

সঙ্গে বুঝা-পড়া করা ইহাদের পক্ষে কঠিন নয়। দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সুযোগ-সুবিধাগুলাকে নিজ দেশের কাজে লাগাইবার ক্ষমতা দেখিতেছি তিনজনেরই। বিদেশী বুখ্‌নি-সমূহের পাল্লায় পড়িবার পাত্র এই ত্রিমূর্তির এক মূর্তি নয়।

লম্বা-লম্বা বোল্‌চালওয়ালা বিশ্ব-পাঁতির আবহাওয়ায় সুবিমল হাবু ডুবু খাইতেছে না। বরং ঘাড় খাড়া করিয়া সোজাসুজি হিসাব লইতেছে ভারতীয় স্বার্থসিদ্ধির। অধিকন্তু ভারতীয় কিষাণ-মজুরের জন্য দরদও তার আছে। সত্য'র অন্যতম বক্তব্য নিম্নরূপ—"আধুনিক বাঙালী কবিরা প্রধানতঃ এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডারের ভক্ত। কিন্তু কথা হোলো এই যে, ইংলণ্ডের এই সব কবিরা আজ ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের শেষ অধ্যায়ে বাস ক'র্‌ছেন। কিন্তু আমরা এখনো সামন্ততন্ত্রের গণ্ডী পার হইনি। যন্ত্রশিল্পের প্রসারণশীল যুগ এখনো আমাদের দেশে শেষ হয়নি।" সঙ্গে-সঙ্গে অমলেন্দুর দর্শন বলিতেছে ঃ—"চিন্তার স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে কোনো প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব নয়। বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে যে প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হ'য়েছিল তার বিকাশের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সাম্প্রতিক গোঁড়ামি।"

"যুদ্ধ যখন থাম্‌বে"র মজলিশে সর্বত্র পাইতেছি স্বাধীন চিন্তার ছোঁআচ। ইহার নাম সাংস্কৃতিক স্বরাজ। বাঙালী জাত্‌ স্বরাজ-সাধনায় বাস্তবিকই বেশ-কিছু অগ্রসর হইয়াছে। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তনের কাজে এই ত্রিবীরের ডাক পড়িবে অনেকবার। ইতিমধ্যে ছোক্‌রাদের বিদ্যাও বাড়িয়া যাইবে,—অভিজ্ঞতাও বাড়িতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

লোকে বলে,—আজকের ছোক্‌রারা হবে কাল্‌কের নেতা। কথাটা ঠিক নয়। খাঁটি সত্য ঠিক উল্টা। আজকের ছোক্‌রারা আজকেরই নেতা। আজকের বুড়োরা আজকের নেতা নয়। তারা কোনো অতীতে,—ছোক্‌রা বয়সে,—হয়ত নেতা ছিল।

যে-তিনজন বিশ-বাইশ বছরের ছোক্‌রার রচনা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল তাহাদের মতনই আরও অনেক ছোক্‌রা আজকের বাঙলা দেশে কর্তৃত্ব করিতেছে। এই ছোক্‌রারাই বাঙালীর দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মাতব্বর বয়স-প্রবীণেরা মনে করিতেছেন যে, তাঁহারাই দেশ-নায়ক। এই ভুল তাঁহাদের মগজ হইতে খেদাইয়া দিলেই তাঁহারা সুস্থ মনে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন। "যুদ্ধ যখন থামবে"র ভিতরকার চিন্তার মতন চিন্তাগুলাই ১৯৪০-৪৪ সনের খাঁটি ও যথার্থ বঙ্গ-সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির অন্যান্য ধারাও ছোক্‌রা মহলেই পাক্‌ড়াও করিতে হইবে।

একালের ছোক্‌রাদের হৃদয় ও মুড়ো লইয়া আমি আর একবার ১৯০৫ সন সুরু করিতে পারিলে সুখী হই। কিন্তু অসম্ভব তাহা ভবে। কাজেই ১৯৪৪ সনের যৌবন-শক্তিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ধন্য হইতেছি।

এপ্রিল ১৯৪৪

"সমাজ-নেত্রী"দের মেজাজ

১৮ই এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—আপনি কি মনে করেন যে, আজকাল ইস্কুল-কলেজে যে-সব মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌ছে তারা সবাই চড়া আর দেমাকী মেজাজ নিয়ে সংসার চলাফেরা ক'র্‌ছে?

সরকার—পাগল হ'য়েছো? হাজারি-চার-হাজারির স্ত্রী-মেয়ে-বোন কি কালো-জামের মতন ঝুড়ি-ঝুড়ি পাওয়া যায়? কল্‌কাতায় ও মফঃস্বলে গুন্‌তিতে এরা গোটা-শয়েকের বেশী তো নয়ই। একশ'ও হবে কিনা সন্দেহ। সত্যি-কথা—বিলাত, আমেরিকা, জার্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনী দেশেও হাজারি-চার-হাজারি লোকের সংখ্যা অন্যান্য লোকের অনুপাতে নেহাৎ নগণ্য। কাজেই সামাজিক জীবনে কর্তৃত্বশীল মেয়েদের দল সকল দেশেই যারপর-নাই ছোটো-খাটো। "সমাজ-নেত্রী" (বা "সোসাইটি-উওম্যান") এই সকল দেশে কয়েক হাজারের বেশী হবে না।

লেখক—সমাজ-নেত্রীরা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ভিন্ন-চরিত্রের নয় কি?

সরকার—চরিত্র-হিসাবে পাশ্চাত্য দেশের সমাজ-নেত্রীরা আমাদের বাঙালী বা ভারতীয় সমাজ-নেত্রীদের বড়্‌-দি। এরা সব মাসতুতো বোন। পূর্বে-পশ্চিমে ফারাক নেই আধ-কাঁচ্চাও। গুন্‌তিতে ওরা হাজার-হাজার, আর বাঙলা দেশে এদের দলে আজ ১৯৪৪ সনেও বড় জোর এক-শ'। ব্যস্। আমাদের মেয়েরা বুঝে রেশমী সাড়ী— শাদা মেয়েরা বুঝে "ফার" (জানোআরের লোম)-কোট আর পার্শী গালিচা। সোনার গয়নায় মাতে আমাদের বাদামিনীরা। শ্বেতাঙ্গিনীরা পাগল হয় হীরা-মুক্তোর নামে। এইটুকু ফারাক। একে যদি ফারাক বল্‌তে চাও, বলো।

লেখক—লিখিয়ে-পড়িয়ে অথবা পাশ-করা মেয়েদের সার্বজনিক মতিগতি কিরূপ?

সরকার—এদের অধিকাংশ হচ্ছে অল্প-আয়ের লোক, কেরাণী—উকিল—ডাক্তার—ইস্কুলমাস্টার—বণিক্ ইত্যাদি পরিবারের স্ত্রী-বোন-মেয়ে। মাসিক পঞ্চাশ-পঁচাত্তর থেকে বড়জোর শ' আড়াই-চার-পাঁচেকের ভেতর এদের আয়। তবে শ'তিনেকের উপরে যারা, তাদের মেজাজে কিঞ্চিৎ-কিছু হাজারি-চার-হাজারিদের মেজাজ উঁকি-ঝুঁকি মার্‌তে সুরু করে। গোটা-কয়েক আহাম্মুক আছে যারা শ'-তিনেকের কোঠায়ই টাকার গরম দেখাতে লেগে যায়। "সমাজ-নেত্রী" বা "সোসাইটি-উওম্যান" ফলাবার ব্যাধি এই আয়ের মেয়েদেরকেও কখনো-কখনো পেয়ে বসে। কিন্তু অনেকেই মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ্‌তে জানে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, বাঙালী সমাজে লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েদের অধিকাংশই নিজ-নিজ আর্থিক অবস্থা বুঝ্‌তে সমর্থ। আর তারা হাম-বড়ানি দেখাবার দিকে বেশী প্রলুব্ধ হয় না। অর্থাৎ হাজারি-চার-হাজারি মেয়েদের ব্যাধি সমাজে আজও বেশী ছড়িয়ে পড়েনি। আগামী-ভবিষ্যতে বা দূর-ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াবে জানি না।

লেখক—সমাজ-সেবার কর্মে ঢুক্‌লে মেয়েরা "সমাজ-নেত্রী"র মেজাজ পেয়ে বসে না কি?

সরকার—কোনো-কোনো সময়ে হয় তো "সমাজ-নেত্রী"র চড়া মেজাজ অল্প-আয়ের "সমাজকর্মী" মেয়েদের চরিত্রকে আক্রমণ করে। কিন্তু তা কেটে উঠাবার দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

বঙ্গীয় লেখিকা-সমিতি

লেখক—লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েদের ভেতর আর্থিক অবস্থা মাফিক ব্যবস্থা কর্‌বার ক্ষমতা দেখা যায় কি?

সরকার—নিশ্চয়ই। আজকালকার কেরাণী-ইস্কুলমাস্টার-ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার-বেপারী ইত্যাদি লোকের স্ত্রীরা লেখাপড়া জানে। এই সকল মেয়েদের অনেকেরই মাথা ঠাণ্ডা। যে-সব মেয়েরা চাক্‌রী ক'রে খায় আর পরিবার চালায় তাদেরও অনেকে ঠাণ্ডা-মেজাজের লোক। যেসকল মেয়েরা খাঁটি-স্বদেশ-সেবক,—জেল খাটে,—তাদেরও অনেকেই বুঝে-সুঝে সংসার চালাতে সুপটু।

লেখক—অন্য পেশার মেয়েদের মেজাজ কিরূপ?

সরকার—বোধ হয় শ'খানেক মেয়ে কবিতা লেখে, গল্প লেখে, গান গায়, বক্তৃতা করে। এই দলের ভেতর অধিকাংশই মনে হচ্ছে বুঝে-সুঝে জীবন চালায়। আর তথাকথিত "সমাজ-নেত্রী"দের হামবড়ামি এই দলের অনেকেই এড়িয়ে চল্‌তে অভ্যস্ত। আমাদের উন্নতি এই সকল মেয়েদের কাজে বেশ-কিছু সাধিত হচ্ছে।

লেখক—এই প্রভেদ টান্‌ছেন কেন? কোনো-কোনো মেয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা, কোনো-কোনো মেয়ের মেজাজ গরম কেন?

সরকার—আসল কথা, পয়সা-পদ-পদবীর গরম মাস্টারণী-কেরাণী-গাল্পিক-ডাক্তারণী-ধাত্রী ইত্যাদি পেশার মেয়েদেরকে সহজে আক্রমণ কর্‌তে পারে না। জেল খাট্‌তে অভ্যস্ত স্বদেশ-সেবিকারাও পয়সার হামবড়ামি জানে না। প্রধান কারণ, পয়সার পরিমাণ এদের অল্প। কাজেই সার্বজনিক ভাবে লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েদের বিরুদ্ধে অথবা "সমাজকর্মী" মেয়েদের বিরুদ্ধে বকাবকি চালানো উচিত নয়।

লেখক—মেয়ে "সমাজ-কর্মী"দের অস্তিত্ব সহজে বুঝা যায় কি?

সরকার—"আনন্দবাজার পত্রিকা"র "নারীর কথা" অধ্যায়ে যে-সব মেয়েরা লেখা-লেখি করে তাদের অনেকেই তথাকথিত "সমাজনেত্রী" বা "সোসাইটি-উওম্যানে"র দলস্থ নয়। এই ধরণের মেয়ে-"সমাজ-কর্মীর" দল পুরু হচ্ছে,—বেড়ে চ'লেছে। তারা ক্রমশঃ "সমাজ-নেত্রী"র দলকে কলা দেখিয়ে চল্‌তে পার্‌বে। জেল-খাটিয়ে মেয়েরা কোনো দিন-ই "সমাজ-নেত্রীদের" হামবড়ামি বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বে না। তাতেও বাড়তির পথে বাঙালী।

লেখক—মেয়ে কবি, গাল্পিক, শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার, ধাত্রী ইত্যাদির সংখ্যা কত হবে?

সরকার—সারা বাঙলার বোধ হয় শ-পাঁচেক। এদেরকে মেয়ে "সমাজকর্মী' বা "সমাজ-সেবিকা" বলা যেতে পারে। এই সকল পেশার মেয়েরা দলবদ্ধভাবে সমিতি ও সম্মেলনের ব্যবস্থা কর্‌লে দেশের উপকার হয়। বঙ্গীয় সমাজ-সেবিকা সমিতি গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে। কম-সে-কম একটা বঙ্গীয় লেখিকা সমিতি কায়েম কর্‌বার দিন এসেছে।

লেখক—'সমাজ-নেত্রী"রা লেখিকা-সমিতির বা মেয়ে "সমাজ-কর্মী"দের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর্‌বে মনে হয়?

সরকার—"সমাজ-নেত্রী"রা লেখিকাদেরকে সুনজরে দেখ্‌বে কিনা সন্দেহ। লেখিকারা "সমাজ-নেত্রী"দের হাম-বড়ামি বর্‌দাস্ত কর্‌তে রাজি হবে না। "সমাজ-নেত্রী"দের সঙ্গে তাদের বনিবনাও না হবারই কথা। "সমাজ-নেত্রী"রা একঘ'রে হ'য়ে থাক্‌তে বাধ্য।

লেখক—"সমাজ-নেত্রীরা" একঘ'রে হ'য়ে থাক্‌লে দেশের লাভ আছে কি?

সরকার—অ-লাভ কিছু নেই। "সমাজ-নেত্রীরা" চল্‌বে আপন মনে আপন পথে, আর "সমাজ-কর্মীরা (যথা লেখিকারা) চল্‌বে আপন মনে আপন পথে। দুয়ের ধরণ-ধারণ আলাদা। কিন্তু দুয়ের কাজকর্মেই দেশের পক্ষে সুফল।

লেখক—ধরণ-ধারণ দুটা কী?—দেশের লাভই বা কোথায়?

সরকার—মেয়ে কবি-গাল্পিক-মাস্টারণী-ধাত্রীরা সমাজ-সেবা চালাবে স্বদেশী-স্বরাজী-স্বাধীন আওতায়। জেল-ফের্‌তা সমাজসেবিকারাও এই আওতার লোক। আর "সমাজ-নেত্রীরা" শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালাবার লোভে সমাজ-সেবার আন্দোলনে নাম লেখাবে। দুই দলে ক্বচিৎ-কখনো মেলামেশা হ'লেও হ'তে পারে। টাকাপয়সার জোর থাক্‌বে "সমাজ-নেত্রী"দের কোঠে,—বলা বাহুল্য। সুতরাং "সমাজ-নেত্রী"দের কাজকর্মে মোটের উপর দেশের কিঞ্চিৎ-কিছু উপকার হ'তে বাধ্য।

সমাজ-সেবায় পয়সাওয়ালাদের লাভালাভ

লেখক—"সমাজ-নেত্রী"দের কাজে দেশের লাভ কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—সরকারী যোগাযোগের প্রভাবে পয়সাওয়ালারা যাহ'ক কিছু স্বদেশ-সেবা বা সমাজ-সেবা ক'র্‌ছে তো? তাই বা মন্দ কী? সকলেই কি স্বার্থত্যাগী, স্বদেশ-সেবক, খাঁটি সমাজসেবক হবে? ভারতবর্ষের নানাস্থানে রকমারি সমাজমঙ্গল-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে কেন জানো?

লেখক—বলুন না?

সরকার—তাদের পেছনে শাদাচামড়াওয়ালা সরকারী ও বে-সরকারী স্ত্রীপুরুষের ছায়া আছে ব'লে। এই সব শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের সুনজর পাবার লোভে আমাদের পয়সাওয়ালা লোকেরা কোনো-কোনো সমাজ-সেবা-কেন্দ্রের পাণ্ডা হবার দিকে ঝুঁকে থাকেন। এই সকল মহলে দেশের মঙ্গল, উন্নতি বা প্রগতির অর্থ হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ নরনারীর পছন্দ-মত কাজ করা,—অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ-সেবা।

লেখক—সমাজসেবায় যোগ দিয়ে পয়সাওয়ালারা লাভবান হয় কী ক'রে?

সরকার—একবার কোনো শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা হ'লে বা ফটো তুল্‌লে পয়সাওয়ালা ভারত-সন্তানেরা সেই সম্বন্ধে গল্প চালাতে অভ্যস্ত সারাজীবন। ঘটনাটা তাদের ঠিক যেন পারিবারিক সম্পত্তি বিশেষ। এই হচ্ছে সমাজসেবায় পয়সাওয়ালাদের লাভের কথা। এই লাভটা অবশ্য বোধ হয় খানিকটা "আধ্যাত্মিক"। তাছাড়া আধিভৌতিক আর খাঁটি আর্থিক লাভও হয়তো জুট্‌তে পারে। ছেলের চাকরী, ভাগ্নের চাকরী, জামাইয়ের চাক্‌রী, নিজের খেতাব, নিজের পদোন্নতি, নিজের মাইনে-বৃদ্ধি অনেক-কিছুই ডাইনে-বাঁয়ে জুটা সম্ভব। এসব কি লাভের জিনিষ নয়? তার ওপর আছে যখন-তখন পাড়াপড়শীদের সঙ্গে ব্যবহারের নাক উঁচিয়ে হামবড়ামি চালানোর সুযোগ। তার সোজা নাম সামাজিক অত্যাচার।

লেখক—শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যোগাযোগে হাজারি-চার-হাজারি মেয়ে-পুরুষেরা বেশ-কিছু আন্তর্জাতিক ও বিশ্বপ্রেমিক হ'য়ে উঠে না কি?

সরকার—এতে আন্তর্জাতিকতাও জন্মে না, বিশ্বপ্রেমও গজায় না। পয়সাওয়ালা ভারতীয় নর-নারীর আন্তর্জাতিকতা হ'চ্ছে বিলাতের মর্জিমাফিক মগজ খেলানো। অনেক

সময় তারা ইংরেজদের চেয়েও বেশী বৃটিশ-মেজাজী। এ কথাটা ইংরেজরাও জানে। ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজ নর-নারী বেশ-কিছু ওয়াকিবহাল।

লেখক—এতে দেশের কোনো ভাল কাজ হয় কি?

সরকার—কেন হবে না? পয়সাওয়ালা স্ত্রী-পুরুষেরা সাধারণতঃ গরীব স্বদেশ-সেবকদের প্রবর্তিত কাজ-কর্মকে "টম, ডিক ও হ্যারি"র অর্থাৎ নকড়া-ছকড়া লোকের কাজ সমঝিতে অভ্যস্ত। এই সকল কাজে তারা সাধারণতঃ মেজাজ লাগাতে রাজি নয়, সময় দিতে রাজি নয়, পয়সা খরচ করতে রাজি নয়। তাদের মেজাজ, সময় আর পয়সা জুট্‌তে পারে একমাত্র বা প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের সুরু-করা বা যোগাযোগওয়ালা কাজে। তাতে মোটের উপর প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্র বেশ-ভালই গ'ড়ে উঠে।

লেখক—আমাদের পয়সাওয়ালা স্ত্রী-পুরুষেরা কি গরীবদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় না?

সরকার—যে-সকল প্রতিষ্ঠানে বা সভায় কোনো শাদাচামড়াওয়ালা লোক সভাপতি বা ঐ-দরের কিছু নেই সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা সভা হাজারি-চার-হাজারিদের নজরে "বোগাস" বা অস্তিত্বহীন চিজ। স্বদেশী লোকের সভাসমিতি, পরিষৎ, কর্মকেন্দ্র ইত্যাদি ব্যবস্থায় এঁদের মেজাজ শরীফ হয় কখন? যখন কম-সে-কম দু-একজন "স্যার"-উপাধিওয়ালা বা শাদাচামড়াওয়ালার সুপরিচিত ভারতসন্তান সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতের যে-কোনো জেলার মফঃস্বলে গিয়ে সার্বজনিক কাজকর্মের হিসাব নিয়ে দ্যাখো। দেখ্‌বে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াবে এইরূপ,—আজ ১৯৪৪ সনেও। আর কল্‌কাতা তো "স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ।

লেখক—এতে কি পৃথিবীর উপকার হয়?

সরকার—পৃথিবীর উপকার সাধনের আর কোনো উপায় নেই। এই হচ্ছে দুনিয়ার উন্নতির সনাতন, সার্বজনিক ও প্রায়-একমাত্র পথ। প্রথম কথা,—পয়সা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। দ্বিতীয় কথা,—পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজেদের পয়সা-পদ-পদবীর উন্নতির আশা বা সম্ভাবনা যেখানে নাই সেখানে পা মাড়ায় না, সময় দেয় না, পয়সা খরচ করে না। পয়সাওয়ালারা সর্বদাই নিজ পয়সা-পদ-পদবীর উন্নতি টুঁড়ে বেড়ায়। দু-একটা অন্য-মেজাজের লোক পয়সাওয়ালাদের গণ্ডীর ভেতর দেখা যায় কিনা খুঁজে দেখা ভাল। তাও সামজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক গবেষণার বস্তু।

("পয়সা-পদ-পদবীর প্রভাব", "খ্যাতি—আধ্যাত্মিক ও সামাজিক", ৬ই নভেম্বর ১৯৪২)।

সামাজিক যোগাযোগ পয়সাওয়ালা ও সাহিত্য-স্রষ্টা

২২শে এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—পয়সাওয়ালাদের সঙ্গে কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের মেলমেশ বা সামাজিক যোগাযোগ অসম্ভব কি?

সরকার—একপ্রকার অসম্ভব। ক্বচিৎ-কখনো বারোআরিতলার মহোচ্ছবে একটু-আধটু "কেমন আছেন?", "এই একরকম চ'লে যাচ্ছে"—ইত্যাদি ধরণের আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ চল্‌তে পারে। এই ধরণের সার্বজনিক সামিয়ানার তলায় বার-ভূতের সঙ্গে গা-ঘেঁশা-ঘেঁশি

অসম্ভব নয়। তাকে সত্যিকার সামাজিক মেলমেশ, লেনদেন, যোগাযোগ বা বন্ধুত্ব বলে না। ("খ্যাতি,—আধ্যাত্মিক ও সামাজিক" ৬ই নবেম্বর ১৯৪২)

লেখক—সত্যিকার সামাজিক মেলমেশের জন্য কী-কী আবশ্যক?

সরকার—সেজন্য জরুরি আয়ে-আয়ে সমতা। টাকাকড়িতে যারা সমান বা কাছাকাছি নয় তারা কখনও সামাজিক মেলমেশের বা বন্ধুত্বের যোগাযোগ চাখ্‌তে পারে না। গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকার বেচারারা হাজারি-চার-হাজারিদের "স্যালনে" (বৈঠকখানায়)" "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়্‌তে বাধ্য। অপর দিকে হাজারি-চার-হাজারির দল গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের কুঁড়ে-ঘরে দম আট্‌কে মারা যাবার অবস্থায় পড়তে পারে। তেলে-জ্বলে মেশে না। অবশ্য এক-আধটা ব্যতিরেক অসম্ভব নয়।

লেখক—পয়সাওয়ালারা কবি-গাল্পিক নাট্যকারদেরকে সম্মান কর্‌তে পারে না কি?

সরকার—আগেই ব'লেছি পারে না। তাদের পক্ষে সাহিত্য-স্রষ্টাদের দু-এক লাইন মনে রাখা হয়ত অসম্ভব নয়। বড়-জোর দূর হ'তে লোকজনের সাম্‌নে একটু-আধটু সম্মান দেখানো চল্‌তে পারে। তা না হ'লে পয়সাওয়ালাদেরকে লোকেরা হয়তো সংস্কৃতিহীন মুখ্‌খু বা চোআড় সন্দেহ ক'র্‌বে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবপদাবলীর কুচো-কাচা আওড়ানো পয়সাওয়ালাদের একটা বাতিক বিশেষ। তাতে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাহিত্যের প্রতি তাদের আগ্রহ জাহির করা সম্ভব।

লেখক—কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা পয়সাওয়ালাদেরকে সম্মান করে না কি?

সরকার—সম্মান করে না। ভয় ক'রে চলে।

লেখক—সম্মান করে না কেন?

সরকার—কবি-গাল্পিক-নাট্যকারের স্রষ্টা। নয়া-নয়া দুনিয়া তারা সৃষ্টি ক'র্‌ছে। তারা যে স্রষ্টা এই সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান টন্‌টনে। টাকাপয়সা তারা বেশী-বেশী রোজগার করে না। সংসার চালায় তারা কষ্টে। এই সম্বন্ধে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা জানে যে, টাকা-পয়সায় যারা বড় বা কৃতকার্য তারা নয়া-নয়া দুনিয়া সৃষ্টি কর্‌তে অসমর্থ। তারা অমর নয়, অমর হচ্ছে স্রষ্টারা। কাজেই কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা দেমাকী। যখন-তখন পয়সাওয়ালা লোককে তারা সম্মানযোগ্য ভাব্‌তে পারে না।

লেখক—কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা পয়সাওয়ালাদেরকে ভয় করে কেন?

সরকার—পয়সাওয়ালাদের কৃপাদৃষ্টি হ'লে কখনো-কখনো টাকাটা-সিকিটা-দোআনিটা হয়ত কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের বরাতে জুট্‌তে পারে। তাতে দু-বেলা না হ'ক দেড় বেলা আঁচাবার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। এই জন্য পয়সাওয়ালাদেরকে দূর হ'তে মৌখিক বা লোক-দেখানো সম্মান ক'রে চলা গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের দস্তুর।

লেখক—পয়সাওয়ালাদের স্ত্রীর সঙ্গে গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের স্ত্রীদের যোগাযোগ বন্ধুত্ব সৃষ্ট হ'তে পারে না কি?

সরকার—না। পয়সাওয়ালাদের স্ত্রীরা জানে যে, তাদের স্বামীরা টাকা-রোজগারের পেশায় কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদেরকে হারিয়েছে। স্বামীদের দেমাকে তারা নিজকে ফুলিয়ে চল্‌তে অভ্যস্ত। কিন্তু গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের স্ত্রীদের পক্ষে তাদের স্বামীর সৃষ্টি-দেমাককে নিজের গৌরব সমঝে চলা আহাম্মুকি। সৃষ্টিগুলা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সামগ্রী। পর দিকে টাকা-পয়সার গরম তাদের স্বামীরই নাই, সেই গরম মেয়েদের হবে কী ক'রে?

লেখক—পয়সাওয়ালার স্ত্রীতে আর সাহিত্যসেবীর স্ত্রীতে প্রভেদ কী?

সরকার—পয়সাওয়ালাদের মেয়েরা কম্-সে-কম্ টাকার গরমে মেজাজ গরম কর্‌তে সমর্থ। কিন্তু গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের মেয়েরা না পারে দুনিয়া-স্রষ্টার মেজাজ দেখাতে আর না পারে পয়সার মেজাজ দেখাতে। কাজেই পয়সাওয়ালা মেয়েদের বৈঠকখানায় গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের মেয়েরা মড়ার মতন দু'এক মিনিট থাক্‌তে পারে মাত্র। তার বেশী নয়। তাতে সামাজিক লেনদেনই পায়দা হয় না। বন্ধুত্ব সৃষ্ট হবে কোথ্‌থেকে? আবার জেনে রাখা ভাল,—এই সকল ক্ষেত্রেও একটা-আধটা ব্যতিরেক ঘটা অসম্ভব নয়।

সাহিত্যসেবীর সংসার চালানো

লেখক—পয়সাওয়ালাদেরকে কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা সম্মান করে না। অথচ তাদের অনুগ্রহ পেতে এরা রাজি। এই অবস্থা কি আপনার পছন্দসই?

সরকার—কেন অ-পছন্দসই হবে? মর্‌বার জন্য কেহ জন্মে নি। সকলেই চায় বেঁচে থাক্‌তে। টাকা-পয়সা সম্বন্ধে অনুগ্রহ কর্‌বার ক্ষমতা একমাত্র পয়সাওয়ালাদের। কাজেই তাদের অনুগ্রহ পাওয়াটা, গরীব, কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের পক্ষে অ-মানানসই হবার কারণ নাই। তবে এই অনুগ্রহের জন্য নিজকে কতটা খাটো করা আবশ্যক? এই প্রশ্নের বিচার প্রকৃত ঘটনাস্থলে চালানো সম্ভব। এই সম্বন্ধে কোনো পাতি, ফর্মুলা, সার্বজনিক ব্যবস্থা ও সনাতনসূত্র জারি করা চলে না।

লেখক—অনেক সময় শোনা যায় যে, পয়সাওয়ালা লোকেরা গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকার বা সাংবাদিক বা ইস্কুল-মাষ্টার ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্যসেবীকে দিয়ে প্রবন্ধ বা বই লিখিয়ে নিজের নামে ছাপেন। সার্বজনিক সভা-সমিতিতে সভাপতির ভাষণ নাকি লিখে দেয় গরীব সাংবাদিক বা অন্যান্য সাহিত্যসেবীরা,—আর সে সব চলে পয়সাওয়ালাদের বাণী, মত, রচনা হিসাবে। এই জন্য সাহিত্যসেবীরা পয়সাওয়ালাদের কাছ থেকে দক্ষিণাও পেয়ে থাকে শুনেছি। এই ব্যবস্থা আপনার মতে বাঞ্ছনীয় কি?

সরকার—অবাঞ্ছনীয় কেন হবে? রচনাটার আসল মালিক যে-ই হোক না কেন, সেই মাল তো শাদা কাগজের ওপর কালো আঁচড়ের সাহায্যে বাঙলাদেশে স্থায়ী হ'য়ে রইল। চিন্তাটা, খেয়ালটা, বুখ্‌নিটা, বাণীটা, উপদেশটা বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারের সম্পদ্‌স্বরূপ থাক্‌তে বাধ্য। কোনো-না-কোনো বাঙালীর বাচ্চাই সেটা সৃষ্টি ক'রেছে তো। আসল স্রষ্টার নাম তাতে সংযুক্ত থাক্‌লো না বটে। স্রষ্টার অন্নদাতা বা মুরুব্বি নামজাদা হ'লো। তাতে লোকসান কী? লোকসান একমাত্র বেচারা সাহিত্য-সেবীর সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রচনাটা বেচে সে টাকাটা-সিকিটা-দোআনিটা পেয়েছে। আর তাই দিয়ে সে পরিবার-সংসার-গেরস্থালি চালিয়েছে। সুতরাং কেনা-বেচার ফলে তার নিজের পক্ষে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। দুঃখ এই যে, তার নামটা দুনিয়ায় জাহির হ'লো না। কিন্তু নাম দিয়ে কি ধুয়ে খাবে?

লেখক—আপনি কখনো আপনার রচনা এইভাবে কোনো পয়সাওয়ালার নামে প্রকাশ ক'রেছেন?

সরকার—আজ পর্যন্ত সেই কেনা-বেচার অবস্থায় পড়িনি। তবে এই অধমের ছাপা-হওয়া রচনা অনেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজের নাম ছেপেছে,—তা জানি। সে কথা আলাদা।

কিন্তু পয়সার জন্য পরের নামে নিজের কোনো রচনা প্রকাশ করার দরকার হয়নি।

("শরৎ-সাহিত্যে ব্যবসাদারি")

মেজাজে-মেজাজে লড়াই

লেখক—পয়সাওয়ালা নরনারী সম্বন্ধে আপনি কী বল্‌ছেন বুঝা যাচ্ছে না। ভালোও বল্‌ছেন, খারাপও বল্‌ছেন?

("পয়সাওয়ালা স্ত্রীপুরুষের সমাজসেবা")

সরকার—ভালোও বলিনি, খারাপও বলিনি। বল্‌ছি যে, পয়সাওয়ালারা পয়সাওয়ালা আর গরীবরা গরীব। অধিকন্তু এ' দু'য়ে মেলমেশ হ'তে পারে না। ব্যস্‌।

লেখক—গরীবদেরকে পয়সাওয়ালাদের চেয়ে চরিত্র হিসাবে ভালো বল্‌ছেন না কি?

সরকার—তা তো বলিনি। ব'লেছি গরীবদের ধরণ-ধারণে আর পয়সাওয়ালাদের ধরণ-ধারণে আকাশ-পাতাল ফারাক। কাজেই এই দুই শ্রেণীর লোক এক সমাজে ওঠ্‌-ব'স্‌ ক'র্‌তে পারে না।

লেখক—একটু বস্তুনিষ্ঠভাবে বুঝিয়ে দেবেন?

সরকার—কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা দেড়-পয়সা, দু-আনা, দশ-আনা ইত্যাদির হিসাবে বুঝে। হাজারি-চারহাজারি মেয়ে-পুরুষেরা মামুলি কথাবার্তায় দশ-বিশ-পঁচিশ টাকা বা শ-দেড়-দুইয়েব হাঁক ছাড়ে। কাজেই কোনো খোসগল্পের সময় অতি-সহজেই দুটো বিভিন্ন "শ্রেণীর" জানোআর নজরে পড়ে। ফলতঃ একটা শ্রেণী অপর শ্রেণীর সঙ্গে বৈঠকি-গল্প চালাতে অসমর্থ হয়। একেই বলে তেলে-জলে-মেশে না।

লেখক—হাজারি-চারহাজারিরা চরিত্র হিসাবে গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের চেয়ে নিকৃষ্ট বা অবনত নয়?

সরকার—সে-কথা অনেক সময়েই আমি স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নই। সুচরিত্র চিজটা গরীব লোকের একচেটিয়া মাল নয়। পয়সাওয়ালারা সকলেই দুশ্চরিত্র, চরিত্রহীন এরূপ বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁদের ট্যাঁকে পয়সা বেশী। এইজন্য বাড়ীঘর, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন ইত্যাদি আটপৌরে জীবনের খুঁটিনাটিতে স্বচ্ছলতা, আরাম, সুখভোগের মাত্রা চড়া। এই সকল বিষয়ে গরীবদের মাত্রা নেহাৎ খাটো। ট্যাঁকে পয়সা এলে গরীবরাও আর টাকাটা-সিকিটা-দোআনিটার হিসাব কর্‌বে না। তাদের মুখেও যখন-তখন বেরুবে শ-দেড়-আড়াই-চারেক টাকার।

লেখক—গরীবে আর পয়সাওয়ালায় চরিত্র হিসাবে কোনো প্রভেদ দেখ্‌তে পান না?

সরকার—সাধারণভাবে বল্‌বো 'পাই না'। হিংসায়, চুক্‌লিতে, পরশ্রীকাতরতায় গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা কম মশ্‌গুল হয় না। গরীবে-গরীবেও পরস্পর খাওয়া-খাওয়ি বেশ চলে। পয়সাওয়ালারা এই সম্বন্ধে গরীবদের চেয়ে বেশী পাপী কিনা সন্দেহ। তবে এদের টক্কর, কামড়া-কামড়ি, লাঠালাঠি চলে হাজার-হাজার নিয়ে, আর গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের নোংরামি, মাথা-ফাটাফাটি যা-কিছু দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকার মামলা, এই তফাৎ।

লেখক—সাহিত্যসেবী, সাংবাদিক, অধ্যাপক ইত্যাদি মহলের পরস্পর খাওয়া-খাওয়ি বুঝ্‌বো কী ক'রে?

সরকার—কেন, তুমি কি ন্যাকা নাকি? ডাইনে-বাঁয়ে উঠ্‌তে-বস্‌তে ত্রিশ-পঞ্চাশ-দেড়শওয়ালাদের ভেতরকার মাথা-ফাটাফাটি দেখ্‌তে পাও না? কেরাণীদের ভেতর সদ্ভাব দেখেছো কত জায়গায়?

লেখক—তবুও একটা দৃষ্টান্ত পেলে ভাল হয়।

সরকার—মনে করো,—একজন কবি বা গাল্পিক ম্যাট্রিক ফেল বা পাশ, আর একজন এম-এ, বি-এল পাশ,—হয়ত' ডক্টর-উপাধিওয়ালা লোক। ডক্টর-কবি ম্যাট্রিক-কবিকে পুছবে কি? আবার ধরো,—কোনো গাল্পিকের বই বাজারে বেশ কাটে। তার সঙ্গে কথা কইতে সাহসী হবে কোন্-কোন্ গাল্পিক? একমাত্র যারা গল্প বা বই বেচে সংসার চালাতে পারে। আয় নিয়ে, আর নাম নিয়ে,—গাল্পিকে-গাল্পিকে লড়াই তুমুল। চিত্রশিল্পীদের আসরে যাওয়া-আসা আছে? দেখ্‌বে লড়াই কাকে বলে,—দেড়শ'-দুশ-ওয়ালাদের ভেতর। পয়সার লড়াই পাবে কমিউনিস্ট্ "কমরেড" মহলে চরমভাবে। ম্যাট্রিক-ফেল "কমরেড" আর কেম্ব্রিজের বিলেত-ফের্‌তা "কমরেড" কি এক জাতের "কমরেড",—এক "শ্রেণীর" কমিউনিস্ট? দুনিয়ার সাম্যবাদীরা কট্টর অসাম্য-নিষ্ঠ জানোআর।

লেখক—সাংবাদিক আর ইস্কুল-কলেজের মাস্টার মহলে পয়সার লড়াই আর পদের লড়াই কি এইরূপই বল্‌তে চান?

সরকার—মাস্টারি পেশার খবর রাখো তো? মাস্টারি পেশারও খবর রাখো আর সাংবাদিক পেশার খবরও রাখো। আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? যে-মাস্টারটা পদে দেড় ইঞ্চি উঁচু তিনি তাঁর দেড় ইঞ্চি নীচু পদের মাস্টারকে চাপরাশির সমান ভাব্‌তে অভ্যস্ত। টাকা পনেরো বেশী যিনি পান, তাঁর জরীপে পনেরো রূপৈয়া কমওয়ালা হ'চ্ছে খাঁটি প্রোলেটারিয়াট্। কাজেই অল্প-আয়ের লোকজন হাজারি-চার-হাজারিদের চেয়ে চরিত্র হিসাবে উঁচু বা পৃথক নয়। এই সব জানোআরদের সম্বন্ধে আরও মজার কথা আছে।

লেখক—কী সে-সব?

সরকার—কল্‌কাতার মাস্টারে আর মফঃস্বলের মাস্টারে বামুন-শূদ্দুর ফারাক করা হ'য়ে থাকে। তাছাড়া কল্‌কাতার ভেতরই ইস্কুল-কলেজের ছোট-বড় আছে। আর সেই অনুসারে মাস্টারদের জাতিভেদও চরম আকারে দেখা দেয়। এসব কথা জানে না কে? হাজারি-চারহাজারিরা গরীব কবি-গাল্পিক-সাংবাদিক-মাস্টারদের তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌বে তাতে আর আশ্চর্য কী? পয়সার আর পদের লড়াই সাংবাদিক, অধ্যাপক ইত্যাদি সকল মহলেই জবরদস্ত। আরে, ভায়া, রক্তমাংসের মানুষ যে! জানোই তো, এমন কি সন্ন্যাসীরাও লড়ে চিম্‌টে আর কম্বল নিয়ে। এসব হচ্ছে জীবজন্তু-জানোআর মাত্রের স্বধর্ম। হাজারি-চারহাজারিদের দোষ কী?

লেখক—নৈতিক চরিত্রের দোষগুণ একরূপ বল্‌ছেন। অথচ এক-শ্রেণী আর একশ্রেণীর সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা চালাতে অসমর্থ বল্‌ছেন কেন?

সরকার—কারণটা অনেকবারই বাৎলিয়েছি। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের আটপৌরে খুঁটিনাটিগুলা পয়সাওয়ালাদের একরকম আর গরীব কবি-গাল্পিক-নাট্যকারদের আরেকরকম। অধিকন্তু হাজারি-চারহাজারি মেয়ে-পুরুষদের অনেকে শয়নে-স্বপনে-নিশিজাগরণে শ্বেতাঙ্গ-ঘেঁশা ও ঘোরতর বৃটিশ-মেজাজী। গরীবেরা সাধারণতঃ প্রায়-সকলেই স্বদেশী-স্বরাজী-বাঙালী মেজাজী। কাজেই মেজাজে-মেজাজে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। হাজারি-চারহাজারিরা গরীব-গুর্বোদের আবহাওয়ায় এক মিনিটও কাটাতে গেলে অস্থির হ'য়ে পড়ে। আর গরীব-গুর্বোরাও হাজারি-চারহাজারিদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চায় না। একশ্রেণী আর

এক শ্রেণীকে বরদাস্ত করতে অসমর্থ। পারস্পরিক হিংসাদ্বেষ চরম।

লেখক—আমাদের দেশে ধনীর সঙ্গে নির্ধনের যোগাযোগ তাহ'লে কিরূপ?

সরকার—ভারতে পয়সাওয়ালাদেরকে গরীবরা কোনো দিন পছন্দ করে না,—চিরকাল নিন্দা করে, ঘৃণা করে, হিংসা করে, ভয় করে। আর পয়সাওয়ালারাও গরীবদেরকে সর্বদাই এড়িয়ে চলে। তাদের কাছে ঘেঁশ্‌তে চায় না। ধনী-নির্ধনের আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ সম্বন্ধে এই হচ্ছে সনাতন বেদান্ত। শ্রেণী-লড়াইটা জবরদস্ত।

("শরৎ-সাহিত্যে ব্যবসাদারি")

লেখক—ভারতে মোটের উপর শ্রেণী-লড়াইটা কিরূপ?

সরকার—ভারতবর্ষে চল্লিশ কোটি লোকের বাস। তার ভেতর ইনকাম-ট্যাক্‌স বা আয়-কর দেয় লাখ তিনেকেরও কম। অর্থাৎ এই লাখ তিনেকের ভেতর পড়ে মাসিক কম-সে-কম সওয়া শ' বা শ-দেড়েক রূপৈয়ার লোক। গুন্‌তিতে ধনীরা নগণ্য। বুঝ্‌তে হবে যে, ভারতীয় নরনারীর প্রায়-প্রত্যেক লোকই এই লাখ-তিনেকের সমাজ ও ব্যক্তিগুলাকে জবরভাবে ঘৃণা করে। এই লাখ তিনেকের শ্রেণীকে দেশের দুস্‌মন বিবেচনা করাও কোটি-কোটি ভারত-সন্তানের দস্তুর। ভারতীয় নরনারীর অধিকাংশ অথবা প্রায়-সকলেই গরীব। এই গরীবদের বিচারে লাখ-তিনেক ধনীরা হ'চ্ছে দেশোন্নতির শত্রু। দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর উল্টা। হাটে-বাজারে, রাস্তায়-ঘাটে জনসাধারণের সঙ্গে কথা বল্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে,—জনসাধারণের মেজাজে দেশের শত্রু কারা।

পয়সাওয়ালাদের বর্বরতা

২৮শে এপ্রিল ১৯৪৪

মন্মথ—সমাজসেবকেরা পয়সাওয়ালা-পয়সাওয়ালীদের মেজাজে হামবড়ামি লক্ষ্য কর্‌তে পারে কি?

সরকার—অনেক সময়েই পারে। এমন ধনী লোকও আছে যারা গরীব সহযোগীদেরকে গরীব ব'লে অপদস্থ কর্‌তে পেছপাও হয় না। তারা অতিমাত্রায় বর্বর। পয়সার গরম তাদের যখন-তখন প্রকাশ পায়। গরীব লোকদের অনুষ্ঠিত সভাসমিতিকে তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। গরীবের প্রশংসায় তারা নাক সিঁট্‌কাতে অভ্যস্ত। গরীবদের দেওয়া উপাধি-খেতাব-মানপত্র তাদের চিন্তায় শূন্য বিশেষ। "আরে তুই ঐ ক্লাবে মেম্বার হ'য়ে কী কর্‌বি? ওসব পয়সার খেলা,—বড়-লোকের জন্যে।" গরীব বন্ধুদের সঙ্গে এই ধরণের মধুর সম্ভাষণ পয়সাওয়ালা-পয়সাওয়ালীদের মুখে নতুন-কিছু নয়। নির্লজ্জভাবে কথা বলা ধনী লোকেরা লজ্জার কথা ভাবে না। লাজ-লজ্জার মাথা খাওয়া তাদের কাছে মুড়-মুড়কি মাত্র। বর্বরতা হচ্ছে পয়সাওয়ালাদের প্রায়-সার্বজনিক স্বধর্ম। তা ছাড়া তারা তাদের "বৃটিশ মেজাজ" যখন-তখন জাহির কর্‌তে অভ্যস্ত।

লেখক—পয়সাওয়ালাদের কি চক্ষুলজ্জা নাই?

সরকার—বড়লোকদের অনেকেই চক্ষুলজ্জাহীন,—কি ভারতে কি ইয়োরামেরিকায় ও চীন-জাপান মিশরে। ধনী স্ত্রীপুরুষেরা সাধারণতঃ,—অবশ্য সকলেই নয়,—নীচ প্রবৃত্তির লোক। কৃতজ্ঞতা তাদের কোষ্ঠীতে বড়-একটা লেখা থাকে না। পয়সার গরম মানুষকে

মনুষ্যত্ব-হীন করে।

লেখক—পয়সাওয়ালাদের অকৃতজ্ঞতা বুঝা যায় কী ক'রে?

সরকার—বেশী-বিদেশী বহু ধনী লোক বিজ্ঞান-গবেষক, দর্শন-গবেষক, যন্ত্র-গবেষক ইত্যাদি সুধী লোকজনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু কাজের ফলগুলা বাজারে চালু হয় সুধীদের নামে নয়,—পয়সাওয়ালা মনিবদের নামে। মনুষ্যত্বশীল মনিবদের দস্তুর অন্য রকমের হ'তো। তেমন মনিবের সংখ্যা খুব কম।

লেখক—পয়সাওয়ালারা সুধীদেরকে বেতন বা পারিশ্রমিক দেয় না কি?

সরকার—কিঞ্চিৎ-কিছু তঙ্খা দেয় বৈকি। কিন্তু ধনীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুধীদের কাজকর্মের তারিফ করে না। সত্যি কথা,—কাজগুলা যে গবেষকদের মেহনতের ফল তা অনেক সময়েই উল্লেখ করা হয় না। মনিবেরা মাথাওয়ালা মজুরদের কাজ নিজের কাজ ব'লে চালিয়ে দেয়। ধনীরা মনে করে যে,—গোটা কয়েক টাকা যখন দেওয়া হ'য়েছে তখন গরীব মাথাওয়ালাদের মুড়োটা তারা কিনে রেখেছে। গরীবদের ইজ্জদ আবার কী? ঝী-চাকর-চাপরাশি-দ্বারোআন ইত্যাদি মজুরও যা—মাথাওয়ালা গবেষক-লেখক-আবিষ্কারক ইত্যাদি মজুরও তা। ঠিক যেন "দুটো টাকা ফেল্‌বো আর পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে জুতো মেরে মন্তর আদায় ক'রে নেবো"—এই অবস্থা। মাথাওয়ালাদের কাছে মনিবেরা যে কিছু কখনো শিখেছে তা মনেই রাখে না। এরি নাম অকৃতজ্ঞতা আর মনুষ্যত্বহীনতা।

লেখক—আপনি ইয়োরোপে আর আমেরিকায়ও এই অবস্থা দেখেছেন?

সরকার—সকল দেশেই এই হালত্। ওসব দেশে টাকা-পয়সার পরিমাণ বেশী-বেশী। কাজেই লিখিয়ে-পড়িয়েরা, মাথাওয়ালারা, উদ্ভাবক-আবিষ্কারকেরা নাকাল আর বে-ইজ্জদ্‌ও হয় তেমনি বেশী-বেশী। অকৃতজ্ঞ আর মনুষ্যত্বহীন জানোআর পয়সাওয়ালাদের দেশে আটপৌরে চিজ। যে-দেশে যত টাকা, সেই দেশে তত বর্বরতা।

লেখক—মনুষ্যত্বশীল আর কৃতজ্ঞতাশীল মনিবদের চরিত্র কিরূপ?

সরকার—যে-সকল পয়সাওয়ালা মনিব গবেষক-উদ্ভাবক-লেখকদের নামে আবিষ্কার-গবেষণা-গ্রন্থগুলা প্রচার করে তারা মনুষ্যত্বশীল ও কৃতজ্ঞতাশীল লোক। মনিবেরা মুরুব্বি, পৃষ্ঠপোষক, অন্নদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী বা বন্ধু ইত্যাদি রূপে পরিচিত হ'লে বল্‌বো যে, মানুষের মতন কাজ করা হচ্ছে। এই রকম মনুষ্যত্বশীল মানুষও দুনিয়ার পয়সাওয়ালা সমাজে মাঝে-মাঝে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশই নির্লজ্জ, বেহায়া, কৃতজ্ঞতাহীন, বর্বর।

বাল্‌জাক ও ফ্লোবেয়ার

লেখক—আপনার কথায় মনে হচ্ছে যেন নভেল-নাটক-উপন্যাসের গল্প শুন্‌ছি?

সরকার—কেন, গল্প-সাহিত্য কি বুজরুকি নাকি? মানুষ নিয়ে যে-সকল কবি-গাল্পিক-নাট্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করে তারা আমার কথাগুলাই ব'লে যেতে বাধ্য। উনবিংশ শতাব্দীর ডিকেন্স আর থ্যাকারে পয়সাওয়ালাদের মুগুরভাবেই বিলাতী সাহিত্যে অমর। ফরাসী সাহিত্যবীর বাল্‌জাকের নাম শুনেছ তো? তার "কোমেদী ইমেন" (বা মানব-নাট্য) নামক গদ্য গল্প বা উপন্যাসগুলা বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যের সেরা নিদর্শন। এ সব হচ্ছে ১৮১৫-৫০ সনের মাল। পরবর্তী গল্প-সাহিত্যে ফ্লোবেয়ার আরও চরম ভাবে পয়সাওয়ালাদের বর্বরতার মুগুর।

লেখক—বাল্‌জাক আর ফ্লোবেয়ারের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে আছে কি?

সরকার—থাক্‌বার তো কথা। এই দুই সাহিত্য-বীরের অনেক-কিছুই ইংরেজিতে পাওয়া যায়। গল্প আর উপন্যাসের দুনিয়ায় বাল্‌জাক আর ফ্লোবেয়ার বাদশা বিশেষ। অধিকন্তু সমাজ-নিষ্ঠ গল্প-সাহিত্যে এই দুই লেখক ইয়োরামেরিকাকে মাত্‌ করে রেখেছে।

লেখক—বাঙালী লেখক-মহলে বিদেশী-কাদের প্রভাব বেশী?

সরকার—বাংলাদেশে নামডাক আছে ফরাসী মোপাসাঁর রবি. প্রভাত, চারু, সৌরীন, মণি গাঙ্গুলি ইত্যাদি গাল্পিকদের যুগ থেকে। আজকালকার লেখকেরা দস্তয়েব্‌স্‌কি, টলস্টয় আর গর্কি হতে এরেণবুর্গ পর্যন্ত রুশ গাল্পিকদের ধরণ-ধারণ রপ্ত কর্‌ছে। একালের ইংরেজ লরেন্স, হাক্‌স্‌লে আর এলিঅটও কিছু-কিছু প্রভাবশীল। কিন্তু বাল্‌জাক (১৭৯৯-১৮৫০) আর ফ্লোবেয়ার (১৮২১-৮০) সাম্প্রতিক বাঙালী লেখক-পাঠক মহলে বেশী চলে কিনা সন্দেহ। বোধ হয় কিছু-পুরোণো বা সেকেলে ব'লে।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, বাল্‌জাক আর ফ্লোবেয়ার বাঙালীর সাহিত্যে চালু হওয়া উচিত?

সরকার—আমার বিবেচনায় এই দুইজনের সঙ্গে মাখামাখি করা বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়েদের পক্ষে আজও বেশ-কিছু উপকারী। বাল্‌জাক আর ফ্লোবেয়ার ফরাসী সমাজের যে-যুগ দেখেছে, এঁকেছে আর সমালোচনা ক'রেছে ১৯৩০-৪৪ সনের বাঙালী আমরা মোটের উপর প্রায় সেই ধরণের যুগেই চলাফেরা কর্‌ছি।

লেখক—তুলনাটা আর একটু খুলে বল্‌বেন?

সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর ১৮৭০-৮০ পর্যন্ত ফরাসীদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙন-গড়ন যা, বিংশ শতাব্দীর ১৯০৫ সনের পরবর্তী বাঙলায় আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙন-গড়ন প্রায় সেই গড়নের ও সেই বহরের বস্তু। ১৯৪৪ সনেও আমরা ফ্রান্সের প্রায় ১৮৭০ সনের অবস্থায়ই র'য়েছি। অর্থাৎ ফরাসী জাতের ৭০।৭৫।৮০ বছর আগেকার ধরণ-ধারণই হচ্ছে বাঙালী জাতের অতি-সাম্প্রতিক ধরণ-ধারণ। কাজেই বাল্‌জাক আর ফ্লোবেয়ারের মতন লেখকেরাই হালের বাঙালী লেখকদের যথার্থ গুরু ও পথপ্রদর্শক হবার যোগ্য। বাল্‌জাকের "পেয়ার গোরিও" (১৮৩৪) ও "লে পেইজাঁ" (১৮৪৪) আর ফ্লোবেয়ারের "মাদাম বোভারি" (১৮৫৭) ও "লেদুকাসিঅঁ সাঁতিমাঁতাল" (১৮৭০) ইত্যাদি বইয়ে একালের বাঙালী কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা অনেক কেজো হদিশ পেতে পারে। পয়সাওয়ালা-পয়সাওয়ালীদের বর্বরতা এই ধরণের ফরাসী সাহিত্যে বেশ-কিছু মালুম হবে।

এপ্রিল-মে ১৯৪৪

ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তান রবীন্দ্রনাথ*

এপ্রিল-মে ১৯৪৪

রবীন্দ্রনাথ পরলোকগত হইয়াছেন (৭ আগস্ট-১৯৪১), আর সেই সঙ্গে চারুকলা, সাহিত্য, দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে সর্বকালের ও সর্বজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুনর্গঠনকর্তার অন্তর্ধান হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন?—তিনি ছিলেন ১৯০৫ সালের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম স্রষ্টা, আর তিনি ছিলেন সেই সময় হইতে পরবর্তী কালের যুবক বাংলার জনক-স্বরূপ। চন্দ্রগুপ্ত, আকবর ও শিবাজী ছিলেন স্বয়ংকৃত নায়ক ও রাজনীতিজ্ঞ শাসক। বুদ্ধ ছিলেন ঋষি ও ধর্মপ্রচারক। সাধারণ নরনারীর চিন্তায় বুদ্ধদেবের মানবীয় কার্যাবলী অতি-মানবিক দৈবভাবে আচ্ছন্ন। যদি এই কয়েকজন বিরাট পুরুষের কথা বাদ দিই তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তান বলিতে পারি। গদ্য, পদ্য, দর্শন ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি যেমনই বিশাল, তেমনই উৎকৃষ্ট, তেমনই প্রচুর ও তেমনই ব্যাপক। এই সৃষ্টির নিকট বাল্মীকি, কালিদাস, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য ভারতীয় অমর কবিগণের সৃষ্টি ম্লান দেখায়। মহেঞ্জোদড়ো ও বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় সাহিত্যবীর তাঁহার মত প্রচুর সৃজন-ক্ষমতা ও সর্বমুখিনী শক্তির অধিকারী ছিলেন না। সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার উৎকর্ষ ছিল উচ্চতম স্তরের অন্তর্গত।

বিশ্বের চিন্তাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও প্রতিভার উৎকর্ষ ছিল অনুপম। ফরাসী ভিক্তর উগো অথবা জার্মাণ গ্যেটে অনেকটা তাঁহার কাছাকাছি ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর কোনো একজন স্রষ্টাই রবীন্দ্রনাথের আলোচিত বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই, এমন কি, তাঁহার সমান হইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। নানাবিষয়িনী সৃষ্টিশক্তি, হিমালয়ের উচ্চতা আর বিশ্বগ্রাসী মানবিকতা এই সবই তাঁহার ছিল। এই তুলামূলক বিশ্লেষণে আমি দস্তয়েভ্স্কি, বার্ণার্ড শ, আনাতল্ ফ্রাঁস, ষ্টেফান্ গেওর্গে, লুইজি পিরান্দেল্ল প্রভৃতি মনীষিগণের অবদানের কথা বাদ দিতেছি না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অমরগণের মধ্যে অমর। রবীন্দ্রনাথ গান, গীতি-কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও চিত্র রচনা করিয়াছেন। সে হইতেছে স্বাধীনতা। তিনি একটিমাত্র দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা হইতেছে ব্যক্তিত্ব। আর তিনি একটিমাত্র মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন—তাহা হইতেছে আত্মপ্রকাশ। তিনি মানব-স্বাধীনতার অবতার। তিনি ছিলেন নিয়ম-নিষেধ-সংস্কার-শৃঙ্খল হইতে নরনারীর স্বাধীনতা লাভের মূর্ত বিগ্রহ। সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদারতা অবলম্বন ছিল তাঁহার চরম উপদেশ।

আমরা বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গান, গীতিকবিতা, নাটক, গল্প ও উপন্যাসে প্রকাশিত সামাজিক বাণীর বিষয় আলোচনা করিতেছি না। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা অসংখ্য এবং সেগুলির বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিবিধ ;—যেমন সাহিত্য-সমালোচনা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, লোক-সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা-বিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কার, অন্ন-সমস্যা, কুটীর-শিল্প, রাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ—সব-কিছুই তাঁহার আলোচনায়

* বর্তমান প্রবন্ধ বিনয় সরকারের "টাগোর দি গ্রেটেষ্ট ইণ্ডিয়ান অব হিষ্ট্রি" (১৯৪১) নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ। অনুবাদক প্রমথনাথ পাল কর্তৃক তাঁহার সম্পাদিত "দেশপ্রাণ" পত্রিকায় প্রকাশিত।

ঠাঁই পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সূক্ষ্ম তার্কিক ও বাক্-বিতণ্ডায় সিদ্ধহস্ত। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ও সমস্যার প্রতি তাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি ছিল। এই কারণে তিনি সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহার চিন্তাধারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৮৮৪ সালের "ভারতী" মাসিক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রে সহিত রবীন্দ্রনাথের বাদানুবাদ প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। তর্কাতর্কির বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু আদর্শ। ১৮৮৫ সালে ব্রাহ্ম সমাজের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া তিনি আর একটা বাদানুবাদ চালাইয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালে হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা দেন। লয় আত্মপ্রসারের নামান্তর কিনা ইহা ছিল তাঁহার ১৮৯২ সালের তর্কের বিষয়। আধুনিক হিন্দু সমাজের গোঁড়ামিও তাঁহার সমালোচনায় অন্তর্গত হয়। তিনি হিন্দুদের খাদ্যনীতির ভিতরকার তথাকথিত দার্শনিকতার নিন্দা করিতেন।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ("শিক্ষার হেরফের")। ইহা ছাড়া "স্ত্রী মজুর" আর "কর্মের উমেদার" সম্পর্কেও দুইটি প্রবন্ধ ছিল। এই রচনাগুলির মধ্যে তাঁহার বিশ্লেষণ-ও গঠন-মূলক বুদ্ধির সহিত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত রচনা তাঁহার ২৩-৩১ বৎসর বয়সের চিন্তার সাক্ষী। আমরা এখানে তাঁহার সামাজিক দর্শনের কথা আলোচনা করিতেছি না এবং সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধাবলীর তালিকা সন্নিবিষ্ট করার প্রয়োজন বোধও করি না। মৃত্যুর চাব-পাঁচ মাস পূর্বে ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ তিনি আন্তর্জাতিক সমস্যা ও ইন্দোবৃটিশ প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁহার শেষ বাণী উচ্চারণ করেন। সেদিনও পর্যন্ত সমাজ-দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

সমাজদার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিনিষ্ঠা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর নৈতিক স্বরাজের প্রতিশব্দ বিবেচনা করিয়াছি। তাঁহার এই স্বাধীনতার মূর্তি ২৩ বৎসর বয়সেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। এই কথাটার উপর বর্তমানে জোর দিতে চাই। সেই সময় সামাজিক, ধর্ম-সম্বন্ধীয়, এবং অন্যান্য আচার-বিষয়ক তর্কাতর্কিতে তাঁহার এই প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে (১৮৮৪)। বস্তুতঃ স্বাধীনতানিষ্ঠা তাঁহার সর্বপ্রথম গদ্য-প্রবন্ধেই মূর্তি লাভ করিয়াছিল। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সেই গদ্য প্রবন্ধ। এই সমালোচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ তখন যোল বৎসরের কিশোর।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার রচনাগুলিকে তাচ্ছিল্য করা এবং সেগুলিকে তাঁহার পরবর্তী জীবনের প্রাপ্ত প্রশংসার অনুপযোগী বোধে অবহেলা করা রবীন্দ্রানুরাগীদের একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ, এই মনোভাব বিজ্ঞানসম্মত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল রচনার মধ্যেও তাঁহার চারিত্রিক ব্যক্তিত্বের অনেক-কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া এই সবের ভিতর "মনোবিকলন"-বিদ্যার জন্য গবেষণার বস্তু বেশ-কিছু পাওয়া যাইতে পারে।

মে ১৯৪৪

শরৎ-নজরুলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বঙ্গ-সাহিত্য

২রা মে ১৯৪৪

সুবোধ—বঙ্গ-সাহিত্যের অবনতি সাব্যস্ত কর্‌তে যদি কেহ চায়, তাহ'লে তার কাছে আপনি কিরূপ প্রমাণ দাবী কর্‌বেন?

সরকার—সোজা জবাব। তাকে দেখাতে হবে যে, ফি পাঁচ-পাঁচ বা দশ-দশ বছরে বাঙ্‌লার কাব্য, নাট্য ও গল্প আগেকার চেয়ে অবনত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল্‌তে পারি যে, যুক্তির ধারা হবে নিম্নরূপ ঃ—১৯০১-১০-এর কাব্য-নাট্য-গল্পের চেয়ে ১৯১১-২০-এর কাব্য-নাট্য-গল্প ছোটদরের ও ছোটবহরের চিজ। আবার তার চেয়ে নিকৃষ্ট চিজ ১৯২১-৩০-এর কাব্য-নাট্য-গল্প। ১৯৩১-৪০-এর কাব্য-নাট্য-গল্প ১৯২১-৩০-এর কাব্য-নাট্য-গল্পের চেয়ে নিকৃষ্ট, ইত্যাদি।

লেখক—আর একটু খুলে বল্‌বেন?

সরকার—রবীন্দ্র-সাহিত্য বাদ দিয়ে যাচ্ছি। ধরা যাক্ যেন ১৯১১—২০-এর যুগের ছোট-গল্পের আসরে গয়ার ব্যারিস্টার প্রভাত মুখোপাধ্যায় বাঙালী জাতের প্রতিনিধি। তার পরবর্তী দশকে (১৯২১-৩০) শরৎ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যের গল্প-মূর্তি। সৌরীন, চারু, অনুরূপা, নরেশ ইত্যাদি লেখক এই যুগের। আর ১৯৩১-৪০ সনের গল্প-মূর্তি বিভূতি-তারাশঙ্কর-প্রভাবতী-অন্নদাশঙ্কর-মাণিক ইত্যাদি। আমার মতন ম্যাড়াকাণ্ডকে বুঝাতে হবে যে, গল্পের ব্যক্তি, ঘটনা আর অবস্থা সৃষ্টি হিসবে প্রভাতের চেয়ে শরৎ নিকৃষ্ট, আর বিভূতি ইত্যাদি একালের লেখকেরা শরতের চেয়ে নিকৃষ্ট।

লেখক—আপনি একথা বিশ্বাস করেন না?

সরকার—না। আমার পক্ষে এইরূপ স্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু ফারাক দেখ্‌তে পাই। সে হচ্ছে নিম্নরূপ। প্রভাত-সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার বা ভাব-নিষ্ঠার ডোজ ছিল বেশী, বস্তুনিষ্ঠার ডোজ ছিল কম। শরৎ-সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার ডোজ কম, বস্তুনিষ্ঠার ডোজ বেশী। বিভূতি ইত্যাদি লেখকদের সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠার মাত্রা আরো চ'ড়েছে। তবে রোমাণ্টিকতা আজও গুল্‌জার। এতে বঙ্গ-সাহিত্যের অবনতি প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হয় সম্পদ-বৃদ্ধি, উৎকর্ষ-বৃদ্ধি। গড়ন-বৈচিত্র্য, আকার-প্রকারের বৈচিত্র্য, সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রমাণিত হচ্ছে।

লেখক—আরও হালের অবস্থা কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—দোল-সংখ্যার "আনন্দবাজার" খুলে দ্যাখ্ (৯ই মার্চ, ১৯৪৪)। ঘাট্‌তির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। গাল্পিকেরা সকলেই সুপরিচিত। নয়া লেখক একজনও দেখ্‌ছি না মনে হচ্ছে। এই যা। বিশ্বনাথ মণ্ডলের নাম আগে শুনিনি বোধ হয়। "দোস্ত্" গল্পটা লাগ্‌ছে ভালই। তারাপদ রাহা "মাস্টার"-গল্পে অবস্থাসৃষ্টির কায়দা দেখিয়েছেন। মনোজ বসুর "ভাই মাদার বিশ্বাস" আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আহ্বান" নতুন-নতুন শ্রেণী বা জাত্‌কে সাহিত্যের ভেতর ঠেলে তুল্‌তে পেরেছে। তারাশঙ্কর "সুরত-হাল রিপোর্ট" গল্পে বাউড়ি পর্যন্ত নেমেছেন। এ হচ্ছে "গণদেবতা" ও "পঞ্চগ্রাম"-এর পরবর্তী ধাপ। "কাঞ্চন-সংসর্গাৎ" গল্পে সুবোধ ঘোষ বেপারী বা বুর্জোআ জননায়কের চরিত্র বিশ্লেষণে হাত খেলিয়েছেন।

মন্বন্তর-বিশ্লেষণের গল্পে হৃদয়বিদারক শিল্প পাই অচিন্ত্য সেনগুপ্ত'র "শেষ-চিঠি"তে।

লেখক—কবিদের বেলায় কী বল্‌তে চান?

সরকার—আবার অরৈবিক কাব্য ধ'রে বল্‌ছি। ১৯১১-২০ সনের প্রতিনিধি মনে করা যাক্ সত্যেনকে। নজরুল ১৯২১-৩০-এর প্রতিনিধি। ১৯৩১-৪০-এর প্রতিনিধি ব'ল্‌বো বিবেকানন্দ-সজনী-বুদ্ধদেব-প্রেমেন-বিষ্ণু দে ইত্যাদি কবিদেরকে। সত্যেনের চেয়ে নজরুল আকারে-প্রকারে, বহরে-মুরোদে ছোট নয়। নজরুলের চেয়ে বিবেকানন্দ-সজনী-জসীমউদ্দিন-বিষ্ণু ইত্যাদি কবিদেরকে ছন্দে, বোলে, মালে খাটো বিবেচনা করা অসম্ভব। যার যেমন মর্জি কষ্টি-পাথর নিয়ে কাব্যের ওপর ঘষাঘষি সুরু করুক। চাই জরীপ,—বস্তুনিষ্ঠ জরীপ।

লেখক—আপনি কাব্য-ধারায় কোনো পরিবর্তন দেখ্‌তে পান না?

সরকার—কেন পাবো না? আগে ছিল ভাবুকতা, ভাবনিষ্ঠা বা রোমাণ্টিকতার মাত্রা বেশী। কিন্তু রোমাণ্টিক ভাবুকতা আজও মরে নি। স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদির জয়জয়কার দেখা যেত। সে-সব একালেও র'য়েছে। নতুনের মধ্যে এখন হয়ত কিছু বেশী-বেশী ঠাঁই পাচ্ছে "সবহারাদের গান"। এতে বাঙালী জাতের ঘাট্‌তি, অবনতি, বিলোপ বা ধ্বংস-সাধন প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হ্‌চ্ছে বাড়্‌তি, উন্নতি, প্রগতি, দিগ্-বিজয়।

লেখক—সহজে বুঝা যাবে কী ক'রে?

সরকার—রাধারাণী ও নরেনের "কাব্য-দীপালি" (১৯২৮) আর আইয়ুব ও হীরেনের "আধুনিক বাংলা কবিতা" (১৯৪০) বই দুটোর হাড়-মাস সর্বদা চিবুতে আরম্ভ কর্। বেশ মালুম হ'তে থাক্‌বে যে, বাড়্‌তির পথেই বাঙালী জাত্ আগুয়ান। নয়া-নয়া ছন্দে, নয়া-নয়া শব্দে আর নয়া-নয়া বাণীতে বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪১-৪৪ সনে যাদের বয়স পঁচিশ-ত্রিশের ভেতর তারাও ১৯০৫-০৮ সনের পঁচিশ-ত্রিশের কবিদের চেয়ে ছোটদরের নয়। চঞ্চল ও কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি লেখকের রচনায় জোর আছে। নয়া-দুনিয়া গড়্‌বার মালমশলা এঁদের কব্‌জায় র'য়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এরা সজনী-জসীমউদ্দিন-বিষ্ণু ইত্যাদিরও খানিকটা পরবর্তী দুনিয়ার বাসিন্দা।

সুভাষের "প্রস্তাব", কামাক্ষীর "মৈনাক" আর আবুলের "নব-বসন্ত"

লেখক—নেহাৎ ছোক্‌রা কবিদের রচনায়ও দুনিয়া গড়্‌বার ক্ষমতা দেখ্‌ছেন? লেখাগুলার ঢঙ কিরূপ? (পৃঃ ৫৬৩-৫৬৮)

সরকার—দুনিয়াকে ঠুকবার রক্তে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মানস গঠিত। এই জন্যই মনে হচ্ছে এই কবি নয়া-দুনিয়া গড়্‌তে পার্‌বে। শোন্ তার "প্রস্তাব" হ'তে দু-এক শ্লোক :—

"হা-ঘরে আমরা! মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির।
হে প্রভু! তুমিই শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল—
তাই তো আজিকে মন্ত্র নিয়েছি উপবাসীর!
ফলে নাই লোভ! তোমার গোলায় তুমি ফসল।
"হে সওদাগর ; সিপাই সান্ত্রী সব তোমার।

দয়া ক'রে শুধু মহা-মানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার,
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।'

লেখক—এই দুই শ্লোকের ভেতর কী দেখ্ছেন?

সরকার—কবি সুভাষের বয়স আজ বছর চব্বিশেক। কবিতাটা লেখা হ'য়েছে বোধ হয় বিশ বছর বয়সে। সংসারকে চিচিংফাঁক ক'রে দেখ্বার মগজ আছে এই কবির। বুঝেছে যে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রায় সব-কিছুই বুজরুকি-পূর্ণ, জুচ্চুরিতে ভরা মাল। এই সবের উপর চাবুক লাগিয়েছে চোস্ত-কড়া ঠাট্টার পশ্‌লা ছড়িয়ে। এই ধরণের ব্যঙ্গ-শ্লেষ সৃষ্টি কর্‌তে ক্ষমতার দরকার হয়। এই ধরণের মানুষ-সমালোচনা, সমাজ-সমালোচনা, সভ্যতা-সমালোচনা সৃষ্টিমূলক মেজাজেরই সাক্ষী। ভবিষ্যতে সুভাষের হাতে আরো অনেক-কিছুই বেরুবে। গুরু-চাণ্ডালীও আছে। ছন্দও জোরালো। আর কী চাই?

লেখক—ছোক্‌রা কবিদের আর এক-আধটা নমুনা দেখাবেন?

সরকার—কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের "মৈনাক, সৈনিক হও" কবিতাটা বোধ হয় বছর তেইশেকের কোঠায় লেখা। কয়েক লাইন নিম্নরূপ ঃ—

"মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা
মেদময় স্ফীত বৃদ্ধ জরা।
রক্তে জাগে পুরাণো সূর্যের ইতিহাস,
সে কি পরিহাস?
এ সুদীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রেত-পদক্ষেপে
স্মৃতিকে ক'রেছে পিরামিড।
আর সব ঊর্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মমি, হায়
শিশিরে ধূসর।
মৈনাক, সৈনিক হও।"

লেখক—কিছু বুঝা যাচ্ছে কি?

সরকার—কবির লড়াই চল্‌ছে "স্ফীত বৃদ্ধ জরা"র বিরুদ্ধে। "আয়ুহীন, বলহীন, মেদহীন, হীন" "জরদ্‌গব দিন"কে জ্বতোনো হচ্ছে কামাক্ষীর ধান্ধা। চায় সে "আরক্ত প্রহর" আর "মর্মরিত ঊর্মিবাণীময় জীবনের জয়"। মিশরের মমিকে কেওড়াতলায় পাঠাচ্ছে কামাক্ষীর মৈনাক। পুরাণো সূর্যকে দিয়ে সে আবার নয়া-রক্তের ও নয়া-জীবনের গান গায়িয়ে ছাড়্‌বে। বাক্যগুলার স্রোত চ'লেছে পাহাড়ী ঝোরার মতন,—হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে। কলিজাওয়ালা কবির দরদ ছন্দকে ছুটিয়েছে বিনা লাগামে,—অথচ সংযত ও সরসভাবে।

লেখক—কামাক্ষী আর সুভাষের কবিতা দুটা সমাজ-সচেতন। একালের বঙ্গ-কাব্যে অন্য কোনো সুর শুনা যায় না কি?

সরকার—তা হ'লে আবুল হোসেনের "নব-বসন্ত" (১৯৪০) বই-এর "সঙ্গীত" কবিতাটার কয়েক লাইন শোন্‌ ঃ—

'আমি হাসি কাঁদি গান গাই,
নিস্পৃহ সদাই।
জোছ্নার গাঢ় চৈতী নিশি মোর সনে
গলাগলি হ'য়ে হাসে পূবালি পবনে,
শ্রাবণের শ্রান্তিহীন নিঃশব্দ বাদল
নয়নে জমায় মোর গাঢ় অশ্রুজল।"

লেখক—এই কবির বয়স কত?

সরকার—কবিতাটা লেখা হ'য়েছিল বোধহয় সতর-আঠার বছর বয়সে। শেষ শ্লোকটা নিম্নরূপ ঃ—

"হে অজানা, হে অচেনা নাহি নাহি জানি
অলক্ষ্যে প্রসারি পাণি
কোথা তুমি রহিয়াছ স্বপন-বিভোর!
তবু মোর
জীবনের আনন্দের ক্ষুদ্র ক্ষুর কণাগুলি ধরি
অনামী লেফাফা ভরি
উড়ায়ে দিলাম নিরুদ্দেশে
তুমি কি গ্রহণ তারে করিবে না কভু ভালবেসে?"

লেখক—আবুল হোসেনের কাব্যশক্তি সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—কল্পনা আছে। এই হচ্ছে বড় কথা। "নব-বসন্ত"র অন্যান্য কবিতায়ও আবুলের কল্পনা-শক্তি মূর্তি পেয়েছে। তথা-কথিত গদ্য-কাব্য" এসব নয়। সিঁড়ি-কাটা গদ্যের মতন যেগুলা দেখায়, সেগুলার ভেতরও ছন্দের গতিভঙ্গী আছে। ছান্দসিক সংযমও আছে, রসও আছে। প'ড়্বার সময় হোঁচট্ খেতে হয় না। হড়-হড় ক'রে পড়া যায়। আবুলের বিষয়বস্তু রকমারি।

লেখক—আবুলের অন্য সুরও আছে?

সরকার—প'ড়ে দ্যাখ্ "আমরা বাংলাদেশের মেয়ে"—কবিতার কয়েক লাইন।

লেখক—আচ্ছা পড়্ছি ঃ—

"আজকের দিনে রান্নাঘরের অন্ধকারার
মাঝে যে মেয়ে ব'সে
টীনের বাসন মাজে, মস্‌লা পিষ্‌তে চোখ
ভ'রে আসে জলে
তাদেরো অন্ধ জীবনের তলে উঁকি-ঝুঁকি
মারে রাজকুমার।
বোর্‌খার বেড়া ভেঙে ছুটে আসে
মালবিকা-মদনিকা।
রাজকুমারীর টীকা কপালে তার ; সেও খোঁজে তার
রাজকুমার।"

এই কবিতার মানে কী?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর শ্রেণী-সংগ্রামের যুগেও সমাজ-সচেতন ছোক্‌রা কবি বুঝেছে

যে, মান্ধাতার আমলের রাজকুমার-খোঁজ দস্তুর-মতনই বজায় আছে। মেয়েদের রাজকুমার-স্বপ্ন বা রাজকুমার-নেশা একমাত্র মধ্যযুগের মাল নয়। সাহিত্যের রাজকুমার-সৃষ্টিকে সামন্ত-যুগের একচেটিয়া মানসবিলাস স'ম্‌ঝে রাখা আহাম্মুকি। এ চিজ্‌ হচ্ছে সনাতন ও সার্বজনিক। এখানে একাল-সেকাল ফারাক করা ঝকমারি। দুনিয়ার কোনো-কিছুর উপরই অদ্বৈতবাদী সামাজিক ব্যাখ্যা, আর্থিক ব্যাখ্যা বা রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা চাপানো সম্ভবপর নয়। সাহিত্যের আর শিল্পের অনেক বিষয়-বস্তুই কাল-হীন ও দেশ-হীন,—অতএব সমাজের অতীত। অর্থাৎ যে-কোনো সমাজের আবহাওয়ায়ই কোনো নির্দিষ্ট ঢঙের সৃষ্টি বা গড়ন কায়েম করা সম্ভব।

শরৎ-সাহিত্যে ব্যবসাদারি

লেখক—স্বাধীন চিন্তার সাক্ষী স্বরূপ কোনো আধুনিক বাংলা বইয়ের নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—নানা ক্ষেত্রের নানা বইয়েই লেখকদের স্বাধীন চিন্তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাহিত্য-সমালোচনার আসরে উল্লেখ করতে পারি 'শরৎ-সাহিত্যে নারী" (১৯৩৭)। লেখকের নাম প্রমথনাথ পাল। "দত্তা"-পরিচয় ব'লে তাঁর আর একটা শরৎ-সাহিত্য-বিষয়ক বই আছে। এঁর "মহাপ্রাণ শাসমল" (১৯৩৯) সুন্দর জীবন-বৃত্তান্ত। তা ছাড়া "গ্রাম্য-বালিকা", "দেবেন" ইত্যাদি গল্প-গ্রন্থও এই হাতে বেরিয়েছে। প্রমথ পাল "দেশপ্রাণ" মাসিকের সম্পাদক।

লেখক—"শরৎ-সাহিত্যে নারী" বইয়ে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে স্বাধীনতা দেখ্‌ছেন?

সরকার—এই বইয়ের ভেতর শরৎ সম্বন্ধে ঠোঁটকাটা সমালোচনা আছে। বই বেরিয়েছিল শরৎ বেঁচে থাক্‌বার সময়েই। এইজন্য স্বাধীন চিন্তার সাক্ষী হিসাবে বইটা বেশ-কিছু দামী।

লেখক—স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় কোথায়?

সরকার—শরৎ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রমথ পাল বল্‌ছেন যে,—টাকা রোজগারের মতলবে কোনো-কোনো গল্প, চরিত্র বা অবস্থা সৃষ্টি করা হ'য়েছে। এই মতটা জোরের সহিত প্রকাশ করা বাহাদুরির লক্ষণ। বইটার লেখক খাদির-নদারৎ।

লেখক—কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা কী ভেবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে?

সরকার—কী ভেবে? হাজার কথা ভেবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি অসংখ্য মতলব থাক্‌তে পারে। অন্যতম মতলব হচ্ছে পয়সা কামানো।

লেখক—পয়সা-রোজগারের লোভে কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা সাহিত্যের বিষয়বস্তু বেছে নেয়?

সরকার—ঠিক তাই। "শরৎ-সাহিত্যে নারী"র ভেতর কী আছে দেখ্‌বি?

লেখক—দেখি। আচ্ছা, পড়্‌ছি ঃ—

"শরৎচন্দ্র কি যুগপৎ সময়-সেবী অথচ শিল্পী ও কবি হইতে চান? দুই বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চাতুরী মাত্র।" (পৃঃ ১০)

"শরৎ-সাহিত্যের বহু স্থানে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা সুন্দর হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ছদ্ম স্বার্থ ও নিপীড়িত যুবক-মনের পরিতৃপ্তির বাসনাটা জাগ্রত ছিল মনে হয়।" (পৃঃ ১১)

শরৎকে "ব্যবসায়াত্মক" বলা হ'য়েছে (পৃঃ ১৫১)

সরকার—ঐ ধরণের কথা প্রমথ পালের বইয়ে অনেকবার আছে। এই দ্যাখ্ আবার।

লেখক—তাই তো।

"শরৎচন্দ্রের মনে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিটাও কম নাই মনে হয়। এই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে "গৃহদাহ" জাতীয় পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়া কল্পনা-প্রবণ বাঙালী জাতির নিপীড়িত যুবক-মনের সাময়িক উত্তেজনাপ্রদ কিছু কিছু খোরাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র একথা ভালই বুঝেন—এই জাতীয় পুস্তক * * * লেখকের পকেট পূর্ণ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।" (পৃঃ ১৬৯-১৭০)

প্রমথ পালের মত কতটা যুক্তিসঙ্গত?

সরকার—অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। প্রমথ পালের কথাগুলা নেহাৎ ফেলিতব্য চিজ নয়।

লেখক—টাকা রোজগারই শরৎ-সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য?

সরকার—তা তো বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে,—অন্যতম লক্ষ্য। প্রমথ পালের মতে শরৎ খুব হুসিয়ার লেখক। একবার ছোকরাদের ট্যাঁক থেকে টাকা আদায় কর্‌তে ওস্তাদ। তারপরেই আবার বুড়োদের প্যাঁট্‌রা খালি কর্‌বার ক্যার্‌দানিও তাঁর আছে শরৎ শেয়ানা লেখক।

লেখক—কোথায় ব'লেছে দেখি?

সরকার—এই পড়্। (পৃঃ ১৭২)

লেখক—"শরৎচন্দ্র যুবক মনের উগ্র উত্তেজনাসূচক একখানি রচনা প্রকাশ করিতেছেন। আবার সংরক্ষণশীল জনসাধারণের বাঁধন-কষণের দিক্‌টা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাহাদের রুচি-মাফিক রচনা বাহির করিয়াছেন। আমরা ইহা ব্যবসায়াত্মক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সুবিধা গ্রহণের দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি।"

সরকার—এই উপলক্ষ্যে একটা প্রায়-সর্বজনিক কথা জেনে রাখা ভাল। ব্যবসাদারি একমাত্র শরৎ-সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ নয়। যে-কোনো কবি-গাল্পিক-নাট্যকার-সিনেমালেখক পয়সার দিকে নজর রেখে মাল পরিবেষণ কর্‌তে অভ্যস্ত। যে-যে সাহিত্য-সেবার গল্প বিক্রী হয় না, তারা একমাত্র বা প্রধানতঃ শিল্প-সম্পদ্, আদর্শ-নিষ্ঠা ইত্যাদি চিজ চালাতে সমর্থ। কিন্তু কবিতা, গল্প, নাটক আর ছবির বই বিক্রী সুরু হওয়া মাত্র সাহিত্য-সেবীদের আন্তরিক শিল্প-দরদ আর আদর্শ নিষ্ঠা বেশ-কিছু চাপা পড়্‌তে বাধ্য।

লেখক—এই কথা বিশ্বাস-যোগ্য কি?

সরকার—বাজার-মাফিক শিল্প-প্রচার সাহিত্য-দুনিয়ার অতি-সোজা দস্তুর। সাহিত্য-সমালোচকেরা এই কথাটা সাধারণতঃ মনে রাখে না। এইজন্য সাহিত্যের দর-যাচাই সম্বন্ধে অনেক সময় ভুলচুক সৃষ্ট হয়। গল্প-নাটকের দৌলতে পয়সা-রোজগারের মাত্রা ইয়োরামেরিকায় লাখ-লাখ ছাড়িয়ে যায়। আমাদের দেশে গাল্পিক-নাট্যকারদের আয় বোধ হয় মাসিক শ'চারেক-পাঁচেকের বেশী হয় না। যাহোক,—এই কোঠায় উঠ্‌বা মাত্র সাহিত্য-স্রষ্টারা বুর্জোআ হাজারি-চার-হাজারিদের মেজাজ অল্পবিস্তর পেয়ে বসে।

লেখক—আপনি কি বল্‌ছেন যে,—আয়ের মাত্রার উপর সাহিত্য-স্রষ্টাদের শিল্প-দরদ ও আদর্শ-প্রচার বেশ-কিছু নির্ভর করে?

সরকার—ঠিক ধ'রেছিস্। প্রথম অবস্থায় দেখ্‌তে হবে যে, কবি-গাল্পিক-নাট্যকারের আয় একদম নাই। এই সময়ে শিল্প-দরদ আর আদর্শ-নিষ্ঠা কোনো নির্দ্দিষ্ট ধরণের চিজ,—বেশ ঝাঁঝাল মাল। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে আয়ের সূত্রপাত আর পরিমাণে ক্রমিক বৃদ্ধি। সংসার

চালানো সম্ভব। সাহিত্য-স্রষ্টারা এই ধাপে উঠে আদর্শ, শিল্প ইত্যাদি চিজ খানিকটা বদ্‌লাতে সুরু করে। কিছু-কিছু পান্‌শে জোলো মাল পরিবেষণ ক'র্‌তে থাকে। তৃতীয় ধাপের কথা ব'লেছি মাসিক শ'চার-পাঁচেকের অবস্থা। তখন লেখকেরা পুঁজিপন্থী শ্রেণীর লোক। দরদ, কলিজা, আদর্শ, ধরণ-ধারণ, দৃষ্টিভঙ্গী, হাবভাব সেই অবস্থায় বিলকুল আলাদা। অনেকটা মামুলি "খাড়া-বড়ি-থোড়" অথবা শুষ্কং কাষ্ঠং ছাড়া বেশী-কিছু পাওয়া যায় না,—বেশ-কিছু আয়শীল লেখকদের কলমে। তখন এঁরা ঠিক যেন সমাজপতি দাঁড়িয়ে যান। স্রষ্টার আবেগ, আনন্দ বা উন্মাদনা মিয়িয়ে আসে। চলে গড্ডলিকা-প্রবাহ বা চর্বিত-চর্বন অর্থাৎ পুরোণোর এপিঠ-ওপিঠ।

লেখক—বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার এই ফর্মূলা (সূত্র) খাট্‌বে কি?

সরকার—আজকাল যে ক'জন কবি-গাল্পিক-নাট্যকার সাহিত্যের বাজারে ঠিকানা কায়েম ক'রেছে তাদের বয়স আর আয়ের পরিমাণ খতিয়ে দ্যাখ্‌। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পুরোণো লেখাগুলোর সন-তারিখের হিসেব কর্‌। দেখ্‌বি শিল্প-দরদ, আদর্শ-নিষ্ঠা, "ইজ্‌ম্‌"-প্রীতি ইত্যাদি চিজের ধারা প্রায়-সকল ক্ষেত্রেই এই অধমের প্রচারিত ধারা মাফিক চল্‌ছে। একটু-আধটু ব্যতিরেকও অসম্ভব নয়। মাঝে-মাঝে মার্ক্‌স্‌-মিএগার "আর্থিক ব্যাখ্যা" মনে রাখা ভাল। তবে অদ্বৈতবাদীর কায়দায় শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির উপর আয়ের একচেটিয়া প্রভাব জাহির কর্‌তে যাওয়া ঠিক হবে না।

("সামাজিক যোগাযোগে পয়সাওয়ালা ও সাহিত্য-স্রষ্টা", "মেজাজে-মেজাজে লড়াই")

স্বদেশী যুগের সাংবাদিক

৫ই মে ১৯৪৪

সুবোধ—ভারতীয় সাংবাদিক-সঙেঘর সভায় (১৫ই এপ্রিল) প্রফুল্ল সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে দুএক কথা ব'লেছেন দেখ্‌লাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল কি?

সরকার—হাঁ। স্বদেশী যুগের পূর্বেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯০২-০৫ সনে ডন সোসাইটিতে আমরা ছিলাম সতীশ মুখোপাধ্যায়ের চেলা। এই সম্পর্কে প্রফুল্ল সরকার (১৮৮৩-১৯৪৪) এই অধমের "গুরুভাই"। কিন্তু বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে এই কথাটা জানা ছিল না।

লেখক—খবরটা পেলেন কোথায়? কবে?

সরকার—১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার আফিস ছিল কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূব কোণে। সেই অফিসে স্বদেশী যুগের বন্ধু মাখন সেনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে আলাপ হয় প্রফুল্ল সরকারের সঙ্গে। সেখানে সত্যেন মজুমদারকেও দেখি। তখন জান্‌তে পেলাম ডন সোসাইটির মারফৎ প্রফুল্ল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের কথা।*

* বিনয় সরকার প্রণীত "প্রফুল্ল সরকারের একাল-সেকাল" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৪)।

লেখক—স্বদেশী যুগের সাংবাদিকদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল?

সরকার—সে-যুগে (১৯০৫-১৪) সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী এই দুই শব্দের কোনোটাই চালু হয়নি। এমন কি "জার্নালিস্ট্" বোল্‌টাও কল্‌কাতার বাঙালী সমাজে সুপ্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। তখনও এদিকে সত্যিকার একটা পেশা দাঁড়ায় নি। ১৯২৫-এর পর দেখ্‌ছি সংবাদপত্র-সেবা একটা আর্থিক বৃত্তি, জীবনযাত্রার উপায় বা পেশা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সাংবাদিকতা হচ্ছে হালের একটা নয়া পেশা।

লেখক—তখনকার দিনের কাগজওয়ালাদেরকে আপনি চিন্‌তেন?

সরকার—১৯০৫-১৪ সনে আমি চ্যাংড়া বই তো নয়। বয়স আঠারো—সাতাইশ মাত্র। "বেঙ্গলী"র সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আর 'অমৃতবাজারের" মতি ঘোষ ছিলেন নামজাদা সম্পাদক। তাঁদের পিঠ্‌চাপ্‌ড়ানো মাঝে-মাঝে খেয়েছি বই কি। অমৃতবাজারের পীযূষ ঘোষ, গোপাল ঘোষ, মৃণাল ঘোষ ইত্যাদি "সাংবাদিক"দের মারফৎ এই অধমের লেখালেখি সমালোচিত হ'তো। "বেঙ্গলী"তে প্রচার হ'তো সুরেন্দ্র-শিষ্য উকিল-সাংবাদিক শচীন মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ। পীযূষ, শচীন ইত্যাদি লেখকেরা আমার "শিক্ষা-বিজ্ঞান"-সাহিত্যের আর "সাধনা", "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" ইত্যাদি বইয়ের গুণগ্রাহী ছিলেন।

লেখক—বাংলা কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ কেমন ছিল?

সরকার—"হিতবাদী" হাত বদ্‌লেছিল কয়েকবার। প্রথমে মনে পড়্‌ছে সম্পাদক মারাঠা-বাঙালী সখারাম গণেশ দেউস্করকে। তিনি ছিলেন ন্যাশন্যাল কলেজে আমাদের সহযোগী বা সহকর্মী অধ্যাপক। কাজেই বন্ধুবর্গের অন্তর্গত। তারপর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারী সরকারকে দেখি। বিহারী সরকার আমার "সাধনা" বইয়ের সমালোচনায় ব'লেছিলেন ঃ—"এ বই স্বদেশসেবার বই হ'তে পারে, ন্যাশন্যালিস্ট-পন্থী হ'তে পারে। কিন্তু এর ভেতর হিন্দুত্ব নাই।" ঠিকঠাক কথাগুলো মনে পড়্‌ছে না। এই ধরণের একটা মন্তব্য পাওয়া গিয়েছিল। বোধহয় ১৯১২-সনের কথা।

লেখক—আর কোনো বাংলা কাগজ ছিল?

সরকার—পাঁচকড়ির হাতে 'নায়ক" চল্‌তো বোধ হয় ১৯১১-১৪ সনে। এই অধম তাঁর পছন্দসই ছিল। দৈনিক "বসুমতী"তে ছাপ্‌বার জন্য নলিনী পণ্ডিত আমার "সাহিত্য-সেবী" নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯১১ সনের কথা। সম্পাদক ব'লেছিলেন ঃ—"এর ভেতর বই-প্রকাশের ব্যবসা আছে। বুঝেছি,—তোমরা পরে টাকা রোজগার কর্‌তে চাও। কাজেই এটা ছাপ্‌তে পারি বিজ্ঞাপন হিসাবে। তার জন্য টাকা চাই।"

লেখক—কী করলেন?

সরকার—'সাহিত্য-সেবী" ছাপা হ'য়েছিল "প্রবাসী"তে আর অন্যান্য পত্রিকায়। কোনো সম্পাদক এটাকে কোনো ব্যবসার বিজ্ঞাপন সম্‌ঝে নি।

লেখক—"বন্দেমাতরম্"-এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল?

সরকার—সে হচ্ছে ১৯০৬-০৮ সনের কথা। অরবিন্দ ও বিপিন পাল দুজনই ছিলেন মুরুব্বি। দুজনেরই পিঠ-চাপ্‌ড়াও খেয়েছি।

লেখক—"সঞ্জীবনা"র সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল?

সরকার—"সঞ্জীবনী"র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁর কাগজে বইয়ের সমালোচনা বেরুতো। কৃষ্ণকুমারের মেয়ে কুমুদিনী ছিলেন "সুপ্রভাত" মাসিকের সম্পাদক। এই পত্রিকায় কয়েকটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। কুমুদিনী পরে স্বদেশী-বীর শচীন বসুর

পত্নী হন।

লেখক—মাসিক পত্রের সম্পাদকদের কে-কে চেনা ছিল?

সরকার—"প্রবাসী"-"মডার্ণ রিভিউ"য়ের রামানন্দ ছিলেন মুরুব্বিদের অন্তর্গত। "নব্যভারত"-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, "আর্যাবর্ত"-সম্পাদক হেমেন ঘোষ, "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক জলধর সেন, "সাহিত্য"-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি ইত্যাদি লেখকেরা সেকালে প্রবীণ। এঁরা সকলেই সুনজরে দেখ্‌তেন। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে এঁরা এই অধমকে নিজের লোক ভাব্‌তে অভ্যস্ত ছিলেন।

লেখক—আপনি নিজে কখনো সাংবাদিক ছিলেন?

সরকার—তখনকার দিনে "গৃহস্থ" মাসিক সম্পাদিত হ'তো এই হাতে ১৯১১ সন হ'তে। প্রকাশক রামরাখাল ঘোষ। কিন্তু মাসিক-পত্র-সম্পাদনকে আমি সাধারণতঃ সাংবাদিক পেশার অন্তর্গত করি না। এই হিসাবে আমি সাংবাদিক নই। এ-কালে নরেন লাহার সাহায্যে "আর্থিক উন্নতি" মাসিক চালাচ্ছি ১৯২৬ হ'তে আজও আমাকে সাংবাদিক বলা চল্‌বে না।

সাংবাদিক কাহাকে বলে?

লেখক—সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী তাহ'লে কাকে বল্‌বো?

সরকার—দৈনিক কাগজের সম্পাদক বা নিয়মিত লেখক হওয়া চাই। এই হচ্ছে সাংবাদিকের প্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ হ'লো প্রতিদিনকার রাষ্ট্রিক সংবাদ সম্বন্ধে টীকা-টিপ্পনী ঝাড়া, মতামত প্রকাশ করা, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা। এই দুটো লক্ষণ যে-সকল লেখকের রচনায় প্রধান নয় তাদেরকে সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী বল্‌তে আমি রাজি নই। পারিভাষিক হিসাবে আমাকে সাংবাদিক বলা উচিত নয়। নিত্য-নৈমিত্তিক রাষ্ট্রনীতি-চর্চা এই অধমের কলমে অজ্ঞাত। তাছাড়া দৈনিক কাগজ কোনো দিনই চালাই নি।

লেখক—তাহ'লে স্বদেশী যুগের মাসিক-সম্পাদকেরা সাংবাদিক ছিলেন কি?

সরকার—সাংবাদিকের তৃতীয় লক্ষণ এখনো বলিনি। তা হ'চ্ছে কাগজ চালিয়ে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করা। মাসিক পত্রিকা যদি কোনো সম্পাদক, লেখক বা প্রকাশকের পক্ষে রোজগারের পথ হয় তাহ'লে মাসিক-চালানোকে সাংবাদিকতার অন্তর্গত ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। "প্রবাসী" আর "মডার্ণ রিভিউ" মাসিক বটে, কিন্তু সম্পাদকের পক্ষে এই দুই পত্রিকা ছিল অন্ন-সংস্থান। কাজেই রামানন্দ ছিলেন সত্যিকার সাংবাদিক। বস্তুতঃ তাঁর পক্ষে কলেজের মাষ্টারি ছেড়ে মাসিক নিয়ে প'ড়ে থাকা সেকালে জবরদস্ত্ বীরত্বের লক্ষণ।

লেখক—রামানন্দকে শুধু এই কারণে সাংবাদিক বল্‌ছেন?

সরকার—না। তাছাড়া তাঁর "প্রবাসী" আর "মডার্ণ-রিফিউ" দুইই ছিল রাষ্ট্রিক ঘটনা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনী আর প্রবন্ধের বাহন। এই কাগজ দুটা ছিল বিলকুল দৈনিকের মতন। "বেঙ্গলী", "অমৃতবাজার", আর "বন্দেমাতরম্" ইত্যাদি দৈনিক এবং "হিতবাদী", "বসুমতী" ও "সঞ্জীবনী" এই কয় সাপ্তাহিকের জুড়িদার ছিল "মডার্ণ রিভিউ" আর প্রবাসী"।

লেখক—"হিতবাদী"'র কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে কখনো দেখেন নি?

সরকার—দেখেছি ব'লে মনে প'ড়ছে না।

লেখক—তাঁর স্বদেশী যুগের কাজকর্ম কতটুকু জানেন?

সরকার—কাব্যবিশারদের "যায় যাবে জীবন চ'লে" গানটা আমাদের মুখে-মুখে চল্‌তো, আর জানা ছিল "ভাইয়া, দেশকা য়হ্‌ ক্যোয়া হাল?" তা ছাড়া জাপান থেকে ফিরবার পথে তিনি মারা যান। সেই সময়ে তিনি ব'লেছিলেন যে,—"জাপানীরা ভারতের বন্ধু নয়।" এই মন্তব্যটাও বাঙালী সমাজে খুব ছড়িয়ে প'ড়েছিল (১৯০৬-০৭)।

লেখক—"বঙ্গবাসী" সম্বন্ধে কিছু বল্‌লেন না তো?

সরকার—"বঙ্গাবাসী"তেই বিহারী সরকার লিখেছিলেন (১৯১২) যে, এই অধমের "সাধনা" স্বদেশী বটে, কিন্তু হিন্দু নয়। "সামাজিক স্বাধীনতা" শব্দটা আমার লেখার ভেতর ছিল। এই শব্দের মানে কি তিনি সমালোচক হিসাবে জান্‌তে চেয়েছিলেন। স্বরাজী ভারতে "নতুন ধরণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র" দেখা দেবে এই বিশ্বাসও বইটার মারফৎ প্রচার ক'রেছিলাম। বিহারী জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন ঃ—"এই চিজটা কী?" অবশ্য তাঁর সমালোচনায় ব্যবহৃত শব্দগুলা আমার মনে নাই। (পৃঃ ৬১৮ দ্রষ্টব্য)

লেখক—আপনাকে কেউ যদি সাংবাদিক বলে তাহ'লে আশ্চর্য হবেন?

সরকার—আশ্চর্যের কিছু নাই। বাঙলাদেশের প্রায় প্রত্যেক বাংলা আর ইংরেজি লেখকই এই অধমের মতন সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী!

লেখক—কেন?

সরকার—পারিভাষিক হিসাবে সাংবাদিক অনেকে নয়, কিন্তু প্রায় সকল লেখকই বিস্তৃত অর্থে সাংবাদিক। কেন না দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে লিখেই বাঙলা অধিকাংশ কবি, গাল্পিক, প্রাবন্ধিক, আর ইতিহাস-ও-দর্শন-গবেষক বঙ্গ-সংস্কৃতির সেবা বা সৃষ্টি ক'রেছে। আগে পত্রিকার লেখক তারপর গ্রন্থকার,—এই হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক বাঙালী সংস্কৃতি-সেবকের দস্তুর। ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর এমন কোনো বাঙালী লেখক বোধ হয় নাই যার সঙ্গে কোনো-না-কোনো দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের সক্রিয় যোগাযোগ নাই। এই হিসাবে বাঙ্‌লার প্রায় প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকই সংবাদপত্রসেবী। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রের বাঙালী স্বদেশ-সেবকেরাও প্রায় সকলেই সাংবাদিক।

লেখক—সাংবাদিকতার আরেক তরফ হ'তে প্রশ্ন কর্‌ছি। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকেরা আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ চালিয়ে-প্রশ্নোত্তরের আকারে আপনার মতামত প্রকাশ ক'রেছে?

সরকার—অনেকবার অনেক দেশে।

লেখক—বিদেশী দৈনিকে আপনার সঙ্গে সম্পাদকীয় কথাবার্তার বৃত্তান্ত বেরিয়েছে?

সরকার—জাপানী, মার্কিণ, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান পত্রিকায় এই অধমের মতামত একাধিকবার ছাপা হ'য়েছে,—১৯১৪-২৫ আর ১৯২৯-৩১ সালের ভেতর।

লেখক—বাঙলাদেশের বাইরে ভারতীয় দৈনিকে আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ প্রকাশিত হ'য়েছে?

সরকার—বম্বে, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরের দৈনিকে বেরিয়েছে,—১৯২৫-এর পরবর্তী কালে।

লেখক—বাঙলাদেশের কোন্‌-কোন্‌ কাগজে বেরিয়েছে?

সরকার—অমৃতবাজার, ফরোআর্ড, আনন্দবাজার, অ্যাড্‌ভান্স, ইংলিশম্যান, লিবার্টি, হিতবাদী ইত্যাদি কাগজে। সবই ১৯২৫-এর পরবর্তীকালে। এই সকল মোলাকাতের সংখ্যা গুন্‌তিতে অনেক। কথাবার্তার বিষয়বস্তুও রকমারি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—সব-কিছু

সম্বন্ধেই এই অধমকে পত্রিকা-সম্পাদকেরা জেরা ক'রেছেন।

"ফরোআর্ড"-এর "বিদেশী-সংবাদদাতা"

লেখক—আপনি দৈনিকে কখনো লেখেন নি?

সরকার—লিখেছি বই কি? কিন্তু সে-সব লেখা সাপ্তাহিকে, মাসিকে, আর ত্রৈমাসিকেও বেরুতে পার্‌তো। কোনো বইয়ের কতকগুলা অধ্যায় ভিন্ন-ভিন্ন প্রবন্ধের আকারে দৈনিকে বেরিয়েছে। তাকে সাংবাদিকের লেখা বলে না। দৈনিকে লিখ্‌লেই সাংবাদিক হওয়া যায় না। তবে একবার ঘটনাচক্রে সত্যিকার সাংবাদিক হ'তে হ'য়েছিল,—কিছুকালের জন্য।

লেখক—কখন? কী উপলক্ষে?

সরকার—তখন সুইটসার্‌ল্যাণ্ডে ছিলাম। লুগানো শহরে বা পল্লীতে। হঠাৎ সুভাষ বসুর টেলিগ্রাম পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চিঠি। চিত্তরঞ্জনের "ফরোআর্ড" দৈনিক তখন সবে বেরিয়েছে বা বেরোয়-বেরোয় হ'য়েছে। ১৯২৩ সন।

লেখক—সুভাষের চিঠিতে কী ছিল?

সরকার—"ফরোআর্ড"-এর জন্য এই অধমকে "বিদেশী-সংবাদদাতা" বাহাল করা হ'য়েছিল। আমার উপর ভার ছিল ফরাসী, ইতালিয়ান আর জার্মাণ ভাষায় প্রচারিত বিশ্ব-সংবাদ টেলিগ্রাফে 'ফরোআর্ড"কে পাঠাবার। চিঠিতে লেখা ছিল,—"রয়টারকে হারাতে হবে।"—এই কথাটায় খুব খুশী হ'য়েছিলাম।

লেখক—আপনি কী ক'র্‌লেন?

সরকার—বুঝ্‌লাম,—বাঙালীরা বাচ্চারা এতদিনে সজ্ঞানে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারে ঝুঁকেছে। কম্‌-সে-কম্‌ সংবাদপত্র-সেবায় বাঙ্‌লার যুগান্তর এসেছে বা আস্‌ছে। চিঠি পেয়েই লুগানোর তার-আফিসে খবর নিলাম,—আমার দেওয়া খবর সাংবাদিকদের শস্তা হারে ফরোআর্ডে পাঠাবে কি না। তক্ষুনি তারা লণ্ডনের সঙ্গে কথা ক'য়ে রাজি হ'লো। বল্‌লে,—"কুছ পরোআ নাই। ফরোআর্ডের জনা খবর তোমার কাছ থেকে বিনা পয়সায় পাঠিয়ে দেবো। পয়সা আদায় ক'রে নেবো কল্‌কাতা থেকে লণ্ডনের মারফৎ।"

লেখক—আপনি 'ফরোআর্ড'-এর জন্য "বিদেশী সংবাদদাতার" কাজ কিছু ক'রেছিলেন কি?

সরকার—প্রথম সংবাদটা ছিল তুর্কি সম্বন্ধে। সেই সময় সুলতানকে খেদিয়ে দেয় কমাল পাশা। ফরাসী-ইতালিয়ান-জার্মাণে নানা মন্তব্য প্রচারিত হ'লো। সেই সবের চুম্বক তারে ছেড়ে দিলাম। মাত্র কয়েক লাইনেই দেখি লাগ্‌লো পঁচিশ টঙ্কা। চক্ষু স্থির!

লেখক—তারপর কী হ'লো?

সরকার—বুঝলাম,—অত টাকা খরচের ক্ষমতা বাঙালীর মুরোদে জুটবে না। তারে জানালাম সুভাষকে, "ভায়া, এসব এলাহি কারখানা পোষাবে না, সন্দেহ হচ্ছে। হপ্তায়-হপ্তায় চিঠি ছাড়া যাবে ডাকে। তাতেই যথেষ্ট। ক্বচিৎ-কখনো তারাঘাতেও চল্‌তে পারে। কিন্তু তার-বিলাস বর্জনীয়,—নিত্যনৈমিত্তিকভাবে।"

লেখক—কী জবাব পেলেন?

সরকার—সুভাষ তখন জেলে। ফরোআর্ডের দপ্তর থেকে তার মামা বীরেন দত্তর জবাব

এলো—"তাই সই"। তারপর থেকে ফী সপ্তাহে একটা ক'রে চিঠি ঝেড়েছি যতদিন বিদেশে ছিলাম। ১৯২৩ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর হ'তে ১৯২৫ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাইশ-তেইশ মাস এই অধমের চিঠি নিয়মিত বেরিয়েছে ফরোআর্ডে। সেই সব কল্‌কাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরের নানা কাগজে উদ্ধৃতও হ'তো। সুতরাং বল্‌তে বাধ্য যে, প্রায় বছর দুয়েক আমি পারিভাষিক হিসাবেও সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী ছিলাম। অতএব একালের অনেক বাঙালী সাংবাদিকের আমি বড়্‌দা!

লেখক—ফরোআর্ডের এই কাজটা সাংবাদিক-কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য?

সরকার—"ফরোআর্ড"ই বোধহয় বাঙালী দৈনিকের ভেতব বাঙালীর বাচ্চাকে সর্বপ্রথম "বিদেশী-সংবাদদাতা" বাহাল ক'রেছে। বিদেশী লোকজন বাহাল ক'রে সংবাদ আমদানি করা বোধ হয় ফরোআর্ডের আগেও ঘ'টেছে। "বেঙ্গলী", "অমৃতবাজার পত্রিকা" ইত্যাদি দৈনিকের প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গবেষকেরা খাঁটি খবর দিতে পার্‌বে। এই অধমই বোধহয় বাঙালী সাংবাদিকদের ভেতর কাল-হিসাবে "সর্বপ্রথম" "বিদেশী-সংবাদদাতা"।

গল্প-সাহিত্যে সাংবাদিক

লেখক—কাগজে-কাগজে দেখ্‌লাম আপনি ব'লেছেন যে প্রফুল্ল সরকারের মতন সংবাদপত্রসেবী পৃথিবীতে খুব কম আছে। এর মানে কী?

সরকার—মানে সোজা। ভায়া, আমরা গোলামের বাচ্চা। এই জন্য যখ-- তখন আমরা যে-কোনো স্বাধীনদেশের লোক-জনকে হাতী-ঘোড়া ভাব্‌তে অভ্যস্ত। আমাদের বিশ্বাস,—ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, রুশ, মার্কিণ, ইতালিয়ান, জাপানী ইত্যাদি সংবাদপত্রসেবীরা হোমরা-চোমরা কিছু। এই ধারণা চরম ভুল। এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখক—প্রফুল্ল সরকারের বিশেষত্ব কী?

সরকার—লোকটা সাংবাদিকের কাজ কর্‌তে-কর্‌তেই গল্প, উপন্যাস ও গবেষণা চালাতে পার্‌তো। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে লিখেছে জীবন-বৃত্তান্ত (১৯৩৪)। লোকসংখ্যা আর সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" (১৯৪০) তার গবেষণা-শক্তির আর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাছাড়া গাল্পিক হিসাবেও প্রফুল্ল তারিফযোগ্য।

লেখক—প্রফুল্লকে উপন্যাস-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন?

সরকার—ঘটনাসৃষ্টি কর্‌বার ক্ষমতা ছিল প্রফুল্ল'র। সঙ্গে-সঙ্গে গল্পের মারফৎ পাত্র বা চরিত্র খাড়াও হ'য়েছে। আর অবস্থা গ'ড়ে তোল্‌বার ক্ষমতাও দেখা যায় প্রফুল্ল-সাহিত্যে। গাল্পিক হিসাবে প্রফুল্ল সরকার আরও নামজাদা হতে পার্‌তো যদি সাংবাদিকতা তার আটপৌরে পেশা না থাক্‌তো।

লেখক—সাংবাদিক থাক্‌তে-থাক্‌তে গাল্পিকভাবে নামজাদা হওয়া কঠিন কেন?

সরকার—একসঙ্গে দুই কোঠে নাম করা কারু পক্ষে সহজ নয়। পাঠক-সমাজে সাধারণতঃ কোনো লোককে একসঙ্গে দুই আসরে স্রষ্টা হিসাবে দেখ্‌তে নারাজ। এ হচ্ছে পাঠকদের দুর্বলতা। অধিকন্তু কোনো লেখকের পক্ষেই একটা পেশা চালিয়ে আর একটা পেশা নিয়মিত ভাবে চালানো সম্ভবপর নয়। "অনাগত" (১৯২৮), "ভ্রষ্টলগ্ন" (১৯২৯),

"লোকারণ্য" (১৯৩২), "বালির বাঁধ" (১৯৩৫) ইত্যাদি গল্পের স্রষ্টাকে কেউ পেশাদার গাল্পিক বল্‌বে না। আরও অনেক গল্পের লেখক হ'লে প্রফুল্লকে বাঙালী পাঠক-সমাজ গল্পসাহিত্যেও ইজ্জদ দিতে ঝুঁক্‌তো। যাহ'ক,—সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে প্রফুল্লর নাম থেকে যাবে। বাংলা সাহিত্যে তার ঠিকানা কায়েম হ'য়ে রইলো।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, প্রফুল্ল'র মতন একাধারে সাংবাদিক ও গাল্পিক দুনিয়ার সংবাদপত্রসেবীর মজলিশে বেশী নাই?

সরকার—ঠিক তাই। বিলাতী, ফরাসী, মার্কিণ ইত্যাদি সব-কয়টা বড়-বড় বা স্বাধীন দেশের সাংবাদিক মহলে পায়চারি ক'রে দেখা মন্দ নয়। একালের অনেক বাঙালী ও অ-বাঙালী ভারত-সন্তান দেশ-বিদেশের সাংবাদিক-বৈঠকে টুঁ মেরে বেড়িয়েছে। ভারতবাসী আজকাল দুনিয়ার সাংবাদিকদের সম্বন্ধে একদম আনাড়ি নয়। বেশ বুঝা যায় যে, কবি-গাল্পিক-নাট্যকার হ'য়েও সাংবাদিক থাকা অথবা সাংবাদিক হ'য়েও কবি-গাল্পিক-নাট্যকার থাকা বিলাতী, ফরাসী ইত্যাদি সংসারে কালো জামের মতন প্রচুর নয়। প্রফুল্ল সরব ার দুনিয়ার সেই সকল সাংবাদিক-গাল্পিক দলেরই অন্যতম।

লেখক—তাহ'লে প্রফুল্ল সরকারকে বাঙলা দেশের ভিতর অসাধারণ সাংবাদিক বল্‌ছেন?

সরকার—না। বাঙালী সমাজে প্রফুল্ল সরকারকে অসাধারণ সাংবাদিক বলা উচিত হবে না। কেন না এক সঙ্গে কবি-গাল্পিক ও সাংবাদিক একালের বাঙলারই একাধিক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে,—বাঙালী জাত বড় জাত। দুনিয়ার যে-কোনো কুলীনতম সাংবাদিকের সঙ্গে টক্কর দেবার মতন সাংবাদিক বাঙালী সমাজে আছে। এই কথাটা প্রত্যেক বাঙালীর বাচ্চার জেনে রাখা ভাল। আজকাল—১৯৪৪ সনে বাঙালী জাতের অবস্থা যারপরনাই গৌরবময় ও আশাপ্রদ।

প্রফুল্ল সরকারের "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"*

লেখক—আপনি প্রফুল্ল সরকারকে সমাজ-সংস্কার হিসাবেও উঁচু ঠাঁই দিয়েছিলেন দেখ্‌লাম। তা তো বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। ব্যাপার কী?

সরকার—প্রফুল্লকে সমাজ-সংস্কারকরূপে বোধহয় কেউ জানে না। লোকে তাকে বৈষ্ণব ব'লে জানে। হয়ত বা রামকৃষ্ণভক্তরূপেই তাঁর সামাজিক বা ধর্ম-পরিচয়। সাংসারিক লেন-দেনে মোটের উপর বোধহয় প্রফুল্ল ছিলেন গোঁড়া-হিন্দু বা ঐ-ধরণের কিছু।

লেখক—তা'হলে তাঁকে সমাজ-সংস্কারক বল্‌ছেন কেন?

সরকার—ঘটনাচক্রে প্রফুল্ল সরকারের হাতে এমন একটা বই বেরিয়েছে, যার ভেতরকার মাল হচ্ছে সমাজ-সংস্কারমূলক। শুধু সমাজ-সংস্কারমূলক বল্‌লেও ঠিক বলা হয় না। অতি-চরম মতের সংস্কার ছিল প্রফুল্ল'র মাথায়! বইটাকে ১৯৪৪ সনের মাপেও এই হিসাবে সমাজ-বিপ্লবের ইস্তাহার বলা চলে। এতটা চরমপন্থী সংস্কারের ঝাণ্ডা কোনো

* বিনয় সরকার প্রণীত "প্রফুল্ল সরকারের একাল-সেকাল" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৪)

বাঙালী হিন্দু গ্রন্থকার প্রফুল্ল'র আগে খাড়া কর্তে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

লেখক—আপনি কোন্ বইয়ের কথা বল্ছেন?

সরকার—'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" (১৯৪০)। সমাজ-সংস্কারের পাঁতি এই বইয়ে যেরূপ পাই তার তুলনায় কেশব সেনের পাঁতিও ছিল ছেলেখেলা। ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর, আর গুরুদাস ইত্যাদি সনাতনী হিন্দুদের ব্যবস্থা তো সে-কেলে পেছনমুখো বিধিনিষেধ মাত্র। প্রফুল্লর পূর্ববর্তী সনাতনী সমাজ-দার্শনিকেরা যারপরনাই স্থিতি-নিষ্ঠ ও নড়ন-চড়নহীন। রাবীন্দ্রিক "অচলায়তনে"র ভাষায় বলা চলে যে, তাঁরা "নিষ্ঠা" বুঝ্তে জবরদস্তভাবে,—'নিষ্ক্রমণে"র ধার ধার্তেন না ব'ল্লেই চলে। বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজ-চিন্তায় প্রফুল্ল অন্যতম বিপ্লবী।

লেখক—কেন, "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"র পাঁতিটা কী?

সরকার—বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদের নল-নল্চে দুইই বদ্লাবার প্রস্তাব আছে। বিদ্যাসাগরী বিধবা-বিবাহ তো আছেই। এটা তিনি চালু করতে চান সার্বজনিক ও ব্যাপকভাবে। তার ওপর আছে বামুন-চাঁড়াল-নির্বিশেষে যে-কোনো জাতের সঙ্গে যে-কোনো জাতের বিয়ে।

লেখক—আপনি তো বিংশ শতাব্দীর মনু হিসাবে এই ধরণের ব্যবস্থাই চান? তা হলে 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"র পাঁতি সম্বন্ধে আপনার আপত্তি কী? (পৃঃ ৫৩০-৫৩৫)

সরকার—আমার আপত্তি আছে কে বল্লে? আমি বলছি যে, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কোনো সনাতনী হিন্দু প্রফুল্ল সরকারের মতন বিপ্লবাত্মক সমাজ-সংস্কারের পাঁতি ঝাড়্তে পারেনি। মুখে-মুখে হয় তো অনেক হিন্দুই এইরূপ পাঁতির প্রশংসা করে। অথবা সার্বজনিক সভায় দুএকজন হয়ত এই ধরণের নল-নলচে-বদ্লানো হিন্দু সমাজের স্বপক্ষে বক্তৃতা করে। কিন্তু শাদা কাগজের ওপর কালো আঁচড় মেরে কোনো স্বদেশ-সেবক হিন্দু পন্থা-পদ্ধতি জাতিভেদহীন, বামুন-চাঁড়ালে বিবাহশীল হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা দেয় নি। এই হিসাবে প্রফুল্ল সরকার বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ-সংস্কারকদের ভেতর বিপ্লব-প্রবর্তকরূপে সম্বর্ধনা পাবে। অথচ মজার কথা লোকটা নিজ জীবনে ছিল মোটের উপর প্রাচীনপন্থী গোঁড়া।

লেখক—"ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"র সকল মতামতের সঙ্গে আপনার মিল আছে?

সরকার—তাকি কখনো সম্ভব? সমাজ-সংস্কারবিষয়ক পাঁতিগুলা প্রায়-সবই আমার মেজাজ-মাফিক। কিন্তু বইটার ভেতর লোক-বিজ্ঞানবিষয়ক বিশ্লেষণ আছে। সেই বিশ্লেষণ আমার বিচারে পুরাপুরি নির্ভুল নয়।

লেখক—কেন? কী পেয়েছেন?

সরকার—লোকসংখ্যার হিসাবে বাঙলার হিন্দু "ক্ষয়িষ্ণু" প্রমাণিত হয় না। প্রফুল্ল সরকারের দেওয়া অঙ্কগুলা হ'তেই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গীয় হিন্দু নর-নারী বর্দ্ধিষ্ণু, বাড়তির দিকে,—ঘাট্তির দিকে নয়, ক্ষয়িষ্ণু নয়।

লেখক—তা হ'লে প্রফুল্ল সরকার "ক্ষয়িষ্ণু" শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন কেন?

সরকার—ঐ খানেই গলদ। বইয়ের ভেতরকার সংখ্যাগুলার জোরে প্রমাণিত হয় প্রধানতঃ দুই কথা ঃ—(১) বাঙলার মুসলমানেরা বর্দ্ধিষ্ণু, (২) বাঙলার হিন্দুরাও বর্দ্ধিষ্ণু। তৃতীয় কথা হচ্ছে গোলমেলে।

লেখক—কী সেটা?

সরকার—মুসলমানেরা যে-হারে বাড়্ছে, হিন্দুরা তার চেয়ে কম হারে বাড়্ছে। ব্যস।

এই পর্যন্ত। বৃদ্ধির হারের কম-বেশীর জোরে হিন্দুকে ক্ষয়িষ্ণু বলা উচিত নয়। যা হ'ক প্রফুল্লর বইয়ে তাই করা হ'য়েছে। আর এক কথা। স্বাস্থ্যের অবস্থা, জন্ম-মৃত্যুর হার ইত্যাদি অন্যান্য মাপে হিন্দুকে মুসলমানের চেয়ে অবনত দেখা যায় না। বস্তুতঃ উন্নতই দেখা যায়।

সাংবাদিকের পেশা

৮ই মে ১৯৪৪

সুবোধ—আপনি সংবাদপত্রসেবীদেরকে অনেকবার বাঙালী জাতের পক্ষে একটা নতুন পেশার প্রতিনিধি ব'লেছেন এর কারণ কী?

সরকার—সংবাদপত্রসেবা একটা নয়া ঢঙের অন্নসংস্থান ব'লে। জীবন-যাত্রার একটা নয়া পথ বা প্রণালী হ'চ্ছে সাংবাদিকতা। এরি নাম পেশা। সাংবাদিকতা একটা নয়া পেশা। তবে আগেই ব'লে চুকেছি যে, সাধারণ হিসাবে বাঙালী লেখক আর সমাজসেবকদের ভেতর প্রায়-সকলেই সাংবাদিক।

লেখক—এই পেশা কি আগে ছিল না?

সরকার—কিঞ্চিৎ-কিছু ছিল,—খুব-কম বহরে ছিল। দু'একজন মাত্র হয়তো সাংবাদিকের পথে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা কর্‌তো। আজকাল গণ্ডা-গণ্ডা আর ডজন-ডজন শুধু নয়,—কয়েক শ' বা এমনকি হাজারখানেক লোক সাংবাদিক রূপে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে।

লেখক—আপনার চিরপ্রসিদ্ধ বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে সাংবাদিকের পেশা কিরূপ ছিল?

সরকার—অতি সামান্য আকারের সাংবাদিকতা দেখা যেতো। সেকালের জাঁদ্‌রেল সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোপুরি সাংবাদিক পেশার প্রতিনিধি বলা ঠিক হবে কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রধান পেশা ছিল বোধহয় ক'লেজের মাষ্টারি করা। তাছাড়া রিপণ কলেজ চালানো ছিল তাঁর ব্যবসা। এতে তাঁর আয় হ'তো দস্তুরমতন। "বেঙ্গলী"র সম্পাদক তিনি ছিলেন বটে। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে সুরেনের আয় বোধহয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার কর্‌তো। যা-হোক,—এসব হ্চ্ছে চুল-চেরা বিশ্লেষণের কথা।

লেখক—অমৃতবাজার পত্রিকার কথা কিরূপ?

সরকার—বোধহয় শিশির ঘোষ আর মতি ঘোষ পত্রিকা-সম্পাদককে আয়ের প্রধান পথ সম্‌ঝিতেন। তাছাড়া পত্রিকাটা ছিল তাঁদের সম্পত্তি। কাজেই পত্রিকা চালাবার ব্যবসায় তারা মোতায়েন ছিলেন। সুতরাং শিশির, মতি এবং এই পরিবারের অন্যান্য অনেককে পেশাদার সাংবাদিক বল্‌তে হবে। বাঙলায় সাংবাদিকতার অন্যতম জন্মদাতা এই পরিবার। একালের তুষারকান্তি ঘোষের আমলে সেই সম্পাদকীয়-মালিকানা ধারা বজায় আছে।

লেখক—বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ ইত্যাদি বঙ্গ-বিপ্লবের জননায়কেরা সাংবাদিক ছিলেন কি?

সরকার—না, তাঁদের আসল বা একমাত্র কারবার ছিল দেশকে জাগানো, মাতানো, ক্ষ্যাপানো। তাঁরা ছিলেন খাঁটি লোক-শিক্ষক, নীতি-প্রচারক, স্বদেশ-সেবক। সুরেনও খানিকটা এইরূপ। দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করা বিপিন-অরবিন্দ'র পক্ষে মুখ্য কাজ ছিল না। পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের পক্ষে বেশ-কিছু গৌণ কারবার ছিল। এই বিশ্লেষণটা অনেকেরই পছন্দসই হবে না।

লেখক—একালের "বসুমতী"-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কি সাংবাদিক ছিলেন?

সরকার—তাঁর সঙ্গে দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের যোগাযোগ ছিল। তিনি গল্প-সাহিত্যের লেখক হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু ১৯০৫-১৪ সনের যুগে তাঁকে সোজাসুজি সাংবাদিক পেশার অন্তর্গত করা চল্‌বে কিনা সন্দেহ। অথচ রামানন্দকে পাকাপাকি সাংবাদিক বল্‌তে হবে। তিনি কলেজের মাষ্টারি ছেড়ে "প্রবাসী"-"মডার্ণ রিভিউ" নিয়ে যোল আনা লেগে প'ড়েছিলেন।

লেখক—আজকালকার সাংবাদিক তাহ'লে কারা?

সরকার—অনেকগুলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, আর মাসিকের সম্পাদকেরা আজকাল (১৯৪০-৪৪) কাগজের চাক্‌রি ক'রে থাকেন। ইস্কুল-মাস্টারি বা উকিলের দিকে না গিয়ে এঁরা কাগজের পথে জুটেছেন। প্রত্যেক কাগজের সঙ্গেই একাধিক সম্পাদকীয় লেখক এই কারবারে লেগে র'য়েছেন।

লেখক—সংবাদপত্রসেবীদের সঙ্ঘ আছে জানেন তো? এই সঙ্ঘের সকলকেই পেশাদার সাংবাদিক বল্‌তে রাজি আছেন কি?

সরকার—না। অনেককেই পেশাদার সাংবাদিক বল্‌বো। কিন্তু এই সঙ্ঘের কেহ-কেহ পেশা বা জীবন-যাত্রা হিসাবে পুরাপুরি সাংবাদিক নন। তাছাড়া এই সঙ্ঘের কেহ-কেহ কাগজের মালিক বা স্বত্বাধিকারী। অধিকাংশই তাঁদের চাক্‌রে। আমি সাধারণতঃ সংবাদপত্রের চাক্‌রেদেরকে সাংবাদিক সম্ঝে থাকি। চাক্‌রেদের কেহ-কেহ সম্পাদক, কেহ হয়ত আধা-সম্পাদক, কেহ বা সিকি-সম্পাদক। তাছাড়া সংবাদ-সংগ্রাহক ও অন্যান্য শ্রেণীর লেখক বাঁধা-মাইনের চাক্‌রেরূপে নানা কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত। এই ধরণের মস্তিষ্কজীবীদের আমি সাংবাদিক বল্‌বো। আমার পারিভাষিকে পত্রিকার মালিক সুরেশ মজুমদারকে (আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড) "পেশাদার সাংবাদিক" বলা সম্ভব হবে না! কথাটা শুন্‌বামাত্র লোকেরা হাসাহাসি কর্‌বে।

লেখক—দু-এক জন সাংবাদিকের নাম করুন না?

সরকার—সংবাদপত্রসেবীদের সঙ্ঘটা খাড়া ক'রেছেন বোধহয় মৃণালকান্তি বসু আর তাঁর সহযোগী কয়েকজন বন্ধু। ইনি "অমৃতবাজার পত্রিকা"র অন্যতম সম্পাদক। কাজেই সাংবাদিকতা এঁর পেশা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাছাড়া ইনি আবার কলেজে মাস্টারিও করেন। কাজেই মৃণালকে যোল আনা সাংবাদিক বলা হবে কিনা বিচার-সাপেক্ষ।

লেখক—প্রফুল্ল সরকারকে পেশাদার সাংবাদিক বল্‌তে রাজী আছেন? অন্যান্য কয়েকজনের সম্বন্ধেও কিছু বলুন শুনি।

সরকার—হাঁ। প্রফুল্ল'র অন্য কোনো ব্যবসা তাঁর জীবনের শেষ বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। "মুসলমান" নামক ইংরেজি পত্রিকার মজিবর রহমান আর "অ্যাড্‌ভান্সে"র প্রফুল্ল চক্রবর্তী ছিলেন এইরূপ সাংবাদিক। একলের "মোহম্মদীর" আক্রাম খাঁ, "আর্থিক-জগৎ" সাপ্তাহিকের যতীন ভট্টাচার্য ইত্যাদি লেখকদেরকেও পাকাপাকি সাংবাদিক বল্‌বো। এই দলেরই অন্তর্গত "ভারতবর্ষ"'র ফণী মুখোপাধ্যায়, "যুগান্তর"-দৈনিকের বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে"র হেম নাগ ইত্যাদি লেখকেরা। অপরদিকে অমৃতবাজারের ধীরেন সেন আর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের খগেন সেনকে পেশা হিসাবে যোল আনা সাংবাদিকের দলে ফেলা সম্ভব নয়। এঁদের মাস্টারি ব্যবসা আছে। নামজাদা "ফরোআর্ড" আর "লিবার্টির" সত্যরঞ্জন বক্‌সি পাকা সাংবাদিক। ইনি নয়া বাঙলার অন্যতম

খাঁটি স্বদেশ-সেবকও বটে।

লেখক—সত্যেন মজুমদারকে কী বল্‌বেন?

সরকার—সত্যেন হচ্ছেন প্রফুল্ল'রই মতন পাকাপাকি সাংবাদিক। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রবর্তক এঁরা। তাছাড়া সম্পাদনও চ'লেছে এই দুই হাতে প্রথম থেকেই (১৯২২ মার্চ)। বর্তমানে সত্যেনের সঙ্গে আনন্দবাজারের যোগাযোগ নাই। কিন্তু আজও সত্যেন অন্য ঢঙের সাংবাদিকের কাজে মোতায়েন।

লেখক—অন্য ঢঙের সাংবাদিকের কাজটা কী?

সরকার—"গ্লোব-এজেন্সি" নামক সংবাদ-কেনা-বেচার ব্যবসা? সত্যেন আজকাল বাহাল আছেন। এই এজেন্সির মালিক হচ্ছে বিলাতী কোম্পানী।

বিধু সেনগুপ্ত'র "ইউনাইটেড প্রেস"

লেখক—সংবাদ কেনা-বেচার ব্যবসাটা কিরূপ?

সরকার—আজকাল এই ব্যবসার স্বদেশী প্রতিনিধিও আছে। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত সংবাদ কেনা-বেচার ব্যবসায় বাঙালী জাতের অন্যতম প্রবর্তক।

লেখক—এই ব্যবসায় আর কোনো বাঙালী আছে?

সরকার—স্বদেশী যুগে আমাদের মুরুব্বি-বন্ধু কেশব রায় ছিলেন সংবাদ কেনা-বেচার ব্যবসায় নামজাদা বাঙালী। তাঁর সহযোগী ছিলেন ঊষা সেন। কেশব মারা গেছেন। ঊষা আজও পেশায় বাহাল আছেন। তাঁরা দুজনেই বিলাতী কোম্পানীর চাক্‌রে বা সহযোগী। "অ্যাসোশিয়েটেড প্রেস" হচ্ছে তাঁদের কোম্পানী। তখনকার দিনে স্বদেশী সংবাদ-কোম্পানী ছিল না। ১৯১৪ পর্যন্ত দেখিনি। ১৯২৫ সনের শেষে দেশে ফিরে এসেও প্রথম-প্রথম বাঙালী সংবাদ-কোম্পানী দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না। বোধ হয় বিধু সেনগুপ্তই "ইউনাইটেড প্রেস" খাড়া ক'রে প্রথম বাঙালী সংবাদ-কোম্পানীর জন্মদাতা। বছর দশ-এগারো হ'লো ১৯৩৪ সনে,—এই কোম্পানী কায়েম হ'য়েছে। বছর দেড়-দুই ধ'রে লণ্ডনেও কোম্পানীর কর্মকেন্দ্র র'য়েছে।

লেখক—সংবাদ কেনা-বেচার কারবারটা কী?

সরকার—সংবাদ-কোম্পানীর কারবার হচ্ছে কারখানায়, দালাল-পাড়ায়, সুধী-সংসদে, রাষ্ট্রিক সভায়, পার্লামেণ্ট-ভবনে, সার্বজনিক মজলিসে, বিদেশী-কনসালের আফিসে, ইস্কুল-কলেজে আর এই ধরণের অন্যান্য কর্মকেন্দ্রে আড়কাঠি পাঠানো। আড়কঠিরা লোকজনের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। এই খবরগুলো রোজ-রোজ তারে অথবা টেলিফোনে বা ডাকযোগে বিভিন্ন কেন্দ্রের সংবাদপত্রে পাঠানো হয়। সংবাদপত্রের মালিক-পরিচালকেরা ফি বছর নির্দিষ্ট দক্ষিণা বা দাম দিয়ে সংবাদ-কোম্পানীর কাছ থেকে খবরগুলা কিনে নেয়। বুঝ্‌তে হবে যে, সংবাদপত্রের রসদ জুটে সংবাদ-কোম্পানীর মারফৎ, আর সংবাদ-কোম্পানীর রুধির বা খোরপোষ জুটে সংবাদপত্রের মর্জিতে। এরি নাম কেনা-বেচা।

লেখক—সংবাদ-কোম্পানীর ব্যবসা চালানো কঠিন কি?

সরকার—দস্তুরমত কঠিন। অন্যান্য ব্যবসা যত কঠিন এই ব্যবসাও তত কঠিন। টাকা লাগে অনেক। নানা শহরে-পল্লীতে আড়কাঠি রাখা জরুরি হয়। আড়কাঠিগুলা বিশ্বাসযোগ্য

আর ভদ্রলোকের পাতে দেবার উপযুক্ত হওয়া চাই। যে-সে আড়কাঠি সকল-প্রকার আফিসে বা কর্মকেন্দ্রে পাত্তা পায় না। সন্তোষজনক বেতনে আড়কাঠি পুষ্‌তে বেশ-কিছু টাকা আবশ্যক হয়। সংবাদ-কোম্পানী চালানো পয়সার খেলা। "ইউনাইটেড প্রেস" চালিয়ে বিধু নতুন দিকে বাঙালী জাতের হাত-পা দেখাতে পেরেছেন। এই কোম্পানীর পেছনে আরও কিছু পুঁজিপাটা থাক্‌লে ব্যবসাটা নয়া বাঙ্‌লার ইজ্জদ রক্ষা কর্‌তে পারে। অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের মতন এই কারবারেও পয়সাওয়ালা বাঙালীর নজর ফেলা উচিত। বিধু সাংবাদিক মাত্র নন, কারবারীও বটে।

লেখক—"ইউনাইটেড প্রেস" সম্বন্ধে আর-কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—বর্তমানে এইটাই বোধ হয় গোটা ভারতের একমাত্র ভারতীয় সংবাদ-কোম্পানী। বাঙালীর বাচ্চা এই কারবারের জন্মদাতা ও কর্মকর্তা বাড়্‌তির পথে বাঙালীর আরেক দৃষ্টান্ত। বিধু বাঙালীজাতের অন্যতম কর্মবীর।

জন-নায়ক ও সাংবাদিক

লেখক—জননায়ক আর সাংবাদিক বা পত্রিকা-সম্পাদক কি এক লোক?

সরকার—এঁরা দু'টা স্বতন্ত্র কারবার বা পেশার লোক। অনেক সময়ই এই দুই পেশা এক হাতে থাকে না। "লীডারী" বা নেতৃত্ব করা অর্থাৎ জন-নায়ক হওয়া এক ব্যবসা আর সংবাদপত্র সম্পাদন করা আলাদা ব্যবসা।

লেখক—কী রকম?

সরকার—পত্রিকা-সম্পাদকদের অনেকেই বক্তা নয়। মত-প্রচার, নীতি-প্রচার, কর্তব্য-প্রচার ইত্যাদি প্রচারও অনেকের ধান্ধা নয়। অনেকেই হয়ত রাষ্ট্রিক সভার মাতব্বর নয়। সরকারী কাউন্সিল, অ্যাসেম্ব্লি বা কর্পোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বহু পত্রিকা-সম্পাদক সভ্য নয়। এমন কি কংগ্রেস ইত্যাদি বে-সরকারী মজলিশেও পত্রিকা-সম্পাদকদের অনেকই হয়ত কোনো প্রকার প্রতিনিধি নয়। সম্পাদক মাত্রকেই "লীডার" বা জন-নায়ক বলা ঠিক হবে না।

লেখক—সরকারী-বেসরকারী মজলিশের প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ সাংবাদিক বা পত্রিকা-সম্পাদক হয় কি?

সরকার—কে বল্‌লে? অনেক সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিই পত্রিকা-সম্পাদক বা সাংবাদিক নয়। এমন কি বহু কাউন্সিল-কংগ্রেস-কর্পোরেশনওয়ালা হয় ত দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। অথচ তারা কোনো-না-কোনো হিসাবে কতকগুলা নর-নারীর প্রতিনিধি বা জন-নায়ক। সুতরাং জন-নায়ক হ'তে হ'লে সাংবাদিক বা পত্রিকা-সম্পাদক বা কাগজের মালিক হ'তেই হবে এমন কোনো কথা নাই।

লেখক—একালের পত্রিকাসমূহের সঙ্গে জন-নায়কদের যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—এক কথায় বলা সম্ভব নয়। জন-নায়কেরা একালে দলের লোক। তারা দল গ'ড়ে তোলে। বিনা দলে কাজ চালানো অসম্ভব। এখানে বল্‌বো যে, তারা দলপতি। প্রত্যেক দল বা দলপতির জন্য দু-একটা কাগজ থাকা জরুরি সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সময়েই কোনো কাগজ হয়ত কোনো নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে গাঁথা নয়। কাগজগুলা আপন-আপন মনে চলে। যখন তাদের যেরূপ মর্জি, তখন তারা সেইভাবে দলগুলার বা দলপতিসমূহের

কার্যপ্রণালীতে সায় দিতে রাজী হয়। অপর দিকে দলপতিরা নিজ-নিজ মত গেয়ে চ'লে,—নিজ-নিজ পথ তৈরী কর্‌তে থাকে। হয়ত বা কখনো-কখনো তারা কোনো পত্রিকার সুরমাফিক কাজ-কর্ম চালায়। কিন্তু পত্রিকামাফিক দল বা দলপতি-মাফিক পত্রিকা হয়ত অনেক সময়েই দেখা যায় না।

লেখক—স্বদেশীযুগে পত্রিকায় আর জন-নায়কে যোগাযোগ কিরূপ ছিল?

সরকার—সেকালে জন-নায়কদের সমস্যা অনেকটা সহজ-সরল ছিল। মোটের উপর তারা ছিল দেশী লোকজনের স্বার্থরক্ষক আর বিদেশী 'গবর্মেণ্টের' সমালোচক। সরকারের সমালোচনা আর স্বদেশের স্বার্থরক্ষা প্রায় প্রত্যেক জন-নায়কের পক্ষেই একরূপ ছিল।

লেখক—তখনকার দিনে দল ছিল না কি?

সরকার—দলাদলির 'সমস্যা" একপ্রকার ছিল না। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) রাষ্ট্রিক দলের সূত্রপাত হয়। পত্রিকায়-পত্রিকায় মতামত নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। নরম আর গরম (বা চরম) মত বাজারে জারি হ'তে থাকে। "অমৃতবাজার"কে "খানিকটা" গরম বলা হ'তো আর "বেঙ্গলীকে"কে "খানিকটা" নরম বলা হ'তো। যে-কয় বছর (১৯০৬ আগষ্ট—১৯০৮ অক্টোবর) "বন্দেমাতরম্" চ'লেছিল, সে-কয় বছর অবশ্য আসল চরম বা গরম কাগজ ছিল এইটাই। তখনকার দিনে কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে কোনো দলেরই একতিয়ার ছিল না। একমাত্র কংগ্রেস ইত্যাদি বে-সরকারী মজলিশে "বন্দেমাতরম্" বনাম "বেঙ্গলী" অথবা "বন্দেমাতরম্" বনাম "অমৃতবাজার" সমস্যা যৎকিঞ্চিৎ মালুম হ'তো।

সাংবাদিকতা ও দলাদলি

৯ই মে ১৯৪৪

সুবোধ—একালের দলাদলি বা দলপতি ইত্যাদি বল্‌লে কবেকার বা কতদিনকার কথা বুঝ্‌বো?

সরকার— বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের (১৯১৪-১৮) পরবর্তী-পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কথা বল্‌ছি। ১৯১৯ সনে নয়া ভারত-শাসনের কানুন জারি হয়। তখন একালের রাষ্ট্রিক দলাদলি সুরু বলা চল্‌তে পারে। সেই সঙ্গেই একালের সাংবাদিকতাও সুরু বল্‌তে পারি। সংবাদপত্রসেবী তখন হ'তে একটা সত্যিকার পেশায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বলা সম্ভব।

লেখক—তার পূর্বে কী ছিল?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগের (১৯০৫-১৪) সাংবাদিকতাও একালে নাই,—আর জননায়কতা বা রাষ্ট্রিক দলপতিত্বও একালে নাই। সে-সব ছিল নেহাৎ সাদাসিধে মামলা। একালের মাপে সেকালে "লীডারী," দলপতিত্ব বা জননেতৃত্বও ছিল না। অধিকন্তু সেকালে একালের পারিভাষিক-মাফিক সাংবাদিকতাও ছিল না।

লেখক—একালে সংবাদপত্র-সেবায় নতুন-নতুন ধরণ-ধারণ কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কর্মচারীরা নানা দলের লোক। সম্পাদক যে-মতের দল পছন্দ করে সহ-সম্পাদকেরা হয়ত সেই মতের দল পছন্দ করে না। সহ-সম্পাদকেরা গুন্‌তিতে অনেক। তারা সকলেই আবার কোনো নির্দিষ্ট মত-পথের লোক নয়। এসবের ওপর আছে "রিপোর্টার", সংবাদ-সংগ্রাহক, সাহিত্য-সমালোচক ইত্যাদি নানাবিধ

বাঁধা-লেখকের দল। তাদের মতি-গতিও রকমারি। ফলতঃ কোনো পত্রিকায় কোনো দাগ-দেওয়া মত বড়-বেশী দিন চালানো সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ।

লেখক—পত্রিকা-সম্পাদকের দায়িত্ব তাহ'লে কিরূপ?

সরকার—প্রত্যেক দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম-পরিচালনায় লেখকে-লেখকে বাগ্‌-বিতণ্ডা বোধ হয় লেগেই আছে। সম্পাদককে বহুসংখ্যক অনৈক্য, বিরোধ, ঝগড়া-ঝাঁটির সম্মুখীন হ'তে হয়। রোজই আপিসে একটা ক'রে সম্পাদকীয় সমস্যা হাজির হওয়া অতি-সোজা কথা।

লেখক—সেকালে কি এই ধরণের গণ্ডগোল ছিল না?

সরকার—এই সব খিট্‌খেল বা হ-য-ব-র-ল ১৯০৫-১৪ সনের যুগে সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় বা মতি ঘোষকে হজম ক'র্‌তে হ'তো কিনা সন্দেহ। এই সব এত জটিল ছিল না। এক-সুরেনের হুকুম বা মর্জিমাফিক চল্‌তো "বেঙ্গলী"। এক-মতির হুকুম বা মর্জি-মাফিক চল্‌তো "অমৃতবাজার।" এইরূপই বলা চলে সহজে এক কথায়।

লেখক—আজকাল কাগজগুলার সম্পাদকীয় অবস্থা কিরূপ?

সরকার—প্রত্যেক কাগজেই দেখা যায় মজার কাণ্ড। বিদেশী সংবাদ-বিশ্লেষণ বিষয়ক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কোনো সংখ্যায় এক স্তম্ভে বাহির হ'লো হয়ত ইংরেজ-বিরোধী তথ্য বা মন্তব্য আর এক স্তম্ভে প্রচারিত হ'লো ইংরেজ-পক্ষীয় কথা। সেই সংখ্যায়ই কোনো টিপ্পনীতে মালুম হয় রুশ-প্রীতি। আবার জার্মাণ-প্রীতি হয় ত দেখি অন্য টিপ্পনীতে। তা ছাড়া দেশী সমস্যা নিয়েও অমিল দেখা যায় খুব। এইরূপ বৈচিত্র্য, জটিলতা, আর অনৈক্য বর্তমানে বেশ পরিস্ফুট।

লেখক—এই জটিলতার কারণ কী?

সরকার—দেশের ভেতর দল গ'ড়ে উঠেছে বহুসংখ্যক। দলপতিও রকমারি। তাদের বন্ধু, পেটোআ, চেলা, ধামাধরা বা ভাড়া-করা লোক হয়ত প্রত্যেক পত্রিকার আপিসে দু-একজন আছে। অধিকন্তু আছে পত্রিকার মালিক বনাম চাক্‌রে-সংক্রান্ত সমস্যা। এইজন্য কোনো কাগজ কোনো নির্দিষ্ট দলের দাগী মুখপত্র দাঁড়াতে পার্‌ছে না।

লেখক—এই অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—বোধ হয় এই অবস্থাটা দেশের পক্ষে ভালই। তা না হ'লে মতের অত্যাচার সমাজের উপর খুব বেশী চ'ল্‌তো। জটিলতা সকল ক্ষেত্রেই খারাপ নয়। বরং বহুত্বই বাঞ্ছনীয়।

লেখক—মালিক-সংক্রান্ত সমস্যাটা কী?

সরকার—যে-কোনো ফ্যাক্টরীর মালিক-সংক্রান্ত সমস্যা যা, পত্রিকার মালিক-সংক্রান্ত সমস্যাও তা। সম্পাদক ইত্যাদি লেখকেরা মালিকের বা মালিক-সঙ্ঘের ভাড়া-করা চাক্‌রে। মনিবের সঙ্গে চাকরের সম্বন্ধ দুনিয়ার কোন্ ব্যবসায় বন্ধুত্বময়? পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখকেরা পত্রিকার মালিক-মনিবের হুকুম তামিল কর্‌তে বাধ্য।

লেখক—এই ব্যবস্থার ভাল-মন্দ কিরূপ?

সরকার—ঘটনাচক্রে মালিক যে-দলের বা যে-মতের লোক সম্পাদকীয় লেখকদের অনেকেই হয়ত সেই দলের বা সেই মতের লোক নয়। মালিক চায় কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে বা কোনো কর্ম-প্রণালীকে বাজারে দাঁড় করাতে। সম্পাদকীয় লেখকেরা প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই সেই ব্যক্তিবিশেষের বা কর্ম-প্রণালীর বিরোধী। তাদের মগজে হয় অন্যান্য দলের বা

দলপতির জন্য দরদ র'য়েছে। মোটের ওপর ১৯৪০-৪৪ সনের বঙ্গ-সমাজে সাংবাদিকতায় আর "লীডারী"তে অর্থাৎ জননায়কতায় অমিল জবরদস্ত।

সাংবাদিকের সামাজিক ইজ্জদ্

লেখক—সাংবাদিকদের সামাজিক ইজ্জদ্ কিরূপ?

সরকার—ইস্কুল-কলেজের মাস্টারদের সামাজিক ইজ্জদ যতটা, সাংবাদিকদেরও ঠিক ততটা। অর্থাৎ বিলকুল কোনো ইজ্জদ্ নাই।

লেখক—ইজ্জদ্ নাই কেন?

সরকার—ইস্কুল-কলেজের মাস্টারেরা আর সাংবাদিকেরা কম টাকা রোজগার করে। অতিকষ্টে তাদের সংসার চলে। অপরদিকে সামাজিক ইজ্জদ্ হয় টাকা-পয়সার জোরে। কাজেই সাংবাদিক আর মাস্টারজাতীয় চাক্‌রেরা সমাজের অতি চোঁথা জীব। কেউ পুছে না। মাস্টারদের ভেতর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগুলাকেও বেঁধে রাখ্‌ছি।

লেখক—সাংবাদিকদের রোজগার অতি কম কি?

সরকার—বাঙলা দেশের সাংবাদিকেরা অতি-কম মাইনে পায়। দু-একজন বোধ হয় খানিকটা স্বচ্ছল অবস্থায় আছে। অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তবে লড়াইয়ের হিড়িকে দৈনিক-মাসিকের আয় বেড়েছে প্রচুর। এইজন্য সাংবাদিকেরা কিছু-কিছু মোটা হারে টাকা গুন্‌বার সুযোগ বোধহয় পাচ্ছে। কিন্তু বাঙলা দেশের বাইরে ভারতীয় সাংবাদিকেরা বাঙালী সাংবাদিকদের চেয়ে সাধারণতঃ বেশী রোজগার করে। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলের সম্পাদকীয় লেখকেরা খানিকটা স্বচ্ছল অবস্থার লোক।

লেখক—বাঙলা দেশের সাংবাদিকেরা কম মাইনে পায় কেন?

সরকার—বাঙলা দেশের অন্যান্য লিখিয়ে-পড়িয়েদের পেশায়ও রোজগারের হার বেশ-কিছু কম। সাংবাদিকদের হারের সমান। এই হার বাঙলা দেশের সকল কর্মক্ষেত্রেই বাড়ানো উচিত। বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা অতি ঘৃণ্য-জীবে পরিণত হ'য়েছে। এই দুরবস্থার দাওয়াই আবিষ্কার করা উচিত।

লেখক—বাঙালী সাংবাদিকদেরকে কেউ পুছে না বল্‌ছেন কেন?

সরকার—কথাটা পরিষ্কার ক'রে বুঝা উচিত। টাকা-পয়সার মাপে সাংবাদিকরা তুচ্ছ। এই জন্য এরা ইজ্জদ্‌হীন। কিন্তু দুনিয়ার চিড়িয়া-খানায় টাকা-পয়সার মাপই একমাত্র মাপ নয়।

লেখক—আর কোন্ মাপের কথা বল্‌ছেন?

সরকার—এই অধমের মতন গরীব লোক অন্যান্য মাপও কায়েম ক'র্‌তে অভ্যস্ত। **আমার জরীপে বাঙালী সাংবাদিকেরা চরমভাবে সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য। সাংবাদিকদের দৌলতে বাঙলার ভাষা গ'ড়ে উঠ্‌ছে, সাহিত্য উন্নত হচ্ছে, কৃষি-ও-শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছে, রাষ্ট্রিক কর্তব্য-জ্ঞান বাড়্‌ছে, মেয়েদের পুরুষ-সাম্য কায়েম হচ্ছে, মজুর-দল পুষ্ট হচ্ছে, সমাজ-তন্ত্রের দিকে যুবক বাঙলার মেজাজ খেল্‌ছে, দেশ-বিদেশের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে বাঙালীর বাচ্চা শক্ত মুঠায় পাকড়াও কর্‌তে শিখ্‌ছে, নয়া-বাঙলার গোড়া-পত্তন হচ্ছে, বাঙালী জাত্ বাড়্‌তির দিকে এগুচ্ছে। সাংবাদিকেরা যুবক বাঙলার সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার বিপুল স্তম্ভ।** স্বদেশ-

সেবক হিসাবে সাংবাদিকদের চেয়ে বড় লোক আমার চিন্তায় আর কোনো পেশার লোকেরা নয়। অধিকন্তু বহুসংখ্যক স্বার্থত্যাগী, কষ্ট-সহিষ্ণু, দেশযোগী লোক কর্তব্যজ্ঞানে সাংবাদিকের পেশায় ঢুকেছে।

লেখক—আপনার জরীপ-মাফিক জরীপ চালাতে জনসাধারণ অভ্যস্ত নয় কি?

সরকার—বল্‌তে পারি না। আমার জরীপটা বেশ-কিছু অ-সাংসারিক,—হয়ত কেউ-কেউ বল্‌বে আধ্যাত্মিক। একে সামাজিক জরীপ বল্‌বো না। সামাজিক জরীপে লোকেরা হিসাব করে রূপৈয়া। পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া সমাজে সামাজিক ইজ্জদ্‌ পায় না। আর আমি দেখি পয়সাহীনের কর্তব্যনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ, কৃতিত্ব আর বীরত্ব।

সমাজপতির ঘাড় মট্‌কায় সাংবাদিকেরা

লেখক—পয়সাওয়ালা লোকেরা সাংবাদিকদেরকে সম্মান করে না কি?

সরকার—পয়সাওয়ালা লোকেরা সাধারণত সাংবাদিকদের নাম-ধাম কিছুরই খবর রাখে না। কিন্তু পয়সাওয়ালাদের ভেতর ব্যবসাদার, শিল্পপতি, রাষ্ট্রিক "লীডার" বা জন-নায়ক, সমাজপতি ইত্যাদি শ্রেণীর লোক সাংবাদিকদের খোসামোদ ক'রে চলে।

লেখক—কেন?

সরকার—এইসব পয়সাওয়ালারা কাগজের মারফৎ নিজের প্রচার চায়। তাদের পেছনে অর্থাৎ স্বপক্ষে কাগজে না থাক্‌লে ব্যবসা জাহির হবে না. টাকা রোজগার ক'মে আস্‌বে। দেশের লোক তাদেরকে "লীডার" বা নেতা ব'লে চিন্‌বে না। দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকে যেন-তেন-প্রকারেণ নাম ছাপা হওয়া এই সকল পয়সাওয়ালা লোকের পক্ষে জন্ম-মরণ সমস্যার সামিল। বছরে দু'চার-দশ বার নিজ-নিজ ছবি প্রকাশ করাবার জন্যও এই সব পয়সাওয়ালাদের দরদ অতি স্বাভাবিক। কাজেই সাংবাদিকেরা অনেক সময়েই পয়সাওয়ালাদের তোআজ পেতে অভ্যস্ত। বিদেশী কন্‌সালরাও এই কারণেই সাংবাদিকদের ঘরে-বাড়ীতে ঢুঁ মেরে বেড়ায়। ভায়া, দুনিয়া বিচিত্র। সাংবাদিকরা গরীব বটে, কিন্তু সাংবাদিকদের মর্জির বা খেয়ালের উপর নির্ভর করে বণিক-শিল্পীর সম্পদ-বৃদ্ধি আর জন-নায়কের লীডারী বা নেতৃত্ব।

লেখক—তাহ'লে সাংবাদিক আর মাস্টারকে সামাজিক ইজ্জদ্‌ হিসাবে একদলের ভেতর ফেল্‌ছেন কেন?

সরকার—ঠিক ব'লেছিস। ইস্কুল-কলেজের মাস্টারগুলা একদম গো-বেচারা। এদেরকে সমাজে ঠেলে তোলা অসম্ভব। কিন্তু সাংবাদিকেরা যে-কোনো পয়সাওয়ালা শিল্পী. বণিক্‌, দেশনায়ক, লীডার, দলপতি ইত্যাদি লোককে টিট্‌ করতে সমর্থ। সাংবাদিকদের পেছন-পেছন টাকার তোড়া নিয়ে অনেক ধনী সমাজপতি ছুট্‌তে বাধ্য। সমাজপতিদের ঘাড় ম'ট্‌কে দেওয়া সাংবাদিকদের পক্ষে সম্ভব। "সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।" গরীব সাংবাদিকেরা পয়সাওয়ালাদেরকে "বাবা" ব'লিয়ে ছাড়ে। সাংবাদিকদেরকে "মিষ্টিমুখ" করিয়ে আর "অনান্য উপায়ে" হাতে রেখে চলা প্রত্যেক লীডার, দলপতি, সমাজপতি, লক্ষপতির দস্তুর। এই শ্রেণীর লোককে সাংবাদিকেরা যখন-তখন "নাকের জলে চোখের জলে" অস্থির ক'রে ছাড়্‌তে পারে।

কাগজওয়ালাদের শত্রুতা

লেখক—জননায়কদেরকে কাগজওয়ালারা নাকের জলে চোখের জলে অস্থির কর্তে পারে কী ক'রে?

সরকার—একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কোনো জননায়ক সার্বজনিক সভায় গিয়ে গলাবাজি কর্লো। পরের দিন কাগজগুলা খুলে দেখ্লে যে, বিশ-পঁচিশ জন বক্তার নাম বেরুলো। তাদের বক্তৃতার চুম্বকও বেরুলো। কিন্তু তার বক্তৃতার উল্লেখ নাই। এমন কি তার নাম পর্যন্ত ছাপ হয়নি। চরম দৃষ্টান্ত অবশ্য।

লেখক—এমন ঘ'ট্তে পারে কি?

সরকার—তাই তো ঘটে দুনিয়ায় অহরহ।

লেখক—এমন কেন হয়?

সরকার—কোনো-কোনো কাগজ হয়ত কোনো "লীডার" বা সার্বজনিক লোকের শত্রু। কেন শত্রু জান্বার দরকার নেই। কোনো-না-কোনো কারণ থাক্তে পারে। এই সকল কাগজের "রিপোর্টার" বা সংবাদদাতারা সভায় গিয়ে সেই সার্বজনিক লোকের নাম টুকে রাখ্বে না। মনে কর্ ঘটনাচক্রে সেই লোকের নাম আর বক্তৃতা কাগজে ছাপ্তে দেওয়া হ'লো। কী হবে জানিস্? কাগজের সহ-সম্পাদক বা সম্পাদক নিজে অথবা এমন কি প্রুফ-রীডার যথাসময়ে সেই সব উড়িয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত ছাপা হবে না। একে বলে কাগজের সঙ্গে জননায়কের লড়াই। দুনিয়ার চিড়িয়াখানা সহজ-সরল নয়রে, ভায়া।

লেখক—এই অবস্থায় জননায়ক কী ক'র্বে?

সরকার—ক'র্বে আর কী? খাবে কলা। কী ক'র্বে তা নির্ভর ক'র্বে জননায়ক-চাচার ট্যাকের জোরের উপর। অর্থাৎ সে নতুন কাগজ খাড়া কর্বে। যদি সে বাপকা বেটা হয়। তা আর কটা? কাজেই সেই শত্রু-কাগজের তোআজ কর্বার জন্য সে বেদ-বাইবেল-কোরাণ-মাফিক দাওয়াই বা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা কর্বে। সংসারে "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেহয়নায়।" কাগজওয়ালাদের, মায় রিপোর্টাদের পা-চাটা চাই-ই-চাই। আর চাই টাকার তোড়া।

লেখক—আপনার কথায় মনে হচ্ছে যে, অনেক সংবাদপত্রেই দেশের সার্বজনিক স্বার্থ বা প্রতিনিধি যথোচিত ইজ্জদ্ পায় না। এর কারণ কী?

সরকার—ঠিক তাই। কারণ সোজা। প্রত্যেক কাগজই নিজ মালিক বা সম্পাদকের স্বার্থ-মাফিক চলে। মালিক বা সম্পাদকের ব্যক্তিগত বা দলগত বন্ধুরা কাগজটায় প্রচারিত হয়। তাদের বিরোধী, টক্করশীল বা শত্রুস্থানীয় লোকের ঠাঁই সেই কাগজে আশা করা অসম্ভব। প্রত্যেক লোক যে-কোনো আসরে ক'ল্কে পেতে পারে না।

লেখক—তাহ'লে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে কী ক'রে?

সরকার—ভিন্ন-ভিন্ন কাগজ পড়া উচিত। এক কাগজে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন সম্বন্ধে একটা শব্দও হয়ত নাই। অথচ অন্য কাগজ হয়ত সেই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই জানে না। ইহারই নাম দেশ। ইহারই নাম দুনিয়া। সবই বহুত্বময়, পরস্পর-বিরোধীদের বারোআরি-তলা।

সাংবাদিক-পেশায় মনিব-মজুর

লেখক—সাংবাদিকের জীবন সম্বন্ধে আপনার মত কিরূপ?

সরকার—যে-সে হাড়ে সাংবাদিকের জীবন পোষাবে না। খোল্‌তাই বাংলা লিখ্‌তে পারা অথবা ইংরেজিতে সরস প্রবন্ধ ঝাড়্‌তে পারা সাংবাদিকতার প্রধান বা একমাত্র লক্ষণ নয়।

লেখক—এমন কী কঠিন কাজ?

সরকার—দিনরাত হামেশা সাংবাদিকদেরকে দু-মাঠের লড়াই চালাতে হয়।

লেখক—কী-কী দুই মাঠ?

সরকার—পয়লা মাঠ হচ্ছে গবর্মেন্টের সঙ্গে বচসা, তর্কাতর্কি, হাতাহাতি। সরকারী আইনের সঙ্গে চোপর দিনরাত লড়াই চালানো সাংবাদিক জীবনের মস্ত-বড় কথা। শিপাহী হ'তে সেনাপতি পর্যন্ত সাংবাদিক মাত্রকেই গবর্মেন্টের সঙ্গে পাঞ্জা ক'ষে জীবন চালাতে হয়। সকল দেশেই এই দস্তুর।

লেখক—দ্বিতীয় লড়াইয়ের মাঠ কোন্‌টা?

সরকার—সংবাদপত্রের মালিক, পুঁজিপতি বা কর্তা হচ্ছে সাংবাদিকের নিত্যনৈমিত্তিক বচসা, তর্কাতর্কি আর হাতাহাতির পাত্র। মালিকদের সঙ্গে সাংবাদিকদের লড়াই প্রথমতঃ মতামত নিয়ে। মালিকদের মতে সাংবাদিকরা অনেক সময়েই সায় দিতে পারে না। দ্বিতীয় লড়াই হচ্ছে তঙ্খাবিষয়ক। মনে রাখ্‌তে হবে যে, সাংবাদিকরা মজুর বা কেরাণী মাত্র আর মালিকেরা মনিব। মনিবে-মজুরে যোগাযোগ মধুর যোগাযোগ নয়।

লেখক—সংবাদপত্রের মালিকেরা সাংবাদিকদেরকে মজুরভাবে দেখে কি?

সরকার—কেনরে, তুই ন্যাকা না কি? যে-লোক চাক্‌রি করে সে-ই মজুর। যে-লোক নক্‌রি দেয় সে মনিব। কাজেই সাংবাদিকদেরকে মালিকেরা আর কী ভাবে দেখ্‌তে পারে?

লেখক—অন্যান্য ব্যবসায় মজুর-মালিক যা, সংবাদপত্রের ব্যবসায়ও মজুর-মালিক তা-ই কি?

সরকার—আলবৎ। খাদের মালিক, তেলের মালিক, কলের মালিক, দোকানের মালিক যেমন মালিক, সংবাদপত্রের মালিকও ঠিক তেমন মালিক। মালিক, মালিকানা, মালিক-লক্ষণ, মালিক-চরিত্র, মালিকের ধরণ-ধারণ ইত্যাদি চিজ সকল পেশায়ই একরূপ। সাংবাদিকদের পেশায় এমন-কোনো গুড় মাখানো নাই যে মালিকেরা মিঠে-মেজাজের হবে। অন্যান্য পেশার চাকর-বাকরদের মতন সাংবাদিক-পেশার চাকর-বাকররাও ইয়োরামেরিকায় মজুর-সমিতি (ট্রেড-ইউনিয়ন) কায়েম ক'রেছে। আমাদের দেশের সাংবাদিকদের ভেতর (ট্রেড ইউনিয়ন) কায়েম হওয়া উচিত। বুর্জোআ পুঁজিপতিদের যুগে অন্যান্য মজুরদের মতন সাংবাদিক-মজুরদের জন্যও "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

লেখক—বাঙলাদেশেও সংবাদপত্রের ব্যবসায় বুর্জোআ-নীতি কতটা পরিস্ফুট?

সরকার—বাঙলাদেশেও "বুর্জোআমি" অল্পে-অল্পে শিকড় গাড়্‌ছে এখনো উৎকট ভাবে দেখা দেয় নি। কিন্তু অবাঙালী সমাজে কোনো-কোনো পুঁজিপতি আট-দশটা কাগজের মালিক। গোটা কয়েক পুঁজিপতি বোম্বাইয়ে, গোটা কয়েক যুক্তপ্রদেশে, আর গোটা কয়েক কল্‌কাতায় সাংবাদিক ক্ষেত্রের জবরদস্ত বেপারী। সাংবাদিক-পেশায় বুর্জোআ-মালিকানা একালের ভারতে বেশ-কিছু চল্‌ছে।

জননায়কের ভবঘুরেমি

১০ই মে ১৯৪৪

সুবোধ—জননায়ক কাদেরকে বল্‌ছেন? গুন্‌তিতে তারা কত?

সরকার—গুন্‌তিতে জননায়ক বা "লীডার" অনেক। প্রত্যেক জেলায় জননায়ক র'য়েছে গোটা কয়েক। তা ছাড়া কল্‌কাতায় তো আছেই। "লীডার"দের সংখ্যা বেশী থাকা ভালই।

লেখক—কোন্ শ্রেণীর লোক "লীডার" বা জননায়ক?

সরকার—প্রধানতঃ রাষ্ট্রিক কর্মক্ষেত্রের লোক তারা। তাদের প্রধান কাজ বকাবকি করা। মত-প্রচার আর মত-গঠন ছাড়া তারা আর কিছু জানে না।

লেখক—আর কোনো লক্ষণ আছে জননায়কদের?

সরকার—মত-প্রচারের জন্য তারা চোপর দিন-রাত ভবঘুরে। শহরে-মফঃস্বলে সর্বত্রই তাদের গতিবিধি। সর্বদাই তারা চলাফেরা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত। যে-ই যখন যেখানে ডাকুক তার কাছে তখনই সেখানে যেতে না পার্‌লে লীডার বা জননায়ক হওয়া যায় না। এই হচ্ছে জননায়ক-লক্ষণম্ আমার পারিভাষিকে।

লেখক—কোনো মানুষের পক্ষে আপনার পারিভাষিক-মাফিক জননায়ক হওয়া সম্ভব কি?

সরকার—আলবৎ সম্ভব। শুধু বাঙলা দেশে কেন, দুনিয়ার সর্বত্রই রাষ্ট্রিক উন্নতি, পরিবর্তন বা আন্দোলন সম্ভব হচ্ছে এই ধরণের ভবঘুরে-বক্তাদের হামেশা চলা-ফেরার দৌলতে।

লেখক—সকল জননায়কই সমান?

সরকার—ভবঘুরেমির আর বকাবকির আকার-প্রকার সকলের পক্ষেই জান্‌ুমানি বহরের নয়। ছোট-বড়-মাঝারি ভবঘুরে আছে। ছোট-বড়-মাঝারি বক্তাও আছে। কাজেই জননায়কের ছোট-বড়-মাঝারিও আছে।

লেখক—বাঙ্‌লাদেশের কয়েকজন জননায়কের নাম কর্‌বেন?

সরকার—সুভাষ বসুর পরবর্তী কালে,—১৯৪০-এর পর হ'তে আজ পর্যন্ত বাঙালী জাতের সর্বপ্রধান জননায়ক বল্‌বো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। ঠিক এতটা ঘুরা-ফিরা আর বকাবকির রেওআজ, তাগিদ আর ক্ষমতা আর কারু দেখা যাচ্ছে না। বয়সে অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ চুআল্লিশের কোঠায়।

লেখক—শ্যামাপ্রসাদের কাছাকাছি কারু নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—বোধ হয় ভবঘুরে-বক্তা হিসাবে হুমায়ুন কবির বেশ-কিছু উল্লেখযোগ্য। "ছোকরা" জননায়কদের অন্যতম হুমায়ুন। এঁর বয়স প্রায়-চল্লিশ। আর একজন নলিনাক্ষ সান্যাল। বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ। হুমায়ুনের ভবঘুরেমি বোধ হয় নলিনাক্ষ'র চেয়ে বেশী। সৌম্যেন ঠাকুর আর নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদারও ভবঘুরে-বক্তা বটে।

লেখক—এঁদের নাম শুনেছে সকলেই। আর কারুর নাম করুন।

সরকার—কমিউনিস্ট বক্তা হাবিবুল্লা বাহার এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের আর একজন উল্লেখযোগ্য মানব রায়-পন্থী অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র ব্যানার্জি। মুস্‌লিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশেম কমিউনিস্ট-ধর্মী জননায়ক।

লেখক—আপনি দেখ্‌ছি ডাইনে-বাঁয়ে ন্যাশন্যালিস্ট-কমিউনিস্টের নামও কর্‌ছেন। আবার এক নিঃশ্বাসেই হিন্দু আর মুসলমান দুয়েরই ফিরিস্তি দিচ্ছেন?

সরকার—কী কর্‌বো? আমার "লীডার"-জরীপে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগিও নাই। ন্যাশন্যালিস্ট-কমিউনিস্ট জাতিভেদও নাই দেখ্‌ছি বাঙ্‌লা দেশে লীডার কারা?

লেখক—আচ্ছা, তাহ'লে আর কয়েকজন লীডারের নাম করুন।

সরকার—কংগ্রেস-পন্থী আশ্‌রাফ-উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, লীগ-পন্থী মজুর-নায়ক আবদুল মালেক, কমিউনিস্ট বঙ্কিম মুখার্জি, "কৃষক"-সম্পাদক আবুল হোসেন, আর সোভিয়েট-প্রেমিক হীরেন মুখার্জিও ছোক্‌রা জননায়ক। গান্ধি-ভক্তদের মধ্যে অনেক লীডার আছে। তাছাড়া সার্বজনিক কংগ্রেস-পন্থীদের অনেকেই এই ধরণের জননায়ক।

লেখক—প্রবীণদের ভেতর দুএকজন জননায়কের নাম কর্‌বেন?

সরকার—"নবযুগ"-সম্পাদক আহম্মদ আলি, ফজলল হক, ভূপেন দত্ত, সুরেশ ব্যান্যার্জি, প্রফুল্ল ঘোষ, সতীশ দাশগুপ্ত, মুজঃফর আহম্মদ, মানব রায় ইত্যাদি। পঞ্চান্ন-ষাটের ওপরের লোক এঁরা। আবুলকালাম আজাদ, ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, আর নৌশের আলিকেও এই দলে ফেল্‌তে হবে। রাষ্ট্রিক দলাদলির কথা ভুলে যাচ্ছি। দেখ্‌ছি শুধু জননায়কের ধরণ-ধারণ।

লেখক—আপনি শরৎ বসুকে জননায়ক বলেন?

সরকার—সুভাষ যে-অর্থে জননায়ক তার দাদা শরৎ সে-অর্থে জননায়ক নন।

লেখক—মন্ত্রীদেরকে জননায়ক বলা সম্ভব?

সরকার—অনেক সময়েই নয়। তবে শহীদ সুহ্রাওয়ার্দিকে জননায়ক বল্‌তে পারি। মন্ত্রী হবার আগে লোকজনের সঙ্গে এঁর গা-ঘেঁশাঘেঁশি ছিল মন্দ নয়। ফজলল হক এই হিসাবে অনেক দিন ধ'রেই জননায়ক। তবে জমিদার-নবাব শ্রেণীর মন্ত্রীরা জননায়ক নন,—বলা বাহুল্য।

লেখক—এই সকল জননায়কের পেছনে কোনো দৈনিক কাগজ আছে?

সরকার—"কৃষক" র'য়েছে আবুল হোসেন সরকার আর হাসান আলি চৌধুরীর সঙ্গে। আর কোনো কাগজ কারু সঙ্গে গাঁথা দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

লেখক—তাহ'লে জননায়কদের বক্তৃতা, ঘুরাফিরা আর মতামত প্রচারিত হয় কী ক'রে?

সরকার—দেশের মামুলি কাগজগুলার মর্জিমাফিক এঁদের মতামত প্রচারিত হয়। মাঝে-মাঝে এঁদের চিঠি-পত্র ছাপা হ'য়ে থাকে। তা ছাড়া কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লির ভেতরকার বিতণ্ডার উপলক্ষে শ্যামাপ্রসাদ, ফজলল, শরৎ, হুমায়ুন, নলিনাক্ষ, সুহ্রাওয়ার্দি, নীহারেন্দু, বঙ্কিম, নৌশের ইত্যাদি জননায়কদের নাম ও কাম কাগজে বেরোয়। অমৃতবাজার, আনন্দবাজার ইত্যাদি কাগজ বোধ হয় কোনো দলের বা ব্যক্তির দাগী বাহন নয়। স্টার অব ইণ্ডিয়া আর মোহাম্মদী লীগ-পন্থী।

লেখক—কাগজওয়ালাদের ভেতর কাউকে জননায়ক বল্‌তে রাজি আছেন?

সরকার—সুরেশ মজুমদার (আনন্দবাজার) আর তুষার ঘোষ (অমৃতবাজার) দুজনেই বকাবকির বাইরে। কচিৎ-কখনো কোনো সভায় "পতির" আসন অলঙ্কৃত করা বোধ হয় এঁদের দস্তুর। কিন্তু মফঃস্বলের ডাকে, পল্লীর ডাকে, ছোট-বড়-মাঝারি সমিতির ডাকে, চোঁথা বা কুলীন পরিষদের ডাকে এঁরা যখন-তখন হাজিরা দিতে অভ্যস্ত নন। কাজেই এই ধরণের লোককে জননায়ক বলা চল্‌বে না। পত্রিকা-সম্পাদকদের ভেতরও কাউকে ভবঘুরে-বক্তা পাচ্ছি না।

পাণ্ডিত্য ও জননায়ক

লেখক—জননায়ক হ'তে হ'লে লেখকরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক নয় কি?

সরকার—না। লেখক হওয়া জরুরি নয়। অতি-জরুরি হচ্ছে বক্তা হওয়া।

লেখক—চিন্তাশীল লোক না হ'লে জননায়ক হওয়া যায় কি?

সরকার—যায়। যে-সকল লোকের মগজে চিন্তা গিজ্-গিজ্ করে তারা জননায়ক হ'তে পারে না। নয়া-নয়া চিন্তার স্রষ্টাদের পক্ষে জননায়ক হওয়া কঠিন,—বোধ হয় অসম্ভব।

লেখক—আপনি কী আজগুবি ব'ক্ছেন?

সরকার—সত্যি বল্ছি। জননায়কের পক্ষে জরুরি দু'টা বা মাত্র একটা কথা। যেখানে-সেখানে যখন-তখন ব'কে চলা। বেশী কথা ব'ক্তে গেলেই দেশের লোকেরা ভবঘুরে-বক্তাকে বুঝ্তে পার্বে না। চাই মাত্র একটা বাণী, বুখ্নি বা বয়েৎ। আর চাই সেই বাণীটা ঝালে-ঝোলে-অম্বলে ছড়িয়ে বেড়ানো। গবেষক, পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক ইত্যাদি লোকেরা জননায়ক হবার উপযুক্ত নয়।

লেখক—জননায়কদেরকে তাহ'লে মাথার ক্ষমতায় ছোট দরের লোক ভাব্ছেন?

সরকার—না। অনেকগুলা চিন্তার বেপারী হ'লেই উঁচু দরের লোক হওয়া যায় না। অতি-চিন্তাশীল লোকেরা অনেক সময়েই আহাম্মুক হয়। পণ্ডিতদেরকে লোকেরা আহাম্মুক বলে। আহাম্মুকদের পক্ষে জননায়ক হওয়া অসম্ভব।

লেখক—জননায়কদের আসল ক্ষমতা কোথায়?

সরকার—জননায়কেরা বাজারে-চালু-হওয়া চিন্তাগুলা নিয়ে কারবার করে। তারা স্বাধীনভাবে নিজ মুড়ো থেকে চিন্তা গজাতে চেষ্টা করে না। এইটেই হচ্ছে তাদের বাহাদুরি।

লেখক—পরকীয় চিন্তা নিয়ে কারবার চালানো জননায়কদের বাহাদুরি বল্ছেন?

সরকার—ঠিক তাই। জননায়কেরা স্বকীয় সৃষ্টির ক্যার্দানি দেখাবার জন্য লালায়িত নয়। তাদের সওদা হচ্ছে সার্বজনিক মতগুলা। তারা এই সকল সুপ্রচলিত মতের দুটা-একটাকে শক্ত মুঠোয় পাকড়াও করে। তারপর চালায় তারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়দৌড়। গাঁ হ'তে শহর আর শহর হ'তে গাঁ—উস্তম-পুস্তম ক'রে ছাড়া হ'লো তাদের ধান্ধা। কিন্তু পুঁজি তাদের ঐ পরকীয় মতগুলা। তামাম দেশটাকে সেই ধার-করা বুখ্নির সঙ্গে গেঁথে রাখা হ'চ্ছে আসল "লীডার" বা জননায়কের কাজ।

লেখক—তাহ'লে পণ্ডিতদেরকে জননায়ক হবার অনুপযুক্ত বল্ছেন?

সরকার—বুঝ্তে হবে যে,—লেখালেখি করা খারাপ নয়, পণ্ডিত হওয়া খারাপ নয়, গবেষক হওয়া খারাপ নয়। কিন্তু জননায়কদের পক্ষে এই সকল সদ্গুণ বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি কর্তে পারে। এইসব সদ্গুণ চেপে রেখে তাদেরকে বাজারে দাঁড়াতে হবে, বকাবকি আর ভবঘুরেমি চালাতে হবে! পাণ্ডিত্য তাদের কাছে বড় কথা নয়, লেখক হওয়া তাদের কাছে বড় কথা নয়, নতুন-নতুন চিন্তার মালিক হওয়া তাদের কাছে বড় কথা নয়।

লেখক—বড় কথা তা হ'লে কী?

সরকার—সকল ঠাঁইয়ে ভবঘুরেমি আর হামেশা বকাবকি। সুরেন-বিপিন হ'তে সুভাষ-শ্যামাপ্রসাদ পর্যন্ত বাঙালী জননায়কদের এই ধারা বজায় আছে। এইজন্যে বাঙালীর বাচ্চারা রোজই রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। চাই বাঙালী সমাজে সুরেন-শ্যামাপ্রসাদের হাড়-মাস ও গলাবাজি আরও বেশী-বেশী। পঁচিশ-ত্রিশের ছোক্রাদের ওপর নজর ফেল্ছি। একমাত্র

হিন্দু-দরদী বা একমাত্র মুসলমান-দরদী হ'লে চল্‌বে না। চাই সমানভাবে হিন্দু-মুসলমানের দরদী বঙ্গ-সন্তান,—সত্যিকার বাঙালী।

লেখক—শ্যামাপ্রসাদ তো হিন্দু মহাসভার কর্তা। তাঁকে আপনি "সত্যিকার বাঙালী" বলেন?

সরকার—কোনো বাঙালী-হিন্দু একমাত্র হিন্দু-দরদী কিনা সন্দেহ। বাঙলা দেশে হিন্দু-বিরোধী কোনো-কোনো মুসলমানের দল খাড়া হ'য়েছে। তারা জবাব স্বরূপ দাঁড়িয়েছে বাঙালীর হিন্দু-মহাসভা। হিন্দু-মহাসভার বাঙালীরা প্রাণে-প্রাণে সমানভাবে হিন্দু-মুসলমানের দরদী। এই হিসাবে তারা কংগ্রেস-পন্থী। এরা বাঙালীর বাচ্চা ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দুয়ানী হিন্দু মহাসভার কাছে বড়-কথা নয়। শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে একচোখো হিন্দু হওয়া অসম্ভব।

লেখক—আপনি হিন্দু মহাসভার লোক?

সরকার—আমি কোনো-কিছুর লোক নই। সকলেই জানে।

লেখক—বাঙলা দেশের সকল মুসলমানই কি মুস্‌লিম লীগের লোক?

সরকার—না। বাঙালী মুসলমানের লাখ-লাখ লোক,—এক কথায় অধিকাংশ লোক—খাঁটি বাঙালীর বাচ্চা। তারা হিন্দু-বিরোধী মুস্‌লিম লীগের ধার ধারে না। সমানভাবে হিন্দু-মুসলমানের দরদী হচ্ছে বাঙলার মুসলমানদের অগণিত নরনারী।

মে ১৯৪৪

সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতি

১২ই মে ১৯৪৪

হেমেন সেন—বঙ্গীয়-সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে?

সরকার—না। কোনো রাষ্ট্রিক দল বা আন্দোলনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নাই।

লেখক—এপ্রিল মাসের ২১-২৩ তারিখে এই সমিতির সভা ব'সেছিল। তাতে একটা ইস্তাহার জারি করা হ'য়েছে। দেখ্‌লাম তাতে অনেকের নাম সই আছে। আপনার নাম দেখ্‌লাম না তো?

সরকার—এই অধম রাষ্ট্রিক কারবারে নাম সই কর্‌তে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু এই সভার প্রথম দুইদিনকার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম।

লেখক—কেন?

সরকার—যে-কোনো বিদেশের সঙ্গে বাঙলার নর-নারীর মেলামেশা আমি পছন্দ করি। রুশিয়াকে নিয়ে বাঙালী জাত্‌ কতখানি মেতেছে তা জরীপ কর্‌বার মতলবে সভায় গিয়েছিলাম।

লেখক—জরীপের ফলাফল কী রকম মনে হচ্ছে?

সরকার—প্রথম দিন ছিল বৌবাজারে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে সভা। তাতে হাজির ছিল প্রধানতঃ সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতির নানা শাখার প্রতিনিধি। হাওড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর ইত্যাদি বিভিন্ন জেলা থেকে লোক এসেছিল। সকলেই ছোক্‌রা। এইটেই আসল কথা।

লেখক—কী শুন্‌লেন?

সরকার—প্রায় সকলেই যেন বল্‌লে—"আন্দোলন চল্‌ছে না। লোকেরা গা কর্‌তে চায় না। একমাত্র আমিই কোনো মতে ধূনি জ্বেলে ব'সে র'য়েছি। কল্‌কতার কেন্দ্র-সভা থেকে প্রচারক যাওয়া চাই মাঝে-মাঝে। তাহ'লে যথাসময়ে ছোক্‌রাদের ভেতর উৎসাহ জেগে উঠবে।"

লেখক—এই আন্দোলনে কর্তা দেখ্‌লেন কাদেরকে?

সরকার—আন্দোলনের চাঁইরা অনেকেই সুপরিচিত। বাঙালী সোশ্যালিস্ট্‌দের ঠাকুরদাদা ভূপেন দত্ত ছিল। তাকে অনেকদিন ধ'রেই এই ক্ষেত্রের মাতব্বর জানি। কাজেই নতুন-কিছু মনে হ'লো না। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তো ভূপেনের অনেকদিনকার বন্ধু। সে-ও নতুন চাঁই নয়। মৃণাল বসুকে সাংবাদিক-সভায় মাতব্বর ভাবেই দেখা যায়। আর ট্রেড-ইউনিয়ন-কংগ্রেসের কারবারেও মৃণাল মাতব্বরই বটে। কাজেই মৃণালও নতুন নয়। রিপণ কলেজের অধ্যাপক নীরেন রায়কেও নতুন বলি না। নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়কে সোশ্যালিস্ট্‌ মূর্তিতে এই প্রথম দেখ্‌লাম।

লেখক—নতুন দেখ্‌লেন আর কী?

সরকার—সেকালের বন্ধু ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর ছেলে স্নেহাংশুকে এই দলে দেখা গেল। ছোক্‌রা ব্যারিস্টার। সবদিক্‌ থেকেই নতুন বটে। বাঙালী জাত এগুচ্ছে। প্রত্যেক আন্দোলনই বাইশ-পঁচিশ-আটাশ বছরের ছোকরাদের উৎসাহ আসল কথা। আর এক ছোকরা দিলীপ বসু। একে মনে হ'লো ভলাণ্টিয়ার গোছের। তবে আন্দোলনের ভেতর বোধহয় বড় কর্মকর্তা। এই ধরণের ছোকরা ছিল সভায় বেশী। তাতেই অবশ্য সভার গৌরব। বোধহয় শ'-দেড়-দুই লোক ছিল। কয়েকজন মেয়েও হাজির ছিল। তাদের ভেতর অধ্যাপক রেণু চক্রবর্তী আর একজন এম-এ ক্লাশের ছাত্রী (কমলা চ্যাটার্জি)।

লেখক—উল্লেখযোগ্য আর কিছু দেখ্‌লেন?

সরকার—গাল্পিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপস্থিত দেখ্‌লাম। ইনি হাজির প্রতিনিধিরূপে না দর্শকরূপে বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলে গেলাম। নবাবজাদা হাসান আলি চৌধুরীকেও দেখ্‌লাম। স্নেহাংশুর মতনই ছোকরা। বঙ্কিমের মতন লেজিসলেটিভ্‌ অ্যাসেম্ব্লির লোক। বঙ্কিম সর্ব-ভারতীয় কিষাণ-সভার প্রতিনিধি। আর হাসান বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা-দলের প্রতিনিধি। হাসান হচ্ছেন পনের-বিশ বছর আগেকার মন্ত্রী নবাব আলি চৌধুরীর ছেলে। নবাব সাহেবের সঙ্গে আলাপ ছিল।

লেখক—দেখে শুনে কী ভাব্‌লেন?

সরকার—ছোকরারে আওতায়,—মনে হ'লো,—আন্দোলনটা দাঁড়িয়ে যাবে। আবার বল্‌ছি, গোটা কয়েক ছোকরা—বিশ-পঁচিশ আটাশ বছরের যুবা—যেখানে দেখি সেখানে কাজকর্মের পরমায়ু সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ জাগে না।

লেখক—আর কিছু বিশেষত্ব ছিল?

সরকার—এই মজলিশের নয়া-পুরাণা, ছোড়া-বুড়ো বা নবীন-প্রবীণ চাঁই বা কর্মকর্তাদের ভেতর হা-ভাতে, হা-ঘরে কেউ নয়। সকলেরই ঘরে হাঁড়ী চড়ে দস্তুর মতন। প্রত্যেকেই দু-বেলা বেশ আঁচায় ঠিক যথা সময়ে। অনেকেই সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। কাজেই তথাকথিত প্রোলেটারিয়াটের আন্দোলন এটা নয়। ঝী-চাকর, কুলি-মজুর, মুটে-চাষীর আবহাওয়া এখানে নাই। এই আন্দোলন হচ্ছে যুবক বাঙলার ভাবুকতাময় স্বদেশ-সেবকদের উন্নতি-নিষ্ঠার

অন্যতম সাক্ষী। পয়সাওয়ালা লোকেরা দেশটাকে সজ্ঞানে কোনো-একটা নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা কর্ছে। কাজেই এই আন্দোলন জীবনের আন্দোলন। এই জন্যেই আন্দোলনটা টেঁকসই। এই আন্দোলন বাঙালী জাতের সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য।

লেখক—অন্য কোনো লক্ষণ দেখ্লেন?

সরকার—নবীন-প্রবীণ মাতব্বরেরা সকলেই মুড়োওয়ালা লোক। চাঁইদের ঘাড়ের উপর একটা ক'রে মাথা আছে। সেই মাথার ভেতরকার ঘী খরচ ক'রে এরা জীবন চালাতে অভ্যস্ত। আন্দোলন চল্ছে মস্তিষ্কজীবীদের হাতপা'র জোরে আর মাথার জোরে। কাজেই আন্দোলনের মার নাই।

হীরেন মুখোপাধ্যায়ের রুশ-প্রীতি

লেখক—মাতব্বরদের ভেতর বক্তৃতা হ'লো কার-কার?

সরকার—শেষ পর্যন্ত ছিলাম না। ইস্তাহারটা জারি হ'লো হীরেন মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ। বাংলায় পড়া হ'লো। ইংরেজিতেও তৈরি ছিল। ইংরেজি আর বাংলা,—দুটার লেখকই বোধ হয় হীরেন নিজে।

লেখক—কতক্ষণ ছিলেন? শেষ পর্যন্ত কী ধারণা নিয়ে ফির্লেন?

সরকার—ছিলাম ঘণ্টা দুয়েক। মনে হ'লো যে, বর্তমানে হীরেন বঙ্গীয় রুশ-আন্দোলনের আসল চাঁই। অন্যান্য মাতব্বরদের তুলনায় হীরেন বেশ-কিছু বিশেষত্বশীল।

লেখক—হীরেন মুখোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব কোথায়?

সরকার—হীরেন বক্তাও বটে, লেখকও বটে। এই হিসাবে প্রবীণ ভূপেনের পাশে নবীন হীরেনকে দাঁড় করাতে পারি। তবে ভূপেন সাধারণভাবে সোশ্যালিজ্ম্ বা সমাজতন্ত্রের প্রচারক। একমাত্র রুশিয়া নিয়ে তার কারবার নয়। হীরেন প্রধানতঃ বা একমাত্র রুশিয়া নিয়ে আছে। ১৯৪১ সনের জুন মাসে জার্মাণির রুশ-অভিযানের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙলার সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতি কায়েম হয়। এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তা বোধহয় হীরেন।

লেখক—রুশিয়া সম্বন্ধে হীরেনের লেখা-লেখি কিরূপ দেখেছেন?

সরকার—১৯৪২ সনের নবেম্বর মাসে হীরেনের তদ্বিরে "ইন্ডো-সোভিয়েট জার্ন্যাল" বেরুতে সুরু ক'রেছে। এটা ইংরেজি পাক্ষিক। হীরেনের সম্পাদকীয় লেখা তো আছেই; তাছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধও আছে। এই পত্রিকার মারফৎ ডাক্তার অমিয় বসু, অধ্যাপক নীরেন রায়, ব্যারিস্টার ভূপেশ গুপ্ত ও জ্যোতি বসু ইত্যাদি লেখকের রুশিয়াবিষয়ক রচনা বেরিয়েছে। তাছাড়া রুশ গাল্পিক এরেনবুর্গ ইত্যাদি সাহিত্য-স্রষ্টাদের লেখা ভারতে প্রচারিত হ'য়েছে। পত্রিকাটা তারিফ-যোগ্য।

লেখক—এই পত্রিকাটার সম্পাদন ও প্রকাশের জন্য হীরেনকে তারিফ কর্ছেন?

সরকার—হাঁ। নতুন আন্দোলন চালু কর্তে হ'লে প্রথমেই চাই পত্রিকা। বিনা পত্রিকায় নয়া-নয়া খেয়াল ছড়ানো অসম্ভব। কলম চালাতেই হবে চোপর দিনরাত। তার সঙ্গে জরুরি গলাবাজি। একমাত্র বক্তৃতার দ্বারা আন্দোলন দাঁড় করানো যায় না। লেখা-লেখি আবশ্যক দস্তুরমতন। একমাত্র পুস্তিকা আর গ্রন্থের জোরেও আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। চাই পত্রিকা। দৈনিক হ'লেই সেরা। কম-সে কম-সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক। নেহাৎ পয়সার অভাব

হ'লে মাসিক বা এমন কি ত্রৈমাসিকও সই। চাই নিয়মিত ছাপা-ছাপির ব্যবস্থা। হীরেন বক্তাকে বক্তা, লেখককে লেখক।

লেখক—"ইন্ডো-সোভিয়েট জার্ন্যাল" ছাড়া হীরেনের লেখা-লেখি আর কিছু দেখেছেন?

সরকার—একটা জবরদস্ত লেখা হীরেনের হাতে বেরিয়েছে। এই জন্য হীরেন বাঙালী জাতের অন্যতম কৃতী পুরুষ। প্রকাণ্ড বাংলা বইয়ের লেখক হিসাবে হীরেনকে বাংলা সাহিত্যের আসরে সমঝ্-দারেরা অনেকদিন মনে রাখ্‌বে।

লেখক—কোন্ বই?

সরকার—রুশিয়ার কমিউনিস্ট্‌দলের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা শ'-চারেক পৃষ্ঠার ইংরেজি বই আছে। তাতে ১৮৮৩ সন হ'তে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত চুআন্ন বছরের রুশ রাষ্ট্রিক আন্দোলন সহজে পাকড়াও করা যায়। এই বইটার ঝাড়া তর্জমা ক'রেছে হীরেন (১৯৪৪)। বাংলায় দাঁড়িয়েছে শ'-সতেক পৃষ্ঠার মাল। এতবড় বই লেখা বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে একটা ঘটনা বিশেষ।

(গুরুদাসের 'জ্ঞান ও কর্ম" ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)

লেখক—কেন? বড় বই লেখা কি বাঙালীর পক্ষে কঠিন?

সরকার—কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বড় বইয়ের লেখক বাঙালী সংসারে বেশী নাই। গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি সুকুমার সাহিত্য বাদ দিচ্ছি। বাঙালীর বাচ্চা আমরা সাধারণতঃ বার-চোদ্দ-ষোল পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লিখ্‌তে অভ্যস্ত। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অথবা সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে কখনো-কখনো বিশ-বাইশ পৃষ্ঠার বক্তৃতা লেখাও আমাদের কোষ্ঠীতে সুপরিচিত। তাছাড়া শ' তিন-চারেক পৃষ্ঠার গল্প বা উপন্যাস লেখা হালে সুরু হ'য়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা পি-এইচ্ ডি উপাধি পাবার জন্য ইংরেজিতে শ' তিন-চারেক পৃষ্ঠার বইও আজকাল লিখ্‌ছে। কিন্তু পাঁচ-সাত শ' পৃষ্ঠায় ভরা বাংলা বই লিখ্‌তে বাঙালীর বাচ্চা বড় একটা এগোয় না। কোনো ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা ঐ ধরণের মাল যাতে আছে এমন বই বড়-আকারে লিখ্‌তে মেহনৎ লাগে, সময় লাগে আর চরিত্রও লাগে।

লেখক—কিন্তু হীরেনের বইটা তো তর্জমা মাত্র?

সরকার—বড়-বহরের তর্জমায়ও বাঙালী জাত বেশী-কিছু দেখাতে পারে নি। এই জন্যই তর্জমা সত্ত্বেও হীরেনের বাহাদুরি সম্বর্দ্ধনা কর্‌ছি। চরম আগ্রহ দেখ্‌ছি, চরম উন্মাদনা দেখ্‌ছি, চরম আদর্শনিষ্ঠা দেখ্‌ছি, চরম ভক্তিযোগ দেখ্‌ছি, চরম বাংলাপ্রীতি দেখ্‌ছি, চরম স্বদেশ-সেবা দেখ্‌ছি। তর্জমায়ও তারিফ কর্‌বার মাল আছে। এই সব সদ্‌গুণের সঙ্গে র'য়েছে চরম পরিশ্রমনিষ্ঠা, কঠোর কর্তব্যজ্ঞান, আর নিয়মিত কাজকর্মের প্রবল অভ্যাস। এই ধরণের নৈতিক শক্তি না থাক্‌লে কোনো লোক এতবড় বই ঝাড়্‌তে পারে না। তর্জমাকারী হিসাবে, বড়-বহরের লেখক হিসাবে হীরেন যুবক বাঙলার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর রাষ্ট্রিক মতামত আমি জানি না। তার খবর না রেখেও আমি হীরেনকে নয়া-বাঙলার অন্যতম জবরদস্ত গঠনকর্তা বল্‌তে প্রস্তুত আছি। হীরেনের কাজ-কর্মে বাঙালী জাত বাড়্‌তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

লেখক—একটা বড়-বই লেখার জন্য হীরেন সম্বন্ধে এত কথা বল্‌লেন?

সরকার—কী ক'র্‌বো ভায়া? বই লেখা-লেখির কারবারটা বেশ-কিছু কঠিন। এই গরীবের জীবন কাট্‌লো এই কারবারে। সেই জন্য হীরেনের বিশেষত্ব ধর্‌তে পার্‌ছি। হীরেনের মতন যে-কোনো বাঙালীর বাচ্চা বাংলায় বড়-বড় বই লিখুক সকলের কাছেই আমি সমানভাবে মাথা নোআতে প্রস্তুত আছি। তর্জমাকে তর্জমাই সই। চাই বড়-কিছু।

বাঙালী জাতকে দুনিয়ার জগদ্‌বরেণ্য কর্‌বার অন্যতম উপায় হচ্ছে বাংলা ভাষায় বড়-বহরের বই ঝাড়া। যাক্,—মুখ্‌খু ও গরীব আমি। আমার মতের দামই বা কী?

বাচ্চা, ছোকরা, যুবা

লেখক—আপনি "বাচ্চা", "ছোক্‌রা", "যুবা" ইত্যাদি শব্দে কী বুঝেন?

সরকার—যাদেরকে আমি সম্বর্দ্ধনা করি তাদেরকে বলি বাচ্চা, ছোক্‌রা, যুবা। অনেক সময়ে এই তিন শব্দের মানে এক। তবে কখনো-কখনো ফারাক করি। বয়সের কম-বেশীর মাপ-মাফিক ফারাক হয়।

লেখক—কিরূপ ফারাক? কোন্ বয়সে বাচ্চা আর কোন্ বয়সে ছোক্‌রা?

সরকার—বিশ-পঁচিশের ভেতরকার ছেলে-মেয়ে হচ্ছে বাচ্চা, আর পঁচিশ-ত্রিশের কোঠায় যারা তাদেরকে বলি ছোক্‌রা। জোআন আর ছোক্‌রা আমার পারিভাষিকে প্রায়-এক। তবে কখনো-কখনো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের (এমন কি চল্লিশের) দলও আমার জরীপে জোআনের দল।

লেখক—এই ধরণের জরীপ কিছু-নতুন রকমের নয় কি?

সরকার—তাও আবার বল্‌তে হবে? নিশ্চয়ই বেয়াড়া রকমের কিম্ভূতকিমাকার পারিভাষিক। আসল কথা,—বয়সে এই অধম ক্রমেই উঁচিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ চল্‌তি কথায় যাকে বলে বুড়িয়ে যাওয়া তাই ঘ'টেছে বা ঘট্‌ছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের লোকেরা আজ ১৯৪৪ সনে আমার চেয়ে বিশ-বাইশ বছর ছোট। চেহারা দেখ্‌বামাত্রই ফারাকটা জবরদস্ত মালুম হয়। এই জন্যে এদিক্-ওদিক্ না তাকিয়ে ধাঁ করে তাদেরকে ছোক্‌রা ব'লে ডাকি। কী ক'র্‌বো? আর যারা বিশ-পঁচিশ বছরের তাদেরকে নেহাৎ-কচি মনে হয়। বয়সের ফারাক এত বেশী। এই অধম আজকাল বেশ-কিছু বয়স-প্রবীণ।

লেখক—কিন্তু আপনি নিজেকে আজ ১৯৪৪ সনে বুড়ো, বয়স-প্রবীণ ইত্যাদি বিবেচনা করেন কি?

সরকার—কোনো মতেই না। আমি আজও চ্যাংড়াই আছি; শুধু ছোক্‌রা বা জোআন মাত্র নই। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নর পরবর্তী সাতান্নতে পা দিয়েও আমি নিজেকে বাচ্চা ছাড়া আর কিছু ভাবি না। ১৯০৫ সনের সতর-আঠারতে যা ছিলাম আজও তাছাড়া আর-কিছু নই। একটা মজার কথা আছে। শোনাবো?

লেখক—বলুন না?

সরকার—বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশে যে-সব ছেলে-মেয়েরা পড়ে তাদের বয়স কত জানা আছে তো? বিশ-বাইশের কোঠায় তারা সব। তাদেরকে যখন দেখি মনে হয় না যে,—এরা এম-এ পড়্‌ছে।

লেখক—কী মনে হয়?

সরকার—ঠিক যেন পাঠশালার কচি ছেলে-মেয়েরা ছেলে-খেলা কর্‌ছে। ওদের দিকে চোখ ফেল্‌লেই আপনা-আপনি আমার মাথায় এই খেয়াল জাগে। এরা যখন হাসা-হাসি করে বা হট্টগোল করে মনে হয় যেন বাচ্চারা খেলার মাঠে চেঁচাচ্ছে। একদম নাতী-নাত্‌নী যেন এরা আমার। মজার কথা,—এদের ভেতর অনেকে বাস্তবিকই আমার ছাত্রদের ছেলে-

মেয়ে। আমার স্বদেশী যুগের ছাত্ররা অনেকেই আমার সমান-বয়েসি ছিল। বন্ধুদের ছেলে-মেয়ে তো গণ্ডা-গণ্ডাই পেয়েছি। তবে এদেরকে নাতী-নাত্নী বল্বার বিশেষ কারণ আছে।

লেখক—কী সেই কারণ?

সরকার—আমরা যখন ১৯০৫-এর বাচ্চা তখন তাদের বাচ্চারা নিশ্চয়ই ১৯০৫-এর নাতী-নাত্নী। তাই কখনো-কখনো এদেরকে বঙ্গ-বিপ্লবের বা ১৯০৫-সনের নাতী-নাত্নী ব'লে ডাকি।

লেখক—এই ধরণের খেয়াল আপনার কবে থেকে সুরু হ'য়েছে?

সরকার—বলা কঠিন। বোধ হয় ১৯৪০ সনের কাছাকাছি। ঐ সময়ে এম-এ ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অতি-কচি নাতী-নাত্নীর মতন ভাব্তে সুরু ক'রেছি। এ এক মজার অভিজ্ঞতা।

লেখক—তখন আপনার বয়স কত?

সরকার—কতই বা? বাআন্ন-তেপ্পান্নো। অর্থাৎ পঞ্চাশের পর বিশ-বাইশের ছেলেমেয়েদেরকে যার-পর নাই কচি-শিশু মনে করাটা সুরু হ'য়েছে। অন্যান্য পঞ্চাশোর্দ্ধদের খেয়াল বা ধরণ-ধারণ আলোচনা ক'রে দেখা মন্দ নয়। মানুষের চিত্তবিকাশে এই এক নয়া-ঢঙের তথ্য। তবে মেজাজ সকলেরই এক-প্রকার নয়।

লেখক—এই বিচিত্র অবস্থার কোনো কারণ ঠাওরাতে পেরেছেন?

সরকার—বোধ হয় না। তবে একটা নেহাৎ ঘরোআ ব্যক্তিগত কথা ব'লে যাচ্ছি। ১৯৪০ সনে আমার মেয়ে (ইন্দিরা) কলেজে (ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউশনে) ভর্তি হ'লো। তৎক্ষণাৎ আমার ঐ ধরণের খেয়াল এসে জুটলো। ঐ বাচ্চা যদি কলেজের ছাত্রী হয় তাহ'লে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরাও নিশ্চয়ই বাচ্চা। এইরূপ দাঁড়িয়ে গেল মেজাজে। বি-এ, এম-এর ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকাবা মাত্রই মনে পড়ে নিজের কচি-মেয়ের কথা। সকলেই তো প্রায় এরি জুড়িদার? তাহ'লে তারাও বাচ্চা বা কচি-শিশু নয় তো কি? ১৯৪৪ সনে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়্তে চল্লো (জুন)। এই অবস্থায় এম-এর বিদ্যাটাকে অতি-কিছু ভাবা বা গুরু-গম্ভীর, সম্ঝে চলা অসম্ভব।

লেখক—১৯৪০-এর আগে এম-এর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কিরূপ ভাব্তেন?

সরকার—ঠিক আমার সমান-সমান ভাব্তাম।

লেখক—আপনার সমান কোন্ অর্থে?

সরকার—আমি ঠিক যেন ১৯০৫ সনের চ্যাংড়াই আছি। চিরকাল এইরূপ আমার মতিগতি। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যুবক বাঙলা ব'লে ডাক্তাম। ১৯০৫-এ আমি যেমন ছিলাম প্রত্যেক বছরের এম-এ ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিক-যেন তাই আছে। এই ছিল আমার ধারণা। আমিও যুবক বাঙ্লা, এরাও যুবক বাঙ্লা। কোনো তফাৎ নেই।

লেখক—আপনি বয়সে যে এদের চেয়ে অনেক বড় তা মনে হতো না?

সরকার—না। ১৯৪০ পর্যন্ত আমি নিজেকে কখনো কোনো এম-এর ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে বয়সে বড় ভাব্তে পারিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমার যদি মেয়ে (বা ছেলে) না থাক্তো আর কলেজে ভর্তি হবার অবস্থায় না আস্তো তাহ'লে বোধ হয় আজও আমি সেইরূপই র'য়ে যেতাম। অর্থাৎ এম-এর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিজের মতনই যুবক বাঙ্লা ভাব্তাম। মানুষের মতিগতি বিচিত্র! আমি লোকটা আহাম্মুক। আমার আর আক্কেল হ'লো না। বয়স বাড়্লোই না যেন মনে হচ্ছে।

রুশ-প্রচারে সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতি

১৪ই মে, ১৯৪৪

লেখক—সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতির আর কোনো অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন?

সরকার—হাঁ। দ্বিতীয় দিনের সভা ব'সেছিল ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট ভবনে (২২এ এপ্রিল)। এ বৈঠক ছিল সার্বজনিক। লোকের ভিড় হ'য়েছিল জবরদস্ত। এত বড় সভা সাধারণতঃ দেখা যায় না। ছেলে-মেয়ে, নবীন-প্রবীণ, সব-রকম লোক হাজির ছিল। নানা পেশার প্রতিনিধিও দেখ্‌লাম। তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি। শেষ পর্যন্ত ছিলাম। জীবনে কোনো সভায় এতক্ষণ কাটাইনি। কল্‌কাতার সার্বজনিক মজলিশে সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতির এই অধিবেশনটা যার-পর-নাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

লেখক—কী দেখ্‌লেন?

সরকার—সমিতি একটা "প্রেসিডিয়ুম" বা সভাপতি-মণ্ডলী খাড়া ক'রেছিল। তাতে বার-চোদ্দ জনের নাম দেখা গেল। তাঁরা বোধ হয় সকলেই বক্তৃতামঞ্চে হাজির ছিলেন। দুই মহিলা। প্রথমতঃ ইন্দিরা দেবী ("বীরবল" প্রমথ চৌধুরীর পত্নী) বল্‌লেন—"আমি এই মজলিশে র'য়েছি ব'লে আপনারা ভাব্‌বেন না যে, সোভিয়েট রুশিয়ার অন্যতম দাগী লোক বা চাঁই আমি।" নেলী সেনগুপ্তা (পরলোকগত জননায়ক যতীন সেনগুপ্ত'র পত্নী) বল্‌লেন—"সোভিয়েট রুশিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রে দেবে এইরূপ সম্‌ঝে রাখা ঠিক নয়।" দু'টাই পাকা কথা।

লেখক—বক্তা ছিল কতজন?

সরকার—সভাপতি-মণ্ডলী ছাড়া আর কোনো বক্তা ছিল না। গোটা তিনেক গান হ'লো। সোভিয়েট গানের বাংলা তর্জমাটা শুনালো মন্দ না।

লেখক—অন্যান্য বক্তাদের কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—তেজী বক্তা ভূপেশ দাশগুপ্ত। ছোকরা ব্যারিস্টার। লেখকও বটে। ইন্ডো-সোভিয়েট জার্ন্যালের অন্যতম সম্পাদক। ইংরেজি বক্তৃতা শুনা গেল। আর একজন তেজী বক্তা আবুল হাশেম। ইনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক। স্বাধীন মেজাজের লোক। লেজিস্‌লেটিভ্‌ অ্যাসেম্‌ব্লির সভ্য। বয়স বেশী নয়। জানা গেল ইনি বর্দ্ধমানের আবুল কাসেমের ছেলে। স্বদেশী যুগে আবুল কাসেম প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় ঝাঁঝ ছিল। হাশেমের বক্তৃতায়ও বাপের ঝাঁঝ পেলাম। ভূপেশ গুপ্ত রুশ আন্দোলনের অন্যতম চাঁই। কিন্তু হাশেম চাঁই কিনা বুঝা গেল না। তবে দরদী যুবা বটে।

লেখক—সোভিয়েট-পন্থী চাঁইদের ভেতর কে কে ছিলেন?

সরকার—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ভূপেন দত্ত। তিনি পড়্‌লেন বাংলায় লেখা প্রবন্ধ। মাতব্বরদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসু, ব্যারিস্টার যোগেশ গুপ্ত, অধ্যাপক ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় আর হীরেন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। নতুনের ভেতর দেখ্‌লাম গাল্পিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

লেখক—তারাশঙ্করের বক্তৃতা হ'লো?

সরকার—হাঁ। ইনি প্রথমেই ছেলেবেলা হ'তে ১৯০৫ পর্যন্ত যুগের গ্রাম্য অভিজ্ঞতা বিবৃত ক'র্‌লেন। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র (১৯১৪-১৮) ও তার পরবর্তী গান্ধি-যুগ ও স্বরাজ-আন্দোলনের (১৯২০-২৪) কথাও বিশ্লেষণ কর্‌লেন। জানিয়ে দিলেন যে,

তিনি বর্তমানে রুশ-দর্শনের সাক্‌রেত্।

লেখক—বক্তৃতাগুলার মোটা কথা ছিল কী?

সরকার—এক বক্তৃতার মুদ্দা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ—"বহুসংখ্যক ধর্ম, ভাষা, ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রেছে সোভিয়েট রুশিয়া। এইজন্য সোভিয়েট রুশিয়া ভারতের সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য।"

লেখক—এই বাণী সম্বন্ধে আপনি কী বল্‌তে চান?

সরকার—এইরূপ ঐক্যস্থাপন সোভিয়েট-রুশিয়ার পক্ষে বিশেষত্ব নয়। সোভিয়েটহীন আমেরিকায়ও ঐক্য স্থাপিত হ'য়েছে। জারশাসিত রুশিয়ারও ঐক্য ছিল। তাছাড়া বৃটিশ-শাসিত ভারতেও ঐক্য আছে। পল্টনের জোর থাক্‌লে যেখানে-সেখানে জুতিয়ে ঐক্য কায়েম করা সম্ভব। কাজেই ঐক্যস্থাপন হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। সোভিয়েট রুশিয়াকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য কারণ বাৎলানো উচিত। ঐক্যস্থাপনকে সোভিয়েট রুশিয়ার বিশেষত্ব বুঝ্‌লে তার জাত্ মারা হয়। অনেক বক্তাই রুশিয়ার জাত মেরেছে দেখ্‌লাম।

লেখক—আর কোনো বাণী মনে আছে?

সরকার—একজনের বক্তৃতায় জোর ছিল সোভিয়েটের শিক্ষা-প্রচার, শিল্প-প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান-গবেষণা, সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদি কাজের ওপর। এই ক্ষেত্রেও সোভিয়েটের খাশ-বিশেষত্ব কিছুই প্রচারিত হ'লো না। কেননা বিলাত, জার্মাণি, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য স্বাধীন দেশে শিক্ষা-প্রচার ইত্যাদি কাজ জোরের সহিতই চলে। তাছাড়া অল্পকালের ভেতর অধিক ফল দেখাবার দৃষ্টান্ত হিসাবে জার্মাণি আর জাপান সর্বদাই উল্লেখযোগ্য।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতির এত-বড় অধিবেশনে রুশিয়ার খাশ-বিশেষত্ব সম্বন্ধে রুশ-পন্থী বাঙালী মাতব্বরেরা অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেন নি?

সরকার—তাই আমার মনে হচ্ছে। ইস্কুল-কলেজ কায়েম করা, হাসপাতাল গ'ড়ে তোলা, যন্ত্রপাতির রেওয়াজ বাড়ানো ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ও আর্থিক কাজকর্মকে সোভিয়েটের বিশেষত্বরূপে জা'হির করা তার ইজ্জদ নাশ করার সামিল। আরেক জন বল্‌লেন—"সোভিয়েট রুশিয়ার ধর্ম হচ্ছে মানবসেবা ও সমাজসেবা।"

লেখক—সোভিয়েট-বিষয়ক এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—এই ধরণের ব্যাখ্যা কিরূপ বল্‌বো? মনে করা যাক,—হিন্দু সমাজের কোনো সংস্কারক বল্‌ছেন—"দেব-দেবী কিছু নয়, বেদ-পুরাণ-তন্ত্রসমূহ কিছু নয়, পুরুত ঠাকুর কিছু নয় ইত্যাদি। চালাও পরোপকার, মানবসেবা, সমাজ-সেবা।" অথবা মুসলমান সমাজের সংস্কারক বল্‌ছেন—"মহম্মদের নাম মুখে আন্‌বার দরকার নাই। কোরাণ বয়কট্ করা চল্‌তে পারে। লেগে থাকো দান-খয়রাতে।" খৃষ্টিয়ান সমাজে রুশ বোলশেভিকরা বল্‌ছে—"যীশু-মেরী বাতিল। বাইবেল করো বয়কট্। পাদ্রী, গির্জা ইত্যাদি ব্যক্তি ও সঙ্ঘ সেকেলে চিজ। সব ধর্ম মাঝে ত্যাগ ধর্ম সার ভুবনে।" এই ধরণের ধর্ম-প্রতিষ্ঠাকে কেউ ধর্মরক্ষা বা ধর্মপ্রচার বল্‌বে না। সবাই বল্‌বে ধর্মের ধ্বংস-সাধন, অধর্ম, ধর্মস্য গ্লানি।

লেখক—সোভিয়েট-সুহৃদগণের আর কোনো বক্তৃতা সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—একজন রুশ-প্রচারকের বাণীতে মজার কথা শুনা গেল। তিনি বল্‌লেন—"সোভিয়েট রুশিয়ার কর্মনীতি যা, ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শ বিলকুল তা।" এই ধরণের বক্তৃতা ১৯৪৪ সনের এপ্রিল মাসেও বাঙালী সমাজের মগজওয়ালাদের ভেতর অনুষ্ঠিত হ'লো! রুশ-প্রচার রকমারি,—বলাই বাহুল্য। যার যা খুশী সে তাই বলে। তার বাণীই রুশ-বাণী!

লালফৌজের কীর্তি বনাম বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির জয়জয়কার

লেখক—বক্তাদের অন্য কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—আর একটা বাণীর কথা বল্‌বো। শুন্‌লাম,—"সোভিয়েট রুশিয়ার লালফৌজ জার্মাণ পল্টনগুলাকে হারাতে-হারাতে পোল্যাণ্ড আর রুমানিয়া পর্যন্ত এনে ঠেকিয়েছে। এই রুশ-গৌরবে বিশ্ববাসীর গৌরব" ইত্যাদি।

লেখক—আপনি লালফৌজের এই গৌরব-প্রচার সম্বন্ধে কী বিবেচনা করেন?

সরকার—আমি রাষ্ট্রনীতি বুঝি না। আর লড়াইএর কায়দা সম্বন্ধে এই অধমের চৌদ্দ পুরুষ আনাড়ি। কিন্তু মামুলি চোখে মনে হচ্ছে যে,—বিলাতী-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির জয়জয়কার দেখা যাচ্ছে বেশী। এই জন্যেই জার্মাণি রুশিয়া থেকে হ'ঠে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছে।

লেখক—আপনি কী বল্‌ছেন?

সরকার—সোভিয়েট লালফৌজ জার্মাণ পল্টনগুলাকে রুশিয়া থেকে হঠাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। যদি কাউকে ১৯৪৪ সনের মে মাসে বাপটা বেটা বল্‌তে হয় তাহ'লে ইংরেজ (আর মার্কিণ) রাষ্ট্রবীরদেরকে বাপ্‌কা বেটা বলা উচিত। রুশিয়ার লালফৌজ এখনো সেই ইজ্জদ দাবী কর্‌তে পারে না।

লেখক—লালফৌজদের সামরিক কীর্তি কতটা?

সরকার—খোলাখুলি লড়াইয়ের মাঠে লালফৌজ জার্মাণ পল্টনকে হারিয়েছে একমাত্র স্তালিনগ্রাদে (১৯৪৩ ফেব্রুয়ারি)। মস্কো, লেনিনগ্রাদ ইত্যাদি আর কোথাও সম্মুখ-সমরে জার্মাণরা রুশিয়ার কাছে হারে নি। রুশিয়ার মাঠে জিত্‌ চ'লেছে বৃটিশ পর-রাষ্ট্রনীতির। জার্মাণ পল্টন হেরেছে ইংরেজ রাষ্ট্রবীরদের কাছে। ইংরেজরা লড়ে মাথার জোরে আর টাকার জোরে। রুশিয়ায় জার্মাণির পরাজয়ে ইংরেজ মাথার জোর আর ইংরেজ টাকার জোর দেখ্‌তে হবে।

লেখক—আপনার মন্তব্য ভয়ানক নতুন মনে হচ্ছে। দুর্বোধ্য শুধু নয়,—অবোধ্য।

সরকার—কী কোর্‌বো? আমি মুখ্‌খু মানুষ। রুশ-জার্মাণ যুদ্ধে সকলে দেখ্‌ছে লালফৌজ বনাম জার্মাণ-ফৌজ। আর আমি দেখ্‌ছি ইংরেজ-মার্কিণ রাষ্ট্রবীরদের কর্ম-কৌশল। ১৯৪৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালি রাতারাতি লড়াই থেকে খ'সে পড়্‌লো। জার্মাণির পক্ষে এটা কি সোজা লোকসান? ইংরেজ-মার্কিণের পক্ষে ইতালির লড়াই ছেড়ে দেওয়া কি মামুলি লাভ?

আসল দ্বিতীয় রণাঙ্গন

লেখক—ইতালির লড়াই ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে রুশ-জার্মাণ লড়াইয়ের যোগাযোগ কোথায়?

সরকার—ইতালির লাখ পঞ্চাশেক লোক জার্মাণ সরকারের তাবে ইয়োরোপের নানা দেশে কাজ কর্‌ছিল। ইতালিয়ান নৌ-বহরও ভূমধ্য সাগরে জার্মাণ স্বার্থমাফিক কাজে বহাল ছিল। মুসলিনিকে যেই বাদলিও চিৎ কর্‌লে অমনি জার্মাণরা ইতালিয়ান পল্টন, ইতালিয়ান

উড়োজাহাজ আর ইতালিয়ান নৌবহরকে খরচের খাতায় লিখ্‌লে। তৎক্ষণাৎ জার্মাণ সেনানায়করা দেখ্‌লে যে, ইতালিকে জার্মাণির দখলে রাখ্‌তে হবে। তার জন্য চাই ইতালিতে জার্মাণ ফৌজ আর জার্মাণ উড়োজাহাজ। শুধু তাই নয়।

লেখক—কেন? আর কী?

সরকার—লাখ পঞ্চাশেক ইতালিয়ান ফৌজের অনেকে জার্মাণ হুকুমে কাজ কর্‌তো গ্রীসে, যুগোস্লাভিয়ায়, বল্কানের অন্যত্র, পোল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, হল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে ইত্যাদি ইয়োরোপের জার্মাণ-সাম্রাজ্যে। সেই লাখ-পঞ্চাশেকের একজনও আর জার্মাণ সেনানায়কদের বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের জায়গায় বসানো চাই জার্মাণ ফৌজ আর জার্মাণ উড়োজাহাজ। এই অবস্থা বুঝ্‌তে জার্মাণদের এক মুহূর্তও লাগে নি।

লেখক—তাতে কী হ'লো?

সরকার—যেই ইতালি খ'সে পড়লো অমনি জার্মাণ পল্টন জার্মাণির রুশ-সাম্রাজ্য বিনা বাক্যব্যয়ে ছেড়ে দিতে সুরু কর্‌লো। ইতালি জার্মাণিকে ডুবিয়েছে। ১৯৪৩ সনের সেপ্টেম্বর হ'তে আজ পর্যন্ত জার্মাণি নিজ কব্‌জা থেকে রুশ-সাম্রাজ্যকে ছেড়ে দিচ্ছে। আরও অনেক ছাড়্‌বে। জার্মাণির রুশিয়া-বর্জন কাণ্ডটা ইংরেজ-মার্কিণের ইত্যালিকে ভাগিয়ে নেওয়ার ফল।

লেখক—আপনার বিবেচনায় রুশিয়া জার্মাণিকে হারাচ্ছে না?

সরকার—আজ পর্যন্ত লড়াই ক'রে লালফৌজ জার্মাণ পল্টনকে হারাতে পারে নি। স্তালিনগ্রাদের পর আর সত্যিকার লড়াই হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। ইতালির ওপর নির্ভর কর্‌তে পার্‌লে আজ ১৯৪৪এর মে মাসেও জার্মাণ পল্টন লেলিনগ্রাদ-মস্কো রস্তভ লাইনের নিকটবর্তী পশ্চিমেই র'য়ে যেত। রুশিয়া ছেড়ে চ'লে আসা জরুরি হ'তো না। আমার বিবেচনায় ইতালিকে জার্মাণি থেকে ভাগিয়ে আনাই বর্তমান লড়াইয়ের আসল দ্বিতীয় রণাঙ্গন।

লেখক—একথার মানে কী?

সরকার—ইংরেজ-মার্কিণ পল্টন ইতালিতে নেমেছে বটে, আন্তসিঅ আর কাসিন'র কাছে লড়াইও কর্‌ছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতালিতে না নেমেও একমাত্র ইতালিকে জার্মাণ তাঁবু থেকে সরিয়ে দেওয়াটাই দ্বিতীয় রণাঙ্গন। এই রণাঙ্গনই রুশিয়ার জার্মাণির হ'ঠে আসার স'চ্চা কারণ। জয়জয়কার ইংরেজ পররাষ্ট্র-নীতির,—রুশ লালফৌজের নয়।

লেখক—ফ্রান্সে মার্কিণ ও ইংরেজের আক্রমণকে কী বল্‌বেন?

সরকার—বল্‌বো লড়াইয়ের তৃতীয় ময়দান। তার ফলাফল আলাদা বিশ্লেষণ কর্‌তে হবে।

কমিউনিজ্‌ম্ বনাম সোশ্যালিজ্‌ম্

লেখক—আপনার বিচারে সোভিয়েট রুশিয়ার খাশ বিশেষত্ব কী? কোন্ কাজের জন্য আপনি সোভিয়েটকে সম্বর্দ্ধনাযোগ্য বিবেচনা করেন? সোভিয়েট রুশিয়ার আসল গৌরব কিসের জন্য? রুশ-প্রচারের জন্য সোভিয়েট-সুহৃদ্‌গণের কোন্-কোন্ কথার উপর জোর দেওয়া উচিত?

সরকার—এক কথায় বল্‌বো,—কমিউনিজ্‌ম্ (সরকারী মালিকানা) প্রতিষ্ঠা হচ্ছে

সোভিয়েট রুশিয়ার একমাত্র বা সর্বপ্রধান গৌরবজনক কাজ। বোল্‌শেভিকরা দুনিয়ার নর-নারীকে সংসার ও সমাজ চালাবার একদম নয়া পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এর জুড়িদার কোনো চিজ্ আর কোনো দেশের কেউ দেখাতে পারে নি। কমিউনিজ্‌ম্-এর বিশ্লেষণ না ক'রে ইস্কুল, হাসপাতাল, কারখানা, ঐক্য ইত্যাদির বুখ্‌নি ঝাড়্‌তে বসা ছেলেখেলা মাত্র। এই সব আছে ছোট-বড়-মাঝারি সকল দেশে। বড়-বড় দেশে আছে প্রচুর পরিমাণে আর চরম মাত্রায়। কিন্তু এই সকল দেশে নাই কমিউনিজ্‌ম্।

লেখক—কেন? সোশ্যালিজ্‌ম্ (সমাজতন্ত্র) আজকাল সকল দেশেই অতি সু-পরিচিত জিনিষ নয় কি?

সরকার—কমিউনিজ্‌ম্ (সরকারী মালিকানা) নয়া চিজ্। তার সঙ্গে সোশ্যালিজ্‌মের (সমাজতন্ত্রের) সম্পর্ক নাই। দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই অল্প-বিস্তর সমাজ-তন্ত্র কায়েম হ'য়েছে। সোভিয়েট রুশিয়া ছাড়া আর কোথাও, এই ১৯৪৪ সনেও, কমিউনিজম্ নাই। সোশ্যালিজ্‌ম্-এ আর কমিউনিজ্‌ম্-এ আকাশ-পাতাল ফারাক। সোশ্যালিজ্‌ম্ চরম মাত্রায় কায়েম হ'লেও কমিউনিজ্‌ম্ (সরকারী মালিকানা) গজায় না। সমাজতন্ত্র আর সরকারী মালিকানা হ্‌চ্ছে দুই বিলকুল আলাদা চিজ। একের সঙ্গে অপরের কোনো প্রকার রক্তের যোগ নাই।

লেখক—বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সাধারণতঃ সোশ্যালিজ্‌ম্ আর কমিউনিজ্‌ম্ একই ধ'রে নেওয়া হয় নাকি?

সরকার—তা হয় বটে। কিন্তু সেটা ভুল। অনেকবার অনেক-জায়গায় ব'কেছি যে, সোশ্যালিজ্‌ম্ (সমাজতন্ত্র) অতি-সোজা জিনিষ। জনসাধারণের সম্পত্তির উপর গবর্মেণ্ট মাত্রা হিসাবে কম-বেশী শাসন বা একতিয়ার বা নিয়ন্ত্রণ কায়েম কর্‌লেই সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কমিউনিজ্‌ম্ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শাসন-এক্‌তিয়ার-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মাত্র নয়।

লেখক—কমিউনিজ্‌ম্ কী?

সরকার—তার জন্য চাই জনসাধারণের তরফ হ'তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার-লোপ। কমিউনিজ্‌ম্-এর কানুনে ও আর্থিক ব্যবস্থায় দেশের কোটি কোটি লোকের একজনও আধ পয়সার মালিক থাক্‌তে পারে না। দেশের ভেতরকার হরেক প্রকারের জমিজমা, বাড়ীঘর, ধনদৌলত, টাকাকড়ি সবই সরকারী সম্পত্তি। স্বত্বাধিকারী নামক জানোআর সমাজ থেকে লোপাট হয়। কোনো মিঞাকে ধনদৌলতের অধিকারী দেখা যায় না। কোনো ছেলে-মেয়ে তাদের বাপ-দাদার সন্তান হিসাবে এক দামড়িও পেতে অধিকারী নয়। সকল প্রকার মালিকানাই সার্বজনিক ভাবে সরকারী।

লেখক—রুশিয়ার সোভিয়েট-ব্যবস্থা কি এইরূপ?

সরকার—প্রায় এইরূপ। অনেকাংশে এইরূপ। ইংল্যাণ্ড, জার্মাণি ইত্যাদি দেশ সোশ্যালিজ্‌ম্-এর (সমাজতন্ত্রের) মাপে খুব উঁচিয়ে গেছে। এমন কি ভারতেও ব্যক্তিগত ধনদৌলতের উপর সরকারী শাসন-এক্‌তিয়ার-নিয়ন্ত্রণ কিঞ্চিৎ-কিছু আছে। কিন্তু বিলাতী-জার্মাণ-মার্কিণ-ইতালিয়ান-জাপানী-ভারতীয় নরনারী স্বচ্ছন্দে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করে। জন-সাধারণ নিজ-নিজ আয়ের মালিক। সেই আয় ছেলে-মেয়েদেরকে উত্তরাধিকারের আইনে দিয়ে যাবার অধিকার এই সকল দেশের লোকের আছে। সরকারী মালিকানা নাই।

লেখক—সোভিয়েট ব্যবস্থা কিরূপ?

সরকার—সোভিয়েট রুশিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান নাই,

ব্যক্তিগত জমিজমা বা বাড়ীঘরের কেনা-বেচা নাই। প্রত্যেক জমির টুক্‌রা, বাড়ীঘর, কারখানা, ব্যাঙ্ক, স্টীমার, রেল রুশ-গর্বমেণ্টের সম্পত্তি। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের লাভ-লোকসান সবই সরকারী। জনসাধারণ সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক হারে বেতন পায় মাত্র। কথাগুলা চরমভাবে ব'লে যাচ্ছি। একটু-আধটু "কিন্তু" আছে। তা ব্যতিরেক মাত্র। আসল কথা,—সরকারী মালিকানার ব্যবস্থাই সোভিয়েট রুশিয়ার গৌরবজনক আবিষ্কার।

লেখক—সমাজতন্ত্র আর সরকারী মালিকানা,—এই পারিভাষিক দু'টা বাজারে চল্‌ছে কি?

সরকার—সমাজতন্ত্র বোধ হয় চালু হ'চ্ছে। কিন্তু সরকারী মালিকানা চল্‌ছে না। ধনসাম্য, সাম্যবাদ ইত্যাদি শব্দ ও কমিউনিজ্‌মের জন্য কায়েম করা হ'য়ে থাকে।

("নজরুল-কাব্য কি সাম্যবাদী?" "সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বনাম কমিউনিজ্‌ম্‌" জুলাই ১৯৪৩ দ্রষ্টব্য)

মে ১৯৪৪

সোরোকিন বনাম সরকার

১৫ই মে ১৯৪৪

হরিদাস—আজ আপনার সঙ্গে মার্কিণ পণ্ডিত সোরোকিন সম্বন্ধে একটু মোলাকাৎ চালাতে চাই।

সরকার—কেন? সোরোকিন সম্বন্ধে আগে কিছু শুনিস্‌নি?

লেখক—না। কেবল নামটা শুনেছি। আপনার কাছে তাঁর চিঠিপত্র আসে—শুধু এইটুকু জানি। তবে তাঁর চিন্তাধারার কোনো বিশ্লেষণ আপনার মুখে এখনো শুনিনি। অবশ্য আপনার বইয়ের মধ্যে কিছু কিছু প'ড়েছি।

সরকার—কোন্‌ বইয়ে পড়্‌লি?

লেখক—আপনার ঐ "ভিলেজেস অ্যাণ্ড টাউনস্‌ অ্যাজ সোশ্যাল্‌ প্যাটার্নস্‌" বইটা কিছুদিন যাবৎ পড়্‌ছি। তার ভেতর উন্নতি-দর্শন সম্বন্ধে শেষ দিকে একটা খুব বড় আলোচনা আছে। সেখানে আপনি সোরোকিন ও স্পেংলারের উন্নতি-তত্ত্ব নিয়ে প্রথমেই আলোচনা ক'রেছেন। বইটা পড়্‌বার সময় আপনার স্বকীয় মতটাও বেশ জোরের সাথে মনে দাগ রেখে গেলো। ইতিপূর্বে স্পেংলার সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা আপনার সঙ্গে চালিয়েছিলাম। আজ তাই সোরোকিন সম্বন্ধে কিছু ভাল ক'রে জান্‌তে চাই। (ডিসেম্বর ১৯৪৩)

সরকার—মার্কিণ সমাজশাস্ত্রীদের ভেতর সোরোকিনের ঠাঁই বেশ উঁচুতে। লোকটা আসলে রুশ। বোল্‌শেভিক বিপ্লবের দুস্‌মন—কাজেই সোভিয়েট রুশিয়া হ'তে ফেরার। গণ্ডাকয়েক বই তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে। অধিকাংশই ইংরেজিতে। আজকাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চাক্‌রে।

লেখক—দু' একখানা বইয়ের নাম বলুন না।

সরকার—তাজা বইয়ের নাম "সোশ্যাল্‌ অ্যাণ্ড কাল্‌চার‍্যাল্‌ ডিনামিক্‌স্‌" (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর)। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই দ্যাখ্‌ সেদিন চতুর্থ খণ্ডটা এসে পৌঁছেছে

সোরোকিনের কাছ থেকে। অন্যান্য বইয়ের ভেতর "সোশ্যাল মবিলিটি," "জেনার‍্যাল থিয়োরি অব্ ল," "কন্‌টেম্‌পোরারি সোশিঅলজিক্যাল থিয়োরীজ্" "সোশিঅলজি অব রেভোলিউশন্," "রুব্যাল্-আর্বান্ সোশিঅলজি" ইত্যাদি সুপরিচিত।

লেখক—দু-এক কথায় এখন বুঝিয়ে বলুন সোরোকিনের চিন্তা-প্রণালীর বিশেষত্ব কী।

সরকার—"সোশ্যাল মবিলিটি" (সামাজিক গতিভঙ্গী) ইত্যাদি বইয়ে সোরোকিন ছিলেন সমাজশাস্ত্রী। "ডিনামিক্‌স্" (রূপান্তর) বইয়ে তাঁকে দার্শনিক মূর্তিতে পাওয়া যাচ্ছে।

লেখক—কী তাঁর দর্শন?

সরকার—সোরোকিনের দর্শনের একটা মস্তবড় কথাই হ'লো লোকে যাকে বলে "অধ্যাত্ম-নিষ্ঠা"। সোরোকিন "সেন্‌সেট্" ও "আইডিয়েশন্যাল" ইত্যাদি পরিভাষিকের স্রষ্টা। প্রথমটার অর্থ "ইন্দ্রিয়মুখী" বা "বস্তুতান্ত্রিক"। দ্বিতীয়টার অর্থ "ভাবনিষ্ঠ," চিত্তমুখী ইত্যাদি। পারিভাষিক দুটো আজকাল মার্কিণ পণ্ডিতমহলে চলে মন্দ না। সোরোকিনের "আইডিয়্যালিষ্ট" (আদর্শনিষ্ঠ) পারিভাষিক এই দুয়ের সমন্বয়।

লেখক—আপনার বই পড়্‌তে-পড়্‌তে মাঝে-মাঝে এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখ্‌তে পাই। অর্থটা আগে ঠিক ধর্‌তে পারিনি। এখন আপনি বলুন সোরোকিনের উন্নতি-দর্শনটা কী।

সরকার—ফলের দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে সোরোকিন-দর্শন স্পেংলার-দর্শনেরই প্রতিধ্বনি। "সোশ্যাল অ্যাণ্ড কালচার‍্যাল্ ডিনামিক্‌স্" বইয়ে সোরোকিন ব'লেছেন যে, পড়ুয়ারা যেন তাঁকে স্পেংলারের সঙ্গে একদলস্থ না করে। কিন্তু সত্যি কথাটা কী? দুই দার্শনিকের মধ্যে শব্দগত ও লিখ্‌বার ভঙ্গী-প্রণালীর পার্থক্য আছে যথেষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোরোকিনের যা চরম কথা, তা স্পেংলারের কথারই হুবহু অনুরূপ। 'ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ্ সোশ্যাল্ প্যাটার্নস্' বইয়ের আলোচনাগুলায় এসব কথা খুলে ব'লেছি।

লেখক—সোরোকিন তাঁর দর্শনে কী বল্‌তে চান?

সরকার—সোরোকিনের মতে বর্তমান যুগটা চরম মাত্রায় ইন্দ্রিয়নিষ্ঠা বা বস্তুতান্ত্রিকতার যুগ,—সৃষ্টি-প্রতিভার অবনতির যুগ—বহির্মুখীনতার পরিপূর্ণ আধিপত্যের যুগ। এই স্তরের পরে একটা পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্তরে মানুষ উঠ্‌বে। তখন নয়া সেইণ্ট পল, নয়া সেইণ্ট আগাস্টিন আবার আস্‌বে। এই সকল যুগাবতারের আবহাওয়ায় দুর্যোগের অবসান হবে। এই দ্যাখ্ চতুর্থ খণ্ড বইটা। সোরোকিনের আসল কথাগুলা একসঙ্গে গুছিয়ে বলা আছে শেষ কয় পৃষ্ঠায়। পড়্‌লে দেখ্‌বি ঠিক যেন স্পেংলারের চিন্তাধারা আর সিদ্ধান্তের সারমর্ম।

লেখক—সোরোকিনের উন্নতি-দর্শনটা আপনার লাগে কিরূপ?

সরকার—"সোশ্যাল্ মবিলিটি", "রুর‍্যাল-আর্বান সোশিঅলজি", "কণ্টেম্পোরারি সোশিঅলজিক্যাল থিয়োরীজ্" ইত্যাদি বইয়ের মালই আমার মতে টেঁকসই। এ-সবের তথ্য ও যুক্তি দুই-ই অনেকাংশে স্বীকারযোগ্য। কাজেই "সমাজশাস্ত্রী" সোরোকিনের চিন্তার সঙ্গে আমার মিল আছে বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু "দার্শনিক" সোরোকিনের সঙ্গে আমার বনিবনাও অসম্ভব। "ডিনামিক্‌স্" বইটায় সোরোকিন দার্শনিকের মূর্তিতে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রেছেন। দার্শনিক সোরোকিনের চিন্তাধারাকে আমার দর্শন বহু জায়গাতেই বরদাস্ত কর্‌তে পারে না। এই বইটার চার খণ্ড অনেকাংশেই বস্তুনিষ্ঠায়ও দরিদ্র আর যুক্তিনিষ্ঠায়ও দরিদ্র।

লেখক—উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

সরকার—সোরোকিন বলেন,—মানুষ বর্তমানে পূর্বেকার চেয়ে সৃষ্টিশক্তিতে ছোট। এই

মতবাদের চরম যম আমি। আমি বস্তুনিষ্ঠ নজরে মানব-প্রতিভার ক্রমিক অবনতি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। দ্বিতীয়তঃ সোরোকিনের বিচারে মানুষগুলা বর্তমানে অতিবেশী বস্তুনিষ্ঠ। একথাও প্রতিবাদ-যোগ্য। তৃতীয়তঃ, সোরোকিন মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-বিজয়ের পাঁড়-প্রচারক। আমি এই মতবাদকে নেহাৎ হেঁয়ালিময় ও বুজরুকিপূর্ণ বিবেচনা করি। আমার বিচারে মানুষগুলা কোনো অবস্থাতেই পুরাপুরি বস্তুনিষ্ঠ নয়, আর এমন কোনো স্তরও নেই যেখানে দুনিয়ার নরনারী পুরাপুরি আধ্যাত্মিক জীবে পরিণত হবে। দুনিয়ার সকল যুগে মানুষ একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ আর চিত্তনিষ্ঠ। অথবা এই দুইয়ের সমন্বয়—সোরোকিনের "আইডিয়্যালিজ্‌ম্"—সকল স্তরেই বর্তমান।

লেখক—সোরোকিন কি বলেন যে, এমন স্তর একদিন আস্‌বে যখন মানুষের জীবনে অসৎ, অসুন্দর, অশিবের কোনো ছায়াও থাক্‌বে না?

সরকার—হাঁ। এই ধরণের কথা সোরোকিন বল্‌তে অভ্যস্ত। তাঁর দর্শনে মানুষের পক্ষে চরম "আধ্যাত্মিকতা"র স্তরে ওঠা সম্ভব—সেখানে সবই শিব, সবই সত্য, আর সবই সুন্দর। এসব কথার বিরুদ্ধে আমার কী মতামত তা তোর বেশ জানা আছে।

লেখক—তবুও আবার বলুন।

সরকার—হিংসা-চুক্‌লি, টক্কর, হাম্‌-বড়ামি, জুচ্চুরি, বদ্‌মায়েসি, গুণ্ডামি, লড়াই ইত্যাদি অ-শিব ছাড়া রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব। এই সকল অ-শিব, অ-সত্য বা অ-সুন্দর সম্বন্ধে একালের মানুষ আগেকার (সত্য যুগের) মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়; অপরদিকে ভবিষ্যতের (কল্কিযুগের) মানুষও বর্তমান (কলিযুগের) নরনারীর চেয়ে বেশী-বেশী সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী থাকবে না। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, জুচ্চুরি, গুণ্ডামি, বাটপাড়ি, বদ্‌মায়েসি, ইত্যাদি অ-শিবগুলা আকার-প্রকারে বদ্‌লে যাচ্ছে মাত্র। কিন্তু টক্কর থাক্‌বেই থাকবে। লড়াই থাক্‌বেই থাক্‌বে। হিংসা অমর ও সনাতন। কোনো যুগাবতারের বাবার সাধ্যি নেই যে, সে এসে পৃথিবীর মানুষগুলাকে জুতিয়ে অহিংসা নিষ্ঠ ক'রে তোলে। আমার বিবেচনায় স্পেংলার আর সোরোকিন দুই সমানভাবে বাতিল। দুই সমাজশাস্ত্রী বা দার্শনিকের চিন্তায়ই গলদ র'য়েছে বিস্তর। প্রথমতঃ তথ্যের ভুল। দ্বিতীয়তঃ তথ্য-ব্যাখ্যার, তর্কপ্রণালীর আর যুক্তিপ্রয়োগের ভুল। এই কথায় ধরা পড়্‌ছে আবার এই অধমের "গরুমি"-দর্শন।

মে ১৯৪৪

সাত-সাতটা বিদেশী-আন্দোলন

১৭ই মে ১৯৪৪

হেমেন—আপনি বাংলা দেশে রুশ আন্দোলন পছন্দ করেন?

সরকার—হাঁ। আমি রুশ ভাবে রুশ-আন্দোলন চাই না। বাঙালীর নেতৃত্বে রুশ-আন্দোলন চাই। রুশ-আন্দোলন আমার বিচারে বাঙালীর বাচ্চা কর্তৃক বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহারের অন্যতম মূর্তি। ("আন্তর্জাতিক-বঙ্গ পরিষৎ", ১২ই এপ্রিল, ১৯৩২)

লেখক—ঠিক বুঝা গেল না।

সরকার—বাঙালীর বাচ্চা আমরা অন্যান্য অনেক বিদেশী-আন্দোলন চালিয়েছি। বর্তমানে রুশ-আন্দোলনটা সেইসবের অন্যতম মাত্র।

লেখক—বাঙালীর অন্যান্য বিদেশী-আন্দোলন কী-কী?

সরকার—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাত্ অনেক-কিছু বিদেশী মাল খেয়ে মানুষ হ'য়েছে। বিংশ শতাব্দীতেও বাঙালীর বাচ্চা অনেক বিদেশী মাল খেয়ে মানুষ হচ্ছে।

লেখক—আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

সরকার—বর্তমান যুগের শ'-দেড়-দুই বছরের বাঙালী জাতের পক্ষে প্রথম বিদেশী খাদ্য হচ্ছে বিলাতী সংস্কৃতি। বিলাতের ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদির দৌলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি সুরু হ'য়েছে। বিলাতী মালের প্রভাব আজও দস্তুরমাফিক বজায় আছে। বিলাতী আন্দোলন বাঙালী-সমাজে সার্বজনীন ও জবরদস্ত, বলাই বাহুল্য।

লেখক—বিলাতী আন্দোলন কি বাঙালী-নেতৃত্বে চল্ছে?

সরকার—বিলাতী আন্দোলন সুরু হ'য়েছে বিলাতী তাঁবে। আজও বিলাতী আন্দোলন চল্ছে বিলাতী তাঁবে। কিন্তু বাঙালীরাও স্বাধীনভাবে বিলাতী আন্দোলন কিছু-কিছু চালিয়েছে। বিলাতী আন্দোলন পুরাপুরি স্বাধীনভাবে বাঙালীর তাঁবে চল্লে বঙ্গ-সংস্কৃতির অবস্থা অন্যরূপ হ'তো। তাহ'লে বাঙালী জাত্কে জাপানী জাতের মূর্তিতে দেখা যেতো।

লেখক—অন্যান্য বিদেশী আন্দোলন কি বাঙালীর তাঁবে চল্ছে?

সরকার—হাঁ; অনেকটা। অন্যান্য বিদেশী-আন্দোলন বাঙ্লায় বা ভারতে চালানো ইংরেজ জাতের স্বার্থমাফিক কাজ নয়। ইংরেজদের পক্ষে একমাত্র বিলাতী আন্দোলন চালাবার পক্ষপাতী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তারা ঘটনাচক্রে অন্যান্য বিদেশী মাল একটু-আধটু ভারতে আন্তে বাধ্য হ'য়েছে। সেই সুযোগে বাঙালীরা স্বাধীনভাবে কিছু-কিছু অ-বৃটিশ বিদেশী-সংস্কৃতির আন্দোলন চালাতে শিখেছে। বাঙালী জাতের আন্তর্জাতিকা বাঙালী তাঁবে কিছু-কিছু পুষ্ট হ'তে পেরেছে।

লেখক—কোন্-কোন্ বিদেশের দিকে বাঙালীর দরদ দেখা যায়?

সরকার—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে যুবক বাঙলার প্রধান দরদ ছিল প্রথমতঃ ফরাসী-বিপ্লব আর ফরাসী সংস্কৃতির দিকে। ইস্কুল-কলেজে মার্কিণ-বিপ্লব ও সংস্কৃতি যুবক বাঙলাকে কিছু-কিছু তাতিয়ে তুলেছে। ১৮৭০-৮৫ সনের যুগে এই দুই প্রভাব বাঙালী জাতের চিন্তায় খানিকটা সুস্পষ্ট।

লেখক—প্রমাণ?

সরকার—বঙ্কিম-ভূদেব ইত্যাদি লেখকদের সাহিত্যে ফরাসী কঁৎ-দর্শন বঙ্গসমাজে মূর্তি পেয়েছিল। সেই সময় হেমচন্দ্রের মার্কিণ-প্রশস্তি বেরোয়। মনে আছে বোধ হয়?—

"হোথা আমেরিকা নব-অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে
ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

বিবেকানন্দ'র আমেরিকা-যাত্রাও বাঙালী জাতের পক্ষে মার্কিণ-সম্বর্দ্ধনার অন্যতম সাক্ষী।

১৮৯৩ সনে শিকাগোতে বিবেকানন্দ'র দিগ্‌বিজয়।

লেখক—ফরাসী আর মার্কিণ-আন্দোলন ছাড়া আর কী দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

সরকার—ইতালিয়ান আর জার্মাণ আন্দোলন দুটা যুবক বাঙ্‌লায় আসে এক-সঙ্গে। ১৮৬০-৭০ সনের যুগে ইতালির স্বাধীনতা-লাভ আর জার্মাণ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই দুই ঘটনা সারা ভারতকে চাঙ্গা ক'রে তুলেছিল। বাঙালীর বাচ্চাও মাত্‌ হ'য়ে গিয়েছিল। ইতালিয়ান মাৎসিনি আর জার্মাণ বিস্‌মার্ক সম্বন্ধে বকাবকি না ক'রে কোনো কংগ্রেস-পন্থী বাঙালী জাত হজম কর্‌তে পার্‌তো না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হ'তে না হ'তেই মাৎসিনি আর বিস্‌মার্ক বাঙালী মুড়োর ভেতর স্থায়ী ঠিকানা কায়েম ক'রে ব'সেছিল।

লেখক—আজকালকার সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতির মতন বিদেশীদের জন্য সুহৃৎ-সমিতির ব্যবস্থা বাঙ্‌লাদেশে ছিল কি?

সরকার—প্রশ্নটা চিত্তাকর্ষক। গবেষণা ক'রে দেখা ভাল। আমি ঠিক্‌ বল্‌তে পার্‌ছি না। তবে ফরাসী কঁৎ-দর্শন প্রচারের জন্য যুবক বাঙ্‌লা বঙ্কিমের যুগে "পাজিটিভিস্ট্‌ সমিতি" কায়েম ক'রেছিল জানি। বিবেকানন্দ'র যুগে মার্কিণ-প্রীতি ছেলে-ছোক্‌রাদের ভেতর দেখা যেতো শুনেছি। ব্রজেন শীল আর সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই ধরণের খবর পেয়েছি। সেকালে এঁরা দুজনেই মাৎসিনি ও বিস্‌মার্কের ভক্ত ছিলেন। ("বাঙলায় কঁৎ-দর্শনের দিগ্‌বিজয়", ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)

লেখক—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আপনি তো মালদহ হ'তে কল্‌কাতায় আসেন? তখন কী দেখ্‌তে পান?

সরকার—১৯০১ সনে ছাত্র হ'লাম প্রেসিডেন্সি কলেজে। মনে পড়্‌ছে সেই সময়ে মাৎসিনি আর গারিবাল্‌দি বিষয়ক বই বাংলা ভাষায় পাওয়া যেতো। যোগীন বিদ্যাভূষণকে ইতালিয়ান আন্দোলনের চাঁই বল্‌তে পারি। একালে রুশ আন্দোলনের পক্ষে হীরেন মুখোপাধ্যায় যা তখনকার দিনে ইতালিয়ান আন্দোলনের পক্ষে যোগীন বিদ্যাভূষণ ঠিক যেন তাই। কিন্তু কোনো ইতালিয়ান সুহৃৎ-সমিতি খোলা-খুলি কায়েম হ'য়েছিল কিনা জানি না। সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন শীল, বিপিন পাল ইত্যাদির সুধীরা মাৎসিনি সম্বন্ধে যৌবনে বক্তৃতা ক'রেছেন শুনেছি।

লেখক—জার্মাণ আন্দোলনের কোনো প্রমাণ আছে?

সরকার—ব্রজেন শীল, সতীশ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হীরালাল হালদার ইত্যাদি পণ্ডিতেরা বিবেকানন্দ'র যুগে জার্মাণ হেগেল খেয়ে মানুষ হ'য়েছিল। ভারতের কংগ্রেস-পন্থী রাষ্ট্রিকেরা ভারেতীয় ঐক্যের জন্য কথায়-কথায় বিস্‌মার্ক-প্রবর্তিত জার্মাণ ঐক্যের নজির দিতেন। জার্মাণ জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিল্প-বাণিজ্যের তারিফ চল্‌তো বাঙ্‌লাদেশে দরুণভাবে। ইয়োরোপের সংস্কৃত পণ্ডিত বল্‌লে লোকেরা বুঝ্‌তো জার্মাণ জাতের লোককে। ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় বাঙালীর বাচ্চারা চোখের সাম্‌নে জার্মাণ আদর্শ রেখে কাজে নেমেছিল। রাসবিহারী ঘোষের মতন দুঁদে উকিল জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রীডরিশ লিস্ট্‌ প্রণীত বইটার গুণগ্রাহী ছিলেন (১৯০৫-০৭ সনে)। তার অন্যতম প্রভাব হচ্ছে এস অধম কর্তৃক লিস্ট্‌গ্রন্থের বাংলা তর্জমা। "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি" নামে বইটা বেরিয়েছে একালে (১৯৩২)। প্রবন্ধের আকারে অধ্যায়গুলা বেরিয়েছিল ১৯১৪-১৮ সনের যুগে।

লেখক—বাঙালীর আন্তর্জাতিকতায় অন্য কোনো দেশের ঠাঁই আছে?

সরকার—আছে বৈকি? ১৯০৫ সনে সুরু হয় যুবক বাঙলার জাপানী আন্দোলন। অবশ্য জাপান-সুহৃৎ-সমিতি কায়েম হয়নি। কিন্তু ঝালে-ঝোলে-অম্বলে জাপানের গুণকীর্তন করা ছিল ১৯০৫-১০ সনের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম লক্ষণ। সাঁতার কেটে জাপানে গিয়ে হাজির হ'য়েছিল গণ্ডা-গণ্ডা বাঙালী। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার কর্‌তে গিয়ে বাঙালী বিদেশ-দক্ষেরা জাপানের সঙ্গে যোগাযোগকে খুব বড় ঠাঁই দিতে অভ্যস্ত হ'য়েছিল। বিদেশে বাঙালীর বাচ্চাকে পাঠাবার সময় যোগেন ঘোষ জাপানের দিকে সুনজর ফেলতেন।

লেখক—জাপানী আন্দোলনের পর বাঙ্‌লায় কোন্ বিদেশী আন্দোলন চালু হয়েছে?

সরকার—এবার বল্‌বো রুশ আন্দোলন আর কিছু-কিছু তুর্ক-আন্দোলন। বলা বাহুল্য, —আজও ফরাসী, মার্কিণ, ইতালিয়ান, জার্মাণ আর জাপানী এই পাঁচটা বিদেশী-আন্দোলন বাঙলাদেশে মজুদ আছে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকল বিষয়েই এই পাঁচ বিদেশের সঙ্গে দহরম-মহরম চালাবার লোক যুবক বাঙ্‌লায় বে'ড়ে চলেছে। ইংরেজ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ তো আছেই। তার ওপর ১৯১৭-১৮ সনে এসে জুটেছে রুশ নরনারীর সঙ্গে দহরম-মহরম। তুর্ক-আন্দোলনটা (১৯১৯-২৫) অতখানি পাকেনি। বাঙালীর রুশ-আন্দোলনকে সপ্তম বিদেশী-আন্দোলন বলা উচিত। বর্তমানে আমরা প্রধানতঃ সাত-সাতটা বিদেশী মাল খেয়ে মানুষ হচ্ছি। অবশ্য এই সাত জাতের সাত আলাদা-আলাদা রাষ্ট্রিক স্বার্থ। কাজেই বাঙালী রাষ্ট্রিকেরা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সব-কয়টা জাতের সঙ্গেই সমান ভাবে যোগাযোগ চালায় না। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার কর্‌বার্ সময় নানা রাষ্ট্রিক নানা চোখে বিদেশের সঙ্গে মিতালি পাতাতে অভ্যস্ত।

লেখক—আপনি কোনো বিদেশের বিপক্ষে আন্দোলনের জন্য বাঙালী প্রতিষ্ঠান চান না?

সরকার—না। কোনো একটা বা দু'টা বিদেশের স্বপক্ষে গোটা বাঙালী জাতের ঢলাঢলি চাই না। একসঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন বিদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাঙালী প্রতিষ্ঠান থাকা বাঞ্ছনীয়। কোনো জাত্‌কে ষোল-আনা ভারত-বন্ধু স'মুঝে রাখা ঠিক নয়। তেমনি কোনো জাত্‌কে পুরাপুরি ভারত-শত্রু ঠাওরানোও চল্‌তে পারে না। বাঙালীদের ভেতর যার যেমন মর্জি সে তেমন নিজ-নিজ বাঙালী-বিদেশী প্রতিষ্ঠার স্বাধীন ভাবে বেছে নিলে সুফল দেখা যাবে। কোনো বিদেশকে যে-বাঙালী পছন্দ করে না তার পক্ষে সেই বিদেশ-বিষয়ক বাঙালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখ্‌লেই চল্‌তে পারে।

লেখক—ভারতীয় নরনারী সম্বন্ধে বিদেশী লোকজনের ধারণা কিরূপ?

সরকার—এক কথায় সহজে জবাব দিচ্ছি। কোনো শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী প্রাণে-প্রাণে ভারতবাসীর সুহৃৎ নয়। তাদের অধিকাংশই, প্রায়-সকলেই ভারতীয় নরনারীকে কুকুর-বেড়ালের মতন ঘৃণ্য জঘন্য জানোআর বিবেচনা করে। সাধারণভাবে এইরূপ স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল। কালে-ভদ্রে এক-আধটা ব্যতিরেক অসম্ভব নয়।

লেখক—আপনি নিজে কোনো বিদেশকে অ-পছন্দ করেন?

সরকার—না। আমি যে-কোনো বিদেশ-বিষয়ক "বাঙালী প্রতিষ্ঠানে" যোগ দিতে সর্বদাই রাজি। অবশ্য প্রতিষ্ঠানটার আমাকে নিতে রাজি হওয়া চাই। এমন কি, যে-কোনো 'বিদেশী-শাসিত' বিদেশ-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানেও যোগ দেওয়া আমার মেজাজ-মাফিক কাজ। আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্বন্ধে আমি বয়কটের পক্ষপাতী নই।

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের কলিকাতা-শাখা

লেখক—অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয় তাঁবে ভারতে বিদেশী-প্রচার হচ্ছে কি?

সরকার—ইংরেজরা ভারতে যা-কিছু করে তার সবটাই অ-ভারতীয় বিদেশী-প্রচার। তা ছাড়া আছে ভারতে ফরাসী তাঁবে ফরাসী-প্রচার।

লেখক—তা তো শুনিনি।

সরকার—কেন? প্যারিসের আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ (ফরাসী সঙ্ঘ) কল্‌কাতায় একটা শাখা কায়েম ক'রেছে। কয়েক বছর ধ'রে চল্‌ছে। জানা নাই?

লেখক—আপনি তার সঙ্গে লেগে আছেন জানি। কিন্তু সেটা বিদেশী তাঁবে (ফরাসী তাঁবে) চলে এটা বুঝি নি। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। তাই ভাব্‌তাম "আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ" বাঙালীদের তৈয়ারী প্রতিষ্ঠানই হবে। কল্‌কাতার এই সঙ্ঘের কর্তা কারা?

সরকার—কল্‌কাতার ফরাসী কন্‌সাল-জেনার‍্যাল আর পণ্ডিচেরি-চন্দননগরের ফরাসী "লাট্" ইত্যাদি কয়েকজন। তাছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইংরেজ প্রতিনিধিরা।

লেখক—বাঙালী ও ভারতবাসী এতে নাই কি?

সরকার—থাক্‌বে না কেন? অন্যতম কর্মকর্তাদের ভেতর কয়েকজন বাঙালী বা অন্য কোনো ভারত-সন্তানও আছে। কিন্তু আসল কর্তা ফরাসী লাট আর ইংরেজ জজ সাহেব ইত্যাদি শাদারা।

লেখক—আপনি ফরাসী প্রচারের জন্য বাঙলা দেশে কিরূপ প্রতিষ্ঠান চান?

সরকার—বিল্‌কুল্ বাঙালী প্রতিষ্ঠান। তাতে একজন ফরাসীকেও কর্মকর্তাদের ভেতর রাখা উচিত নয়। ফরাসীরা অতিথিরূপে আস্‌তে পারে। ফরাসীদেরকে প্রচারক ও বক্তাভাবে আনা চল্‌তে পারে। ফরাসী লোকজনের সম্বর্দ্ধনার জন্য জল্‌সার ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটার নাম দেওয়া উচিত "বঙ্গীয় ফরাসী-পরিষৎ"। তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাক্‌বে বাঙালীকে রকমারি ভাবে ফরাসী-দক্ষ ক'রে তোলা। ফরাসি জাতের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, চিত্র-স্থাপত্য, আর্থিক ব্যবস্থা, আইন-কানুন, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বাঙালীর বাচ্চাকে ওআকিবহাল ক'রে তোলা তার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

লেখক—কল্‌কাতায় আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের যে-প্রতিষ্ঠান আছে তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না কি? আপনি তা পছন্দ করে না?

সরকার—কিছু-না-কিছু হচ্ছে বৈকি। আমি এটা পছন্দ করি নিশ্চয়। প্যারিসে থাক্‌বার সময় (১৯২১-২২, ১৯২৯-৩০) এর কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালিয়েছি। দুনিয়ার কোন্ মাল আমার অপছন্দ-সই। তা সত্ত্বেও আমি ষোলআনা বাঙালীর তাঁবে চাই ফরাসী-সংস্কৃতি প্রচারের জন্য বঙ্গীয় ফরাসী-পরিষৎ। হাজার হ'লেও এই অধম বঙ্গ-চন্দ্র, বাঙালীর বাচ্চা। আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ চলুক তার আপন পথে। বঙ্গীয় ফরাসী-পরিষৎ চল্‌বে তার বাঙালী পথে। বাঙালীজাতের বিশ্বশক্তিবিষয়ক স্বার্থ পুষ্ট করবার অন্যতম উপায়-স্বরূপ থাক্‌বে বঙ্গীয় ফরাসী-পরিষৎ।

সুইস, চেকোশ্লোভাক ও ইন্দো-পোলিশ সমিতি

লেখক—বিদেশী তাঁবে কল্‌কাতায় বিদেশী আন্দোলনের আর কোনো ব্যবস্থা আছে?

সরকার—হাঁ, গোটা তিনেক প্রতিষ্ঠানের নাম কর্‌তে পারি। একটা হচ্ছে "চেকোশ্লোভাক সোসাইটি।" বাটানগরের চেকোশ্লোভাকরা এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। আর একটা সুইস ক্লাব।

লেখক—অন্য প্রতিষ্ঠানটা কাদের?

সরকার—তাছাড়া আছে "ইন্দো-পোলিশ অ্যাসোসিয়েশন।" এর আসল কর্মকর্তা হচ্ছে ভারতে অবস্থিত পোল্যাণ্ডের নরনারী। শ্রীমতী মারিলা ফাল্‌ক্‌ লিখিয়ে-পড়িয়েদের ভেতর প্রধান মাতব্বর। ইনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পোলিশ ইত্যাদি ভাষা-সংক্রান্ত বক্তৃতার জন্য বাহাল আছেন বা ছিলেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে ফাল্‌কের দখল আছে। এঁর কাছে কয়েকজন বাঙালী ছোক্‌রা পোলিশ-ভাষা শিখেছে।

লেখক—এই প্রতিষ্ঠানের নামে "ইন্দো" বিশেষণ কেন?

সরকার—কয়েকজন ভারতীয় নরনারীকে এই সমিতির সভ্য ক'রে নেওয়া হ'য়েছে।

লেখক—ভারতবাসীর স্বার্থপুষ্ট কর্‌বার কোনো মতলব আছে কি?

সরকার—চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বার্থপুষ্ট করা একটা সমিতির উদ্দেশ্য। আর একটা সমিতির উদ্দেশ পোল্যাণ্ডের স্বার্থপুষ্ট করা। সুইস ক্লাবে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের স্বার্থ পুষ্ট হয়। তবে কয়েকজন ভারত-সন্তানের নাম থাক্‌লে ভারতীয় নর-নারী এই সকল দেশ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ-কিছু ওয়াকিব্‌হাল হ'তে পারে। তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। কোনো বাঙালীকে যদি এই সব সমিতির মাতব্বরেরা ডাকে তাহ'লে যাওয়া উচিত। কিছু-না-কিছু দেশের উপকার হয়ত করা সম্ভব।

লেখক—আপনি বিদেশীদের সঙ্গে বিদেশী-শাসিত প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর মেলামেশা পছন্দ করেন?

সরকার—কী করা যাবে? ভারতসন্তানকে এখনো অনেক দিন পর্যন্ত বিদেশী আওতায় স্বদেশ-ব্রতী থাক্‌তে হবে। ভবিষ্য ভারতের স্বার্থপুষ্ট কর্‌বার জন্য যেখানে-সেখানে বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার করা আবশ্যক। চাই শয়ে-শয়ে স্বদেশযোগী ভারতসন্তান।

লেখক—এই তিনটার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—ডাকে,—যাই। সুইসদের সঙ্গে সম্বন্ধ খানিকটা ঘরোআ। কল্‌কাতার সুইস আর ডাচ মেয়েদের কেহ-কেহ আমার স্ত্রীর বন্ধু। সুইস ক্লাবে ডাচ ইত্যাদি অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান মেম্বারও আছে। আমার স্ত্রী জন্ম ইন্‌সব্রুকে। অস্ট্রিঅন টিরোলী আল্পস্‌ পাহাড়ের ভেতর এই শহর। কাজেই সুইস নর-নারীর সঙ্গে টিরোলীদের আনাগোনা অনেকটা আটপৌরে চিজ। ইয়োরোপীয় মিঠাইয়ের দোকানওয়ালা ট্রিঙ্কা-পরিবারের সঙ্গে যাওয়া-আসা আছে। এঁরা সুইস জাতের লোক।

লেখক—চেক আর পোলদের সঙ্গে আনাগোনা কেমন?

সরকার—পোলিশ সমিতি কায়েম হ'য়েছে লড়াইয়ের যুগে। ভারতে পোল্যাণ্ডের জন্য প্রচার চালানো মতলব। এই আবহাওয়ায় বহু-সংখ্যক বাঙালীকে ইন্দো-পোলিশ সমিতির জালে পড়্‌তে হ'য়েছে। তবে পোল্যাণ্ডের কোনো-কোনো লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের সঙ্গে এই অধমের যোগাযোগ অনেক আগে হ'তেই আছে। অন্যান্য ভারতীয়

লিখিয়ে-পড়িয়েরও এইরূপ যোগাযোগ আছে। ওআরস'র প্রাচ্য-পরিষদে আমাকে অবৃত্তিক সভ্যও ক'রেছে। তখনও লড়াই বাধেনি। এই ধরণের সভ্য ভারতে আরও আছে।

লেখক—চোকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যতো আপনার এই ধরণের যোগ আছে শুনেছি?

সরকার—চোকোশ্লোভাকিয়ার দার্শনিক ও রাষ্ট্রবীর মাজারিকের সঙ্গে আমার ও অন্যান্য ভারতবাসীর যোগাযোগ হয় বিংশ-শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের আবহাওয়ায়। সে ১৯১৬-১৭ সনের কথা। মার্কিণ শহর নিউইয়র্কে তখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মাজারিক চেক-প্রচারে মশ্‌গুল। তারপর একালে মাজারিক কোনো-কোনো চিন্তার সঙ্গে এই অধমের প্রচারিত বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার-নীতির (১৯১১) আত্মিক যোগ আছে বিপুল। চোকোশ্লোভাকিয়ার প্রাচ্য-পরিষদেও আমি অন্যতম ভারতীয় অবৃত্তিক সভ্য।

লেখক—শুনেছি চেকদের বাটানগর প্রতিষ্ঠার সময় আপনিই নাকি প্রথম ইট ফেলেছিলেন? দেখ্‌ছি জুতার কারখানার সঙ্গে আপনার খাপ খায়?

সরকার—সে ১৯৩৪ সনের কথা। চেকোশ্লোভাকিয়ার কন্‌সাল ছিলেন তখন ডক্টর লুস্ক্। এ-কালের বাটা কোম্পানীর বড়-কর্তা বার্টস্ সেই প্রতিষ্ঠা-তিথির খুঁটি-নাটি বিষয়ক খবর দিতে সমর্থ।

লেখক—আজকালও বাটানগরের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে?

সরকার—বার্টস ও তাঁর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চল্‌তে অভ্যস্ত। ডাক্‌লে যাই। মাস কয়েক হ'লো আমাকে দিয়ে চেকোশ্লোভাক প্রদর্শনী খুলিয়েছে (ডিসেম্বর ১৯৪৩)।

রোটারি ক্লাব

১৯শে মে ১৯৪৪

লেখক—আপনি তো রোটারি ক্লাবেরও মেম্বার? মাঝে-মাঝে সেখানে আপনি বক্তৃতা ক'রেছেন শুনেছি। "স্টেট্‌স্‌ম্যান্", "অমৃতবাজার" ইত্যাদি কাগজে সে-সব ছাপাও হ'তো দেখেছি। এর ভেতর বাঙালীর তাঁব বা কর্তৃত্ব কতটা?

সরকার—কল্‌কাতার রোটারি ক্লাবের আসল বা প্রধান কর্তা হচ্ছে ইংরেজ। অন্-ইংরেজ শাদা কয়েকজন আছে,—যথা মার্কিণ, ডাচ ও চেক। তাছাড়া এশিয়ানদের ভেতর দু-একজন চীনা মেম্বার আছে। মাতব্বর হিসাবে কয়েকজন বাঙালী বা অন্যান্য ভারতবাসীও ফি বছরই থাকে। কখনো-কখনো বাঙালী প্রেসিডেন্টও দেখা যায়। কিন্তু রোটারিকে বিলাতী ক্লাব স'ম্‌ঝে রাখাই ঠিক।

লেখক—রোটারি ক্লাবকে আন্তর্জাতিক ক্লাব বলা হয় নাকি?

সরকার—হাঁ। এক হিসাবে আন্তর্জাতিকই বটে। প্রত্যেক ক্লাবেই নানা দেশের লোক সভ্য। তা ছাড়া নানা দেশে ক্লাবের শাখা। রোটারির জন্ম মার্কিণ মুল্লুকে। সারা দুনিয়ায় আজ হাজার পাঁচেক শাখা। আর সব-শুদ্ধু সভ্য-সংখ্যা লাখদুয়েক। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই শাখাগুলা জাতীয় বা স্বদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের দেশ,—বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা মফঃস্বল মাত্র। কাজেই এখানকার রোটারি বৃটিশ। ভারতে ও লঙ্কায় ক্লাবসংখ্যা গোটা

চল্লিশেক।

লেখক—বৃটিশ কথার মানে?

সরকার—আমেরিকা রোটারি ক্লাবগুলা মার্কিণ। সভ্য অবশ্য অ-মার্কিণ লোকও হয়ত আছে। তেম্‌নি বিলাতের ক্লাবগুলা বিলাতী। এই সবেও অন্‌-ইংরেজ সভ্য হয়ত দেখা যায়। ফ্রান্সের বেলায়ও রোটারি হচ্ছে ফরাসী প্রতিষ্ঠান। অ-ফরাসী লোকেরাও মেম্বার হ'য়ে থাকে,—ধ'রে নিতে পারি। ভারত-নামক বিলাতি দেশের ব্যবস্থায়ও নানা জাতের ঠাঁই আছে।

লেখক—ভারতের রোটারি ক্লাবগুলা ভারতীয় নয় কেন? কল্‌কাতার রোটারি ক্লাবকে বাঙালী প্রতিষ্ঠান বলা উচিত নয় কেন?

সরকার—কী আর ব'লবো? কতবার বল্‌বো? ভারতবর্ষ মুল্লুকটাই ভারতীয় নয় কেন? বাঙেলা দেশটা বাঙালীর মুল্লুক নয় কেন? এসব হচ্ছে ইংরেজের মুল্লুক—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জনপদ। এই সব দেশের যা-কিছুতে একজন মাত্র ইংরেজ থাকে, তার সবটুকুই বৃটিশ। কাজেই কল্‌কাতার রোটারি ক্লাবটা বৃটিশ প্রতিষ্ঠান। গোটা শ'য়েক সভ্য আছে আজকাল। তার অর্দ্ধেকের কিছু-বেশী হচ্ছে ভারতসন্তান (জন ত্রিশেক বাঙালী)। তা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটা বিলাতী। অন্যান্য ভারতীয় রোটারিও তাই।

লেখক—কল্‌কাতার রোটারি ক্লাবে ভাবতীযের পক্ষে সভ্য হ'য়ে কোনো লাভ আছে?

সরকার—আছে বৈকি। তবে লাভ-লোকসান রকমারি। এসবের খতিয়ান করেত নানালোকে নানাভাবে। বেপারীরা একদিক্ দিয়ে দেখে। রাষ্ট্রিকরা আর একদিক্ দিয়ে দেখে। আবার যার সংস্কৃতির দরদী তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা।

লেখক—আপনি কিছু বিশ্লেষণ ক'রে দেখান না?

সরকার—আমি আর কী দেখাবো? একে গরীব লোক। তার ওপর পেশায় মাত্র পড়ুয়া। জানা তো আছেই যে, কল্‌কাতার শাদা-চামড়াওয়ালা লোকেরা বাদামীদের সঙ্গে অন্য কোনো ক্লাবে গা ঘেঁশা-ঘেঁশি করে না। রোটারি হচ্ছে শাদায়-অশাদায় গা ঘেঁশা-ঘেঁশির প্রায় একমাত্র প্রতিষ্ঠান। হপ্তায়, একদিন অন্ততঃ, খেতে ব'সে ঘণ্টাখানেকের জন্য শাদায়-অশাদায় দিল্‌-দেরিয়ামি চালানো সম্ভব। কোনো-কোনো বাদামী লোক শাদার সঙ্গে মিশ্‌তে বেশ-কিছু উৎসাহী। তাদের পক্ষে এই সুযোগটা ছোটো-খাটো কিছু নয়। এই লাভটা তাদের খাতায় উল্লেখযোগ্য বৈ কি। অবশ্য আমি কোনো লোকের পেটের ভেতর ঢুকে একথা বল্‌ছি না। তবে বিশ্লেষণ চালাতে বলা হ'য়েছে,—এই জন্যে মনে হচ্ছে যে, বোধ হয় শাদার সংস্পর্শে আস্‌তে পারাটা কোনো-কোনো ভারতীয় বড়-চাক্‌রে বা বড়-বেপারীর পক্ষে একটা মস্ত-কিছু কাণ্ড।

লেখক—মস্ত কাণ্ড কেন?

সরকার—সহজেই বুঝা যায়। শাদা-চামড়াওয়ালাদের সঙ্গে মুখ-চেনাচেনি থাক্‌লে হয়ত বড়-বড় বেপারীদের ব্যবসা বাড়্‌তে পারে। বড়-বড় উকিল-ডাক্তারদের পশার বাড়া অসম্ভব নয়। চাক্‌রেদের মাইনের-বৃদ্ধি আর পদোন্নতি হওয়া হয়ত খানিকটা সহজ। তাছাড়া উপাধি-পদবী-খেতাব ইত্যাদির যা-হ'ক-কিছু জুট্‌লেও জুট্‌তে পারে। কে জানে, বাবা? এসব রহস্যময় চিজ্।

লেখক—এইরূপ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগকে কি আপনি খারাপ বিবেচনা করেন না?

সরকার—খারাপ মনে ক'রবে কেন? সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা মানুষের পক্ষে অতি

স্বাভাবিক। যদি এসবের সুযোগ কোথাও থাকে তবে তার সদ্ব্যবহার কর্‌বে না কোন্ আহাম্মুক? বাঙালী, অবাঙালী, অভারতীয়, ইংরেজ, মার্কিণ,—সকল সভ্যের পক্ষেই বোধ হয় রোটারিতে কিছু-না-কিছু স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ আছে। অবশ্য স্বার্থগুলা ক'-হাত পানির নীচে-নীচে চলে,—সব সময় বুঝা যায় না। মানুষ জটিল জীব।

আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ

লেখক—এই একমাত্র লাভ?

সরকার—আমি অদ্বৈতবাদী নই। একমাত্র লাভ আবিষ্কার ক'রেছি বুঝ্‌তে হবে না। আরও হয়ত কিছু-কিছু আছে। শাদার সঙ্গে অ-শাদার ব্যবহার বা আন্তর্মানুষিক লেনদেন খানিকটা বুঝ্‌তে পারা যায়। ভারতে শাদায়-অশাদায় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সহজে নজরে পড়ে না। সেই সব দৃষ্টান্ত রোটারিতে জোটে বেশ-কিছু। অন্যান্য ভারতীয় সভ্যের সঙ্গে মোলাকাৎ চালালে হয়ত খবর পাওয়া যাবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আর মতিগতি বিশ্লেষণ করা ভাল।

লেখক—আর কোনো লাভ আছে?

সরকার—শাদায়-শাদায় আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ কিরূপ তা সাধারণতঃ ভারত-সন্তান জানে না। রোটারিতে তা কিঞ্চিৎ-কিছু দেখ্‌বার-বুঝ্‌বার সুযোগ পায় কোনো কোনো ভারতবাসী। হয়ত এও একটা লাভ। সমাজ-শাস্ত্রীদের পক্ষে এই সুযোগ ফেলিতব্য চিজ নয়।

লেখক—রোটারি ক্লাব থেকে আর কোনো সুযোগ পাওয়া যায়?

সরকার—বাঙালীরা বাঙালীর সঙ্গে অথবা ভারতীয়েরা ভারতীয়ের সঙ্গে শাদাদের সাম্‌নে কেমন ব্যবহার করে তাও খানিকটা দখলে আসে। বাঙালীতে-অবাঙালীতে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের দৌড় ও বহর কিরূপ তাও কিছু-কিছু খোলশা হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া ইং'রেজরা অন্যান্য শাদা (ডাচ, মার্কিণ, চেক ইত্যাদি) লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কিরূপ মূর্তি দেখায় তাও যৎকিঞ্চিৎ পাক্‌ড়াও করা সম্ভব। দেখাই যাচ্ছে,—এই সকল বুঝা-বুঝি রোটারি ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব নয়।

লেখক—কল্‌কাতার রোটারিকে আপনি আন্তর্জাতিক ক্লাব বল্‌তে রাজি নন?

সরকার—কাগজে-কলমে, আইনে-কানুনে এই ক্লাব আলবৎ আন্তর্জাতিক। কিন্তু প্রাণে-প্রাণে এটা আন্তর্জাতিক নয়।

লেখক—কল্‌কাতার রোটারিকে আপনি আন্তর্জাতিক ক্লাব বল্‌তে রাজি নন?

সরকার—কাগজে-কলমে, আইনে-কানুনে এই ক্লাব আলবৎ আন্তর্জাতিক। কিন্তু প্রাণে-প্রাণে এটা আন্তর্জাতিক নয়।

লেখক—খাঁটি আন্তর্জাতিক হ'তে পারে কী হ'লে?

সরকার—(১) বাঙালীকে এই ক্লাবের একমাত্র মাতব্বর হ'তে হবে। (২) বাঙালী-শাসিত ক্লাবের নিত্যনৈমিত্তিক বৈঠকে ইংরেজ, মার্কিণ, ডাচ্, চেক, চীনা ইত্যাদি লোকজন নিয়মিত যাওয়া-আসা কর্‌বে। (৩) বাঙালীর আন্তর্জাতিক স্বার্থ অনুসারে এই ক্লাবের বক্তৃতা, বাক্-বিতণ্ডা, খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কাজ-কর্ম চালাতে হবে। (৪) ইংরেজের

চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো বাঙালী কোনো কথা বল্‌বে না বা কোনো কাজ চালাবে না।

লেখক—তা কোনো দিন সম্ভব কি?

সরকার—না। বৃটিশ ভারতে বাঙালীর সেই অবস্থা অসম্ভব। তার জন্য চাই বিলাতী, ফরাসী, মার্কিণ রাষ্ট্রিক অবস্থার মতন বাঙালীর রাষ্ট্রিক অবস্থা।

লেখক—আপনি রোটারির মেম্বার কেন?

সরকার—যে আমাকে চায়, আমি তার। যারা আমাকে ডাকে না তাদের কাছে আমি যাই না। নিজ থেকে দুনিয়ার কোনো-কিছু বয়কট করাও আমার দস্তুর নয়। কতকগুলা রকমারি লোকজনের সঙ্গে দিল-দেরিয়ামি চালানো আমার মেজাজ-মাফিক কাজ। জন্মাবধি আমি ভবঘুরে। আর এক কথা। হপ্তায় একটা ক'রে দুনিয়ার আশ্‌মান-পাতাল সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্‌লে কোনো লোকের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। মেহনৎ হয় না,—খেতে বসে কান খাড়া ক'রে রাখা এমন-কিছু কঠিন কাজ নয়। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মত আর নিজের পথ নিয়ে চলা আমি পছন্দ করি না। নানা মুনির নানা মত-পথ ছুঁয়ে রাখা প্রত্যেক লোকের পক্ষেই "আধ্যাত্মিক' উন্নতির উপায়। নিজ মত-পথের উল্টা যারা চলে তাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব আমি চাই।

লেখক—আপনি রোটারিতে উন্নতি পাচ্ছেন?

সরকার—হঁা। আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ বাড়ছে। তাছাড়া আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানও বাড়ছে। এই যোগাযোগ, আর জ্ঞান সবই আধ্যাত্মিক। অন্যান্য সভ্যেরা আধ্যাত্মিক লাভ পায় কিনা জানি না। বোধহয় তাদের বরাতে জুটে আর্থিক ও সাংসারিক উন্নতি। তবে কিছু-না-কিছু আধ্যাত্মিক বাড়্‌তি তারাও হয়ত অজ্ঞাতসারেই ভোগ করে। এইজন্য রোটারিতে সভ্য হওয়া বাঙালীর-বাচ্চার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। শাদা-চামড়াওয়ালারা ভারত-বন্ধু কিনা হামেশা ভাব্‌বার দরকার নাই। প্রতি মুহূর্ত রাষ্ট্রিক খেয়াল না রাখাই ভাল। আমি নিজে অ-রাষ্ট্রিক মেজাজ নিয়ে চলাফেরা করি। কতকগুলা অ-বাঙালী বাদামী আর অ-ভারতীয় শাদা লোকজনের সঙ্গে আটপৌরে মেলামেশা চালালে বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাতে থাক্‌বে আর মেজাজও মানুষ-ময় হ'তে পারবে। যেখানে-সেখানে ভারত-বন্ধু আর বিশ্বপ্রেম ঢুঁড়্‌তে বসা ঝক্‌মারি।

লেখক—রোটারির মারফৎ বাঙালীদের বা অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে শাদা-চামড়াওয়ালাদের যথার্থ ঘ'টেছে মনে করেন কি?

সরকার—বন্ধুত্বের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে পরিবারে-পরিবারে মেশামেশি। বাড়ীতে যাওয়া-আসার সম্বন্ধ না থাক্‌লে যথার্থ বন্ধুত্ব স্বীকার করা ঠিক নয়। কিন্তু কোনো শাদা-চামড়াওয়ালা লোক কোনো বাঙালী বা ভাবতীয়ের বাড়ীতে এসেছে কিনা সন্দেহ। খবর নিয়ে দেখা ভাল। কোনো বাঙালী বা ভারতীয় কোনো শাদা-চামড়াওয়ালার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছে ব'লে শুনিনি। অথচ শাদা-চামড়াওয়ালারা পরস্পর যাওয়া-আসা করে। অর্থাৎ ভেতরে-ভেতরে,—ক্লাবের বাইরেও শাদায়-শাদায় মেলমেশ, লেনদেন, আনাগোনা চলে দস্তুর মতন। চলে না কেবল শাদায়-অশাদায়।

লেখক—বাঙালীদের সঙ্গে অন্যান্য রোটারিভুক্ত ভারতবাসীর ঘরোআ লেন-দেন কেমন দেখা যায়?

সরকার—বাঙালীতে-বাঙালীতে ঘরোআ বা পারিবারিক মেলামেশ তো চলেই। এমন

কি বাঙালীর সঙ্গে অ-বাঙালী ভারতীয়ের পারিবারিক যোগাযোগও দেখা যায়। গোটা কয়েক মুসলমান সভ্য আছে। মুসলমানে আর অমুসলমানে বন্ধুত্বের সম্বন্ধও মালুম হয়। অশাদায় আর অশাদায় অর্থাৎ ভারতীয়ে-ভারতীয়ে আনাগোনা আর বন্ধুত্বময় যোগাযোগ বেশ-কিছু উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই ধরণের আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ থাকার ফলে রাষ্ট্রিক বন্ধুত্ব পায়দা হয় কিনা সন্দেহ। সে-কথা আলাদা।

বাঙালী চরিত্রে হিংসা হাম্‌বড়ামি

লেখক—বাঙালীরা একমাত্র বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের জন্য এই ধরণের ক্লাব গ'ড়ে তুলতে পারে না কি?

সরকার—আজ পর্যন্ত তো উল্লেখযোগ্য বহরের বাঙালী ক্লাব দেখ্‌ছি না। বাঙালীরা কবে ক্লাব গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌বে বলা কঠিন।

লেখক—পারা কঠিন কেন?

সরকার—হিংসুটে লোকেরা ক্লাব চালাতে পারে না। পারস্পরিক হিংসা বাঙালী চরিত্রে (ভারতীয় চরিত্রে) খুবই জবরদস্ত্‌। স্বাধীনভাবে ক্লাব গ'ড়ে তুল্‌বার রেওয়াজ বাঙালী সমাজে দেখা দিলে আমাদের অনেক সদ্‌গুণ গজাতে পার্‌বে।

লেখক—বাঙালীদের ক্লাব কি নাই?

সরকার—ছোট-খাটো ক্লাব-জাতীয় প্রতিষ্ঠান এখানে-ওখানে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সে-সবকে রোটারি ক্লাবের ইজ্জদ দেওয়া চল্‌বে না। অথচ, ইংরেজেরা, মার্কিণরা, জাপানীরা, জার্মাণরা নিজ-নিজ দেশে রোটারির দরের অসংখ্য ক্লাব গ'ড়ে তু'লেছে। ক্লাবনিষ্ঠায় বাঙালী জাত্‌ বেড়ে উঠুক।

লেখক—তাহ'লে রোটারিতে বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয়েরা ক্লাব চালাচ্ছে কী ক'রে?

সরকার— রোটারিতে বিদেশীদের (বিলাতী লোকের) আবহাওয়া বেশী। প্রায় আধা-আধি ইংরেজ। কর্মকর্তাদের ভেতরও ইংরেজই আধা-আধি। বিদেশীর আওতায় ভারতীয়ে-ভারতীয়ে (বাঙালীতে-বাঙালীতে) হিংসা খানিকটা চাপা প'ড়ে যায়। যে-প্রতিষ্ঠানে শাদার কর্তৃত্ব বা ছায়া নাই, সেই প্রতিষ্ঠানে বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর (ভারতীয়ের সঙ্গে ভারতীয়ের) হিংসা মাথা চেঁড়ে তোলে।

লেখক—আপনি ভয়ঙ্কর বল্‌ছেন?

সরকার—কী করা যাবে? বাঙালী জাতের গুণ অনেক বটে, কিন্তু দোষও আমাদের কম নয়। আমরা অতিমাত্রায় পরশ্রীকাতর। অপরের সুখ, উন্নতি, সৌভাগ্য সইতে এখনো আমরা শিখিনি। তা ছাড়া হাম্‌-বড়ামি আমাদের বড্ড্‌ বেশী। টাকার গরমে আর পদের গরমে অনেকে ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করে। মানুষের সঙ্গে সমানে-সমানে ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে অতি-কঠিন। অধিকাংশ বাঙালীই নিজেকে দুনিয়ার নং ১ বিবেচনা করে। অন্যান্য বাঙালী ও ভারত-সন্তানকে নকড়া-ছকড়া জ্ঞান করা এবং খোলা-খুলি অপদস্থ করা বাঙালী চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। এইজন্য বাঙালীর ক্লাব দাঁড়াচ্ছে না।

লেখক—শাদা-চামড়াওয়ালারা কি পরস্পর হিংসা করে না?

সরকার—কেন কর্‌বে না? হিংসুটে লোক দুনিয়ায় সর্বত্র তফাৎ মাত্রায়। বাঙালী সমাজে পারস্পরিক হিংসা বোধহয় আকার-প্রকারে আপেক্ষিক হিসাবে বেশী। হিংসা-চুক্‌লি চেপে রেখে সইরেজরা, জার্মাণরা, মার্কিণরা অন্যের সঙ্গে কাজকর্ম চালাতে জানে। বাঙালীরা পারস্পরিক হিংসায় এতবেশী জ্বলে যে, বেশীক্ষণ অপরের সঙ্গে লেনদেন চালানো সম্ভব হয় না।

লেখক—বাঙালী চরিত্রের হিংসা ও হাম্‌-বড়ামি কি একমাত্র ক্লাব-পরিচালনায়ই দেখা যায়?

সরকার—তা নয়। প্রত্যেক আন্তর্মানুষিক কারবারেই বাঙালী চরিত্রের এই দুই দোষ ফুটে উঠে। লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকদের ভেতর প্রত্যেকেই নিজেকে একজন নিউটন-লীবিগ-পাস্তয়র সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। রাষ্ট্রিক কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই আস্ত নেপোলিয়ান-কাভুর-বিস্‌মার্ক ইত্যাদি জবরদস্ত-কিছু। প্রত্যেকেই চায় যে, একমাত্র তার কর্মপ্রণালী অনুসারে দেশের স্বাধীনতা আসুক। যদি তাতে দেশ স্বাধীন হয় তো হ'ক,—না হয় তো ব'য়ে গেল। এই হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক বাঙালীর মতি-গতি। অন্যান্যের মগজে ঘী থাক্‌তে পারে তা স্বীকার করা আমাদের দস্তুর নয়। অন্যান্যেরাও কর্মদক্ষ এরূপ ভাবা বাঙালী কর্মবীরের মেজাজে ঠাঁই পায় না। এই ধরণের লাট সাহেবী আর হিংসুটে মেজাজে না চলে রাষ্ট্রিক দল, না চলে বিজ্ঞান-পরিষৎ, আর না চলে সামাজিক ক্লাব।

ছাপাখানার ভুল

৬৩৬ পৃষ্ঠার ১২ লাইনে মজঃফর আহম্মদের নাম বসিয়াছে। এইটা ৬৩৬ পৃষ্ঠার ৩৩ লাইনের প্রথমে বসিবে। মজঃফর বয়সে বেশী মোটা নন, তবে সৌম্যেন ইত্যাদির চেয়ে বড়।

চীন-শাস্ত্রী প্রবোধ বাগ্‌চি

২০শে মে ১৯৪৪

হেমেন—বাঙালী বা ভারতীয় কর্তৃত্বে বিদেশী-আন্দোলন চলছে না কি?

সরকার—চীনা-আন্দোলন সম্বন্ধে বাঙালী বা ভারতবাসীকে বেশ-কিছু স্বাধীন বল্‌তে পারি। বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে চীনা-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম হ'য়েছে। এতে চীনাদের কর্তৃত্বও বেশ-কিছু আছে। ষোল আনা বাঙালী বা ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এটা নয়। চীনা পণ্ডিত তান্‌ ইয়ুন-শান আসল কর্তা। বেশ ভাল লোক,—অনেকদিন ধ'রে বোলপুরে আছেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটা টাকা আসে চীন হ'তে।

লেখক—চীন-প্রচার সম্বন্ধে বাঙালী মহলে চাঁই কাকে-কাকে বল্‌বেন?

সরকার—চীন-বিষয়ক চাঁই বা চীন-প্রচারক বল্‌লে অধ্যাপক প্রবোধ বাগ্‌চির নাম করা হ'চ্ছে আমার দস্তুর। তবে "প্রচার"-পেশায় প্রবোধ মাতেননি। কোনো প্রচার-সমিতির সঙ্গেও বোধ হয় যোগ নাই। কাজেই চাঁই বলাও ঠিক কি না সন্দেহ। চীনা

ভাষা জানেন। চীনা ভাষার ওপর ভর ক'রে ফরাসীতে বই লিখেছেন। তাছাড়া সম্প্রতি বই বেরুলো "ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না" (১৯৪৪) নামে। চীন নিয়ে আছেন। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও প্রবোধ বাগ্‌চির মতন লোক চাই বাঙলাদেশে। প্রবোধ আমার পারিভাষিকে চীন-দক্ষ বা চীন-শাস্ত্রী। বিদেশী ভাষা জানা না থাক্‌লে আমার মেজাজ মাফিক বিদেশ-দক্ষ-হওয়া অসম্ভব। এই হিসাবে প্রমথ রায় আর মণীন্দ্র মৌলিক ইতালিয়া-শাস্ত্রী বা ইতালিয়ান-দক্ষ। মাখনলাল রায়-চৌধুরী আরবী-জান্তা পণ্ডিত। এই ধরণের আরব-শাস্ত্রী বাঙালী-হিন্দুদের ভেতর আরও চাই। "মৌলবী মাখ্‌নলাল" পথ-প্রদর্শক সন্দেহ নাই।

লেখক—আপনার 'চীনা সভ্যতার অ-আ-ক-খ" আর "বর্তমান যুগের চীন সাম্রাজ্য" প্রকাশ ক'রেছিলেন ডক্টর নরেন লাহা বছর বিশ-পঁচিশ আগে। আপনিও তো চীন-প্রচারক। আপনার ঐ বই দু'টা প'ড়ে অনেক বাঙালী নবীন ও প্রবীণ চীন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়েছে। এই দুই বইয়ের নাম সাংবাদিক ও গাল্পিক মহলে সুপরিচিত।

সরকার—তা হ'তে পারে। অনেক-কিছুর প্রচারক বা প্রবর্তক এই অধম। তবে একমাত্র চীন নিয়ে কারবার করা আমার পেশা নয়। চীন-বিশেষজ্ঞ চাই। চীনা ভাষায় আর সংস্কৃতিতে ওস্তাদ হওয়া চাই। খোদ চীনা বই থেকে তর্জমা কর্‌বার ক্ষমতা থাকা চাই। সেই দিক্ থেকে প্রবোধ বাগ্‌চি যুবক বাঙলার পথ-প্রদর্শক।

লেখক— প্রবোধ বাগ্‌চি চীনা ভাষা কিরূপ জানে?

সরকার—তা জরীপ করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমাদের মতন লোকের চেয়ে,—বেশী জানে নিশ্চয়ই!

লেখক—প্রবোধ বাগ্‌চির "ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না" বইয়ে কি বর্তমান যুগের লেনদেন বিষয়ক আলোচনা আছে?

সরকার—না। সবই প্রাচীন ও মধ্যযুগের মাল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যোগাযোগের বৃত্তান্ত এই বইয়ে পাওয়া যায়।

লেখক—আপনার "চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ্" (হিন্দু-চোখে চীনা ধর্ম) বই বেরিয়েছিল তো ১৯১৬ সনে শাংহাইয়ে। সেই বইয়েও তো ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনা-ভারতীয় লেনদেনের কথা আছে। প্রবোধের বইয়ে আর আপনার সেই আঠাইশ বছর আগেকার বইয়ে প্রভেদ কী?

সরকার— সেই বই যখন লিখি তখন আমি ফরাসীও জান্‌তাম না, জার্মাণও জান্‌তাম না, ইতালিয়ানও জান্‌তাম না। বইটা অবশ্য লেখা হ'য়েছিল চীন-প্রবাসের সময়। চীনা ভাষা তখনও জান্‌তাম না, আজও জানি না। আমার রচনা একমাত্র ইংরেজি গ্রন্থাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবোধের বইয়ে ইংরেজি নজিরগুলা তো আছেই। তার ওপর আছে ফরাসী নজির। অধিকন্তু প্রবোধ চীনা-জান্তা লোক। কাজেই এই বইয়ে আর আমার বইয়ে বেশ-কিছু প্রভেদ মালুম হওয়া উচিত।

লেখক—আপনার "চীনা সভ্যতার অ-আ-ক-খ" বইয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তী-যুগ সম্বন্ধেও তথ্য পাওয়া যায়?

সরকার—হাঁ। কিন্তু একমাত্র ইংরেজি নজিরের ওপর ভর ক'রে বইটা লেখা হ'য়েছিল।

লেখক—আধুনিক চীন সম্বন্ধে আপনার "বর্তমান যুগের চীন সাম্রাজ্য"-ই কি বাঙালীর সর্বপ্রথম বই?

সরকার—না। আমার বই লেখা হয় ১৯১৫-১৬ সনে। তখন ইউয়ান শী-কাইয়ের বিরুদ্ধে সুন ইয়াৎ-সেনের দল বিদ্রোহী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৎসর চল্‌ছিল। তার আগে বেরিয়েছিল রামলাল সরকার প্রণীত "চীন-বৃত্তান্ত"। তাঁর রচনায় পাওয়া যায় মাঞ্চু-বিরোধী সুন-প্রবর্তিত বিপ্লব ও লড়াইয়ের কথা (১৯১১-১২)। তিনি সেই সময় বর্মার উত্তর সীমানায় চীনের এক শহরে ভারত-গবর্মেণ্টের কর্মচারী ছিলেন। তার আগেও লেখা হ'য়েছিল "চীন-ভ্রমণ"। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক ছিলেন গ্রন্থকার। তাঁর রচনায় আছে ১৯০০-০১ সনের বিদেশী-বিরোধী যুবক চীনের বিদ্রোহ-বৃত্তান্ত। ইন্দুমাধব ছিলেন ইংরেজ সেনাবিভাগের ডাক্তার।

লেখক—আজকাল বাঙালীরা চীনা-আন্দোলন ব'ল্‌লে একমাত্র বা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের চীন-ভবন সংক্রান্ত কাজ-কর্ম বুঝে থাকে। কিন্তু আপনি সেই কবেকার ইন্দুমাধব মল্লিক পর্যন্ত গিয়ে ঠেক্‌ছেন?

সরকার—কী কর্‌বো, ভায়া? আমি গরীব মানুষ। কোনো নামজাদা লোকের কাজকর্মকে আমার পক্ষে দেশের প্রথম, প্রধান বা একমাত্র কাজকর্ম সম্‌ঝে রাখা অসম্ভব। টুক্‌রা-টাক্‌রা কাজ-কর্ম এই অধমের বিচারে বাদ যায় না। টাকাটা-সিকিটা-দোআনিটা যা-কিছু কোনো লোকের দান হ'ক না কেন,—সবই আমার হিসাবে এসে হাজির হয়। খবরটা যদি জানা না থাকে তা হ'লে আলাদা কথা।

লেখক—রবীন্দ্রনাথ আপনার কতদিন পর চীনে গিয়েছিলেন?

সরকার—আমি ছিলাম ১৯১৫-১৬ সনে। রৈবিক অভিযান ঘ'টেছিল বোধ হয় ১৯২২-২৩ সনে। আমি তখন জার্মাণিতে।

লেখক—চীনা-ভারতীয় মেলমেশকে রৈবিক আন্দোলন বলা উচিত কি?

সরকার—কী উচিত আর কী অনুচিত, তার বিচার করা কঠিন। সত্যিকার রাবীন্দ্রিক যুগ সবে সুরু হচ্ছে বলা যেতে পারে। এখনো অনেকদিন ধ'রে বাঙালী জাত রবির নাম ভাঙিয়ে দেশ ও দুনিয়ায় ক'রে খাবে। কাজেই বহুকাল পর্যন্ত লোকেরা রবিকেই সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান বা একমাত্র চীনা-ভারতীয় লেন-দেনের প্রবর্তক বা প্রচারক বিবেচনা কর্‌তে বাধ্য। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

লেখক—কতদিন পর্যন্ত এই চিন্তাধারা থাক্‌বে মনে হচ্ছে?

সরকার—বোধ হয় বছর পঁচিশেক আমরা এইরূপ রৈবিক আওতায় থাক্‌বো। ১৯৬৫-৭০ সনের যুগে রবীন্দ্রনাথকে "অন্যতম" চীন-প্রচারক বা চীনা-ভারতীয় লেনদেনের প্রবর্তকরূপে ইজ্জদ্ দেওয়া হ'তে থাক্‌বে। তখন ইন্দুমাধব মল্লিক, রামলাল সরকার ইত্যাদি "রামা-শ্যামা-আবদুল-ইস্‌মাইলের" যথোচিত ইজ্জদ দেওয়া সম্ভব হবে।

বঙ্গে রুশ-আন্দোলন

লেখক—রুশ-আন্দোলনের দিকে আপনার সহানুভূতি আছে?

সরকার—আগেই ব'লেছি। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে আমার জীবনের আসল মন্তর। এই জন্য যমের বাড়ীতে যেতেও প্রস্তুত আছি। রুশিয়া যদি যমালয়ও হয় তাহ'লেও

তার সঙ্গে যুবক বাঙলার আনাগোনা আর লেনদেন জবরভাবে বাঞ্ছনীয়। বাঙলাদেশে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করা উচিত। বাঙালী ছোক্‌রাদেরকে রুশিয়ায় গবেষণা কর্‌বার উদ্দেশ্যে খরচপত্র দিয়ে পাঠানো উচিত। সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতি এই দুই কাজ হাতে নিলে বঙ্গ-সংস্কৃতির অনেক উন্নতি হবে। বাঙালী জাত বাড়্‌তির দিকে আরও এগুতে পার্‌বে।

লেখক—আপনি একমাত্র রুশিয়া সম্বন্ধে আন্দোলনের ব্যবস্থা করাতে চান?

সরকার—না। আমি চাই যে-কোনো উন্নতিশীল বর্দ্ধিষ্ণু বিদেশের জন্য বাঙালীর তাঁবে কম্‌সে-কম্ একটা ক'রে প্রতিষ্ঠান। হেমচন্দ্রের বুখ্‌নিটা আমি সর্বদাই আওড়িয়ে থাকি।

লেখক— কোন্ বুখ্‌নিটা?

সরকার—কে না জানে? :—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে
গগনের গ্রহ তন্নতন্ন ক'রে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

"আন্তর্জাতিক বঙ্গ-পরিষৎ" কায়েম ক'রেছি বার বছর হ'লো (এপ্রিল ১৯৩২)। লড়াইয়ের হাঙ্গামায় কাজকর্ম বন্ধ আছে। "বঙ্গীয়-এশিয়া পরিষৎ" ইত্যাদির পরিষদও কিছু কালের জন্য ধামাচাপা রেখেছি। এই কারণেই "বঙ্গীয় জার্মাণ-বিদ্যাসংসদ" আর "বঙ্গীয় দান্তে-সভার" কাজও বন্ধ আছে।

লেখক—বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব কায়েম কর্‌বার চেষ্টা আপনার পরিষদ্-গুলার ভেতর দিয়ে করা হয় কি?

সরকার—না। আমার পরিষৎ, সংসদ, সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মেলামেশা, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদি চিজের স্থান নাই,—অথবা নেহাৎ গৌণ। লেখাপড়া, পঠন-পাঠন, গবেষণা, প্রবন্ধ, পুঁথি, কেতাব, বিদ্যা বাড়ানো ইত্যাদি শুক্‌নো চিজ এই সকল পরিষদের সওদী। রাষ্ট্রিক রস-কষ এইসবের ভেতর পাওয়া অসম্ভব। সব-কিছুই জ্ঞানযোগের মামলা। কোনো দেশের স্বপক্ষে-বিপক্ষে মত-পাকানো বা আন্দোলন-চালানো আমার পরিষদ্‌গুলার ব্যবস্থায় অসম্ভব।

লেখক—কোনো বিদেশের সঙ্গে সৌহার্দ্য কায়েম কর্‌বার ব্যবস্থা বাঙালীর কোনো প্রতিষ্ঠানে আছে?

সরকার—হাঁ। কয়েক বৎসর ধ'রে নেপালের সঙ্গে বন্ধুত্বের লেন-দেন চালাবার জন্য একটা আয়োজন চল্‌ছে। ফি-বছর দু-একবার ডাক্তার হরিদাস মুখোপাধ্যায় কল্‌কাতায় (আর মধুপুর, পাটনা, কাশী ইত্যাদি জায়গায়) নেপাল নিয়ে জল্‌সার ব্যবস্থা করেন। তাতে ভারতবাসীকে খানিকটা নেপাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়।

লেখক—ডাক্তার হরিদাস মুখোপাধ্যায় নাম শুনিনি তো?

সরকার—কল্‌কাতায় হাজার-হাজার ডাক্তার। ক-জনের নাম শোনা সম্ভব? হরিদাস গাছপালা হ'তে ওষুধ বাহির ক'রে অনেক রোগীর উপকার ক'রেছেন। নেপালের সঙ্গে যোগাযোগ বহুকাল ধ'রে। এঁর ব্যবস্থায় "বঙ্গীয় নেপাল-সমিতি" বা "ভারতীয় নেপাল-পরিষৎ" কায়েম হ'তে পারে। এই ধরণের পরিষৎ ইরাণ, তুর্কী, ঈজিপ্ট ইত্যাদি যে-

কোনো দেশ সম্বন্ধেই গ'ড়ে তোলা উচিত। প্রত্যেক দেশের জন্য জরুরি দু-একজন করিৎ-কর্মা বাঙালীর উঠে-প'ড়ে লাগা।

লেখক—আর কোনো বিদেশ সম্বন্ধে বাঙালীর প্রতিষ্ঠান নাই?

সরকার—বর্ষাতির রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার সুরেন বসু, দাঁতের ডাক্তার রফি আহম্মদ আর সুধীর মজুমদার, সাবানের রাসায়নিক খগেন দাশগুপ্ত ইত্যাদি কয়েকজন মার্কিণ-ফের্তা বাঙালী কল্‌কাতায় আমেরিকা-ক্লাব চালাচ্ছে। বছর বিশেক ধ'রে চল্‌ছে। অবশ্য ভাল চলে না।

লেখক—রুশ-আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় কে-কে চাঁই বা মাতব্বর ছিলেন?

সরকার—বাঙালীদের ভেতর মানব রায়, ভূপেন দত্ত, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি মাৎসিনি-ভক্ত বিস্‌মার্ক-পন্থী ন্যাশন্যালিস্ট বা স্বজাতি-নিষ্ঠ যুবারা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রথম মক্কেল। এঁরা ১৯২১ সনে মস্কো পর্যন্ত ধাওয়া ক'রেছিলেন। লেনিন-ট্রট্‌স্‌কি ইত্যাদি বোলশেভিক বীরদের সঙ্গে বাঙালীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের যোগাযোগ কায়েম হয়। তখন আমি বিদেশে। মস্কো হ'তে "হাজী" হ'য়ে যাঁরা ফিরে এসেছিলেন তাঁদের কারু-কারু সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

লেখক—পরবর্তী অবস্থা কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—দেশে ফিরে এসে (১৯২৫-এর শেষাশেষি) দেখ্‌ছি মুজঃফর আহম্মদ আর সৌম্যেন ঠাকুর কল্‌কাতায় চালাচ্ছেন সাপ্তাহিক "লাঙল"। তারপর তাঁদেরই হাতে "গণ-বাণী" সাপ্তাহিক বেরোয়। সে ১৯২৬-২৮ সনের কথা। এঁরা রুশ-প্রচারক, সোভিয়েট-সুহৃৎ। ১৯৩১-৩৫ সনে মার্ক্‌স-দর্শন আর লেনিন নীতি বাঙালী লিখিয়ে পড়িয়েদের মহলে কিঞ্চিৎ-কিছু-কিছু ছড়িয়ে প'ড়েছে। এই বিষয়ে যুবক বাঙলার কোনো-কোনো মহল আজ-কাল বেশকিছু ওয়াকিবহাল। বিনয় ঘোষ প্রণীত "সোভিয়েট সভ্যতা" (দুই খণ্ড, ১৯৩৯-১৯৪১) আর সত্যেন মজুমদার প্রণীত "স্তালিন" (১৯৪১) সুখপাঠ্য বই। ১৯৪১ সনে কায়েম হ'য়েছে সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতি। হীরেন মুখোপাধ্যায় লিখিত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-বইয়ের তর্জমা বর্তমান বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত'র তর্জমায় রুশ গল্প হাজির হ'লো (১৯৪৪)। ক্ষিতি মুখার্জিও রুশ গল্পের তর্জমা-প্রচারক।

লেখক—সর্বজনিক সংস্কৃতির সঙ্গে রুশ-আন্দোলনের যোগাযোগ কেমন?

সরকার—আজকাল বি. এ-ক্লাশের ইতিহাস পড়্‌বার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রুশ-বিপ্লবের কথাও মুখস্থ করতে হয়। তাছাড়া দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকায় রুশিয়া-বিষয়ক অথবা রুশ-প্রভাবওয়ালা গল্প বা প্রবন্ধের আওতা বেড়ে চ'লেছে।

লেখক—আপনি রুশ-গবেষণার কাজে সময় দিয়েছেন?

সরকার—১৯১৭-১৮ সনে অর্থাৎ বোলশেভিক বিপ্লবের সময় এই অধম ছিল নিউইয়র্কে। সেই আবহাওয়াই লেনিনকে যুবক এশিয়ার পক্ষে বিংশ শতাব্দীর যুগাবতার ব'লেছি। "ফিউচারিজম্ অব্ ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা) বইয়ে (বার্লিন, ১৯২২) তার চিহ্নোৎ আছে। বইটা আজকাল পাওয়া যায় "সোশিঅলজি অব রেসেজ, কাল্‌চার্স অ্যান্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস্" (১৯৩৯) নামে। "বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর "প্যারিসে দশমাস", "পরাজিত জার্মাণি" আর 'ইতালিতে বারকয়েক' লেখা হয় ১৯২০-২৫ সনে। তার ভেতর রুশ আন্দোলনের ধাক্কা আছে দস্তুর মতন। রুশ-

আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জন্মদাতা মার্ক্‌স্‌-সাহিত্য। সেই সাহিত্যের অন্যতম জার্মাণ গীতা-কোরাণ-বাইবেল—"পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামে—,আর ফরাসী গীতা-কোরাণ বাইবেল— "ধনদৌলতের রূপান্তর" নামে,—ঝেড়েছি ১৯২৩-২৫ সনের ভেতর। ট্রট্‌স্‌কি প্রণীত জার্মাণ বইয়ের বাংলা চুম্বক দিয়েছি "নবীন রুশিয়ার জীবন-প্রভাত" বইয়ে (১৯২৩-২৪)। এই সকল বইয়ের প্রত্যেক অধ্যায় প্রথমে বেরিয়েছিল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তখন আমি ইয়োরোপের নানাদেশে প্রবাসী। কিন্তু ঘটনাচক্রে কখনো রুশিয়ায় পা ফেলা হয়নি। কাজেই মস্কোয় গিয়ে "হজ" ক'রে আস্‌তে পারি নি।

লেখক—দেশে ফিরে আস্‌বার পর রুশ-গবেষণার কাজ আপনি কিছু ক'রেছেন?

সরকার—আমি কোনো দলের লোক নই। অধিকন্তু রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কোনো গলি-ঘোঁচে আমার গতি-বিধি নাই। কোনো দল আমাকে নিজের লোক ভাবে না। এমন চরমভাবে নির্দল লোক কেহ জগতে আছে কিনা সন্দেহ। তবে ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মাণ ইত্যাদি সংস্কৃতি, এমন কি রুশ-সংস্কৃতিকেও, সর্বদাই আমাদের দেশে প্রচারের জন্য চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি। আগেকার মতনই,—১৯২৫ সনে দেশে ফেরার পরও রুশ-চর্চা বজায় আছে। প্রায় প্রত্যেক বইয়ের কোনো-না-কোনো অধ্যায়ে কথা অথবা সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজ্‌ম্‌-বিষয়ক আলোচনা আছেই আছে। রুশ-গবেষণায় আমি আজও ইস্তাফা দিইনি। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পড়াতে গিয়ে মার্ক্‌স্‌-লেনিন-ট্রট্‌স্‌কি-স্তালিন আটপৌরে চিজের মতন ব্যবহার ক'র্‌তে হয়। রুশিয়ার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক তথ্য ও সংখ্যা রোজই কিছু-কিছু নিজে গিলে থাকি। আবার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদেরকে গেলাতে হয়।

লেখক—রুশতথ্যপূর্ণ আপনার দু-একটা বইয়ের নাম ক'রবেন?

সরকার—কোন্‌টার নামই বা করি? প্রত্যেক বই-ই তুলনা-মূলক। নাম দেখে আমার কোনো বইয়ের ভেতরকার মাল বুঝ্‌বার জো নাই। "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" বইয়ের (১৯৩২) দুই খণ্ডে রুশ মশ্‌লা ছড়ানো আছে। আর ১৯৪৩ সনে প্রকাশিত "ইকুয়েশন্‌স্‌ অব্‌ ওয়ার্লড-ইকনমি" (বিশ্বদৌলতের সাম্য-সম্বন্ধ) বইয়েও রুশ-জার্মাণ লড়াইয়ের যন্ত্র-কথা আর অর্থ-কথা আলোচিত হ'য়েছে। কাজেই এই ছাব্বিশ-সাতাইশ বৎসরের একটা দিনও রুশিয়া-হীন জীবন বা চিন্তাধারা চল্‌ছে না।

লেখক—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক ইংরেজি বইয়ে আর পত্রিকায় আমরা দুনিয়ার সকল প্রকার তথ্য ও তত্ত্বই তো পাই। তার ওপর আপনি রুশ, জার্মাণ, ফরাসী, মার্কিণ, ইতালিয়ান, জাপানী ইত্যাদি নানা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ চাচ্ছেন কেন?

সরকার—একমাত্র বৃটিশ-চোখে দুনিয়া দেখ্‌তে ভারতবাসী অভ্যস্ত। এইজন্য আজ পর্যন্ত ভারত-সন্তানের চোখ ফুট্‌লো না। আমাদের ভারতীয় অধ্যাপক, বিজ্ঞান-গবেষক, সাংবাদিক, শিল্পী, বণিক্‌, মজুর-নায়ক ইত্যাদি নানা পেশার লোকেরা অত্যধিক ইংরেজ-চোখো লোক। ভারতীয় সংস্কৃতি বিলাতী সংস্কৃতির মফঃস্বলে পরিণত হ'য়েছে। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ভারতীয় অধ্যাপকগুলা যুবক ভারতকে ইংরেজের গোলামে পরিণত ক'রে ছেড়েছে।

লেখক—এই গোলামি নিবারণের উপায় কী?

সরকার—এই গোলামি হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য জরুরি রুশ-জার্মাণ-জাপাণী-মার্কিণ ইত্যাদি বিশ্বশক্তির রকমারি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। রকমারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দুনিয়া দেখ্‌তে শেখা উচিত। রুশ-জার্মাণ-জাপানী-মার্কিণ আর অন্যান্য ভাবধারা ও কর্মপ্রণালী ভারতের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক। একমাত্র ইংরেজ সংস্কৃতির তাঁবে এসে ভারতসন্তান কানা হ'য়ে প'ড়েছে। চাই খোলা চোখে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় চলাফেরার আটপৌরে সুযোগ। অনেক বারই ব'কেছি,—চাই দশাননী দৃষ্টিভঙ্গী। এইজন্যই চাই বাঙালীর তাঁবে রুশ-পরিষৎ, মার্কিণ-পরিষৎ, জার্মাণ-পরিষৎ, তুর্ক-পরিষৎ, ফরাসী-পরিষৎ, ইরান-পরিষৎ ইত্যাদি রকমারি প্রতিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে আবার ব'লে রাখ্‌ছি,—বিলাতী সংস্কৃতির বয়কট চাই না। এই অধম বিলাত-ভক্তও বটে।

শাদায়-বাদামিতে বৈঠকি যোগাযোগ

লেখক—নিজ-নিজ সাংসারিক উন্নতির লোভে আমাদের দেশী লোকেরা ইংরেজ আর অন্যান্য বিদেশী স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌তে চায়,—একথা কি বিদেশীরা বুঝে না? (পৃঃ ৬৫৯-৬৬০)।

সরকার—কেন বুঝ্‌বে না? আসল কথা,—ইংরেজরাই ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষদের চরিত্র সম্বন্ধে এই ধরণের অনেক-কথা বলে। কোনো ভারত-সন্তান চাক্‌রি পাবার আশায়, কোনো ভারত-সন্তান মাইনে বাড়াবার আশায়, কোনো ভারত-সন্তান পদবী, উপাধি, খেতাব বা আর-কিছু লোভনীয় চিজ পাবার আশায় ইংরেজদের খোসামোদ করে। বিলাতী লোকজনের সঙ্গে ভারতবাসীর হস্তমর্দন, "মিষ্টিমুখ", ক্লাবভোজন ইত্যাদি বস্তুর ভাবার্থ আর কিছু নয়। ইংরেজরাই অনেক সময়ে এই ধরণের সমালোচনা ক'রে থাকে। ইংরেজরা এইসব গায়ে প'ড়ে ভাব কর্‌বার বেদান্ত সম্বন্ধে আনাড়ি নয়। শাদায়-বাদামিতে বৈঠকি-যোগাযোগের রহস্য বেশ-কিছু জটিল।

লেখক—যারা ইংরেজ নয়,—যেমন মার্কিণ, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান ইত্যাদি,—এমন শাদা লোকজনের সঙ্গে ভারতীয় নর-নারীর যোগাযোগ আপনি এইরূপ লোভনীয় বস্তুর প্রভাব দেখ্‌তে পান না?

সরকার—খুব কম। কেন না—মার্কিণরা, ফরাসীরা বা অন্যান্য শাদারা ভারতবর্ষের রাজা-বাদ্‌শা নয়। তারা কোনো ভারত-সন্তানকে চাক্‌রি-পদবী-খেতাব দিয়ে স্বর্গে তুল্‌তে পারে না। কাজেই তাদের সঙ্গে যে-সকল ভারতবাসীর অল্প-বিস্তর মাখামাখি তারা কিঞ্চিৎ-কিছু "নিরেট" চিজ পাবার আশা রাখে না। অবশ্য কার মেজাজে কী আছে বলা কঠিন।

লেখক—ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তো চাক্‌রি-পদবী-খেতাবের উমেদার নয়; তারা মার্কিণ-ফরাসী-জার্মাণ ইত্যাদি জাতের সঙ্গে ভাব রাখ্‌লে লাভবান্ হ'তে পারে না কি?

সরকার—ঠিক কথা। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতীয় বেপারীদের লাভ কিছু-কিছু সম্ভব। কিন্তু এই সব শাদারা ভারতের রাষ্ট্রিক হর্তা-কর্তা-বিধাতা নয়। কাজেই তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য ভারতীয়েরা বড় বেশী মাতামাতি করে না। তাদের সঙ্গে কথাবার্তায়

নিজেদের ইজ্জদ্ বাঁচিয়ে লেনদেন চালানো সম্ভব। তবে কোনো-কোনো ভারত-সন্তান যে-কোনো শাদা লোককেই ভারতের বাদশা সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। তারা নিজ দেশের ইজ্জদ বাঁচিয়ে চল্‌তে অসমর্থ।

জুন ১৯৪৪

কর্মবীরের জাত্ বাঙালী

২রা জুন ১৯৪৪

মন্মথ—শুন্‌লাম দাশ-নগরে আলামোহনের পঞ্চাশদ্‌বর্ষ সম্বর্দ্ধনা-সভায় (১৮ই এপ্রিল ১৯৪৪) আপনি ব'লেছেন যে, বাঙালীরা কর্মবীরের জাত্। দুনিয়ার অন্য কোনো জাতের তুলনায় বাঙালী জাত্ কর্মবীরের হিসাবে খাটো নয়। একথার মানে কী?

সরকার—কর্মবীরের গুন্‌তিতে হয় তো বাঙালী জাত্ খাটো। বাঙালীরা বিদেশীদের কর্মদক্ষতার মাপেও হয় ত খাটো। কিন্তু কর্মবীরের চরিত্র হিসাবে আমরা খাটো নই। কর্মবীরের আসল লক্ষণ হচ্ছে,—দুরবস্থার সঙ্গে লড়াই করা, বাধাবিঘ্নকে জুতিয়ে দুরস্ত করা, প্রতিকূল শক্তিসমূহকে হারিয়ে সংসারে দাঁড়িয়ে থাকা। দুনিয়ায় ঘাড় খাড়া রাখ্‌তে পারা হচ্ছে বীরত্ব। এই হ'লো আমার পারিভাষিকে কর্মবীর-লক্ষণম্।

লেখক—অন্যান্য জাতের পাশে আপনি এই হিসাবে বাঙালীকে বসাতে পারেন?

সরকার—হাঁ। ইংরেজ বাচ্চা, জার্মাণ বাচ্চা, মার্কিণ বাচ্চা, জাপানী বাচ্চা, রুশ বাচ্চা ইত্যাদি নামজাদা জাতের ছোকরা–জোআন-প্রবীণেরা বাধাবিঘ্নকে জুতোতে জানে বটে। আমরা বাঙালীর বাচ্চারাও দেশের, সংসারের ও সমাজের প্রতিকূল শক্তিগুলাকে টিট্ কর্‌তে কম ওস্তাদ নই। ওরা যদি কর্মবীর হয়, আমরাও তাহ'লে কর্মবীর। ওসব দেশ যদি কর্মবীরের দেশ হয়, আমাদের বাঙলাদেশও কর্মবীরের দেশ। হাজার বার হাজার জায়গায়,—বাঙালী জাত্ বড় জাত্। তার মানে বাঙালীরা কর্মবীরের জাত। বরং ওসব দেশের তুলনায় বাঙ্‌লাদেশের একটা জবরদস্ত বিশেষত্ব আছে। বীর তো বীর বাঙালী বীর।

লেখক—কী সেই বিশেষত্ব? বাঙালী বীরের এত তারিফ কেন?

সরকার—বিলাত, জার্মাণি, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কোনো-না-কোনো উপায়ে কর্মীদের জীবনে পৌঁছে থাকে। ওসব দেশের লোকেরা নানা ঢঙের রকমারি সরকারী সাহায্য ভোগ করে। ভারতে আমাদের কর্মীরা প্রায় সকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ কব্‌জার জোরে কাজকর্ম চালাতে বাধ্য। প্রায়-একমাত্র নিজ ক্ষমতায়, বিনা সরকারী সাহায্যে,—বাঙালীর বাচ্চাকে গবেষণা চালাতে হয়, আবিষ্কারে লেগে থাক্‌তে হয়, কারবার ফাঁদ্‌তে হয়, দুঃসাহসের অভিযানে আগুআন হ'তে হয়। বাহাদুরি বেশী কার? তাদের, না আমাদের? আমার জবাব,—বাঙালীর বাচ্চার, ভারত-সন্তানের কৃতিত্ব বেশী। কর্মবীর হিসাবে বাঙালীর বাচ্চারাই দুনিয়ার সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য। জগতের সেরা বীর বাঙালী।

লেখক—আলামোহনের সম্বর্দ্ধনা-সভায় কল্‌কাতার কেউ উপস্থিত ছিলেন কি?

সরকার—সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। হাজিরদের ভেতর দেখ্‌লাম অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও বাণেশ্বর দাস, জজ বিজনকুমার মুখার্জি ইত্যাদিকে।

লেখক—আলামোহনের মতন কর্মবীর বাঙ্‌লাদেশে অনেক দেখ্‌তে পান কি?

সরকার—আমার চোখে প্রায় যে-কোনো বাঙালীর বাচ্চাই কর্মবীর। কেউ ছোট, কেউ বড়, আর কেউ মাঝারি কর্মবীর। বাঙালী আমরা প্রায় সকলেই প্রতিকূল-শক্তির সঙ্গে লড়াই চালাতে-চালাতে এগিয়ে যাচ্ছি। দুনিয়া বাধা দিচ্ছে আমাদের অসংখ্য দিক্‌ থেকে। সেই-সবকে জুতিয়ে দুরস্ত করা প্রায় প্রত্যেক বাঙালীরস জীবন-কথার অন্তর্গত।

লেখক—দু-একটা বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় চাই।

সরকার—দারিদ্র্য মাথায় ক'রে,—দশ-বারোটা ছেলে-মেয়ের পরিবার চালিয়ে বাঙালীর বাচ্চারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লেগে থাকে,—স্বরাজী হয়,—স্বদেশীতে মাতে,—জেল খাটে,—ঐতিহাসিক হয়,—দর্শন চর্চা করে। এসব কি কম বাহাদুরি? কম বীরত্ব?

গরীব অবস্থা থেকে টাকাকড়ি-রোজগারে বড়লোক হওয়ার দৃষ্টান্ত চাও? বাঙলাদেশে পাবে হাজার-হাজার। এইজন্য মার্কিণ নর-নারীর নজির আন্‌বার প্রয়োজন হয় না। লেখাপড়ায় যারা খাটো তারাও কি গরীব থেকে যায়? না। তাদের অনেকে বাঙলাদেশে পয়সা-রোজগারের কর্মক্ষেত্রে চরম উন্নতি দেখিয়েছে। কি নির্ধন, কি নিরক্ষর বা অর্দ্ধশিক্ষিত,—দুই শ্রেণীর লোকই বাঙালী সমাজে দুনিয়াকে জুতিয়ে বড়লোক হ'য়েছে। তারা সকলেই জবরদস্ত কর্মবীর। বাঙলায় কর্মবীর পায়দা হয়েছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। এই হিসাবে ও বঙ্গজননী বীর-প্রসবিনী।

কর্মবীর-আবিষ্কারের পেশা

লেখক—সাধারণতঃ এই কথাটা আমাদের মনে আসে না কেন? আমরা দু-একজন বাঙালী কর্মবীর দেখ্‌লে তাদেরকে একমাত্র বা "সবেধন নীলমণি" বিবেচনা করি কেন?

সরকার—সাধারণতঃ লোকেরা বীরত্ব মাপে সাংসারিক সফলতা দেখে। কোনো লোক যদি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন চালাতে পারে তবে তাকে কর্মবীর বলা দস্তুর। লোকে চায় কৃতকার্যতা, সার্থকতা, বিজয়লাভ।

লেখক—আপনি কর্মবীর মাপেন কী দেখে?

সরকার—আমি জয়-পরাজয় দেখি না। আমি দেখি শুধু সংগ্রাম। লোকটা বাধা-বিঘ্নকে জুতোচ্ছে কি না? লোকটা প্রতিকূল দুনিয়ার ঘাড় মট্‌কাতে চেষ্টা কর্‌ছে কিনা? যে-লোকটা লড়াই কর্‌ছে সেই লোকটা বীর। যদি লড়াইকে হেরেও যায়, তবুও সে বাপকা বেটা। এই আমার বিচার। যে লড়াই করে না সে নরাধম। বীরত্ব = লড়াইশীলতা, সংগ্রাম-নিষ্ঠা। কর্মবীর-আবিষ্কারের পেশায় আমি আর কিছু দেখি না। আমার বীরত্ব-জরীপ কিছু অদ্ভুত রকমের!

লেখক—সাধারণতঃ লোকেরা কর্মবীরদের সফলতা বা কৃতকার্যতা মাপে কী দেখে?

সরকার—প্রথমতঃ দেখে টাকাকড়ির বহর। দ্বিতীয়তঃ দেখে সরকারী পদবী, খেতাব ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ দেখে দেশ-বিদেশে নাম-ডাক। এই হচ্ছে কর্মবীর জরীপ কর্‌বার

তিন অতি-সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী।

লেখক—এই তিন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জরীপ সুরু কর্‌লে বহুসংখ্যক কর্মবীর দেখা যায় না কি?

সরকার—না। গোলযোগ আছে। ভুলচুকের সম্ভাবনা আছে। এতে দেমাকী মেজাজের খেলা দেখ্‌তে পাই। অহঙ্কারের প্রভাব আছে। টাকা-ওয়ালারা বেশ দেমাকী লোক। তারা যখন-তখন যে-সে লোককে টাকাওয়ালা হিসাবে বড় বল্‌তে নারাজ। তারা মনে করে যে, একমাত্র তারাই টাকাওয়ালা। তাদের মেজাজে তারাই দেশের পাঁড়। তাদের সমান ধনী আর কেউ নাই। অতএব দেশে কর্মবীরের সংখ্যা খুব কম। পদবীওয়ালাদের অহঙ্কার খুব বেশী। তারা ভাবে যে তাদের সমান ইজ্জদ্ বেশী বাঙালী পায় নি। অতএব এই হিসাবেও বাঙালী কর্মবীর গুন্‌তিতে নগণ্য। আর দেশ-বিদেশের নামওয়ালা বাঙালীরা সবাই আঙুল ফুলে কলাগাছ বিশেষ। তারা মনে করে যে, তাদের সমান নামওয়ালা লোক বাঙলা দেশে খুবই কম। ঠিক যেন নাই বল্‌লেই চলে। যাকে-তাকে এই শ্রেণীর দেমাকীরা নামদার-লোক সম্‌ঝিতে নারাজ। সুতরাং এই মেজাজেও কর্মবীর বাঙালী বেশী নাই। মেজাজের এই সকল দুর্বলতা ধনী-পদবীশীল-নামদার নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই তিন শ্রেণীর লোকের মগজে নতুন-নতুন কর্মবীর স্বীকার করা একপ্রকার অসাধ্য। এই সব হচ্ছে মাত্রাবিশেষে অহঙ্কারের খেলা। দেমাকীদের দৃষ্টিভঙ্গী মামুলি দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে আলাদা চিজ্।

লেখক—এই তিন দৃষ্টিভঙ্গীর গলদ কোথায়?

সরকার—আমি গরীব মানুষ। পয়সাওয়ালা, পদবীওয়ালা, নামওয়ালা লোকজনের মেজাজে ঢুক্‌বো কী ক'রে? আমার মতন গরীবের চোখে অল্প-আয়ের লোকও ধনী, আবার গরীবেরাও কর্মবীর। সরকারী পদবী কেমন ক'রে জুটে, তা আমার পক্ষে বুঝা অসম্ভব। তাছাড়া পদবীহীন লোকও কর্মবীর হ'তে পারে। অধিকন্তু নাম-ডাকের মাত্রায় কম-বেশী থাকা স্বাভাবিক। নামটা ঘটনাচক্রে হয়ত বাড়ে-কমে। কে জানে? এই সবের ভেতর বোধ হয় রহস্য আছে।

লেখক—কর্মবীর-আবিষ্কারের জন্য আপনি কী কর্‌তে চান?

সরকার—টাকার গরম, পদবীর গরম, নাম-ডাকের গরম বাদ দিয়ে কর্মবীর আবিষ্কার করার দিকে আমার মতিগতি। সত্যি কথা,—দেশ-বিদেশের কর্মবীর আবিষ্কার করা আমার অন্যতম পেশা। এই পেশায় পয়সা ইত্যাদি চিজের বালাই আমার নাই। সর্বদাই ঢুঁড়্‌ছি লোকজনের লড়াই-শীলতা, সংগ্রাম-নিষ্ঠা, দুনিয়াকে জুতোবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা। এই পরীক্ষায় যে পাশ সেই আমার কর্মবীর। আগেই বলেছি,—লড়াইয়ের পরাজিতেরাও আমার বিচারে পাশ। তারাও বড় বীর। চাই কেবল লড়াই, হামেশা লড়াই,—লড়াইয়ের পর লড়াই। এরি নাম জীবন।

রোজগার-মাফিক কর্মবীর-জরীপ

লেখক—আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি,—টাকাওয়ালারা কি টাকা রোজগারের পরিমাণ না দেখে কাউকে কর্মবীর ঠাওরাতে পারে না?

সরকার—অবস্থা ঠিক তাই। শুধু টাকাওয়ালারা কেন, জনসাধারণ আর দেশের অধিকাংশ লোকই রোজগারের মাপে কর্মবীর জরীপ কর্‌তে অভ্যস্ত। সংসারের লোকজনের মতিগতি নিম্নরূপ :— লাখ পাঁচেক যার রোজগার, সে দেড়-লাখীর চেয়ে বড় কর্মবীর। লাখপতির চেয়ে ছোট কর্মবীর হ'চ্ছে পঞ্চাশ-হাজার-পতি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত শ'খানেক বা গোটা পঞ্চাশেক যার রোজগারে, সে-বেচারা কর্মবীর একদম নয়। এই হ'চ্ছে দুনিয়ায় কর্মবীরের জরীপ-প্রথা। রোজগার-মাফিক কর্মবীর জরীপ করার রীতি অতি সনাতনও সার্বজনিক।

লেখক—এই জরীপ-প্রথার দোষ কোথায়?

সরকার—সহজে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মনে করো দুনিয়ার কোনো দেশে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার লড়াই চল্‌ছে,—পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-শ'বছর ধ'রে। শেষ পর্যন্ত দেশটা স্বাধীন হ'য়ে গেল—শ'বছরের শেষদিন। সেই দিনকার স্বদেশ-সেবকদের ছাড়া আর কাউকে বাপকা বেটা, কর্মবীর ইত্যাদি বলা সাধারণতঃ দস্তুর নয়। কিন্তু এই বিচার যুক্তিসঙ্গত কি?

লেখক—আপনার বিচার কিরূপ?

সরকার—আমার বিচারে সেই দেশের স্বদেশ-সেবক ও রাষ্ট্রনিষ্ঠ কর্মবীর হাজার-হাজার। তারা কারা? তারা শ'বছর ধ'রে জেল খেটেছে, না খেয়ে মরেছে, দেশ-বিদেশে স্বদেশের স্বাধীনতার ঝাণ্ডা খাড়া ক'রেছে, আর তার জন্য নানা নির্যাতন স'য়েছে, এখানে-ওখানে-সেখানে প্রাণ দিয়েছে। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার বেলায় চরম অবস্থার শেষ স্বদেশ-সেবকেরাই একমাত্র বীর নয়। সফলতা-প্রাপ্ত শেষ কর্মবীরদের চেয়ে পূর্ববর্তী স্বদেশ-সেবকদের অনেকেই চরিত্রবতায় আর স্বার্থত্যাগে হয়ত বেশ-কিছু মহত্তর।

লেখক—বেশ তো। তাতে কী হ'লো?

সরকার—ঠিক তেমনি প্রত্যেক দেশেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে র'য়েছে হাজার-হাজার কর্মবীর। তার ভেতর দু'চার-দশজন হয়ত টাকার মুখ দেখ্‌তে পায়, বাড়ী-গাড়ীর বিলাস ভোগ করে। কিন্তু তারাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কর্মবীর নয়। অন্যান্যেরাও কর্মবীর,—হয়ত খুব উঁচু দরেরই কর্মবীর। আগেই ব'লেছি,—ফেল-মারা পরাজিতেরাও আমার বিচারে কর্মবীর। গরীবেরাও কর্মবীর।

দেমাকী লোকেরা কানা

লেখক—অহঙ্কারের দরুণই কি লোকেরা দেশের ভেতরকার বহু-সংখ্যক কর্মবীর দেখ্‌তে পায় না? পণ্ডিতেরাও কি পয়সাওয়ালা ইত্যাদি শ্রেণীর মতন দেমাকী?

সরকার—বহুসংখ্যক কর্মবীর দেখ্‌তে না পাওয়ার অন্যতম কারণ মানুষের অহঙ্কার সন্দেহ নাই। কিন্তু অহঙ্কারই একমাত্র কারণ নয়। তবে দেমাকী লোকেরা প্রায়ই কানা হয়। নিজের ক্যার্‌দানি ও মহত্ত্ব ছাড়া তাদের চোখে আর কিছু পড়ে না। খুব-জোর নিজের সমান দু-এক জনকে তারা সম্মানযোগ্য স্বীকার কর্‌তে রাজি হয়। বহু-সংখ্যক বীরের অস্তিত্ব তাদের মেজাজে অসম্ভব।

লেখক—কেন এইরূপ ঘটে?

সরকার—আগেই ত ব'লেছি কিছু-কিছু। কারণ বাৎলানো সোজা নয়। একটু-আধটু

বিশ্লেষণ ক'র্‌তে পারি। কোনো-কোনো পণ্ডিত এমন দেমাকী যে, তাদের ল্যাজে পা দেওয়া অসম্ভব। আর-কোনো পণ্ডিত কোনো গলি-ঘোঁচে আছে কল্পনা করা পর্যন্ত তাদের পক্ষে কঠিন। যদি থাকে তা হ'লে তাদের ইজ্জদ্‌ বাঁচানো দায় হবে যে! এইরূপ হচ্ছে তাদের মেজাজ।

লেখক দেমাকীদের মেজাজ আর একটু বিশ্লেষণ কর্‌বেন?

সরকার—কোনো-কোনো বিদেশ-ফের্তারা আবার নিজেদেরকে ভারত-বহির্ভূত যে-কোনো দেশের সব-কিছু সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল স'ম্‌ঝে থাকে। তাদের সমান বিদেশ-দক্ষ আদ্‌মি ভারতে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি',—এইরূপ তাদের ধারণা। হয়ত তারা মাত্র মাস কয়েক বা বছর দু-তিন বিদেশে ছিল। তবুও বিদেশের সব কয়টা কর্মবীরের খবর যেন তারা রাখে। অন্যান্যেরা যেন সে-সম্বন্ধে একদম আনাড়ি। এই ধরণের দেমাকী লোকের চিন্তায় হয়ত বিদেশী কর্মবীরের সমান কর্মবীর বাঙলায় একটাও নাই। দেমাক রকমারি। কোন্‌ লোকের দেমাক কী আকার-প্রকারের হবে তা বুঝে উঠা কঠিন। আমি মামুলি মানুষ, সে-সব বুঝি-সুঝি না।

লেখক—দেমাক ছাড়া আর কোনো কারণ সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—আগেই ব'লেছি—কর্মবীর কাকে বলে সেই সম্বন্ধে ধারণ রকমারি। যারা সাংসারিক সফলতা ঢুঁড়ে বেড়ায়, তারা কালে-ভদ্রে দু-এক জন কর্মবীর আবিষ্কার করে। আর এই অধম গরীবের মতন যারা জীবন-সংগ্রামের লড়ুয়া মানুষ ঢুঁড়্‌তে অভ্যস্ত তারা দুনিয়ার যে-কোনো গলি-ঘোঁচে ফি বছরই গণ্ডা-গণ্ডা বাপকা বেটা ও কর্মবীর আবিষ্কার করে।

লেখক—টাকাকড়ির সঙ্গে বীরত্বের যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—পয়সাওয়ালা লোকের ছেলেরা বড়-বড় কারবারের মালিক বা পরিচালক হয়। তাতে বাহাদুরির কিছুই নাই। এদেরকে কর্মবীর বলা আমার দস্তুর নয়। ধনীর বাচ্চা ধনী হ'য়েছে। এতো মামুলি কথা। কাজেই রোজগারের বহর দেখে আমি কর্মবীর জরীপ করি না। পয়সা-হীনের অসাধ্য সাধন বা সাধনার পরাজয় আমার একমাত্র হিসাবের বস্তু। সিদ্ধিলাভ বড় কথা নয়। চাই সাধনা, চাই সাধক।

গরীবের ছেলে কর্মবীর

৫ই জুন ১৯৪৪

লেখক—বাঙলা দেশের কর্মবীর সম্বন্ধে কিছু বলুন না?

সরকার—বাঙালী জাতের কেরাণী-ইস্কুলমাস্টার শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই বীর। আট-দশটা ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে গেরস্থালি চালানো বীরত্ব। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বড়-বড় সংসার চালানো মামুলি কথা নয়। গরীবের পক্ষে জীবন-সংগ্রামে ঘাড় খাড়া রাখা খুবই বাহাদুরির কাজ। রোগে-শোকে কষ্ট-পাওয়া নরনারীর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই বীরত্ব। তা সত্ত্বেও বাঙালীর অনেক ছোট-বড়-মাঝারি অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা দেখাচ্ছে।

লেখক—বাঙালী গরীব আর গেরস্থদেরকে বীর বল্‌ছেন কেন?

সরকার—দশবারো-মুখো পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরকে মানুষ ক'রে তুলেছে তারা।

গরীবেরা দেশকে বাড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য উপায়ে। স্বার্থত্যাগ, স্বদেশ-সেবা, সাহিত্য-সৃষ্টি, শিল্প-সৃষ্টি, বিজ্ঞান-গবেষণা, কারখানা-স্থাপন, বৃহত্তর ভারত-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজের জন্য লোক এসেছে কোন্ শ্রেণীর পরিবার হ'তে? প্রধানতঃ পঁয়ত্রিশ-পঞ্চাশ-পঁচাত্তর টাকার রোজগারওয়ালা পরিবার হ'তে এসেছে এই ধরণের জগদ্‌বরেণ্য বাঙালীর বাচ্চা।

লেখক—কাদের ছেলেরা দেশকে বড় ক'রে তুলেছে?

সরকার—বাঙালীর কেরাণী কর্মবীর। বাঙালীর ইস্কুলমাস্টার কর্মবীর। পয়সাওয়ালা। লোকের ছেলেরা এই সকল স্বদেশ-সেবার কাজে যত নেমেছে তার চেয়ে বেশী নেমেছে গরীব লোকের ছেলেরা। বাঙালীর গরীবেরা কর্মবীর। কেরাণীর কুটিরে জন্মেছে দেশপ্রাণ কর্মবীর। ইস্কুলমাস্টারের ঘরে দেখা দিয়েছে স্বদেশযোগী কর্মবীর।

লেখক—এই ধরণের দৃষ্টান্ত কি অনেক আছে?

সরকার—ঊনবিংশ শতাব্দীর আগাগোড়া দেখ্‌তে পাই এই দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি। গরীবের বাচ্চারাই অনেকাংশে বর্তমান ভারতের আসল কর্ণধার বা ধুরন্ধর। দু-চার-দশজন পয়সাওয়ালা লোকের কৃতিত্ব অস্বীকার করার দরকার নাই। কিন্তু বেশীর ভাগই দেখা যায় যে, অজ্ঞাত কুল-শীল বাপ-মার ছেলেরা নিজ হাত-পার জোরে আর মাথার জোরে বাঙলা দেশে গণ্যমান্য হ'য়েছে। বাঙালী জাত্‌কে বাড়তির পথে ঠেলে দিয়েছে গরীবের বাচ্চারা।

লেখক—বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সম্বন্ধেও কি সেকথা বলা চলে?

সরকার—আলবৎ চলে,—খুব বেশী-বেশী চলে। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব কায়েম ক'রেছিল কারা? সেদিন হ'তে আজ পর্যন্ত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজে, স্বরাজ-স্বাধীনতার কাজে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজে, সুকুমার শিল্প-সাহিত্যের কাজে কোন্-কোন্ শ্রেণীর বাঙালীর দান আকার-প্রকারে বেশী? গরীব-পরিবারের ছেলেরাই স্বদেশী-স্বরাজ-স্বাধীনতা-জাতীয়শিক্ষার বিপুল আন্দোলনে অগ্রণী হ'য়েছে। ১৯৪৪ সনে ব্যাঙ্কিং, বীমা, যন্ত্রপাতির কারখানা, বিজলীর ফ্যাক্টরি, ওষুধের কারানা, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে অনেক বাঙালী টাকার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছে। এদের অনেকে বাঙালী কারবারের প্রবর্তক বা মালিক। কেহ-কেহ হয়ত অ-বাঙালী ভারতীয় বীমা-ফ্যাক্টরি ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্যের কর্মকর্তা। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই এক-একজন আলামোহন। তারা দশ-বিশ-পঁচিশ বছর আগে কী দরের লোক ছিল? অধিকাংশই ছিল গরীব। তাদের বাপ-দাদারা ছিল আরও গরীব।

("হেমেন ঘোষের ওষুধের কারখানা", মার্চ ১৯৪৪)

শ'-পাঁচেক আলামোহন (১৯৪৪)

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, স্বদেশী যুগের পরবর্তী আজ পর্যন্ত যত-বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে আর নতুন-নতুন কৃষি-শিল্পে লেগে র'য়েছে তারা সকলেই আলামোহন দাশের মতন কর্মবীর?

সরকার—প্রকারান্তরে তাই বল্‌ছি বারে-বারে। কোনো আলামোহন হয়ত গণ্ডা কয়েক

টাকা বেশী রোজগার কর্‌ছে, আর-কোনো আলামোহন হয়ত কারবারটা খাড়া কর্‌তে গিয়ে হয়রাণ-পরেষাণ হ'য়ে পড়্‌ছে। কোনো আলামোহন নিজ-কারবারের মালিক। কোনো আলামোহন হয়ত পরকীয় কারবারের কর্মকর্তা। সব-রকমই আছে। লাখপতি-দশলাখপতি দু'চারজন যে নাই তা নয়। আবার হাজারি-চারহাজারিও বেশ-কিছু দেখা যায়। তাছাড়া "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ"—মেজাজী গরীব শিল্পী-বেপারীর সংখ্যা অগণিত। আমার মাপ-জোকে সফলতা বিফলতার হিসাব নাই। হিসাব করি আমি শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লড়াই, লড়াইয়ের প্রবৃত্তি, লড়াইয়ের ক্ষমতা।

লেখক—একালের বাঙলায় রকমারি আলামোহন দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—মাটি কাম্‌ড়ে প'ড়ে রয়েছে শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে বাঙালীর বাচ্চা। কোনো মিঞা র'য়েছে ব্যাঙ্ক নিয়ে, কোনো মিঞা র'য়েছে ফ্যাক্‌টরি নিয়ে। কারুর হাতে চল্‌ছে বীমার হাল, কারু তদবিরে চল্‌ছে বহির্বাণিজ্য। এরা সকলেই কর্মবীর। এমন কি মারোআড়ি-শাসিত বড়বাজারেও বাঙালী বেপারীর টিকি দেখা যাচ্ছে মন্দ নয়। স্টক এক্‌স্‌চেঞ্জে বাঙালীর ছায়া প'ড়েছে।

লেখক—আন্দাজে বল্‌তে পারেন কতগুলা আলামোহন একালের শিল্প-বাণিজ্যে মোতায়েন র'য়েছে?

সরকার—বাঙালী জাতের ট্যাঁকে আজকে উল্লেখযোগ্য আলামোহনের সংখ্যা বোধহয় কম-সে-কম শ'-পাঁচেক। ১৯২৫ সনে হয় ত ছিল শ'-দুয়েক। ১৯০৫-এ বোধ হয় একশ'র বেশী ছিল না। ১৯৬৫-৭০ সনে দেখা যাবে হয়ত হাজার দেড়েক। বাড়্‌তির পথে বাঙালী সম্বন্ধে এই আরেক জরীপ-প্রণালী। তুলনায় বুঝ্‌বার জন্য জেনে রাখা ভালো যে,—জার্মাণ সমাজে বা বিলাতে র'য়েছে বোধ হয় লাখ পাঁচেক আলামোহন।

যাদবপুর কলেজের শিল্পী-বণিক্

লেখক—আপনাদের যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশকরা ছেলেদের কাজকর্ম কিরূপ?

সরকার—বাঙালী কর্মবীরদের ফিরিস্তি দেবার সময় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রবর্তিত এই কলেজের ছোক্‌রাদের কাজ সর্বদাই মনে রেখে চলা উচিত। কল্‌কাতার কারখানায়-কারখানায়, বাঙ্‌লাদেশের কারখানায়-কারখানায়, তামাম ভারতের কারখানায়-কারখানায় যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নামডাক আছে।

লেখক—এর মানে কী?

সরকার—ভারতের সর্বত্রই যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক কারবারে যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারেরা বাহাল আছে। বাঙালীর বাচ্চা এই কলেজের দৌলতে নানা ভারতীয় কর্মকেন্দ্রের বেপারী-মহলে এঞ্জিনিয়াররূপে পরিচিত। পার্শী, ভাটিয়া, গুজরাতী, মারোআড়ি সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের তারিফ করে। অবশ্য বাঙালী এঞ্জিনিয়ার জোগানোই যাদবপুরের একমাত্র কীর্তি নয়। অন্যান্য কৃতিত্বও আছে।

লেখক—যাদবপুর কলেজের অন্যান্য কীর্তি কী?

সরকার—নয়া বাঙলার শিল্প-বাণিজ্য বেশ-কিছু গ'ড়ে উঠেছে যাদবপুরে ছোকরাদের

কর্মবীরত্বে। এই কলেজের পাশ-করা বা ফেল-করা ছাত্রদের ভেতর বহুসংখ্যক আলামোহন টুঁড়ে পাওয়া যায়। যাদবপুরী এঞ্জিনিয়ারেরা একালের বঙ্গীয় স্বদেশী আন্দোলনের তাজা-তাজা খুঁটা।

লেখক—যাদবপুরী আলামোহনেরা কিরূপ শিল্প-বাণিজ্যে মোতায়েন আছে?

সরকার—কোন্ শিল্পেরই বা নাম কর্‌বো আর কোন্‌টারই বা কর্‌বো না? হরেক প্রকার কারবার চালাচ্ছে যাদবপুরের যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারেরা। বাঙলাদেশের অনেকগুলা কারখানা চল্‌ছে এদের তদ্‌বিরে। কলেজের অন্যতম কর্মকর্তা ও অধ্যাপক ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে মোলাকাৎ চালাতে পারো। অনেক খবর পাবে। ত্রিগুণা যাদবপুরী এঞ্জিনিয়ার আর জার্মাণির (মিউনিখের) যন্ত্র-ডক্টর।

লেখক—যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারদের গ'ড়ে-তোলা কয়েকটা কারবারের নাম করুন না?

সরকার—নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা) যন্ত্রপাতি, বিজলী ও লোহার কারবারের কর্মকর্তা প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় নয়া বাঙলার জবরদস্ত প্রতিমূর্তি। শিলিগুড়ি, কালিম্পঙ, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলেও প্রফুল্ল'র বিজলীর কারবার চলে। প্রফুল্ল বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার। কল্‌কাতায় নামজাদা হ'য়েছে ন্যাস্‌কো কোম্পানী। "অজন্তা সাবান" তৈরী হচ্ছে। কর্মকর্তা রতন দত্ত যাদবপুরের রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার। জার্মাণির অভিজ্ঞতাও রতনের আছে।

লেখক—এঁদেরকে কর্মবীরের ফিরিস্তিতে ঠাঁই দেবেন?

সরকার—আলবৎ। এই ধরণের আট-দশ ডজন কর্মবীরের হদিশ দিতে পারে যাদবপুর। শচীন সাহা "ভারত ব্যাটারি"র প্রতিষ্ঠাতা। ঘরবাড়ী তৈরীর কাজে আজকাল নামজাদা সুধীর দত্ত। বৃটিশ-ইন্ডিয়া কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ কোম্পানী চল্‌ছে এর হাতে। বিদ্যায় সুধীর বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার।

লেখক—বিলাতী ও মার্কিণ অভিজ্ঞতাওয়ালা যাদবপুরে এঞ্জিনিয়ার নাই কি?

সরকার—কেন থাক্‌বে না! বেল্‌টিং ও বৈদ্যুতিক কারবারের অন্যতম আলামোহন হচ্ছে সুরেন রায়। সুরেনের ভাই কিরণ ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানীর ধুরন্ধর। দুজনেরই মারফৎ মার্কিণ-অভিজ্ঞতা আমদানি হ'য়েছে। কিরণ আজকাল যাদবপুর কলেজের সেক্রেটারি। ত্রিগুণার মতন কিরণের কাছেও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ছোকরাদের বর্তমান হালচাল জান্‌তে পারা যাবে। প্রভাতী টেক্‌স্‌টাইল মিলের ক্ষিতীশ বিশ্বাসও আর একজন মার্কিণ-অভিজ্ঞতাওয়ালা যাদবপুরী এঞ্জিনিয়ার।

লেখক—বিলাতী অভিজ্ঞতাওয়ালা কোনো যাদবপুরী এঞ্জিনিয়ার আছে কি?

সরকার—"প্লাইক্রীট কোম্পানী" খাড়া হ'য়েছে। এটা লড়াইয়ের মরশুমে নাম ক'রেছে বেশ। ইস্পাত-লোহার পরিবর্তে চটের ব্যবহার এই ব্যবসার অন্যতম লক্ষণ। কারবারটা হচ্ছে চটের উপর কংক্রীট লাগানো। বলা বাহুল্য অনেক টাকা বেঁচে যায় কারবারীদের। সুরেন দত্ত প্লাইক্রীট কোম্পানীর প্রবর্তক। যাদবপুরের পর গ্লাস্‌গো ঢুঁ-মেরে-আসা লোক। সুরেন দত্ত একালের অন্যতম আলামোহন।

যাদবপুরী মেজাজ ও যাদবপুরী ধারা

লেখক—আপনার বিবেচনায় যাদবপুর কলেজের দান বাঙালী সমাজে সবিশেষে উল্লেখযোগ্য কি?

সরকার—নিশ্চয়। যাদবপুর কলেজের প্রথম দান যাদবপুরী মেজাজ, খেয়াল বা মর্জি।

লেখক—যাদবপুরী মেজাজ আবার কী?

সরকার—১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব বাঙালীর বাচ্চাকে একটা নয়া দৃষ্টিভঙ্গী আর নয়া দর্শন দিয়েছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গী আর দর্শনের অন্যতম বর্তমান প্রতিমূর্তি হচ্ছে যাদবপুরী মেজাজ।

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গী আর দর্শন বল্‌লে কী বুঝা যাবে?

সরকার—বর্তমান ক্ষেত্রে বুঝ্‌তে হবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলাকে মানুষের কাজে লাগানো। কর্মমূলক বিজ্ঞান আর এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যার দর্শন হচ্ছে তাই। যাদবপুরী মেজাজে সেই দর্শনকে জ্যান্ত আকারে পাকড়াও করা সম্ভব।

লেখক—যাদবপুরের আর কোনো দান আছে?

সরকার—দ্বিতীয় দান হচ্ছে যাদবপুরী ধারা। ফ্যাক্টরি চালানো হচ্ছে যাদবপুরীদের কাজ। ফ্যাক্টরির পর ফ্যাক্টরি গ'ড়ে উঠেছে যাদবপুরীদের হাতে। বিগত বছর বিশেকের ভেতর যাদবপুরের এঞ্জিনিয়াররা বাঙ্‌লার ও ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে কতকগুলা ঠিকানা কায়েম কর্‌তে পেরেছে। ঠিকানাগুলা হচ্ছে যন্ত্রপাতি আর রাসায়নিক কারখানা বিষয়ক। এইসব নিরেট আর মজবুদও বটে। এই সকল ঠিকানার সাহায্যে বাঙালী এঞ্জিনিয়াররা ধাপে-ধাপে নয়া বাঙ্‌লার ইতিহাস গ'ড়ে তুল্‌ছে। যাদবপুরের ছোক্‌রা বললেই বুঝ্‌তে হবে শিল্প-কারখানার মালিক-পরিচালক-কর্মকর্তা। নয়া পেশার জন্মদাতা ও প্রতিনিধি যাদবপুরীরা। এই হচ্ছে একটা নয়া ধারা, নয়া রীতি, নয়া ঐতিহ্য। যাদবপুরী মেজাজ আর যাদবপুরী ধারা বিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনকে নয়া-নয়া আচারে আব নয়া-নয়া সংস্কারে বাড়্‌তির পথে ঠেলে তুল্‌ছে। বঙ্গ-সংস্কৃতিতে যাদবপুরের দান অমর।

শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালী

লেখক—মারোআড়ি ও অন্যান্য অ-বাঙালী ভারতীয়দের তুলনায় শিল্পী-বণিক্ আলামোহনদের অবস্থা কিরূপ?

সরকার—মারোআড়ি ইত্যাদি অ-বাঙালী শিল্পী-বণিকেরা কোটি-কোটি টাকার কারবার করে। বাঙালী শিল্পী-বণিকদের দৌড় হাজার-হাজার পর্যন্ত,—বড়জোর লাখ-লাখ পর্যন্ত। মারোআড়ি ও অন্যান্যেরা টাকায় বড় সন্দেহ নাই। কিন্তু তা ব'লে কর্মবীরের চরিত্রে অ-বাঙালীরা বাঙালীদের চেয়ে বড় নয়। টাকা-পয়সার মাপে কর্মবীর জরীপ করা আমার দস্তুর নয়। এ কথা অনেকবার ব'কেছি।

লেখক—ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণ ইত্যাদি অ-ভারতীয় শিল্পী-বণিকদের তুলনায় বাঙালী আলামোহনদের অবস্থা কিরূপ?

সরকার—শিল্পের অভিজ্ঞতায় আর গবেষণায় ইংরেজ-জার্মাণ ইত্যাদি শিল্পী-বণিকরা আশমানের চাঁদ। বাঙালী আলামোহনেরা এই বিষয়ে কচি শিশু মাত্র। কিন্তু কর্মবীরের চরিত্র হিসাবে ওরা আমাদের চেয়ে উন্নত নয়। তাছাড়া মারোআড়ি ইত্যাদি ভারতীয় শিল্পী-বণিকদের মতনই বা চেয়েও অ-ভারতীয়েরা অনেক পুঁজি-পাটার মাপে যারপরনাই বড়। বাঙালী শিল্পী-বণিক্‌দের ট্যাকে টাকা অতি-কম। কিন্তু তারা দুনিয়ার হালচাল বেশ-কিছু বুঝে। মারোআড়িরাও হাতি-ঘোড়া নয়, ইংরেজ-জার্মাণরাও হাতী-ঘোড়া নয়।

লেখক—বর্তমান লড়াই খতম হবার পর বাঙালী শিল্পী-বণিক্‌দের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে মনে হচ্ছে?

সরকার—অনেক বাঙালী কর্মবীরই পটল তুল্‌বে। লড়াইয়ের আগে যারা কারবারে লেগেছে, তাদের কেহ-কেহ, হয় ত আত্মরক্ষা কর্‌তে পার্‌বে। একথা নানা জায়গায় ব'লেছি। মারোআড়ি ও অন্যান্য অ-বাঙালী কোম্পানীর কোনো-কোনোটা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। কতকগুলো দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। ইংরেজ ও মার্কিণ কোম্পানী বাঙলাদেশ আর অ-বঙ্গ ভারত ছেয়ে ফেল্‌বে। ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাদের সমঝৌতা ও সহযোগ কিছু-কিছু কায়েম হবে। পৃথিবীর সকল দেশেই লড়াইয়ের সময়কার অনেক কারবার লড়াইয়ের পর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে অসমর্থ দেখা যাবে।

লেখক—লড়াইয়ের সময়কার কারবারগুলা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না কেন?

সরকার—বিলাত, জার্মাণি, জাপাণ, আমেরিকা ইত্যাদি সকল দেশের লড়াইয়ের কারবারই প্রায় একরূপ। এই সব কারবার গবর্মেণ্টের পোষ্যপুত্রস্বরূপ। সরকারী চাহিদা জোগানের জন্য এই সব কায়েম হবে। সরকার এই সবের জন্য কয়লা, রসদ ও কাঁচা মাল জোগায়। সরকারী পুঁজিও এই সকল কারবারের সাহায্যে আসে। মায় দরকার হ'লে মজুর জোগাবার ভারও থাকে সরকারী ঘাড়ে। যান-বাহনের ব্যবস্থাও করে সরকার। কারবারগুলা ঠিক যেন সরকারী আফিসের কয়েকটা কর্মকেন্দ্র মাত্র। এই সবকে সত্যিকার কারবার বলা চলে না। (পৃঃ ৫৫১-৫৫২)

লেখক—সত্যিকার কারবার কিরূপ?

সরকার—তাতে কারবারীরা রসদ, কাঁচামাল, পুঁজি, মজুর, যানবাহন আর কেনা-বেচা সব-কিছুর জন্যই প্রতি মুহূর্ত হয়রাণ-পরেযাণ থাকে। তাছাড়া গণ্ডা-গণ্ডা বা ডজন-ডজন কারবারীর পারস্পরিক টক্কর সাম্‌লে চল্‌তে হয় প্রত্যেককে। টক্করে যাঁরা দাঁড়াতে পারে বা দাঁড়াতে চেষ্টা করে তাদেরকেই বলি কারবারী। টক্করহীন কারবার কারবারই নয়। তার কৃতকার্যতাকে স্থায়ী বিবেচনা করা চল্‌তে পারে না।

লেখক—বাঙালী কর্মবীরেরা উন্নতিতে বেড়ে যাবে বল্‌লেন কেন?

সরকার—এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক আর মিস্ত্রীর দল বেড়ে যাবে। কিন্তু পুঁজি-পাটার জোর বাঙালী শিল্পী-বণিক্‌দের হাতে বড় শীঘ্র দেখা দেবে না। কাজেই বহুসংখ্যক বাঙালী কর্মবীরকে ঘায়েল হ'তে হবে। তাতে আফশোস্ নাই। তা সত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চারা শিল্প-বাণিজ্যে দাঁত লাগিয়ে চল্‌তে থাক্‌বে। নয়া-নয়া বাধা-বিঘ্নের ঘাড় মট্‌কাতে লেগে যাবে অনেক বাঙালী এঞ্জিনিয়ার-রাসায়নিক-বেপারী। অবস্থা-মাফিক ব্যবস্থা কর্‌বার ক্ষমতাওয়ালা লোকের কৃতিত্ব দেখা যাবে। বড়-বড় কারবারের মুরোদ নাই ব'লে বাঙালী আলামোহনেরা হাত গুটিয়ে ব'সে থাক্‌বে না। "ত্যাঁদড়", "ভবঘুরে", আর "ডানপিটে"

এই তিনগুণওয়ালা * বাঙালী সর্বদাই শিল্প-বাণিজ্যের আসরে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টায় মোতায়েন থাক্‌বে। বঙ্গ-সমাজে কর্মবীরের স্রোত চিরদিন ব'য়ে চল্‌বে।

মারোআড়ির বাঙালী-বিদ্বেষ

১২ই জুন ১৯৪৪

মন্মথ—আপনি কি মনে করেন যে, মারোআড়িতে আর বাঙালীতে ঝগড়া বেড়ে যাচ্ছে। পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা কর্‌ছে না কি?

সরকার—প্রশ্নটা জটিল। বেপারী মারোআড়িদের সঙ্গে বেপারী বাঙালীদের টক্কর আর আড়াআড়ি চলে। এই টক্কর আর আড়াআড়ি স্বাভাবিক। কিন্তু গোটা মারোআড়ি জাত্‌কে তামাম বাঙালী জাতের শত্রু সম্‌ঝে রাখা ঠিক নয়।

লেখক—মারোআড়িতে-বাঙালীতে বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি?

সরকার—হাজার-হাজার দৃষ্টান্ত বাঙলাদেশের মফস্বলে-মফস্বলে পাওয়া যায়। বাঙালী-মারোআড়ি বন্ধুত্বের অসংখ্য পরিচয় আছে কি জেলায়। তাছাড়া কলকাতার নানা পাড়ার লোকই বাঙালী মারোআড়ি বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখ্‌তে পায়।

লেখক— তাহ'লে মারোআড়ির বাঙালী-বিদ্বেষ আর বাঙালীর মারোআড়ি-বিদ্বেষ সম্বন্ধে আজকাল এতবেশী বলা-কওয়া হয় কেন?

সরকার—বিদ্বেষটা প্রধানতঃ বা একমাত্র বেপারী-মহলে সীমাবদ্ধ। শিল্প-বাণিজ্যে টক্কর অতি ভয়ানক চিজ। কারবারের বেলায় ইংরেজ ইংরেজের দুস্‌মনি করে, মারোআড়ি মারোয়াড়ির দুস্‌মনি করে, বাঙালী বাঙালীর দুসমনি করে। কাজেই বাঙালীরা মারোআড়ির দুস্‌মনি কর্‌লে আর মারোআড়িরা বাঙালীর দুসমনি কর্‌লে চম্‌কে যাবে কেন? শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বীর ধ্বংসসাধন হচ্ছে কারবারী মাত্রের স্বধর্ম। টক্কর আর রেষারেষি কারবারের প্রাণ।

লেখক—বাঙালীরা মারোআড়ি অফিসে কম মাইনে পায় কেন? মারোআড়ি ইত্যাদি জাতের লোকেরা বাঙালী শিল্প-বণিক্‌দের চেয়ে বেশী কর্মদক্ষ নয় কি? মারোআড়ি ইত্যাদি জাতের লোকেরা বাঙালীকে চাক্‌রি দিলে পঞ্চাশ-পঁচাত্তরের বেশী দেয় না। কিন্তু সেই চাকরীর জন্যই অ-বাঙালীকে শ-পাঁচেক বা এমন কি হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়। কেন? এর মানে কী? অ-বাঙালীরা সত্যিসত্যিই অনেক বেশী কর্মদক্ষ কি?

সরকার—জবাব দেওয়া সোজা নয়। হয়ত কিছুটা স্বজাতি-প্রীতি আছে। জলের চেয়ে রক্ত বেশী ঘন। তবে এইরূপ দৃষ্টান্ত কতগুলা বলা কঠিন। বোধহয় কোনো-কোনো মারোআড়ি বেপারী দেশী-বিদেশী সমাজে নিজের ইজ্জদ্‌ বাড়াবার জন্য প্রধান-প্রধান মারোআড়ি কর্মচারীদেরকে উঁচু হারে বেতন দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এসব সার্বজনিক মারোআড়ি রেওয়াজ কিনা সন্দেহ। অপর দিকে শাদা-চামড়াওয়ালাদের ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদি

* এই সকল শব্দের জন্য বিনয় সরকার প্রণীত "নয়া-বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন" (১৯৩২) ও "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) দ্রষ্টব্য।

আফিসেও শাদাদের তুলনায় বাঙালী কেরাণী-কর্মচারীদের অবস্থা শোচনীয়। তাতে বাঙালীর বাচ্চারা সবাই অমন ম্যাড়াকান্ত নয়। মাইনের মাপে কোনো ব্যক্তি বা জাতের কর্মদক্ষতা জরীপ করা যায় না। মাইনে বেশী পায় ব'লেই অ-বাঙালী কর্মচারীরা হাতী-ঘোড়া নয়।

লেখক—মারোআড়িদের বাঙালী-বিদ্বেষ এমন হ'লো কেন?

সরকার—কারণ অতি স্বাভাবিক। ইংরেজরা চায় না যে, ভারতীয় বেপারীরা তাদের সমান হয়। মারোআড়ি বেপারীরাও ঠিক তেম্‌নি চায় না যে, বাঙালী বেপারীরা শিল্প-বাণিজ্যে তাদের সমান হয়। তাদের বিবেচনায় বাঙালীরা এম-এ, এম এস্-সি, ডি-এস্-সি, বি-এল এম-বি ইত্যাদি পাশ কর্‌তে পারে বটে। করুক না পাশ! কিন্তু এরা আর্থিক দুনিয়া বুঝে না। ব্যবসা-বাণিজ্য এদের হাড়ে লাগ্‌বে না। এই ধারণাটা নানা উপায়ে বাঙালী মেজাজে বসিয়ে দেওয়া ইংরেজের ও অন্যান্য শাদাদের দস্তুর। মারোআড়ি বেপারীদের পক্ষেও এইটে বড় ধান্ধা হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া খাঁটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাঙালীর কারবারকে কূপোকাৎ কর্‌বার জন্য মারোআড়িরা হয়ত অনেক-কিছু করে। আশ্চর্যের কিছু নাই। এই বিষয়ে মারোআড়ি আর ইংরেজ একরূপ। এ হচ্ছে ব্যবসার টক্কর। বাঙ্‌লা দেশে বাঙালী শিল্প-বণিকদের কর্তৃত্ব ও স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাধা হচ্ছে মারোআড়ি বেপারী।

লেখক—সব মারোআড়িই কি এতটা বঙ্গ-শত্রু?

সরকার—কোনো জাতের সব-কটা লোকই কি কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রের হয়? আগেই ব'লেছি, আমি মারোআড়িদেরকে বাঙালী জাতের শত্রু বিবেচনা করি না। শুনেছি কোনো কোনো মারোআড়ি খোলাখুলি বলে,—"বাঙালী তোরা রসায়নের এম্-এস্-সি-ই হ' বা এঞ্জিনিয়ারিং-এর পি-এইচ্-ডিই হ'। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ-পঁচাত্তরের জন্য তোরা মারোআড়ি কেরাণী ছাড়া আর কী?" কিন্তু বাঙালীর বেপারী ছোকরারা মারোআড়িদের সম্বন্ধে অন্য ধরণের সাক্ষ্যও দিতে পারে। তাদের অনেকে মারোআড়িদেরকে বাঙালীজাতের গুণগ্রাহী বিবেচনা করে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মারোআড়ি বেপারীরা বাঙালী বেপারীদের বন্ধু, সহযোগী ও মুরুব্বি।

লেখক—মারোআড়িরা লিখিয়ে-পড়িয়েদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কেন?

সরকার—কারণ অতি-সোজা। পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-শ খানেক টাকা দিয়ে লিখিয়ে-পড়িয়েদের বেঁধে রাখা যায় ব'লে। একে বলে পয়সার গরম। এই কারণেই পয়সাওয়ালা বাঙালীরাও লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালীদেরকে মুখ্‌খু, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্‌ঝে থাকে। কিন্তু মারোআড়িদের সমাজে আজকাল দু-একজন উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি পেশার লোক দেখা দিচ্ছে। কাজেই লিখিয়ে-পড়িয়েদের ইজ্জদ ক্রমশঃ মারোআড়ি সমাজে বেড়ে চল্‌বে। বোম্বাইয়ের মারোআড়িরা ইতিমধ্যেই মারাঠা ও গুজরাতি বিজ্ঞানসেবক, এঞ্জিনিয়ার, অর্থশাস্ত্রী ইত্যাদি লিখিয়ে-পড়িয়েদের ইজ্জদ দিতে সুরু ক'রেছে। বাঙলার মারোআড়িরাও অল্পদিনের ভেতরই বাঙালী এম্-এস্-সি, পি-এইচ্-ডি ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবকদেরকে সম্মান কর্‌তে থাক্‌বে।

চাই বাঙালীর সঙ্গে মারোআড়ির আর্থিক সহযোগ

লেখক—আপনার সঙ্গে মারোআড়িদের যোগাযোগ কেমন?

সরকার—এই অধমের সঙ্গে মারোআড়িদের ভাব আছে। তাদের সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য নিম্নরূপ। এমন কি ছেলেবেলায়ই মালদহে মারোআড়িদের সঙ্গে বাঙালীর সহযোগ দেখেছি। নিজের কথা বল্‌তে পারি। কল্‌কাতায় ১৯০১-০৫ সনের যুগে বন্ধুত্ব সুরু। সেই বন্ধুত্ব আজও চল্‌ছে। শুধু মারোআড়ি কেন,—যে-কোনো অ-বাঙালীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত লেন-দেন বন্ধুত্বময়। কারুর সঙ্গে কোনো দিন বনিবনাওয়ের অভাব ঘটে নি। বাঙ্‌লাদেশের বাইরের বহুসংখ্যক অ-বাঙালী আমাকে বেশ বন্ধুভাবে দেখে। আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু ছিল,—জানোই তো,—কাশীর "বিদ্যাপীঠ"-প্রতিষ্ঠাতা, "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ। এই ধরণের আরও "ভাইয়া" আমার আছে অ-বাঙালী ভারতের নানা কেন্দ্রে। শিবপ্রসাদকে আমি "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (দুই খণ্ড ১৯৩৫) উৎসর্গ ক'রেছি। অল্পকিছু দিন হ'লো শিবপ্রসাদ মারা গেছে (২৪ এপ্রিল)। আমার আরেক অ-বাঙালী "ভাইয়া" বিহারের নামজাদা "রাজেন্দর" (রাজেন্দ্রপ্রসাদ)।

লেখক—বাঙালী জাতের পক্ষে মারোআড়িদের বয়কট করা উচিত নয় কি?

সরকার—না, উচিত নয়। বরং মারোআড়িদের সঙ্গে বাঙালীর সহযোগ চালানো উচিত। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মারোআড়িদের সহযোগ না রাখ্‌লে বাঙালী বেপারীদের আর্থিক উন্নতি কঠিন হবে।

লেখক—ব্যবসা-বাণিজ্যে মারোআড়িদের সঙ্গে বাঙালীদের সহযোগ চান?

সরকার—আলবৎ চাই। অনেক বাঙালী বেপারী মারোআড়ির সহযোগিতার দাঁড়িয়ে আছে। মারোআড়ি-মহলে যাদবপুর কলেজের এঞ্জিনিয়ারদের সুখ্যাতি আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালী-মারোআড়ি সহযোগিতা আরও বেড়ে যাওয়া উচিত। তাছাড়া শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে মারোআড়ি-বাঙালী সমঝৌতা আর সহযোগ তো বাঞ্ছনীয় বটেই। ছেলেবেলা হ'তেই আমি বাঙ্‌লায় হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার পছন্দ করি। হিন্দীর মারফৎ বাঙালীর সঙ্গে মারোআড়ির সদ্ভাব কিছু-কিছু বেড়ে যাওয়া সম্ভব। এদিকে নজর রাখা উচিত। মারোআড়িরা আজকাল বিজ্ঞান-গবেষক, রাসায়নিক, খনি-শাস্ত্রী, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি লিখিয়ে-পড়িয়েদের কদর বুঝ্‌তে সুরু ক'রেছে। এইসূত্রে মারোআড়ি-সমাজে বাঙালীর ইজ্জদ্‌ বেশ-কিছু বাড়্‌তে থাক্‌বে।

লেখক—মারোআড়ি বল্‌লে আপনি কী বুঝ্‌ছেন?

সরকার—বর্তমান আলোচনায় একমাত্র মারোআড়ি জনপদের লোককে মারোআড়ি বল্‌ছি না। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের নরনারীও বুঝ্‌তে হবে। তাছাড়া বোম্বাইয়ের গুজরাতি, বোরা (মুসলমান), ভাটিয়া, সিন্ধি—এই চার জাতও "মারোআড়ি" শব্দের অন্তর্গত। এই আট জাতের লোক এক ধরণের নয়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীদেরকে—বিশেষতঃ—কল্‌কাতায়,—প্রধানতঃ এদের সঙ্গে টক্কর দিতে হয়। সহজে এক কথায় মারোআড়ি নাম দেওয়া গেল। সাময়িকভাবে এ একটা পারিভাষিক মাত্র।

লেখক—মারোআড়িদের আপনি বাঙালীজাতের শত্রুও বল্‌ছেন আবার বন্ধুও বল্‌ছেন। বুঝা যাচ্ছে না।

সরকার—দুনিয়া বড়ই জটিল। বাঙালী মাত্রেই বাঙালী বন্ধু কি? কোনো বাঙালী

কোনো বাঙালীর শত্রু নয় কি? বড়-বড় বাঙালী বেপারীরা ছোটো-খাটো, ছোকরা বা নয়া বাঙালী বেপারীকে হাতে ধ'রে মানুষ কর্‌তে রাজী হয় কি? বাঙালীতে-বাঙালীতে ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্বাণিজ্য ফ্যাক্টরির কারবারে টক্কর চলে না কি? বাঙালীরাই বাঙালীদেরকে ব্যবসা-ক্ষেত্রে শত্রু ভাব্‌তে অভ্যস্ত। মারোআড়িরাও বাঙালীদেরকে টক্করের বেলায় শত্রুভাবে দেখে। তাতে আশ্চর্যের কী আছে? শত্রুদেরকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য যা-কিছু করা আবশ্যক, মারোআড়ি বেপারীরা বাঙালী বেপারীরা বাঙালী বেপারীদের বেলায় ঠিক তাই করে। এমন কি এক মারোআড়ি আর এক মারোআড়ির সঙ্গে কারবারের টক্করে বন্ধুভাবে ব্যবহার করে না,—শত্রুভাবেই ব্যবহার করে। কল্‌কাতার মারোআড়িতে-মারোআড়িতে লড়াই চলে কি কম? ইংরেজ কোম্পানীতে ইংরেজ কোম্পানীতে আড়াআড়ি বহরে বা আকারে-প্রকারে কম কি?

লেখক—আপনার সঙ্গে কোনো মারোআড়ির অসদ্ভাব ঘটেনি কেন?

সরকার—সোজা কথা, পেশায় আমি বৈশ্য নই—হয়ত ব্রাহ্মণ। মারোআড়িরা বৈশ্য। আমি ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্য-ফ্যাক্টরী ইত্যাদি সংক্রান্ত কারবারের বেপারী নই। এই সকল বিষয়ে মোল্লাগিরি করা আমার পেশা। মামুলি পড়ুয়া লোকের সঙ্গে কোনো বেপারী লোকের শত্রুতা হবে কেন? আমার মতন মামুলি লিখিয়ে-পড়িয়ের কাজকর্মের লক্ষ্য সর্বজনিক স্বার্থ-পুষ্টি। তাতে দেশবন্ধু লোকের উন্নতির সম্ভাবনা। এতে মারোআড়ি, অ-মারোআড়ি, বাঙালী, অ-বাঙালী সকল জাতের আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমার সঙ্গে মারোআড়িদের কোনো কর্মক্ষেত্রে টক্কর নেই। এই জন্য তাদের পক্ষে আমার বন্ধু এমনকি মুরুব্বি হওয়া সহজ হ'য়েছে। বৈশ্যরা আমাকে বামুন সম্‌ঝে থাকে,—দুধ-কলাও খেতে দেয়!

মারোআড়িরা অন্যতম বাঙালী বণিক্

লেখক—আপনি তো পাঁচ-সাত রকমের ভারতীয় জাত্‌কে মারোআড়ি বল্‌ছেন। খাঁটি মারোআড়িদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—বাঙলা দেশে আমরা অন্যান্য ভারতবাসীর চেয়ে মারোআড়ের লোকজনকে বেশী চিনি। তারাই সত্যিকার মারোআড়ি। এই ধরণের আসল মারোআড়িরা বাঙ্‌লাদেশের শহরে-মফস্বলে বসবাস কর্‌ছে অনেককাল ধ'রে। জগৎ শেঠের আমল থেকে,—তার আগে থেকেও,—আজ পর্যন্ত মারোআড়িরা বঙ্গবাসী। এই জন্য মারোআড়িদেরকে আমি অ-বাঙালী বলি না। এরা বাঙালী হ'য়ে গেছে।

লেখক—দেখ্‌ছি আরেকটা অদ্ভুত রকমের "বিনয়-সরকারী" মত চালালেন। মারোআড়িরা অবাঙালী নয়,—বাঙালী?

সরকার—তাই তো বল্‌ছি। বাঙ্‌লাদেশের মারোআড়িরা সত্যি-সত্যিই বাঙালী। এরা বাংলা বুঝে, অনেকে কথা বলে বাংলা। কেহ-কেহ কাপড়-চোপড় পরে বাঙালী কায়দায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে। মারোআড়ি মেয়েদের ভেতর বাঙালী সাড়ী কিছু-কিছু চালু হচ্ছে। পুরুষেরা কেউ-কেউ চালায় বাঙালী কোঁচা, বাঙালী টেঁড়ি। তার ওপর মারোআড়ি-পরিবারে চলে কৃষ্ণ, রাধা, রাম, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা-পার্বণ। বাঙালী

বৈষ্ণবদেরই মতন মারোআড়ি জাত্ সাধারণতঃ মাছ-মাংস-ডিম খায় না। তবে দু'চার জন লুকিয়ে-চুরিয়ে সব-কিছুই খায়। কোনো-কোনো মারোআড়ি ষোল আনা আধুনিক। বিদেশী হোটেলে খেতে ব'সে তারা লুকোচুরি করে না। কাজেই বাঙালীতে-মারোআড়িতে কোনো প্রভেদ ঢুঁড়ে পাই না। হাড়-মাস এদের বাঙালী হ'য়ে গেছে। এদের হাসি-ঠাট্টা-কায়দা-কানুনের অনেক-কিছুই বাঙালী। রোটারি ক্লাবের মারোআড়ি সভ্যদেরকে আমার পক্ষে বাঙালী ছাড়া আর কিছু ভাবা অসম্ভব।

লেখক—মারোআড়িরা বাঙালীদের কাজে সাহায্য করে কি?

সরকার—শ'-দেড়-দুই বছর ধ'রে মারোআড়িরা বাঙালীর বাচ্চার অসংখ্য প্রকারের কাজকর্মে বাঙালীর বাচ্চার মতনই মেতেছে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্বন্ধে বাঙালীজাতের এমন কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দেখি না, যাতে মারোআড়ির "ধন-মন-তন" দিয়ে সহযোগিতা দেখা যায় নি। গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের সময় (১৯০৫) আর তার পরবর্তী বছর চল্লিশেকের ভেতর মারোআড়িরা কোন্ আন্দোলনে যুবক বাঙ্লাকে এক্লা ফেলে আল্‌গা হ'য়ে র'য়েছে? বাঙালীতে মারোআড়িতে প্রভেদ আমার চোখে মালুম হয় না।

লেখক—একদম কোনো প্রভেদ নাই?

সরকার—ভেবে হিসেব ক'রে প্রভেদটা আবিষ্কার কর্‌তে হবে। হাঁ, বল্‌বো যে, বিয়ের জন্য মারোআড়িরা সময়ে-সময়ে বিকানীর পর্যন্ত ধাওয়া করে। বাঙালীর সঙ্গে মারোআড়ির বিয়ের যোগাযোগ নাই। কিন্তু তাতেও মারোআড়িরা অ-বাঙালী প্রমাণিত হয় না।

লেখক—কেন অবাঙালী নয়?

সরকার—বাঙালী মুসলমানেরা কি বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে ক'রে? বিয়ে-করা-না-করার উপর বাঙালীত্ব নির্ভর করে না। যে-কোনো বাঙালী হিন্দু কি যে-কোনো বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে করে? বাঙালী সমাজে বিয়ের জন্য জাত্-পাত্ হয়ত ডজন-ডজন। বাঙালীর সমাজের এই সব ডজন-ডজন জাতপাঁতের অন্যতম জাতপাঁত হচ্ছে মারোআড়ি। বৈদ্যরা বৈদ্যর সঙ্গে বিয়ে করে। কিন্তু তবুও তারা বাঙালী। সাহারা সাহাদের বৈদ্যর সঙ্গে বিয়ে করে, তবুও তারা বাঙালী। মারোআড়িরা মারোআড়ির সঙ্গে বিয়ে করলে, ভাঙালি থাক্‌বে না কেন?

লেখক—আপনি দেখ্‌ছি ভাবিয়ে তুল্‌লেন। দেশশুদ্ধু লোকে মারোআড়িদেরকে অ-বাঙালী বল্‌ছে। আর আপনি বাঙালী সমাজের একটা নয়া জাত্ আবিষ্কার কর্‌লেন মাবোআড়িদের ভেতর?

সরকার—কী কর্‌বো, ভায়া? সকলেই জানে,—আমি আনাড়ি, মুখ্‌খু লোক। আমার বিবেচনায় বাঙালীর মারোআড়ি-বিদ্বেষ নেহাৎ যুক্তিহীন। মারোআড়িদের ট্যাঁকে পয়সা আছে। এই কারণেই কি বাঙালীর পক্ষে মারোআড়ি জাত্‌কে হিংসা করা উচিত? তাহ'লে বাঙালীরা তিলি জাত্‌কে হিংসা করে না কেন? তিলিরাও তো পয়সাওয়ালা জাত্। তাদেরকে হিংসা করা উচিত নয় কি? সাহা, গন্ধবণিক্ ইত্যাদি বাঙালী জাত্‌গুলাও ধনী। বাঙালীরা তাদের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন চালু কর্‌ছে না কেন? যে-কোনো পয়সাওয়ালা বাঙালী বৈশ্যকে অবাঙালী বলা কিরূপ যুক্তি?

লেখক—আপনার যুক্তি কী?

সরকার—আমার বক্তব্য সোজা। মারোআড়িরা, গন্ধবণিক্, তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক্

ইত্যাদি পুঁজিশীল বণিক্‌জাতের মতনই অন্যতম বাঙালী বণিক্। এরা সবাই বৈশ্য বাঙালী।

লেখক—আপনার মত বাঙ্‌লাদেশে চল্‌বে কি?

সরকার—আমি গরীব মানুষ। আমার কোন্ মতটাই বা চলে? মারোআড়িদেরকে বাঙালী সমাজের অন্যতম শিল্পদক্ষ ও বাণিজ্যদক্ষ জাত্ সম্‌ঝে রাখা বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনুর পক্ষে যার-পর-নাই জরুরি। মারোআড়িকে অবাঙালী সম্‌ঝে চলা বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে চরম আহাম্মুকি। ("বিংশ শতাব্দীর মনু", ৫৩৩-৫৩৫ পৃষ্ঠা)

লেখক—মারোআড়ি * সম্বন্ধে আপনার পাঁতি দেখ্‌ছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পাঁতির ঠিক বিপরীত।

সরকার—কী করা যাবে? লোকেরা আমাকে গরু ব'লে জানে। যে-কোনো পণ্ডিতের বিপরীত-পন্থী হওয়া আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। একেই বলে গরুমি।

১৯৪৩-এর মন্বন্তর (পঞ্চাশের মন্বন্তর)

২২শে জুন ১৯৪৪

মন্মথ—বর্তমানে বাঙ্‌লাদেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার চল্‌ছে। এ সম্বন্ধে আপনি কী বুঝ্‌ছেন?

সরকার—বুঝ্‌বো আর কী? তুমি নিজেই কম বুঝ্‌ছো কি? আমি নিজে হাড়ে-হাড়ে ভুগ্‌ছি। কাপড়ে তালি লাগিয়েছি দশ জায়গায়। দেখ্‌তেই পাচ্ছো। খদ্দরের পাঞ্জাবীর পিঠকে পিঠ, হাতাকে হাতা, আর কোমরকে কোমর সবই কাঁথা-শেলাইয়ের দশায় এসে পৌঁছেছে। তিনচার বছর আগেকার ছাতায় তালি দিয়ে কাজ চালাচ্ছি। ছাতাটা হ'য়ে প'ড়েছে চারখানা-ছিটের সামিয়ানা। মাছের সের দেড়-দুই-আড়াই টাকা। মাংসের সের টাকা তিনেক। দুধ, ঘী, কয়লা, চাল-ডাল, চিনি—যে-দিকেই তাকাই দাম পাঁচ-সাতগুণ চ'ড়েছে। ওষুধের দাম চ'ড়েছে অসীম। কাজেই দুর্ভিক্ষের হাহাকার আজকে আর অর্থনৈতিক গবেষণার চিজ নয়। নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ধারণের ঘটনা,—আটপৌরে কথা। এসব জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নাই।

লেখক—বাড়ীঘর ঝাড় দিচ্ছেন তো আপনারা নিজেরাই দেখ্‌ছি। ধোআ-ঝাড়ার লোকজন কোথায় গেল?

সরকার—শুধু ধোআ-ঝাড়া কেন, পায়খানা পরিষ্কারও নিজেরাই কর্‌ছি নিজ হাতে। রান্না করার লোক আজ আছে, কাল নাই। এও মন্বন্তরের আর এক দিক্।

লেখক—আজকাল লোকজনের অভাব এত বেশী কেন?

সরকার—ঠাকুর-চাকরেরা পল্টনি ব্যারাকে নক্‌রি পাচ্ছে দেদার। পনর-বিশ-পঁচিশ টাকা যারা গেরস্থ-ঘরে পেতো, তারা সরকারী ফৌজের আড্ডায় পাচ্ছে পঞ্চান্ন-পঁয়ষট্টি-সত্তর। পাঁচ-সাত টাকার ছোক্‌রাদেরকেও পল্টনের কর্তারা নক্‌রি দিচ্ছে মাসিক পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে। তার ওপর পল্টনি খাবার পাচ্ছে। বড়-গোছের চুরি-ছ্যাঁচ্‌ড়ামির

* মারোআড়ি সম্বন্ধে বিনয় সরকারের "নয়া বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন" (১৯৩২) ও "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) দ্রষ্টব্য।

সুযোগও জোটে বেশী-বেশী। কাজেই মামুলি গেরস্থ'র বাড়ীতে লোক খাট্‌বে কেন?

লেখক—মফস্বলের মন্বন্তর সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন?

সরকার—নিজ চোখে কিছু দেখিনি। কল্‌কাতার অবস্থা দেখে কিছু-কিছু আন্দাজ কর্‌তে পারি। নিজ-চোখে যারা দেখে এসেছে তাদের কাছ থেকেও খবর পেয়েছি।

লেখক—কিরূপ মনে হয়?

সরকার—মনে আর কী হবে? অবাক হ'য়ে যেতে হয়। কল্‌কাতায় নিজেরা যা ভুগ্‌ছি বা যা দেখ্‌ছি সে-সব মফস্বলের তুলনায় বিলাস-বিশেষ। দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি আর মড়ক চরমমাত্রায় দেখা দিয়েছে। আগে তা কল্পনাও করা যেতো না। চোখে দেখ্‌লে মাথা ঠাণ্ডা রাখা অসম্ভব। মাথা ঠিক রেখে সে-সব সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে বসা চল্‌তে পারে না। নেহাৎ হৃদয়হীন না হ'লে বোধ হয় এই দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চালানো অতি-কঠিন। মায়ের কবরের ওপরকার তরুলতা সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের গবেষণা যা, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর নিয়ে লেখাপড়া করা ঠিক যেন তাই।

লেখক—ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের বাইরে নজর ফেলে দেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—গত বছর মাস-চারেক ধ'রে (আগস্ট-নবেম্বর, ১৯৪৩) কল্‌কাতার বুকের উপর হাজার পঞ্চাশেক হাভাতে-হাঘ'রে দুর্দশার তাণ্ডব দেখিয়ে গেল। এই হচ্ছে মন্বন্তরের এক দৃশ্য। মফস্বলের জেলায়-জেলায় না খেতে পেয়ে ম'র্‌ছে আর ম'রেছে কতলোক? কেউ বলে সাত লাখ, কেউ বলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ লাখ, কেউ বলে আর কিছু। যাই-হোক, দুর্দশা অসীম। মন্বন্তরের আর এক তথ্য এই দিকে।

লেখক—এই সকল বিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান কিছু হচ্ছে কি?

সরকার—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক করুণাময় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারো। মফস্বলের নানা জেলায় গিয়ে কয়েকমাস কাটিয়ে এসেছে। খুঁটে-খুঁটে তথ্য সংগ্রহের মেজাজ ছিল করুণার। কোন্ জেলায় কতগুলা চাষী জমিজমা বেচে ফেল্‌তে বাধ্য হ'য়েছে তার হিসাবও কিছু-কিছু পাওয়া যাবে। করুণার খোঁজগুলা ছাপা হ'লে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার একটা দলিল খাড়া হ'তে পারে।

লেখক—কল্‌কাতার অবস্থা সম্বন্ধে কোনো খোঁজ হ'য়েছে?

সরকার—কল্‌কাতার বিভিন্ন পাড়ায় ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো হ'য়েছে। বোধ হয় হাজার পাঁচেক নানা বয়সের হিসাব পাওয়া যায়। তাদের ওজন, বুক, চোখ, জীবনী-শক্তি, ব্যাধির ঝোঁক ইত্যাদি বিষয়ক মাপজোক টুকে রাখা হ'য়েছে। বেশ বুঝা যায় যে, মাছ, দুধ, চিনি, ঘী, চাল-ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যে আপেক্ষিক অভাবের দরুণ ছাত্রদের স্বাস্থ্যে ও শক্তিতে ঘাট্‌তি দেখা দিয়েছে।

লেখক—এসব খবর কোথায় পাওয়া যায়?

সরকার—ডাক্তার ও নৃতত্ত্বশাস্ত্রী অনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-মঙ্গল বিভাগের কর্তা। তাঁর অনুসন্ধান-গবেষণার অন্তর্গত এই সব মাপ-জোক। তথ্যগুলা ছাপা হ'লে লোকজনের চোখ ফুট্‌বে।

লেখক—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক ইত্যাদির প্রভাবে বাঙালীজাতের ভবিষ্যৎ কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—১৯৪২ সনের পর যে-সব ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে তাদের কৈশোরে আর

যৌবনে বেশ-কিছু শারীরিক অসুস্থতা আর দুর্বলতা দেখা যাবে। তারা জ'ন্মে অবধি দুধ পাচ্ছে না। তাছাড়া ছেলেবেলার খাদ্যাভাবও পরবর্তী জীবনে তাদেরকে অনেকখানি কাবু ক'রে রাখ্‌বে। ব্যারামে ভুগ্‌তে হবে তাদেরকে বেশী-বেশী। অকালমৃত্যুও ঘট্‌বে অনেকের। ১৯৫০-৬০ সনের ব্যাধি-মৃত্যুর বেশ-একটা বড় হিস্যার জন্য দায়ী থাক্‌বে আজকের দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ক। মন্বন্তরের প্রভাব বহুকাল ধ'রে দেখা যাবে।

লেখক—১৯৪৩ সনের মড়ক বাঙালী জাত্‌কে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছে না কি?

সরকার—না। সাময়িক দুর্যোগ-দুঃখ-কষ্ট হিসাবে বাঙালীরা এই মন্বন্তর আর মন্বন্তরের প্রভাব স'য়ে চল্‌বে। এই সব দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ককে লড়াইয়ের "পরোক্ষ খর্চা" সম্‌ঝে রাখা উচিত।

লেখক—লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা কী?

সরকার—যে-কয় লাখ লোক লড়াইয়ের মাঠে-আকাশে-দরিয়ায় মারা যায় আর যে-কয়খানা বাড়ীঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় একমাত্র সেই সব লোক আর বাড়ীকে লড়াইয়ের খর্চা বুঝে রাখা ঠিক নয়। প্রত্যেক লড়ুয়া দেশের অবস্থা প্রায় একরূপ। লড়াইয়ের মরালোক আর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তি তাদের একমাত্র খর্চা নয়। আরও লাখ-লাখ, কোটি-কোটি লোক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘরোআ জীবনে কষ্ট পাচ্ছে। (পৃঃ ৫১১-৫১২)

লেখক—অন্যান্য দেশের অবস্থাও এইরূপ কি?

সরকার—জার্মাণি, জাপান, রুশিয়া, মার্কিণ মুল্লুক, বিলাত,—সকল দেশেই বে-সামরিক বা অ-সামরিক নর-নারীর দুঃখকষ্ট আজ অসীম। আমরা গরীব জাত্। এইজন্য আমাদের ব্যাধি আর লোক-মড়ক এবং দুর্ভিক্ষের আকার-প্রকার আপেক্ষিক ভাবে বেশী। কিন্তু মোটের ওপর আমাদের সঙ্গে তুলনায় ওসব দেশের লোকেরা লড়াইয়ের যুগে নেহাৎ সুখে-স্বচ্ছন্দে নাই। তারাও ভুগ্‌ছে দস্তুর মতন।

লেখক—তা হ'লে বাঙালী সমাজে মন্বন্তরের প্রভাব শেষ পর্যন্ত কিরূপ দাঁড়াবে?

সরকার—১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের প্রভাব বিলাত, ফ্রান্স, জার্মাণি, ইতালি, রুশিয়া ইত্যাদি দেশ কাটিয়ে উঠেছিল বছর দশ-পনর'র ভেতর। ১৯৩৯ সন আস্‌তে-না-আস্‌তেই সব-কয়টা দেশ আবার চাঙ্গা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের জন্য। বছর বিশেকও লাগেনি পুনর্জীবন বা পুনর্যৌবন কায়েম ক'র্‌তে। অথচ দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ক ধরণের দুঃখকষ্ট ও-সকল দেশে প্রথম কুরুক্ষেত্রের যুগে আর প্রভাবে কম ঘটেনি। দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের পরও অবস্থা মোটের উপর দাঁড়াবে সেইরূপই।

লেখক—আপনি কি বল্‌ছেন যে, ১৯৪৩-এর মন্বন্তরও বাঙালী সমাজ বছর দশ-বিশের ভেতর কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে?

সরকার—ঠিক তাই। বছর দশ-পনর-বিশ যেতে-না-যেতেই দুনিয়ায় পাঁয়তারা সুরু হবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের। তার আগেই বাঙ্‌লাদেশও বেশ-কিছু সেজেগুজে দাঁড়াতে পার্‌বে। আমাদের সেকালে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" ঘ'টেছিল। ১৭৭০ সনের ঘটনা। কিন্তু সেই মন্বন্তরের বিশ-পঞ্চাশ-শ-দেড়শ' বছর পর কী দেখ্‌ছি? ১৮৮৫ সনের বাঙালী, ১৯০৫ সনের বঙ্গ-বিপ্লব, আর তার পরবর্তী বাড়্‌তির পথে বাঙালী।

লেখক—লাখ-লাখ লোকের মৃত্যু-সত্ত্বেও আপনি বাঙালী জাতের বাড়্‌তি দেখ্‌তে

পাচ্ছেন। কথাটা খুব নিষ্ঠুর শুনাচ্ছে না কি?

সরকার—শুনাচ্ছে শুধু নয়। সত্যি-সত্যি অতি-কঠোর, অতি-নিষ্ঠুর। মনে করো,—আমি মারা গেলাম। এতে কল্‌কাতার কী আসে যায়? বাঙ্‌লাদেশের কী আসে যায়? আমার মতন ছ-কোটি লোক র'য়েছে বাঙ্‌লাদেশে। তেম্‌নি ধরো তুমি মারা গেলে। এতে কার কী গেলো-এলো? তেম্‌নি দশ-বিশ হাজার বা দশ-বিশ লাখ লোক মারা গেছে। এতে বাঙ্‌লাদেশের ক্ষতিবৃদ্ধি কোথায়? ছ-কোটি লোকের গুন্‌তিতে এসব কিছুই নয়। মানুষ আবার জন্মাবে। এসব হচ্ছে কেঠো, তেতো, নির্ম্মম সত্য। এই সব ব্যারাম আর মৃত্যু কতকগুলা নিরেট ঘটনামাত্র। কিন্তু এসব হৃদয়হীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর শোনায় কারু-না-কারু কানে।

লেখক—কার কানে নিষ্ঠুর শোনায়?

সরকার—আমি মারা গেলাম। এই ঘটনায় কার প্রাণ ভাঙ্‌বে? আমার স্ত্রীর আর মেয়ের। এই সংবাদ নিষ্ঠুর শোনাবে আমার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে। তুমি মারা গেলে কষ্ট পাবে তোমার পরিবারের লোক। তেমনি এই-যে লাখ-লাখ ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-নারী কষ্ট পেয়েছে, ব্যারামে ভুগেছে, মারা গেছে, তাতে দুঃখ পেয়েছে তাদের নিজ-নিজ আত্মীয়-স্বজন। তাদের কানে এইস সব সংবাদ নিরেট সংবাদমাত্র নয়, নির্দয় সংবাদ।

লেখক—এইবারকার মন্বন্তর-সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যের মারফৎ কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যাবে কি?

সরকার—বেশ-কিছু। হেমচন্দ্রের সময়কার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁর কবিতা আছে। সেই কবিতাটা একালের মন্বন্তর-বিষয়ক কবিতা ও গল্পগুলার পাশে নেহাৎ সাদা-সিধে।

লেখক—কেন? আজকালকার মন্বন্তর বাঙালী লেখকদেরকে জোরে ঘা মেরেছে কি?

সরকার—নিশ্চয়। অমিয় চক্রবর্ত্তী, সজনী দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি কবিদের রচনায় চরম দরদ আছে। এই সকল কবিতা সম্বন্ধে একটা সন্দর্ভ বেরিয়েছে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখা। আনন্দবাজার পত্রিকার দোল সংখ্যাটা (১৯৪৪ মার্চ)—দেখ্‌তে পারো। প্রবন্ধের নাম "কাব্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর"। ঐ সংখ্যায় দেখ্‌ছি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত'র "শেষ চিঠি"। গল্পটা দারুণভাবে কষ্টদায়ক। অবস্থাগুলা সৃষ্টি করা হ'য়েছে অতি নিপুণভাবে। এই সংখ্যায় মন্বন্তর-বিষয়ক অন্যান্য গল্পও আছে। তারাপদ রাহার "মাস্টার", আর সজনী দাসের "আধুনিক দোলতত্ত্ব" মন্বন্তরেরই নানা চিত্র সাম্‌নে ধ'রেছে।

লেখক—আর কিছু উল্লেখযোগ্য পেয়েছেন?

সরকার—তারাশঙ্করের উপন্যাস বেরিয়েছে "মন্বন্তর" নামে (১৯৪৪)। তার ভেতর ১৯৪২-৪৩ এর বঙ্গ-সমাজ কেটে-ছিঁড়ে দেখানো হ'য়েছে। প্রবোধ সান্যালের "অঙ্গার" (১৯৪৪) নামক গল্পের বইয়ে মন্বন্তর মূর্ত্তি পেয়েছে। তাছাড়া আছে শ্যামাপ্রসাদের "পঞ্চাশের মন্বন্তর" (১৯৪৩)। এটা অবশ্য গল্পের বই নয়। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার সমসাময়িক ইতিহাস হিসাবে এটা চল্‌বে বেশ-কিছু কাল। কতকগুলা সরকারী কাজের সমালোচনা হিসাবেও এই বইয়ের কিস্মৎ থাক্‌বে ঢের,—অনেক দিন পর্যন্ত।

মন্বন্তরের যুগে সুখে র'য়েছে কারা?

লেখক—মন্বন্তরের পরবর্তী পুনর্জীবন বা পুনর্যৌবনের কোনো লক্ষণ আজকালকার বাঙলাদেশে দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—আগে ব'লেছি,—আমি নিজে ভাত-কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছি। আর আমার মতন বহুসংখ্যক লোক এই কারণে কষ্ট পাচ্ছে। লাখ-লাখ লোক তো মারাই প'ড়েছে। কিন্তু গোটা বাঙালী জাত্‌ কষ্ট পাচ্ছে কি? তা নয়, প্রধানতঃ কষ্ট পাচ্ছে বাঁধা-মাইনের লোকেরা। চাষীদের অবস্থা ভিন্ন-ভিন্ন জেলায় ভিন্ন-ভিন্ন। এককথায় তাদের আর্থিক অবস্থা বাৎলানো অসম্ভব। যে-সকল চাষী শেয়ানা তারা ধান-চাল ষোলআনা বেচে ফেলে নি। তারা অনেকেই মন্বন্তরের যুগেও কষ্ট পাচ্ছে না। কারখানার মজুরেরা সুখে আছে। আর সুখে আছে নতুন-নতুন শ্রেণীর অসংখ্য লোক।

লেখক—তারা কারা?

সরকার—সরকারী তাঁবে অগণিত ছোট-বড় -মাঝারি কারখানা কায়েম হ'য়েছে। এই সকল কারবারের সঙ্গে যে-সকল বাঙালীর যোগা যোগ আছে তারা সকলেই মন্বন্তরের যুগকে ভাব্‌ছে স্বর্ণযুগ। তারা লড়াইয়ের শেষ আর চায় না। তাদের একমাত্র ধ্যান-ধারণা হ'চ্ছে—"চলুক লড়াই দুশ' বছর, থাক্‌বো আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে।"

লেখক—বাস্তবিক পক্ষে এমন লোক বাঙালী সমাজে আছে কি?

সরকার—বেপারী, শিল্পী, কারখানা-পরিচালক ইত্যাদি লোকেরা সংখ্যা মারোআড়ি, গুজরাতি, ভাটিয়া, পার্শী ইত্যাদি জাতের ভেতর বেশী। তাদের অনেক লক্ষপতি ছিল,—লড়াইয়ের শিল্প-বাণিজ্যের মরশুমে এই সকল জাতের ভেতর গণ্ডা-গণ্ডা বা ডজন-ডজন ক্রোরপতি দাঁড়িয়ে গেছে। বাঙালী জাত্‌ ব্যবসা-বাণিজ্যে হাতেখড়ি দিচ্ছে মাত্র। আমাদের কেউ ক্রোরপতি হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। দু'একজন হয়ত' হয়েছে। কিন্তু লড়াইয়ের হিড়িকে লাখপতি হ'য়েছে কয়েক গণ্ডা বা কয়েক ডজন বাঙালীর বাচ্চা। তারা কি এই যুগকে মন্বন্তরের যুগ বল্‌ছে? বলা অসম্ভব। তারা ধরাখানাকে সরা জ্ঞান কর্‌ছে। জীবনে এমন সুখ তারা আর কখনো চেখে দেখে নি। মামুলি আড়াই টাকার সাড়ীও তারা আনন্দে কিন্‌ছে পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ টাকায়। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকার জুতো তাদের হিসাবে মুড়ি-মুড়কি বিশেষ।

লেখক—শিল্প-বাণিজ্যের কর্মক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো দিকে বাঙালীরা এই যুগে সুখে আছে কি?

সরকার—গর্বমেন্টের মর্জি-মাফিক প্রচার চালাবার জন্য লোক দরকার হয় হাজার-হাজার। বিলাতে, আমেরিকায়, জার্মাণিতে, জাপানে সর্বত্রই জরুরি—প্রচারক। লড়াইয়ের সময় প্রপাগান্ডা বা প্রচার বিভাগের জন্য দুনিয়ার সকল দেশে খরচ হয় অর্বুদ-অর্বুদ টাকা। ভারত-সরকারের ব্যবস্থায় খরচ হ'চ্ছে কত রূপেয়া কে জানে? সরকারী মেজাজ-মাফিক কাজের জন্য বাঙলাদেশে বাহাল আছে স্ত্রী-পুরুষ। গুন্‌তিতে তারা কত কে বল্‌তে পারে? কেউ গাল্পিক, কেউ কবি, কেউ সাংবাদিক, কেউ অধ্যাপক, কেউ গায়ক, কেউ রেডিও-বক্তা ; কেউ বিমান-আক্রমণ-বিরোধী বিভাগের কর্মচারী। এই সকল শ্রেণীর চাক্‌রে আগে ছিল না। অনেক বাঙালী নক্‌রি পেয়েছে,—সুখে আছে তারা সকলে।

লেখক—মন্বন্তর সম্বন্ধে এদের ধারণা কিরূপ?

সরকার—এই সকল স্ত্রী-পুরুষের অনেকেই বেশ-কিছু দাঁও মেরে নিচ্ছে। এদের পরিবারে দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়কের কোনো চিহ্নোৎ নাই। মন্বন্তরকে এরা "সর্বনাশ" বলে না,—বলে "পৌষমাস"। চলুক মন্বন্তর, কুছ পরোআ নাই, থাক্‌বে এরা সুখে। "সার্বজনিক" সুখ-দুঃখ দুনিয়ায় খুবই বিরল।

লেখক—মন্বন্তর জিনিষটা তাহ'লে সার্বজনিক নয়?

সরকার—ঠিক কথা। সুখ-দুঃখ চিজটা ব্যক্তিগত করবার, শ্রেণীগত ঘটনা। "দেশ-শুদ্ধু" লোকের সার্বজনিক সুখও নাই, সার্বজনিক দুঃখ নাই। কাজেই যখন-তখন বাঙালী জাতের সর্বনাশ কল্পনা করা আহাম্মুকি। মন্বন্তরের যুগেই লাখ-লাখ লোক সুখে র'য়েছে।

লেখক—শুনেছেন বোধ হয় যে, দিল্লীর কেন্দ্র-সরকার থেকে মানব রায় মাস-মাস হাজার পনর টাকা পায়,—মজুর-মহলে প্রচার চালাবার জন্য? কিছুদিন হ'লো (৫ এপ্রিল, ১৯৪৪) কাগজে খবরটা বেরিয়েছে।

সরকার—আমি শুনিনি। দৈনিক কাগজের খবরাখবর সম্বন্ধে এই অধম চিরকালেই ম্যাড়াকান্ত। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ধার ধারি না। এই জন্য দৈনিক সংবাদ কাজে লাগে না।

লেখক—কমিউনিস্টরা নাকি অনেকই সরকারী চাক্‌রে?

সরকার—ভায়া, তাও বল্‌তে পারি না। কমিউনিস্টদের কমরেড্‌রা তো সব জেলের বাসিন্দা। তারা আবার সরকারী লোক হ'লো কী ক'রে?

লেখক—কমিউনিস্টদের একদল আছে জেলে। শুনা যায়, আর একদল সরকারী লোক।

সরকার —দেখা যাচ্ছে,—এই অধমের বহুত্ব-নীতি বঙ্গীয় কমিউনিস্ট সমাজেও ভাঙন ধরিয়েছে। বুঝা গেল, সরকারী কমিউনিস্টরা দুধে-ভাতে আছে। মন্বন্তরের যুগে অন্যতম সুখীর দল তাহ'লে "কমরেড্‌রা"। তাহ'লে আবার প্রমাণিত হ'লো যে, দেশশুদ্ধু লোকের সর্বনাশ ঘট্‌ছে না। টাকার মুখ অনেক লোক দেখ্‌ছে। কাজেই খাওয়া-পরায় স্বচ্ছন্দ জীবন চল্‌ছে বহু পরিবারের। এদের কেউ-কেউ পরবর্তীকালে নয়া-নয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে-শিল্প-সঙ্গীতের স্রষ্টা দাঁড়িয়ে যাবে।

দারিদ্র-সত্ত্বেও বাঙালীর বাড়্তি

২৬শে জুন ১৯৪৪

মন্মথ—বাঙালী জাতের দারিদ্র কি বাড়্তির পথে নয়?

সরকার—না। বাঙালীর দারিদ্র বেড়ে চ'লেছে এরূপ বিশ্বাস কর্‌বার কারণ নাই,—হয়ত' ঘাট্‌তির পথে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালী জাত্‌গরীব। বাঙালীর দারিদ্র অনেকদিন থাক্‌বে।

লেখক—আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

সরকার—প্রত্যেক দেশেই অধিকাংশ লোক গরীব, অল্পসংখ্যক লোক মাত্র ধনী। বাঙলাদেশেও অবস্থা তাই। কিন্তু বিলাত, ফ্রান্স, জার্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে মাথা-পিছু লোকজনের আয়, জীবন-যাত্রা, খাওয়া-পরার মাপকাঠি বেশ-কিছু উঁচু। আমাদের

দেশে মাথাপিছু বাঙালী জাতের আয়, জীবন-যাত্রা, খাওয়া-পরার মাপকাঠি বেশকিছু নীচু। এরই নাম বাঙালীর জাতের দারিদ্র।

লেখক—বাঙালী জাতের এই দারিদ্র কম্‌ছে বল্‌লেন কেন?

সরকার—মাথা-পিছু বাঙালীর জীবন-যাত্রা বাড়্‌ছে একথা প্রমাণ করা সম্ভব, কম্‌ছে একথা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যদি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সব প্রমাণ দারিদ্রের বাড়্‌তির দিকে নয়, জীবন যাত্রার বাড়্‌তির দিকে। ১৭৫৭ হ'তে ১৮৫৭ পর্যন্ত মাথা-পিছু বাঙালীর জীবন-যাত্রা বা খাওয়া-পরা কিরূপ ছিল পরিষ্কাররূপে জানা নাই। কাজেই সেই একশ' বছর বাঙালীর সম্পদ্ বেড়েছিল কি দারিদ্র্য বেড়েছিল প্রমাণ করা অসম্ভব অথবা খুবই কঠিন। এ-হচ্ছে খুঁটে-খুঁটে সংখ্যা-প্রয়োগের কারবার। সর্বত্র চাই গড়পড়তা হিসাব। কিন্তু ১৮৫৭-এর পর ১৯০৫ পর্যন্ত কিছু-কিছু সংখ্যার নজির পাওয়া যায়। আরও বেশী সংখ্যানিষ্ঠ প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ১৯০৫ হ'তে ১৯৪৪ পর্যন্ত বছর চল্লিশেক সম্বন্ধে।

লেখক—এই বছর চল্লিশেক সম্বন্ধে প্রমাণের ধরণ-ধারণ কিরূপ?

সরকার—১৯০৫-এর মাপে ১৯৪৪ সনে মাথা-পিছু বাঙালীরা খায়-দায় কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী-বেশী, কাপড়-চোপড় পরে কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী-বেশী, বাড়ী-ঘরের সুখ-স্বচ্ছন্দতা পায় কিঞ্চিৎ-কলেজে ভর্তি হয় কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী-বেশী রাষ্ট্রিক-সামাজিক মহোচ্ছবে খরচ-পত্র করে কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী-বেশী, খবরের কাগজ পড়ে কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী-বেশী ইত্যাদি। এই সব "কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী-বেশী" বুঝ্‌তে হবে ছয় কোটি বাঙালীর গড় হিসাবে। কাজেই গড়পড়তা বাঙালী নরনারী একালে বছর চল্লিশ আগেকার তুলনায় "কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী" সম্পদ্‌শীল অর্থাৎ কম দরিদ্র। দারিদ্র বাড়্‌তির দিকে নয়, ঘাট্‌তির দিকে। সম্পদ্ ঘাট্‌তির দিকে নয়, বাড়্‌তির দিকে।

লেখক—তাহ'লে বাঙালী জাত্‌কে গরীব জাত্ বল্‌ছেন কেন?

সরকার—প্রায় শ'-খানেক বছরের সম্পদ্-বৃদ্ধির ফলেও বাঙালীর জীবন-যাত্রা নেহাৎ নীচু। দারিদ্র বাড়্‌ছে না,—কম্‌ছে। কিন্তু তবুও দারিদ্র র'য়েছে,—ঘুচেনি। ছয় কোটি নর-নারী গড়পড়তা যতটুকু খায়-দায় বা আর-কিছু সম্পদ্ ভোগ করে তার অনেকগুণ জুটলেও বাঙালী জাত্‌কে গরীব জাত ব'ল্‌তেই হবে। আমাদের মাথা-পিছু খাওয়া-পরা বিলাতী-মার্কিণ-জার্মাণ মাপে অতি-খাটো তো বটেই ; এমন কি জাপানী মাপেও বাঙালী জীবন-যাত্রা যারপর-নাই খাটো। "কিঞ্চিৎ-কিছু বেশী-বেশী"র মাত্রা বা ডোজ অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য।

লেখক—তাহ'লে বাঙালী জাতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সম্ভাবনা কোথায়?

সরকার—তুমি ভাব্‌ছ,—গরীব ব'লে বাঙালী জাত্ বাড়্‌তির দিকে যাবে না? দারিদ্র্য বাঙ্‌লার নর-নারীকে পিষে ফেল্‌বে? সংসার বড় বিচিত্র ও জটিল। "দারিদ্রদোষো গুণরাশিনাশী" নয়। ব্যক্তিগত জীবনে সর্বদাই দেখা যায় যে,—গরীব লোকেরাই অনেকক্ষেত্রে নামজাদা সাহিত্যবীর, বিজ্ঞানবীর, যন্ত্রবীর ও অন্যান্য চিন্তার আর কর্মের বীর হ'য়ে দাঁড়ায়। সমষ্টিগত, সামাজিক বা জাতীয় জীবনের বেলায়ও সেই নিয়ম খাটে। প্রত্যেক জাতের ভেতরই থাকে কতকগুলা ত্যাঁদড়-ডানপিটে-ভবঘুরে। গরীব ব'লেই একটা জাত প'চে যায় না। দারিদ্র্যকে জুতিয়ে দুনিয়ায় ব্যক্তিত্বে আর মনুষ্যত্বের ঝাণ্ডা খাড়া করা হচ্ছে সংসারের ত্যাঁদড়-ডানপিটে-ভবঘুরেগুলার কাজ। বাঙালী আমরা গরীব

র'য়েছি, গরীব অনেক দিনই থাক্‌বো। তা সত্ত্বেও বাঙালীর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বাঙালী জাত্ বড় জাত্। বাঙালীর বাড়তির পর বাড়তি ভবিষ্য-দুনিয়ায় অবশ্যম্ভাবী। বাঙলার হিন্দু-মুসলমান-পারিয়া-ব্রাহ্মণ যুগে-যুগে অনেক ত্যাঁদড়-ডানপিটে-ভবঘুরে পায়দা কর্‌তে থাক্‌বে।

লেখক—বাঙালী জাতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার এত আশার কারণ কী?

সরকার—এই অধম তথ্যনিষ্ঠ, সংখ্যা-নিষ্ঠ ও অভিজ্ঞতা-নিষ্ঠ লোক। গা-জুরি ক'রে নিজের খেয়াল-মাফিক আশা-ভরসা চালাই না। চোখের সামনে যা ঘ'টেছে ও ঘট্‌ছে তাই দেখে আন্দাজ করি—অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলী।

লেখক—আগামী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি বাঙালী জাতের বাড়তি নিশ্চিন্তভাবে কল্পনা করতে রাজি?

("বাঙালী জাতের ভবিষ্যৎ", "১৯৮০ সনের বাঙালী", ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—নিশ্চয়। দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালী জাত নেচেছে, বাজিয়েছে, গান গেয়েছে ; দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালী জাত্ নাচবে, বাজাবে, গান কর্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালী জাত ছবি এঁকেছে, মূর্তি গ'ড়েছে ; দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালী জাত ছবি আঁক্‌বে, মূর্তি গ'ড়বে। দারিদ্র-সত্ত্বেও বাঙালী জাত্ কবিতা লিখেছে, গল্প লিখেছে, নাটক লিখেছে, সিনেমা লিখেছে ; দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালী জাত্ কবিতা লিখ্‌বে, গল্প লিখ্‌বে, নাটক লিখ্‌বে, সিনেমা লিখ্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চা বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছে, যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাটি ক'রেছে; দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চা বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবে, যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চা নয়া-নয়া শিল্প-বাণিজ্যে মাথা ঘামিয়েছে, মাটি কাম্‌ড়ে প'ড়ে আছে ; দারিদ্র্যসত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চা নয়া-নয়া শিল্প-বাণিজ্যে মাথা ঘামাবে, মাটি কামড়ে প'ড়ে থাক্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চা ঐতিহাসিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও দার্শনিক অনুসন্ধানে নিজেকে মোতায়েন রেখেছে ; দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্ছা ঐতিহাসিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক অনুসন্ধানে নিজেকে মোতায়েন রাখ্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও যুবক বাঙলা দেশে-বিদেশে বৃহত্তর ভারত কায়েম ক'রে ছেড়েছে ; দারিদ্রসত্ত্বেও যুবক বাঙলা দেশ-বিদেশে বৃহত্তর ভারতের চৌহদ্দি বাড়িয়ে দিতে থাক্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও যুবক বাঙ্‌লা বাপ্‌কা বেটার স্বধর্ম-মাফিক দিগ্‌বিজয়ী হ'য়েছে, দারিদ্রসত্ত্বেও যুবক বাঙ্‌লা বাপ্‌কা বেটার স্বধর্ম-মাফিক দিগ্‌বিজয়ের পর দিগ্‌বিজয় কায়েম ক'রে চল্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও যুবক বাঙ্‌লা স্বাধীনতার ঝাণ্ডা চিরকাল খাড়া রাখ্‌বে।

লেখক—ভবিষ্যতের বাঙালীও কি সর্বদা কর্মনিষ্ঠ থাকবে?

সরকার—দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙ্‌লার নরনারী কোনো মহা-পরিবর্তন বা বিপুল বিপ্লবকে সমাজের চরম পরিবর্তন বা শেষ বিপ্লব ঠাওরাবে না, বরং প্রতি মুহূর্তেই নয়া-নয়া পরিবর্তন ও নয়া-নয়া বিপ্লব চালু কর্‌বার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগে থাক্‌বে। দারিদ্রসত্ত্বেও বাঙ্‌লার নরনারী সুখময় শান্তির লোভে উন্নতির পথ আটক ক'রে রাখ্‌বে না,—বরং নয়া-নয়া সৃষ্টিজনক অস্থিরতার কাজকর্ম বেছে নিতে অগ্রসর হবে। অশান্তি আর কর্মনিষ্ঠা চিরকালই থাক্‌বে বাঙালী জাতের আটপৌরে ধর্ম। যুবক বাঙলার শহরে-পল্লীতে কোনো দিনই ত্যাঁদড়-ভবঘুরে-ডানপিটের অভাব হবে না। তারা যখন-তখন যেখানে-সেখানে

দুনিয়াখানাকে জুতিয়ে দুরস্ত কর্‌বার জন্য ওঁৎ পেতে ব'সে থাক্‌বে। তারা বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার চালাবে হামেশা। এশিয়া ও ইয়োরামেরিকা বাঙালী জাতের নিত্য-নতুন কৃতিত্বে বাড়্‌তির পথে এগিয়ে চল্‌বে।

("মনুষ্যতব বনাম দারিদ্র্য", "দারিদ্র্য-দোষ কি গুণরাশি-নাশী?" ১৫সেপ্টেম্বর ১৯৩২)

চৌদ্দ-আঠার বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য পেশা-পাঠশালা

২৯শে জুন ১৯৪৪

লেখক—বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আপনার কোনো নতুন পাঁতি আছে?

সরকার—চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা যা-কিছু পড়্‌ছে, পড়ুক। সম্প্রতি সেদিকে মাথা খেলাচ্ছি না। সেদিকেও অবশ্য ওলট-পালট চাই। তবে বছর পনর'র অবস্থায় সংস্কার জরুরি।

লেখক— পনর বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য আপনার ব্যবস্থা কী হবে?

সরকার—পনর হ'তে আঠার পর্যন্ত বয়সের ছেলে-মেয়েরা আজ কাল ম্যাট্রিক আর আই-এ ও আই-এস-সি ক্লাসে পড়্‌তে বাধ্য হয়।

লেখক—বাধ্য হয় কেন বল্‌ছেন? বাধ্য কর্‌ছে কে?

সরকার—আর কোনো ঢঙের ইস্কুল-কলেজ বাঙ্‌লা দেশে নেই বল্‌লেই চলে। কাজেই পয়সা খরচ ক'রে যারা লেখাপড়ায় যেতে চায় তাদের পক্ষে অন্য গতি নেই। এরি নাম জোর-জবরদস্তি, বাধ্যতা ইত্যাদি। চাই হরেক রকমের গণ্ডা-গণ্ডা পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজ।

লেখক—আপনি কী চাচ্ছেন?

সরকার—আমার চাহিদা নিম্নরূপ। পনর-আঠার বয়সের ছেলে-মেয়েদের আধা-আধি যাওয়া উচিত ম্যাট্রিক আর আই-এ, আই-এস-সির দিকে। আর আধা-আধির জন্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত অন্য ধরণের।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, ম্যাট্রিক ইস্কুলের উচ্চতম দুই শ্রেণীতে যত ছেলে-মেয়ে পড়ে তাদের আধা-আধির বেশী ঐ সকল শ্রেণীতে থাকা উচিত নয়?

সরকার—ঠিক তাই। আমি ম্যাট্রিকের সেকেন্ড আর ফার্স্ট ক্লাস দুইটাকে কানা ক'রে দিতে চাই। এই দুই ক্লাসের আধা-আধি ছেলে-মেয়ের জন্য চাই আমি রককমারি পাঠশালা। তারা হচ্ছে পনর-ষোল বছরের ছাত্র-ছাত্রী।

লেখক—কয়েক রকমের নাম করুন।

সরকার—প্রথম, কৃষি-বিদ্যালয়। দ্বিতীয়, যন্ত্র-বিদ্যালয়। তৃতীয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয়। চতুর্থ,—ধাত্রী-বিদ্যালয়। পঞ্চম,—শিল্প-বিদ্যালয়। ষষ্ঠ—মূর্তি-বিদ্যালয়। তা ছাড়া চাই গৃহস্থালী-বিদ্যালয়, সমাজসেবা-বিদ্যালয়, শুশ্রূষা-বিদ্যালয়, সঙ্গীত-বিদ্যালয়, কুস্তী-বিদ্যালয় ইত্যাদি। এই ধরণের রকমারি পেশা-বিদ্যালয় চাই। এই সকল পাঠশালায় ছেলে-মেয়েরা পনর আর ষোল বছরের অবস্থা কাটাবে। এদের বয়েসী জুড়িদারেরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

লেখক—ম্যাট্রিকের পরবর্তী ধাপের জন্য আপনার চাহিদা কিরূপ?

সরকার—আমার ব্যবস্থায় পেশা-বিদ্যালয়গুলায় চার বছরের লেখা-পড়া চল্‌বে। কাজেই সতর-আঠার বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা পেশা-বিদ্যালয়ের আওতায় শেষ দুই বছর কাটাবে। এই বয়সের অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা আই-এ আর আই-এস-সি কলেজে পড়্‌বে।

লেখক—ধরুণ আপনার পাঁতি মাফিক ব্যবস্থা করা ঘ'টে উঠলো না। ম্যাট্রিক ক্লাসের সেকেন্ড ও ফার্স্ট ক্লাস থেকে আধা-আধি ছেলে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাহ'লে আপনি কী কর্‌তে চান?

সরকার—তাহ'লে বল্‌বো যে, যত ছেলে-মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ কর্‌ছে তাদের আধা-আধির বেশী আই-এ ও আই-এস-সিতে ঢোকা উচিত নয়। আর আধা-আধির জন্য চাই পেশা-কলেজ।

লেখক—ধরা যাক, বিশ হাজার ছেলে-মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ হ'লো ষোল বছর বয়সে। আপনার ব্যবস্থা তা হ'লে কী হবে?

সরকার—দশ হাজার ছেলে-মেয়ের জন্য চাই রকমারি পেশা-কলেজ। অন্য দশ হাজার গিয়ে ঢুকুক ইন্টারমীডিয়েট কলেজে। পেশা-পাঠশালা আর সাংস্কৃতিক বা মামুলি পাঠশালা চাই সকল অবস্থায় সমান্তরাল ভাবে।

পেশা-বিশ্ববিদ্যালয়ে চাই মামুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান ছাত্রছাত্রী

লেখক—আপনার শিক্ষা-সংস্কারটা বুঝ্‌বার জন্য জিজ্ঞাসা কর্‌ছি উচ্চতম ধাপের জন্য ব্যবস্থা আপনি কেমন চান?

সরকার—ধ'রে নিচ্ছি যেন ছেলে-মেয়েরা ১৯।২০ এই দুই বছর বি-এ আর বি-এস-সি পড়ে। তার পরের দুই বছর পড়ে, এম-এ, এম-এস-সি। বাইশ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইস্কুইলা" লেখা-পড়া খতম। বাঙলা দেশের মামুলি কলেজগুলা আর বিশ্ববিদ্যালয় দুটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক। নতুন-নতুন পেশা-কলেজ আর নতুন-নতুন পেশা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আমার চাহিদার অন্তর্গত।

লেখক—আপনি সাংস্কৃতিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চান না?

সরকার—আমি বল্‌বো যে, ১৯-২২ বয়সের ছেলে-মেয়েদের আধা-আধির বেশী বি-এ, বি-এস-সি আর এম-এ, এম-এস-সি পড়া উচিত নয়। সাংস্কৃতিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একচেটিয়া প্রভাব ভাঙা আবশ্যক।

লেখক—অন্য আধা-আধি যাবে কোথায়?

সরকার—তাদের জন্য চাই উচ্চতর পেশা-কলেজ বা পেশা-বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষি, যন্ত্র, এঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, মূর্ত্তি সঙ্গীত, চিকিৎসা, সার্বজনিক স্বাস্থ্য, আইন, শুশ্রূষা, সমাজ-মঙ্গল ইত্যাদি নানা পেশার জন্য চাই উচ্চাঙ্গের পাঠশালা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখক—আজকাল বাঙলা দেশে বি-এ, বি-এস-সি আর এম-এ, এম-এস-সি কতজন পড়ে?

সরকার—আন্দাজে বল্‌ছি। বোধ হয় হাজার বার।

লেখক—তাহ'লে আপনি হাজার ছয়েক ছেলে-মেয়ে চান এঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, চিকিৎসা, সমাজসেবা, গৃহস্থালী, সঙ্গীত, কুস্তী ইত্যাদি বিষয়ক কলেজের জন্য?

সরকার—এইবার মাথায় ঢুকেছে, দেখ্‌ছি। আমার সূত্র খুব সোজা। তথাকথিত উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে যতগুলা ১৯-২২ বয়সের ছেলে-মেয়ে থাক্‌বে প্রায় ঠিক ততগুলা ঐ বয়সের ছেলে-মেয়ে আমি চাই দেখ্‌তে এঞ্জিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য-মঙ্গল, মেডিক্যাল, কমার্শ্যাল ইত্যাদি কলেজের জন্য। যদি বিশ হাজার বাঙালী ছেলে-মেয়ে এই সব মামুলি সাংস্কৃতিক ক্লাসে থাকে তাহ'লে বিশ হাজার বাঙালীর বাচ্চার জন্য এঞ্জিনিয়ারিং, সমাজসেবা আর অন্যান্য পেশা শেখবার উচ্চতম ব্যবস্থা করা উচিত।

লেখক—একটা বাণী ঝাড়ুন না? যাকে আজকাল লোকেরা "স্লোগান" বলে?

সরকার—সোজা বুখ্‌নি হচ্ছে—পেশা-বিশ্ববিদ্যালয়ে চাই মামুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান ছাত্র-ছাত্রী।

লেখক—কোনো দিন বাঙলা দেশে তা সম্ভব হবে কি?

সরকার—বোধ হয় আরও বছর ত্রিশেকের বকাবকি জরুরি হবে। ইতিমধ্যে একটু-আধটু কাজ সুরু হ'তে পারে।

জুলাই ১৯৪৪

বাঙ্‌লার দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞান-বীরদের যুগ

৩রা জুলাই ১৯৪৪

হেমেন সেন—অনেকদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো ভাব্‌ছি। বলুন তো বাঙ্‌লা দেশে বিজ্ঞান-গবেষণা কেমন চল্‌ছে?

সরকার—১৯০৫-এর তুলনায় ১৯৪৪ এর অবস্থা যুগান্তরের সামিল। এমন কি বছর বিশ-পঁচিশেক আগেও বিজ্ঞান-গবেষণার অবস্থা বাঙালী সমাজে নেহাৎ ছোট-খাটো ছিল।

লেখক—এত পরিবর্তন দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—নিশ্চয়। ১৯০৫-১৪ সনের যুগে আমাদের "সবে ধন নীলমণি" ছিলেন জগদীশ আর প্রফুল্ল। এই কথা আমি যখন-তখন ব'কে থাকি। খনি-শাস্ত্রী প্রমথ বসুও সেকালের বিজ্ঞানবীর। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গবেষক ছিলেন বোধ হয় উপেন ব্রহ্মচারী আর এলাহবাদের মেজর বামনদাস বসু। গবেষণার পথে আর কোনো চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিককে দেখা যেতো কি না সন্দেহ।

লেখক—আপনি যাদের সঙ্গে ইস্কুল-কলেজে প'ড়েছেন তাদের কেউ বিজ্ঞান-গবেষক হ'য়েছে?

সরকার—প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠীদের (১৯০১-০৬) ভেতর পদার্থ-বিজ্ঞানে দেবেন বসু আর চিকিৎসায় (আর পরীক্ষামুলক চিত্তবিজ্ঞানে গিরীন বসু এই দুই জনকে বিজ্ঞান-গবেষণায় মোতায়েন দেখ্‌ছি। আমাদের কিছু-আগেকার দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভূতত্ত্ব-গবেষক হেম দাশগুপ্ত, আকর-শাস্ত্রী কিরণ সেনগুপ্ত, রাসায়নিক রসিক দত্ত, পঞ্চানন নিয়োগী ও প্রফুল্ল মিত্র, বিজলী-শাস্ত্রী ফণী ঘোষ আর জীবতত্ত্ববিৎ সমর

মৌলিককে। এঁরা বয়সে আমার চেয়ে বেশ-কিছু বড়। কিন্তু ১৯১৪ পর্যন্ত এঁদের কোনো গবেষণা কোনো বিজ্ঞান-পত্রিকায় বেরিয়েছিল কি না জানি না। আমাদের কয়েক বছর পরবর্তীদের ভেতর গবেষক হচ্ছেন রসায়ন-শাস্ত্রী প্রিয়দা রায়, বিমান দে ও নীলরতন ধর, পদার্থা-শাস্ত্রী মেঘনাদ ও সত্যেন বসু, আর প্রফুল্লচন্দ্রের "জ্ঞান-ত্রয়" (জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান রায় আর জ্ঞান মুখার্জি)। লাক্ষা-রাসায়নিক হেমেন সেন, সংখ্যাশাস্ত্রী প্রশান্ত মহালানবিশ, রেডিও-শাস্ত্রী শিশির মিত্র আর ওষুধ-রাসায়নিক সুধাময় ঘোষ ও ব্রজেন ঘোষ এই কয়জনের সমসাময়িক।

লেখক— মেঘনাদ ইত্যাদি গবেষকদের রচনা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?

সরকার—বোধহয় ১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের যুগে এঁদের গবেষণা বেরুতে সুরু করে। ১৯২০ সনে হেম দাশগুপ্ত হ'তে জ্ঞান ঘোষ পর্যন্ত গবেষকদের দল বিজ্ঞান-জগতে কিছু-কিছু পরিচিত হ'তে থাকে। আধুনিক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দিগ্‌বিজয় এই সময় হ'তে সুরু করা আমার দস্তুর। মেঘনাদ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন ১৯২৭ সনে। বয়স তখন মাত্র চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। খুব বাহাদুরির কথা।

লেখক— দিগ্‌বিজয় শব্দ ব্যবহার করছেন?

সরকার—হাঁ। যে-ছোক্‌রা ল্যাবরেটরিতে রোজ ঘণ্টা পাঁচ-সাতেক পরীক্ষা চালায় তাকে আমি বলি বিজ্ঞান-সাধক। বিজ্ঞান-সাধনার ফলাফল কোনো দেশী-বিদেশী বিজ্ঞান-পত্রিকায় ছাপা হবা মাত্র সাধনাটা আমার পারিভাষিকে দিগ্‌বিজয় চালাতে থাকে। দেশী বিদেশী কোনো বিজ্ঞান-পরিষদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল বিবৃত করামাত্রই গবেষকেরা আমার বিবেচনায় দিগ্‌বিজয়ী।

লেখক—তাহ'লে "দিগ্‌বিজয়ী" বল্‌ছেন ঠিক কোন্ শ্রেণীর গবেষক-সাধক-পরীক্ষককে?

সরকার— যেই কোনো ল্যাবরেটরি-সাধকের গবেষণা অন্যান্য পাঁচ সাত-দশ জন ল্যাবরেটরি-সাধকের নজরে এলো অমনি সেই সাধক বেরুলো দিগ্‌বিজয়ের পথে। এই হচ্ছে আমার দিগ্‌বিজয়ীর জন্মকথা। চাই দেশী-বিদেশী পরিষদে নিজ পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা ও যাচাই। চাই দেশী-বিদেশী পত্রিকায় নিজ পরীক্ষা-অনুসন্ধান-গবেষণার বৃত্তান্ত-প্রকাশ।

লেখক— গবেষণা, পরীক্ষা, অনুসন্ধান ইত্যাদি জিনিষগুলার সু-কু, ভাল-মন্দ, উঁচু-নীচু সত্যাসত্য দেখ্‌বেন না?

সরকার—না। কোন্ গবেষণাটা টেঁকসই আর কোন্ পরীক্ষার ফল অস্বীকার-যোগ্য তা বিচারের বস্তু। কোনো বিজ্ঞান-পত্রিকায় গবেষণাটা প্রকাশিত হবামাত্র বুঝ্‌তে হবে যে, তার ভেতর কিঞ্চিৎ-কিছু নতুন মাল আছেই-আছে। তা না হ'লে বিজ্ঞান-পরিষদে গবেষকের ডাক পড়ে না, অথবা বিজ্ঞান-পত্রিকায় গবেষণাটা ঠাঁই পেতে পারে না। কিছু-না-কিছু যাচাইয়ের পর মালটা বাজারে এসেছে,—বুঝ্‌তে হবে।

লেখক— সাধারণতঃ লোকেরা দিগ্‌বিজয়ী-শব্দ ব্যবহার করে কখন?

সরকার—বিলাতী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (সভ্য) নির্বাচিত হ'লে গবেষকেরা সাধারণতঃ দিগ্‌বিজয়ী উপাধি পায়। তা ছাড়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নোবেল প্রাইজও আছে। এই পুরস্কার অবশ্য চরম দিগ্‌বিজয়ের সাক্ষী বিবেচিত হয়।

লেখক—আপনি নেহাৎ ছোট মাপকাঠি ব্যবহার ক'র্‌ছেন না কি?

সরকার—তা হ'তে পারে। যে-লোকটা কোনো-প্রকার বাধা বিঘ্নের সঙ্গে সর্বদা লড়াই চালায় তাকেই আমি বলি বীর। আমার বিবেচনায় পৃথিবীর বহুসংখ্যক নরনারী হচ্ছে সত্যিকার বীর। কেন না, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে তারা লড়ুয়া, লড়াইশীল, দুস্‌মন-ধ্বংসকারী, মৃত্যুঞ্জয়ী লোক। ঠিক সেই ধরণেই আমি যে-কোনো ল্যাবরেটরি-সাধক, সমস্যা-বিশ্লেষক, চৌপর-দিন-রাত গবেষণায় মশ্‌গুল লোককে দিগ্‌বিজয়ের সিপাহী সমঝিতে অভ্যস্ত।

লেখক—আপনার বিবেচনায় তাহ'লে জগদীশ হ'তে সুধাময় পর্যন্ত সকলেই দিগ্‌বিজয়ী?

সরকার—তাই তো ব'লেছি। তবে বিশেষ কথা এই যে, জগদীশ-প্রফুল্ল'র সময়ে বাঙ্‌লার দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞান-বীরদের "যুগ" সুরু হয়নি। একটা সত্যিকার "যুগ" দেখা যাচ্ছে ১৯২০ সনের পর।

বিজ্ঞান-বীরদের যুগ কাকে বলে?

লেখক—বাঙ্‌লার দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞানবীরদের "যুগ" বল্‌ছেন কী অর্থে?

সরকার—"যুগ" বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে যে, গণ্ডা-গণ্ডা বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষক ফি-বছর ডজন-ডজন গবেষণা প্রকাশ ক'র্‌ছে। আর সেই গবেষণাগুলার স্বপক্ষে-বিপক্ষে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-পত্রিকায় ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে আলোচনা-সমালোচনা বেরুচ্ছে। অনেকগুলা বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষণা দেশী-বিদেশী গবেষকদের মগজে গিয়ে ভাল-মন্দ যা-হ'ক-আটপৌরে ভাবে।

লেখক—সেই অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—"সবে ধন নীলমণি"'র অবস্থা ১৯২০ সনের পর আর নাই। কালে-ভদ্রে গোটা কয়েক বাঙালী গবেষকদের রচনা প্রকাশ হওয়ার অবস্থা ১৯২০ সনের আগে পর্যন্ত ছিল। তখন হ'তে এই বছর পঁচিশেক হচ্ছে বহুসংখ্যক বাঙালী গবেষকের রকমারি ও অনেকগুলা রচনা প্রকাশের কাল। এই জন্যই বল্‌ছি "বাঙ্‌লার দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞানবীরদের যুগ" চল্‌ছে একালে (১৯২০-৪৪)।

লেখক—যে-ক'জন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নাম কর্‌লেন তাঁদের ভেতর প্রমথ বসু, বামনদাস বসু, হেম দাশগুপ্ত, জগদীশ আর প্রফুল্ল (মৃত্যু ১৬ জুন ১৯৪৪) ছাড়া প্রায়-সকলেই বেঁচে র'য়েছেন। ১৯২০-৪৪ সনের যুগ সম্বন্ধে আপনি কি একমাত্র আপনার সমসাময়িকদের কথাই বল্‌ছেন?

সরকার—না। এঁরা তো আছেনই। এঁদের চেয়ে বয়সে যাঁরা দশ-বিশ পঁচিশ বছর ছোট তাঁদেরকেও বাঙালী বিজ্ঞানবীরদের আসরে ঠাঁই দিচ্ছি। সমর মৌলিক আর কিরণ সেনগুপ্ত হ'তে নীলরতন আর প্রশান্ত পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পঞ্চাশোর্দ্ধ,—এমন কি কেউ-কেউ ষাটের কোঠায়ই র'য়েছেন। ১৯২০-৪৪ সনের বাঙালী বিজ্ঞান-বীরদের অনেকেই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের কোঠার গবেষক।

লেখক—তাঁদের নাম আমরা শুনতে পাই না কেন?

সরকার—তাঁরা বয়সে ছোক্‌রা ব'লে। এই হ'লো প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা

হ'চ্ছে যে, টাকা পয়সার মাপে হয়ত তাঁরা এমন-কিছু উল্লেখযোগ্য নন ব'লে। অধিকন্তু বোধ হয় চাক্‌রি-বাক্‌রির মাপে তাঁদের বিশেষ কোনো ইজ্জদ্ নাই। এই দুই-তিন কারণে আমাদের দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা এঁদেরকে পুছে না।

লেখক—সংবাদপত্রের মারফৎ বৈজ্ঞানিকদের খবর আমরা কতটা পাই?

সরকার—পঞ্চাশ-ষাট বৎসর বয়সের প্রবীণ বিজ্ঞান-বীরদের সম্বন্ধেও আমাদের পত্রিকা-জগৎ প্রায় এক প্রকার নির্বিকার। তাঁদের কথাও বাঙালীর বাচ্চারা খুব কমই জানে-শুনে। দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের মারফৎ বিজ্ঞান-গবেষকদের কাজকর্ম জনসাধারণের জানানো আবশ্যক। উচিতও বটে। সাংবাদিকরা উঠে-পড়ে লাগুন।

দশ বছরে গোটা বিশেক গবেষণা

লেখক—আপনি আর একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে দেবেন কোন্ ধরণের গবেষককে আপনি দিগবিজয়ী বিজ্ঞান-বীর বল্‌ছেন?

সরকার—ধরা যাক যেন যুবক বাঙ্‌লার কোনো ছোকরা বছর পাঁচিশকে থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালালে। তর পর তার কাজকর্ম একদম খতম। হয় কুঁড়েমির জন্য,—না হয় শারীরিক দুর্বলতার জন্য,—না হয় আর-কোনো কারণে। কিন্তু এই সময়ের ভেতর যদি সে-ফি-বছর এমন কি গোটা দুয়েক ক'রে গবেষণা ঝাড়্‌তে পারে তা হ'লেই আমি খুসী। আমি গরীব মানুষ,—সহজেই আমার পেট ভরে।

লেখক—শুধু এই কথা?

সরকার—উল্লেখযোগ্য দেশী-বিদেশী বিজ্ঞান-পত্রিকায় গবেষণাগুলার ছাপা হওয়া আসল কথা। গোটা বিশেক গবেষণা-প্রবন্ধের মালিক আমার মাপে দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞানবীর। অধিকন্তু ন দোষায়,—বলাই বাহুল্য।

লেখক—গোটা বিশেক গবেষণা-প্রবন্ধের ভেতর কী বেরুলো আপনি জান্‌তে চাচ্ছেন না কেন?

সরকার—প্রথম কথা,—অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ-তত্ত্ব, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যা সম্বন্ধে এই অধম একদম আনাড়ি। তার ভেতর প্রবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই বাহির থেকে যেটুকু বুঝা যায় তার বেশী আমার দৌড় নয়। আসল কথা কিন্তু আগেই ব'লেছি।

লেখক—কী সেটা?

সরকার—বিজ্ঞান-পরিষদের সভায় নেহাৎ গাঁজাখুরি আলোচিত হ'তে পারে না। আর বিজ্ঞান-পত্রিকায় কোনো-কিছু ছাপা হবার আগে কয়েক মাস ধ'রে সম্পাদকীয় ওস্তাদের রচনাটা ঝেড়ে-বেছে দেখে। এই ধরণের যাচাই-করা গোটা বিশেক গবেষণা-প্রবন্ধের লেখক একদম নকড়া-ছকড়া নয়। তার সম্বন্ধে আমার মতন আনাড়ির তরফ থেকে নতুন-পরীক্ষা চালাবার দরকার হ'তে পারে না। আমি চোখকান বুজে মেনে নিতে রাজি আছি যে, গবেষকটা দুনিয়ার ভদ্রলোকের পাতে দেবার উপযুক্ত। তবে মুড়ি-মুড়কির ফারাক আছে নিশ্চয়ই আর একটা কথাও বল্‌তে পারি।

লেখক—বলুন না?

সরকার—যে-যে বিদ্যা বা বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের ছিটে-ফোঁটা জানি সেই সকল ক্ষেত্রের দস্তুর আর কায়দা-কানুন সম্বন্ধে কিছু-কিছু ওয়াকিব্‌হাল র'য়েছি। ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, সুকুমার-শিল্প, দর্শন ইত্যাদি বিজ্ঞানের রাজ্যে কী দেখতে পাই?

লেখক—এই সকল রাজ্যের দস্তুর আর কায়দা-কানুন কিরূপ?

সরকার—ধরা যাক,—একজন মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী "আমেরিকানা ইকনমিক রিভিউ" বা ঐ-দরের পত্রিকায় দশ বছরে গোটা বিশেক গবেষণা-প্রবন্ধ ছেপেছে। তার ইজ্জদ মার্কিণ ও অন্যান্য ইয়োরামেরিকান (আর এমন কি এশিয়ান) অর্থশাস্ত্রী মহলে দাঁড়াবে?

লেখক—বলুন।

সরকার—তাকে সকলেই উল্লেখযোগ্য অর্থশাস্ত্রী বল্‌তে রাজি হবে। কেউ তাকে "বাঘা" অর্থশাস্ত্রী হয় ত বলবে না। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের দুনিয়ায় তার ঠিকানা কায়েম হ'য়ে থাক্‌বে। এই নজির আমি বাঙালী অঙ্কশাস্ত্রী, উদ্ভিদশাস্ত্রী, চিকিৎসাশাস্ত্রী, পদার্থশাস্ত্রী, খনিশাস্ত্রী ইত্যাদি নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে খাটাতে চাই। সেই নজির চালিয়েই বল্‌ছি যে, ১৯২০-৪৪ সনে বাঙালীর বাচ্চারা বিজ্ঞান-জগতে দিগ্‌বিজয় চালাচ্ছে দলে-দলে ভবিষ্যতে এই রকমারি গবেষকের দল আরও বেড়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা মামুলি ডাল-ভাত

১০ই জুলাই ১৯৪৪

লেখক—গবেষণা জিনিষটা আপনার মতে খুবই সোজা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না কি?

সরকার—নিশ্চয় সোজা। মামুলি মুড়ি-মুড়কি-ডাল-ভাত বিশেষ। হাতী-ঘোড়া নয়। সকল প্রকার বিজ্ঞান সম্বন্ধেই আমার মত এইরূপ। বিজ্ঞান বল্‌লে আমি যে-কোনো বিদ্যা ও কলা বুঝি। একমাত্র ভূতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা সম্বন্ধে এই কথা বল্‌ছি না। মানুষ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত নৃতত্ত্ব, চিত্ত-তত্ত্ব, দর্শন, ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের গবেষণা সম্বন্ধেও এইরূপই আমার মত। কোনো গবেষণায় অতি-কিছু দেখা আহাম্মুকি। এই সবের ভেতর রহস্য-ঠহস্য বিলকুল নেই। সবই সিগারেট ফুঁক্‌তে-ফুঁক্‌তে হাতে তুড়ি দিতে-দিতে চালানো যায়। চালানো হ'য়ে থাকেও।

লেখক—সাধারণ লোকেরা গবেষণাগুলাকে জাঁদ্‌রেল ও ভীষণ-কিছু স'ম্‌ঝে থাকে না কি?

সরকার—সমালোচক, সাংবাদিক, প্রবন্ধ-লেখক, গ্রন্থকার ইত্যাদি জানোআরকে সাধারণ লোকেরা জাম্বুমানের মতন অতিকায় জবরদস্ত সাংঘাতিক স্ত্রী-পুরুষ ভাব্‌তে অভ্যস্ত। কিন্তু যারা প্রবন্ধ লেখে, গল্প লেখে, ইতিহাস লেখে, দর্শন লেখে, সমালোচনা লেখে, পত্রিকার টিপ্পনী লেখে তারা নিজেদেরকে কী ভাবে? এইসব লেখালেখির ভেতর তারা ভয়ঙ্কর-মারাত্মক জাম্বুমানি-কিছু পায় না। ঘণ্টা দেড়-দুই-তিন-পাঁচ ক'রে টেবিলে বস্‌লেই হ'লো। কলম আপনা-আপনি চল্‌তে থাকে। ইতিমধ্যে পাড়াপড়শির ঝগড়াও কিঞ্চিৎ-কিছু সাম্‌লে নেওয়া চলে। তার ওপর গেরস্থালির ঝী-সমস্যা, নাত্‌নী-সমস্যা,

শাশুড়ী-সমস্যা, চাল-তেল-নুন-সমস্যা ইত্যাদি অন্যান্য সমস্যার হিস্যা নেওয়াও সম্ভব। লেখা-লেখিতে বুক-ফাটাফাটি কাণ্ড দেখা যায় না।

লেখক—ইতিহাস, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা, শিল্প-বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রের লেখালেখি আর ভূ-তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, চিকিৎসা ইত্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক গবেষণা কি একপ্রকার জিনিষ?

সরকার—আল্‌বৎ একপ্রকার জিনিষ। তাই ত ব'লেছি। ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যার সেবকেরাও শেষ পর্যন্ত তাদের খোঁজ-খবর আর অনুসন্ধান-পরীক্ষাগুলার ফলাফল লিখে বাজারে প্রচার করে। ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদি বিজ্ঞানের সেবকেরাও বিলকুল তাই করে। তারাও খোঁজ চালায়, অনুসন্ধান চালায়, পরীক্ষা চালায়। এই সকল পরীক্ষার ফলাফলই দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধের আকারে বেরিয়ে আসে।

লেখক—পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার জন্য ল্যাবরেটরি চাই না কি?

সরকার—ইতিহাস, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি বিদ্যার গবেষণার জন্যও ল্যাবরেটরি আবশ্যক হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বিদ্যার ল্যাবরেটরিতে থাকে যন্ত্রপাতি, কল-কব্‌জা, গ্যাস-বিষ-ওষুধ ইত্যাদি চিজ।

লেখক—মানুষ-বিষয়ক বিদ্যার ল্যাবেরেটরি কিরূপ?

সরকার—ইতিহাস, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি হচ্ছে প্রধানতঃ পুঁথি, ছবি, বই, পত্রিকা, সংখ্যা-তালিকা, সরকারী বেসরকারী কার্যবিবরণী ইত্যাদি বস্তু। তা ছাড়া ঐতিহাসিক-সমাজশাস্ত্রী-শিল্পসমালোচক ইত্যাদি বিজ্ঞান-সেবকদেরকে পায়চারি ক'র্‌তে হয় বিস্তর। ফ্যাক্টরি-পর্যবেক্ষণ, শহর-পর্যটন, দেশ-ভ্রমণ, ভবঘুরেমি, মিউজিয়াম-দর্শন, চিত্রশালা-পরিক্রমা ইত্যাদি কাজ লেগেই আছে। এইসবও ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সামিল।

বৈজ্ঞানিক গবেষকদের মুড়োয় যাদুঘর নেই

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞান অথবা সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক গবেষণা ও লেখালেখি যে-কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব?

সরকার—আলবৎ। বিলাতে, ফ্রান্সে, জার্মাণিতে, আমেরিকায়, জাপানে হাজার-হাজার লোক অসংখ্য ধরণের অনুসন্ধান-গবেষণা চালায়, লাখ-লাখ প্রবন্ধ ও বই লিখে থাকে। তারা কি অতিকায় মারাত্মক হোমরা-চোমরা কিছু? বিলকুল নয়।

লেখক—কী বল্‌ছেন?

সরকার—যে-কোনো কাণ্ডজ্ঞানশীল স্ত্রীপুরুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক গবেষক ও লেখক হওয়া সম্ভব। বাঙলাদেশে আর ভারতের অন্যত্র বর্তমানে মাত্র কয়েক হাজার লোক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গবেষণায় মোতায়েন আছে। কয়েক হাজার প্রবন্ধ-লেখক ও গ্রন্থকারের রচনা বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ। বিপুল ভারতের পক্ষে এই সব খুবই কম।

লেখক—এই কয়েক হাজার লোক বিশেষত্বশীল নয়?

সরকার—এই সকল বাঙালী ও অবাঙালী পদার্থশাস্ত্রী, রাসায়নিক, ভূতাত্ত্বিক, জীবশাস্ত্রী, চিকিৎসাশাস্ত্রী, চিত্তশাস্ত্রী, সমাজ-শাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রী, শিল্পশাস্ত্রী, সাহিত্যশাস্ত্রী ইত্যাদি গবেষক-লেখকেরা মামুলি কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী। এরা মুড়োর শক্তিতে হাতী-ঘোড়া নয়। তারা যে-কোনো বাইশ-পঁচিশ-আঠাশ বছরের এম-এ, এম-এস সি, এম-বি ইত্যাদি বিদ্যাওয়ালা ছেলে-মেয়ের মগজ নিয়েই চলাফেরা করে। গবেষকদের মুড়োর ভেতর কোনো যাদুঘর নেই "বাঘা"-"বাঘা" বিজ্ঞান-বীরেরাও মুড়োর ভেতর যাদুঘর রাখে না।

লেখক—আপনি দেখ্‌ছি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গবেষণা আর লেখালেখিকে নেহাৎ খেলো ক'রে ছেড়ে দিচ্ছেন?

সরকার—কী ক'র্‌বো? গবেষণাগুলা খেলো জিনিষই বটে। আসল কথা,—দুনিয়ার সব-কিছুই মামুলি, খেলো চিজ। চাই শুধু রোজ ঘণ্টা পাঁচ-সাতেক বা তিন-পাঁচেক বা এমন কি দেড়-দুই ঘণ্টা "নিয়মিত" কাজ ল্যাবরেটরিতে-লাইব্রেরিতে-মিউজিয়ামে। এম-এ, এম-এস সি, এম-বি বিদ্যাওয়ালা স্ত্রী-পুরুষেরা থাকুক লেগে এই ধরণের কাজে। আর কিছু চাই না।

লেখক—তা হ'লে কী হবে?

সরকার—প্রত্যেক তিন-তিন মাস পর, ছ'-ছ' মাস পর,—ফি বছর ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরি-মিউজিয়াম থেকে থান-থান অথবা কল্‌সী-কল্‌সী রিসার্চ-গবেষণা-প্রবন্ধ বেরিয়ে আসতে বাধ্য।

লেখক—আমরা গবেষণাগুলাকে মামুলি চিজ ভাব্‌তে পারি না কেন?

সরকার—যারা জীবনে কখনো ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরি-মিউজিয়ামে ঢোকে নি তারা এই সব ঘর-বাড়ীকে "যাদুখানা", রসহস্যময় ইমারত বা ঐ-ধরণের কিছু ভাব্‌বে,—এতো স্বাভাবিক। কিন্তু যারা ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরি-মিউজিয়ামের ঝাড়ুদার ও কেরাণী অথবা কর্মচারী, ওপর-ওয়ালা বড় সাহেব বা বড়-কর্তা, তারা এই সকল বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, আলমারি, দেরাজ ইত্যাদি বস্তুকে মামুলি-খেলো চিজ ছাড়া আর-কিছু ভাবে না।

লেখক—গবেষকদের সম্বন্ধে কী বল্‌ছেন?

সরকার—গবেষকেরা নির্দিষ্ট টেবিলে ব'সে বা দাঁড়িয়ে আট-ঘণ্টার রোজ চালাতে অভ্যস্ত। গ্যাস-বিষ ঢালাঢালি করা তাদের কাজ। কলকব্জা আর যন্ত্রপাতির নড়ন-চড়ন দেখ্‌তে তারা মোতায়েন। অথবা ছবি এঁকে সংখ্যাগুলার রূপ দেখা হচ্ছে তাদের আটপৌরে ধান্দা। তারা এই সকল কাজকে নিত্যনৈমিত্তিক গেরস্থালীর কাজই সম্‌ঝে থাকে।

লেখক—ঠিক বল্‌ছেন?

সরকার—অন্যান্য আফিসে-কর্মকেন্দ্রে-ফ্যাক্টরিতে মজুর-কেরাণী-কর্মকর্তাদের কাজ যে-শ্রেণীর চিজ, ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরি-মিউজিয়ামে মজুর-কেরাণী-কর্মকর্তা-গবেষক-লেখকদের কাজ অবিকল সেই শ্রেণীর চিজ। কোনো ফারাক নেই।

লেখক—তাহ'লে বাঙলাদেশে আর ভারতের অন্যত্র বেশী-বেশী লোক গবেষণায় যায় না কেন?

সরকার—গবেষণার কাজে মজুর-কেরাণী-কর্মচারী আর পরীক্ষক-গবেষক-লেখক বাহাল কর্‌বার জন্য রূপচাঁদের দরকার হয়। চাই টঙ্কা, চাই রুধির, চাই রূপৈয়া। আর

কোনো রহস্য, বুজরুক বা তুকমুক লাগে না। টাকা ঢাল্লেই এক বাঙলাদেশে এই মুহূর্তে হাজার দশেক গবেষক বহাল করা সম্ভব। অধিকন্তু বছরে হাজার-হাজার অথবা লাখ-লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী পদার্থবিজ্ঞান. রসায়ন, ভূতত্ত্ব, গণিত, জীবতত্ত্ব, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি রকমারি বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণা বাজারে জাহির করা সম্ভব। সুরটা বেশ-কিছু চড়া রেখে গেয়ে দিলাম।

লেখক—গবেষকে-গবেষকে উঁচু-নীচু নাই কি? সকল গবেষকই কি সমান দরের বৈজ্ঞানিক?

সরকার—গাল্পিকে-গাল্পিকে তফাৎ নাই কি? চিত্রকরে-চিত্রকরে তফাৎ নাই কি? গায়কে-গায়কে তফাৎ নাই কি? কবিতে-কবিতে তফাৎ নাই কি? নাট্যকারে-নাট্যকারে তফাৎ নাই কি? আল্‌বৎ আছে। তেমনি সমালোচকে-সমালোচকে তফাৎ আছে। ঐতিহাসিকে-ঐতিহাসিকে তফাৎ আছে। দার্শনিকে-দার্শনিকে তফাৎ আছে। সমাজশাস্ত্রীতে-সমাজশাস্ত্রীতে তফাৎ আছে। রাসায়নিকে-রাসায়নিকে তফাৎ আছে। আগেই ব'লেছি মুড়ি-মুড়কির ফারাক র'য়েছে সর্বত্র আর সব সময়েই!

বিলাতী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো-বাছাই

লেখক—বিলাতের রয়্যাল সোসাইটিতে বিজ্ঞান-সেবকেরা "ফেলো" (সভ্য) হয়। এইসব ফেলোদের ইজ্জদ খুব বেশী।

সরকার—বেশ তো? তাতে হ'য়েছে কী?

লেখক—রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ-আর-এস) দরের বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নিজ-নিজ গবেষণার ক্ষেত্রে অতি-কিছু বা হাতী-ঘোড়া নয় কি?

সরকার—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কোনো-কোনো এফ-আর-এস হাতী-ঘোড়া নিশ্চয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয়। অধিকন্তু সকল বৈজ্ঞানিক হাতী-ঘোড়া বা বিজ্ঞানবীরেরা এফ-আর-এস নয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে,—এফ-আর-এস নয় এমন কৃতী-গুণী বৈজ্ঞানিক-গবেষক বিলাতেই আছে বহুসংখ্যক। হাতী-ঘোড়া হ'তে হ'লে এফ-আর-এস হ'তেই হবে এমন কোনো কথা নেই। "বাঘা"-"বাঘা" বিজ্ঞানবীরেরা সকলেই এফ-আর-এস নয়,—এই কথাটা জেনে রাখা ভাল। তাহ'লে মাথাটা পরিষ্কার হবে।

লেখক—বিলাতের সব-ক'টা নামজাদা বিজ্ঞানবীর এফ-আর-এস নয়?

সরকার—তাই তো বক্‌ছি জোর্‌সে। বিলাতের নামজাদা বিজ্ঞান বীর ঝুড়ি-ঝুড়ি। সব-ক'টাকে এফ-আর-এস করা সম্ভব নয়। বাঘা-বাঘা বিজ্ঞান-বীর বিলাতী সমাজে কালোজামের মতন প্রচুর,—এক কথায় অগণিত।

লেখক—এফ-আর-এস হবার জন্য দরকার কী-কী?

সরকার—বলাই বাহুল্য,—অনেকগুলো গবেষণা-প্রবন্ধের মালিক হওয়া চাই। তার পর, এফ-আর-এস হচ্ছে ভোটের কারবার। ভোটাভুটি জিনিষটা দুনিয়ার সকল দেশেই আর সকল কর্মক্ষেত্রেই নেহাৎ জটিল জিনিষ। এর ভেতর দল-পাকানো, দল-এড়ানো, দলাদলি, অবশ্যম্ভাবী। ভোটরঙ্গ দলীয় পদার্থ. দলে চলে। নির্দলভাবে ভোট পাওয়া অসম্ভব। অবশ্য টাকা ঘুশ দিয়ে এফ-আর-এস হওয়া যায় না। ঘুশের জোরে নোবেল

প্রাইজ পাওয়াও সম্ভব নয়। এই সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তা না হ'লে আহাম্মুকি করা হবে।

লেখক—আপনি কি বল্‌ছেন যে, কোনো বিজ্ঞান-বীরের দলে যদি কতকগুলা বিজ্ঞানবীর না থাকে তাহ'লে তার পক্ষে এফ্‌-আর-এস হওয়া অসম্ভব?

সরকার—খাঁটি কথাই তাই। বাঙলাদেশে ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর-বাছাই যে-কাণ্ড, বিলাতে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো-বাছাইও বিলকুল সেই কাণ্ড। ভোটাভুটি কারবারটা সর্বত্রই সামাজিক বা আন্তর্মানুষিক লেনদেন ছাড়া কিছু নয়।

লেখক—মনে করুন কোনো বিজ্ঞান-গবেষক বন্ধুহীন। অথবা ক্ষমতাশালী লোকজন তাকে চেনে না। তার পক্ষে এফ-আর-এস হওয়া সম্ভব নয় কি?

সরকার—এক কথায় বল্‌বো,—সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক নোবেল প্রাইজের বেলায়ও এই সব স্বীকার ক'রে নিতে সাজ। সাজঘরের চলাফেরাগুলা কেউ চোখে দেখ্‌তে পায় না। ভেতরে কী-কী ঘট্‌ছে ক'জন জান্‌তে পায়? শুধু খোলা রঙ্গমঞ্চের খেলাটাই দেখে সকলে। মানুষের বাচ্চারা মানুষের বাচ্চার জন্য ভোট দিচ্ছে। সেই ভোটে মানুষের বাচ্চার পদোন্নতি হবে, আর্থিক উন্নতি হবে, সামাজিক উন্নতি হবে। এই ধরণের জিনিষগুলা ঘোরতর ভাবে সাংসারিক। সাংসারিক কাণ্ড-কারখানায় যা-কিছু ঘট্‌বার,—নোবেল-প্রাইজ আর এফ-আর-এস-বাছাইয়ের কাণ্ড-কারখানায় তার সব-কিছুই ঘ'ট্‌তে পারে। এইরূপ আন্দাজ ক'রে চলাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে হুসিয়ারের কাজ। রক্তমাংসের মানুষ দেবতা নয়। দেশ-বিদেশের গোটাকয়েক নোবেল ওয়ালা আর এফ-আর-এস দেখা আছে।

ভারতে চাই এফ-আর-এস্‌য়ের দল-বৃদ্ধি

লেখক—ভারতবর্ষের বিজ্ঞানবীরেরা এফ-আর-এস হ'তে পারে কি?

সরকার—ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বিলাতী প্রভুরা ভারতীয় প্রজাদের ভেতর দু'একটা বিলাতী উপাধি-খেতাব-ইজ্জদ্‌ বিলি করতে অভ্যস্ত। কাজেই গোটাকয়েক এফ-আর-এসও ভারতে আছে। অবশ্য এইসব বিলাতী লাড্ডু—হরির লুটের বাতাসার মতন—ভারতীয় বারোআরিতলায় ছড়িয়ে দেওয়া ইংরেজদের মেজাজ-মাফিক কাজ নয়। ভারতবাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে ইংরেজদের সমান-সমান ভাবতে দেওয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ হ'তে পারে না। কালে-ভদ্রে এক-আধ জনকে "জাতে তোলা" হ'য়ে থাকে মাত্র।

লেখক—সেই ক'-জন ভারতীয় এফ-আর-এস ছাড়া আর কোনো ভারতীয় বিজ্ঞানবীর এফ-আর-এস হবার উপযুক্ত নয় কি?

সরকার—বিলাতে যে-কজন ইংরেজ এফ-আর-এস্‌ আছে তারা ছাড়াও আরও অনেক ইংরেজ বিজ্ঞানবীর এফ-আর-এস হবার উপযুক্ত। একথা আগেই ব'লেছি। ভারতবর্ষেও তেমনি এফ-আর-এস হবার উপযুক্ত বিজ্ঞান-বীর ঝুড়ি-ঝুড়ি না হ'ক দুয়েক ডজন আছে। বাঙলা দেশেই হয়ত গোটা কয়েক জুট্‌তে পারে। ওয়াকিব্‌হাল মহলে জিজ্ঞাসা করা ভাল।

লেখক—এফ্-আর-এস হবার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান-বীরদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

সরকার—রায়বাহাদুর, খাঁ সাহেব, স্যার, রাজা, নবাব, ও-বি-ই ইত্যাদি উপাধি পাবার জন্য ভারতীয় গণ্যমান্যদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি? উচিত দুই মহলেই একপ্রকারের।

লেখক—এফ-আর-এস হবার জন্য ভারতীয় গবেষকদের কী-কী করা উচিত?

সরকার—পয়সা-পদ-পদবীর দুনিয়ায় এই অধম একদম আনাড়ি। একে মুখ্‌খু তার ওপর গরীব। উঁচু মহলের খবর, কর্ম-কৌশল, ধরণ-ধারণ, কায়দা-কারখানা আমার মতন লোকের পক্ষে জানা অসম্ভব। কাজেই এফ-আর-এস হবার তোড়জোড় বা কর্ম-কৌশল বাৎলাতে আমি অপারগ।

লেখক—কেন? এই তো কয়েক বার ব'লেছেন অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের বেলায় বাছাই-কাণ্ড যা, রয়্যাল সোসাইটির ফেলো-বাছাইয়ের কাণ্ডও তা?

সরকার—তা হ'লে তো ব'লেই চুকেছি। নতুন আর কী ব'ক্‌বো? একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ভারতের চৌহদ্দির ভেতর—ফি বছর গোটা শ-দুইয়েক প্রতিষ্ঠান-পরিষৎ-সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট-বাছাই হয়, সম্পাদক-বাছাই হয়, সভ্য-বাছাই হয়। রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক,—সকল প্রকার পরিষৎ-কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স-সম্মেলনের কথা বল্‌ছি। কতকগুলা সরকারী, কতকগুলা নিম-সরকারী, আর কতকগুলা বে-সরকারী।

লেখক—কী বল্‌তে চাচ্ছেন?

সরকার—এই সকল প্রতিষ্ঠান-সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, মেম্বার ইত্যাদি হবার জন্য রাষ্ট্রিকেরা, সরকারী চাক্‌রেরা, কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা, বিজ্ঞান-গবেষকেরা, চিকিৎসা-গবেষকেরা, অন্যান্য বিদ্যার ওস্তাদেরা বাছাই-মঙ্গলের হরেক-রকম কাপ্তেনি-ক্যার্‌দানি-কারচুপী চালাতে বেশ সুদক্ষ। বিভিন্ন ভারতীয় বিদ্যা-সম্মেলনের সভাপতি হওয়া বিপুল মাথা-ফাটাফাটি কাণ্ড। সেই উপলক্ষে কখনো-কখনো জন্মের মতন শত্রুতা পায়দা হয়। এ-সব জানে না কোন্ বাঙালী সাহিত্যিক,কবি, সাংবাদিক, দার্শনিক?

লেখক—সেই সকল কাপ্তেনি-ক্যার্‌দানি-কারচুপী ছাড়া এফ-আর-এস্ হবার জন্য আর কোনো ওস্তাদি জরুরি হয় না?

সরকার—কী করা যাবে? ভোট-রঙ্গ বস্তুটা হচ্ছে হামেশা সর্বত্র ঘোঁট-মঙ্গল। বিশেষ কথা,—এফ-আর-এস হবার জন্য চাই ইংরেজ মুরুব্বি। এজন্য চাই বিলাতবাসী ইংরেজ বন্ধু, চাই নামজাদা বন্ধু, চাই ক্ষমতাশালী বন্ধু। চাই ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দহরম-মহরম, মিষ্টি-মুখের ব্যবস্থা, পারস্পরিক আনাগোনা, আন্তর্মানুষিক লেন-লেন। আর চাই ভারতীয় ইংরেজ মালিকদের সঙ্গে গলায়-গলায় ভাব—অর্থাৎ বৃটিশ-মেজাজ, বৃটিশ-ভক্তি, বৃটিশ সাম্রাজ্য-নিষ্ঠার দুরন্ধরি।

লেখক—আরও কিছু বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বলুন।

সরকার—কোনো নামজাদা ইংরেজ ভারতে বেড়াতে এলে তাদের সঙ্গে মোলাকৎ চালানো হচ্ছে ভারতীয় বিজ্ঞানবীরদের প্রথম জরুরি। চব্বিশ ঘণ্টা তাদের পেছন-পেছন লেগে থাকা খুবই আবশ্যক। দ্বিতীয় জরুরি হ'চ্ছে "ঘন-ঘন-ঘন-ঘন-ঘনং বাবুদের বিলাত-গমনম্"।

লেখক—এ যে পয়সার খেলা, মশায়?

সরকার—এফ-আর-এস হ'তে চাও, বাবা? চালাকি? ধরাখানাকে সরা জ্ঞান কর্‌বে, পাড়ার লোকজনকে চড়া মেজাজ দেখাবে, অথচ ট্যাঁকে পয়সা নাই? বিলেত যাবার মুরোদ নাই, এফ-আর-এস হ'তে চাস্ কিসের জোরে?

লেখক—বিলাত যাওয়া-আসা কর্‌তেই হবে?

সরকার—ট্যাঁকের পয়সা খরচ করা চাই-ই-চাই। অবশ্য এই বিষয়ে একটা ফন্দী আছে। ঘাড়ে কোনো সরকারী কাজের বোঝা নিয়ে বিলাত যাওয়া সম্ভব। সরকারী "রাহা"—খরচ পাওয়া যায়। অতএব নিজের ট্যাঁক খালি না কর্‌লেও চলে। অথবা কিছু-কম খালি হবে। তৃতীয় কর্ম-কৌশল হচ্ছে—চিঠি ঝাড়া। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। নিজের গবেষণা বিষয়ক লেখালেখিগুলা বিলাতের নামজাদা বিজ্ঞানবীরদেরকে উপহার পাঠানো খুবই আবশ্যক। নামটা আর কামটা যেন তাদের সুপরিচিত থাকে। অ-চেনা লোক ভোট পায় না।

এফ-আর-এস হবার তোড়-জোড়

লেখক—আপনি ভারতীয় বিজ্ঞানবরদেরকে এত হাঙ্গামা পোহাতে পরামর্শ দেন?

সরকার—এমন কী আর হাঙ্গামা? কম-সে-কম বছর আট-দশেক এই ধরণে ধরণা দিয়ে প'ড়ে থাকা চাই। আজই আট-দশ জন ছোকরা বাঙালী গবেষক,—বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়সের ছোকরাদের কথা বলছি—এই অধমের পাঁতি-মাফিক ইংরেজ বিজ্ঞানবীরদের সঙ্গে আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ সুরু করুক। তা হ'লে ১৯৫১-৫৫ সনের ভেতর দু-এক জনের এফ-আর-এস হওয়া আশা করা সম্ভব। তাতে দেশের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। ছোক্‌রা গবেষকদের জন্য এই দিকে পয়সাওয়ালা বাঙালীর পক্ষে মুরুব্বি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখক—আপনার এই কথাগুলা দেশের লোকে জানে কি?

সরকার—আমি গরীব মানুষ আর মুখ্‌খু লোক। কে-ই বা আমার কথা শুনবে? তবে যারা শেআনা তারা আমার পাঁতির জন্য ব'সে নেই। তারা চালাচ্ছে নিজ-নিজ পান্সি,—নিজ-নিজ কব্‌জার জোরে।

লেখক—বুঝা যাবে কী ক'রে?

সরকার—যদি কেউ কোনো দিন এফ-আর-এস হয় বুঝে নিতে হবে যে, এই অধমের পাঁতিটা তারা নিয়মিত রূপে কাজে লাগিয়েছিল,— বছর আট-দশেক ধ'রে। দুনিয়ায় হঠাৎ-কিছু ঘটে-ঠটে না।

লেখক—আপনি বল্‌ছেন যে, গবেষককে নিজে চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। নিজে তোড়-জোড় চালাতে হবে। নিজে নিজের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে?

সরকার—নিজে ক'র্‌বে না তো কি ভগবান তার বাড়ীতে এসে উপাধি-খেতাব-পদবী গছিয়ে দিয়ে যাবে? তবে লেফাফা দুরস্ত থাকা চাই। ইংরেজ-মহলে কমসে-কম একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাক্‌লে সহজেই কাজ হাসিল হয়। সেই বন্ধুটি অতি-দক্ষতার সহিত তার ভারতীয় বন্ধুর জন্য তন্-মন্-ধন্ খাটিয়ে পান্সি চালাবে। যথাসময়ে রয়টার দেবে খবর। এই হচ্ছে কর্মকৌশল। সংসারে বুজরুকি চলে না।

লেখক—আপনি বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষকদেরকে এফ-আর-এস হবার জন্য এত হাঙ্গামা পোহাতে পরামর্শ দিচ্ছেন কোন্ উদ্দেশ্যে?

সরকার—বর্তমানে বাঙালী জাতের ট্যাঁকে র'য়েছে মাত্র একজন এফ-আর-এস,—পদার্থশাস্ত্রী মেঘনাদ সাহা। বাঙালীর বিজ্ঞান-জগতে গণ্ডা-কয়েক এফ-আর-এস থাক্‌লে দুনিয়ায় বাঙালী জাতের ইজ্জদ বেড়ে যাবে। বিলাতী মাপে,—অতএব খানিকটা বিশ্বমাপে—ইজ্জদ পাওয়ার চাপ্‌রাশ হচ্ছে এফ-আর-এস।

লেখক—জাপানীরা, মার্কিণরা, জার্মাণরা, ইতালিয়ানরা, রুশরা কি এফ-আর-এস হবাব. জন্য এত হাঙ্গামা পোহায়?

সরকার—তারা স্বাধীন দেশের লোক। নিজ-নিজ দেশের মাপে তারা চলে। বিলাতী চাপরাশ তাদের দরকার হয় না। কোনো-কোনো মার্কিণ, জাপানী, রুশ, জার্মাণ, ফরাসী, ইতালিয়ানকে হয়ত বিলাতী এফ-আর-এস দেওয়া হয়। সে-সব "অধিকন্তু ন দোষায়।" কিন্তু বাঙালী আর অন্যান্য ভারতবাসীর পক্ষে প্রায়-সকল বিষয়েই মা-বাপ হচ্ছে ইংরেজ জাত্। বিলাতী মাপকাঠিতে ভারতীয় নর-নারীর দর কষাকষি চল্‌তে বাধ্য এখনো অনেক দিন। কাজেই এফ-আর-এসদের দল পূরু হওয়া ভারতীয় নরনারীর পক্ষে দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়ী রূপে চলাফেরা কর্‌বার অন্যতম সহায়। আমি প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই বহুসংখ্যক দিগ্‌বিজয়ী বাঙালী দেখ্‌তে চাই।

লেখক—বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষকদের জন্য তাহ'লে আপনার শেষ পাঁতি কী? সোজাসুজি চি-চিং ফাঁক ক'রে দিন না?

সরকার—ধরা যাক, বাইশ-তেইশ বছরের এক বাঙালীর বাচ্চা এম-এসসি বা এম-বি হ'য়ে বেরুলো ধ'রে নিচ্ছি যে, বছর পঁচিশেক বয়সে সে গবেষণা সুরু কর্‌লে। বছর পঁয়ত্রিশ হ'তে না হ'তেই তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেরিয়ে যাবে কম্‌সে-কম গোটা বিশ-পঁচিশেক। এই অবস্থায় তার পক্ষে এফ-আর-এস হবার দিকে নজর রাখা বাঞ্ছনীয় হবে।

লেখক—নজর রাখার মানে কী?

সরকার—তোড়-জোড় আর কর্মকৌশল সম্বন্ধে আগেই ব'কেছি। বছর দশেক চেষ্টার ফলে বুঝা যাবে কত ধানে কত চাল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি বিলাতী চাপ্‌রাশটা আশা করা যেতে পারে।

লেখক—নতুন আর কিছু বল্‌বেন?

সরকার—গবেষকের পক্ষে বিলাত মেরে আসা উচিত হবে,—কম্‌সে-কম বার দু'তিনেক। একটা বিলাতী ডিগ্রী পকেটস্থ করা খুবই জরুরি। সঙ্গে-সঙ্গে এক-আধটা জার্মাণ, ফরাসী বা মার্কিণ ডিগ্রী দখলে রাখাও আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাগুলা চাই রকমারি। পয়সাওয়ালা বাঙালীরা এই ধরণের গবেষকদের মুরুব্বি হ'তে চেষ্টা করুন।

ছোক্‌রা বিজ্ঞান-বীরদের কাজকর্ম

১৫ই জুলাই ১৯৪৪

হেমেন—নতুন-নতুন বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষকদের ভেতর উল্লেখযোগ্য কে কে?

সরকার—বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের ছোক্‌রা বিজ্ঞানবীর বাঙলা দেশে আজ অনেক। বিশ্ববিদ্যালয়ের "সায়েন্স কলেজ"-দু'টার ঘরে-ঘরে ঢুঁ মেরে দেখা ভাল। তা ছাড়া র'য়েছে মেডিক্যাল কলেজ, ট্রপিক্যাল স্কুল আর ইনস্টিটিউট অব হাইজিন। মহেন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনও আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় গবেষণা অল্প-বিস্তর গুলজার। সকল গবেষকই হয় ত বাঘা বাঘা নয়। কিন্তু আমার পারিভাষিক মাফিক বিজ্ঞানবীর অনেকেই। তা ছাড়া, ভারতের নানা প্রদেশে বাঙালী বিজ্ঞানবীরেরা কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-কারখানায় মোতায়েন আছে। অধিকন্তু বাঙলাদেশে আর অন্যান্য প্রদেশেও সরকারী শাসনবিভাগের নানা কেন্দ্রে বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষকদের কাজকর্ম চল্‌ছে অনেক দিন ধ'রে।

লেখক—খবর পাবো কী ক'রে?

সরকার—অনেকগুলা বিজ্ঞানের জন্য পত্রিকা র'য়েছে। কাজেই পত্রিকা সমূহের ভেতর নাক গুঁজা আবশ্যক। লেখকদের নাম-ধাম-কাম সবই হাতে হাতে ধরা প'ড়্‌বে।

লেখক—কোন্‌ গবেষকের বয়স কত বুঝা যাবে কী ক'রে?

সরকার—মুস্‌কিল বটে চাই দুএক জন ছোকরা গবেষকের সঙ্গে মোলাকাৎ। বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়সের কোনো-কোনো গবেষককে পাকড়াও না কর্‌লে হদিশ পাওয়া কঠিন। অবশ্য প্রবীণদের সঙ্গেও কথা চালানো মন্দ নয়।

লেখক—কয়েকজন ছোকরা গবেষকের নাম করুন না?

সরকার—জীব-রাসায়নিক বীরেশ গুহ আর পদার্থশাস্ত্রী রমেশ মজুমদার (দিল্লী) বোধহয় চল্লিশের এপার-ওপার। তাদেরকেও ছোকরা বিজ্ঞান-বীরদের দলে ফেলা আমার দস্তুর। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের কেদারেশ্বর ব্যানার্জি রঞ্জন-রশ্মির গবেষক। মেঘনাদ সাহার সহকারী বাসন্তী দুলাল নাগ-চৌধুরী সাইক্লোটোন-যন্ত্রের ওস্তাদ। এঁদের বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কোঠায় মনে হচ্ছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অমিয় বসুকে জিজ্ঞাসা করা চল্‌তে পারে। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে শিবসুন্দর দেবের সঙ্গে কথা বলা ভাল। রসায়ন-শিল্প সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহেন্দ্র গোস্বামী আর ব্রজেন ঘোষ খবর দিতে সমর্থ। প্ল্যাস্টিক তৈয়ারীর কারবারে মহেন্দ্র'র হাত খেলে।

লেখক—যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গবেষণা হয় না?

সরকার—যাদবপুরে যান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার হীরালাল রায় আর বাণেশ্বর দাশ বাঙালী গবেষকদের কাজকর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এঁদের কাছে সংবাদ মিল্‌তে পারে। বয়সে এঁরা অবশ্য সুধাময়, মেঘনাদ, নীলরতন, সত্যেন, প্রশান্ত ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকদের দলস্থ,—অর্থাৎ পঞ্চাশোর্দ্ধে।

লেখক—চন্দ্রশেখর রামণ এতদিন কল্‌কাতায় ছিলেন। তাঁর চেলারা কে কোথায় কী কর্‌ছে?

সরকার—একজনের নাম কর্‌তে পারি। সুকুমার রঞ্জন সরকার আলোক-বিকীরণের

কারবার সম্বন্ধে গবেষক।

লেখক—মেঘনাদের বিজ্ঞান-বিভাগে গবেষক কে-কে?

সরকার—নীরদ দাশগুপ্তকে অন্যতম বল্‌তে পারি। তা ছাড়া সুকুমার সরকারের ঠাঁইও এখানে।

লেখক—পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষক আর কেউ আছেন?

সরকার—ছোকরাদের ভেতর পূর্ণ মহান্তি স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ-গবেষক। রেডিও-গবেষক হচ্ছেন হৃষীকেশ রক্ষিত।

লেখক—রেডিও-গবেষণার কথায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—অধ্যাপক শিশির মিত্র'র ল্যাবরেটরিতে গবেষক র'য়েছেন কারা?

সরকার—হৃষীকেশ ছাড়া যতীন ভড়, জ্ঞানশরণ চ্যাটার্জি, সত্যেন ঘোষ, সুধাংশুশেখর ব্যানার্জি, সুকুমার দাশ-শর্মা ইত্যাদি কয়েকজনের গবেষণা পত্রিকায় বেরিয়েছে।

লেখক—দু'টা বিজ্ঞান-কলেজের নাম কর্‌লেন কেন?

সরকার—একটা লোআর সার্কুলার রোডে। এইখানে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন চিত্তবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার চর্চা হয়। আর একটা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। সেখানকার পঠন-পাঠন চলে উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যা সম্বন্ধে। গবেষণার ব্যবস্থা আছে দুই বাড়ীতেই। কল্‌কাতায় অন্যান্য গবেষণা-কেন্দ্রেও আছে।

লেখক—কোথায়-কোথায়?

সরকার? বোস-ইন্‌স্টিটিউটের নাম প্রায় সকলেই জানে। এই প্রতিষ্ঠানের আসল কাজই গবেষণা। মহেন্দ্র সরকার-প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন গবেষণা-কেন্দ্র হিসাবে রামণের কাজের জন্য জগদ্বিখ্যাত। তা ছাড়া র'য়েছে প্রেসেডেন্সি কলেজ। সেকালের জগদীশ ও প্রফুল্ল এই কলেজের ল্যাবরেটরিতেই গবেষণা চালিয়েছেন।

লেখক—আজকাল প্রেসিডেন্সিতে গবেষণার আবহাওয়া কিরূপ?

সরকার—আবহাওয়া বজায় আছে। রসায়নে পঞ্চানন নিয়োগী, কুদরতি খোদা আর সুবোধ মজুমদার ইত্যাদি গবেষকদের নাম করা চলে। পঞ্চানন আজকাল পেন্‌শনে। পদার্থবিদ্যার বিভাগে প্রশান্ত মহালানবিশ প্রধানতঃ অঙ্ক-গবেষক। সংখ্যা-বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরি কায়েম হ'য়েছে এঁর হাতে। প্রশান্তর তদবিরে বাহাল আছে সংখ্যা বিজ্ঞানের ছোকরা গবেষক কয়েক জন। রাজচন্দ্র বসু ইত্যাদি কেহ-কেহ উঁচু দরের ওস্তাদ। প্রশান্ত বয়সে মেঘনাদ, সত্যেন, শিশির ইত্যাদির দলস্থ,—অর্থাৎ পঞ্চাশ পার হ'য়ে গেছে; কাজেই প্রবীণ। সরকারী কাজে ডাক পড়ে ভূতত্ত্ববিদ্যায় মনোমোহন চ্যাটার্জির কাজকর্ম সুপরিচিত।

লেখক—উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানে বাঙালী গবেষকদের কাজকর্ম আছে?

দরকার—ছোক্‌রাদের ভেতর পরম ভাদুড়ীর নাম কর্‌তে পারি। কালীপদ বিশ্বাস শিবপুরে বটানিক্যাল বাগানের কিউরেটর। তাঁর কাজকর্ম উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যায় নামজাদাদের অন্যতম সহায়রাম বসু,—বয়সে প্রবীণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান চলে আজও মারাঠা পণ্ডিত আঘারকারের তদবিরে। গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে বই লিখেছেন। বামনদাস বসু ছিলেন এই বিভাগে অন্যতম পথ-প্রবর্তক। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশ বসু ছিলেন অতি-সেকালের উদ্ভিদ্‌-গবেষক।

লেখক— অঙ্ক-বিজ্ঞানে একালের বাঙালীর নাম-কাম আছে?

সরকার—মেঘনাদের কাছাকাছি বয়সের অঙ্ক-গবেষক নিখিল সেন। সংখ্যাশাস্ত্রী প্রশান্ত মহালানবিশ তো অঙ্ক-গবেষক বটেই। প্রবীণদের ভেতর সুরেন গাঙ্গুলি আর নৃপেন সেন উল্লেখযোগ্য। ছোকরাদের ভেতর নাম আছে ব্রতীশঙ্কর রায়ের আর শিশিরেন্দু গুপ্তর। একজন মেয়ের নাম কর্‌তে চাই। সংখ্যা-বিজ্ঞানের গবেষণায় মোতায়েন দেখা যায় চামেলী বসুকে। চামেলী ডাক্তার অমিয় বসুর স্ত্রী।

লেখক—জীবজন্তুর বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষক কে-কে?

সরকার—শশীভূষণ মিত্র আর বনওআরিলাল চৌধুরীকে সেকালের জীবজন্তু-গবেষক বল্‌তে পারি। সমরেন্দ্র মৌলিক আর একেন ঘোষ তাঁদের পরবর্তী যুগের লোক। একালের ভেতর মাছের গবেষণায় বাহাল আছেন হিমাদ্রি মুখার্জি। পোকা-মাকড়ের গবেষক হচ্ছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। বাঙ্‌লাদেশের বাইরে আছেন হরেন রায়। তাঁর কাজ জীবজন্তুর আদিম অবস্থা নিয়ে। রোগবাহক কীট-পতঙ্গের গবেষক হচ্ছেন ভূদেব বসু।

লেখক—ভূ-তত্ত্বের গবেষক কারা?

সরকার—আগেকার দিনে হেম দাশগুপ্ত আর কিরণ সেনগুপ্ত। তাঁদেরও আগে ছিলেন টাটা-কারখানার জন্য লোহার খনির আবিষ্কারকর্তা প্রমথ বসু। বর্তমানের জন্য মনোমোহন চ্যাটার্জি, নির্মল চ্যাটার্জি, সন্তোষ রায়, শিবসুন্দর দেব ইত্যাদি কয়েকজনের নাম কর্‌তে পারি।

উপেন ব্রহ্মচারী, বামনদাস বসু, কেদার দাশ, নীলরতন সরকার, গোপাল চ্যাটার্জি

২২শে জুলাই ১৯৪৪

লেখক—আপনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষকদের ভেতর উপেন ব্রহ্মচারী আর বামনদাস বসুর নাম কর্‌লেন। আর কারু নাম কর্‌ছেন না কেন? নীলরতন সরকার বাদ যেতে পারেন কি?

সরকার—১৯০৫-১৪ সনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষক খুব কমই ছিল। নীলরতন ইত্যাদি চিকিৎসকেরা তখন নামজাদা আর প্রবীণ। কিন্তু চিকিৎসা-গবেষণায় তাঁর কাজকর্ম ছিল কিনা কেউ জান্‌তো না। শুনেছি ছেলেবেলায় কলেজ থেকে বেরুবার সম-সমকালে নীলরতন যকৃৎ-বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেছিলেন।

লেখক—তখনকার প্রবীণ চিকিৎসকদের ভেতর আর কাউকে গবেষক ঢুঁড়ে পাচ্ছেন না?

সরকার—জীবানুতত্ত্বের গবেষক ছিলেন গোপাল চ্যাটার্জি। বোধ হয় কেদার দাশের গবেষণা আর বই তখনকার দিনে বেরিয়েছিল। কেদারকে উপেন, বামন ইত্যাদি চিকিৎসা-গবেষকদের সমসাময়িক বলা যেতে পারে। প্রসব-বিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর এলাকার অন্তর্গত। বামন ছিলেন ভেষজ উদ্ভিদের গবেষক। কালাজ্বর-গবেষক হচ্ছে উপেন ব্রহ্মচারী। এঁদের বয়সের আর কাউকে গবেষক পাচ্ছি না। স্বদেশী যুগে আর কোনো চিকিৎসা-গবেষকের সন্ধান পাইনি। অস্ত্র-চিকিৎসায় গবেষক ছিলেন করুণা চ্যাটার্জি।

লেখক—বিধান রায়কে কোন্ দলে ফেল্‌বেন? এঁকে স্বদেশী যুগে চিন্‌তেন? ইনি প্রবীণ নন কি?

সরকার—বিধান হচ্ছেন এঁদের চেয়ে বয়সে বেশ-কিছু ছোট অপর দিকে একালের চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের ভেতর বয়সে প্রবীণ। বছর পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি হবে। আমার চেয়ে কম্‌সে-কম্ সাত-আট বছর বড়। গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে ওআর্কিং মেন্‌স্ ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এই আবহাওয়ায় বোধ হয় আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'য়ে থাক্‌বে (১৯০৭-১২)। কেননা আমাদের ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্র সত্যানন্দ রায় ছিল তার অন্যতম কর্মকর্তা। কর্পোরেশন মিউজিয়ামের জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী তখন ছোক্‌রা। এই আড্ডায় গতিবিধি ছিল। এঁরা সকলে নব-বিধানের ব্রাহ্ম। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম হয় আমাদের লোকপ্রিয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের মারফৎ। সত্যানন্দ বিনয় সেনের আত্মীয় (ভাগ্‌নে)।

লেখক—বিধান রায়কে একমাত্র চিকিৎসক বল্‌বেন, না চিকিৎসা-গবেষক ও বল্‌বেন?

সরকার—বিধানের ঠাঁই প্রধানতঃ নীলরতনের গোত্রে। তাঁর চিকিৎসা-গবেষণা এই অধমের মতন আনাড়ির কাছে অজ্ঞাত বটে। একালের পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর বয়সের ছোক্‌রা চিকিৎসক বা চিকিৎসা-গবেষকেরাও তার সংবাদ রাখে কি না বলা কঠিন। তবে নীলরতনের মতনই বিধানেরও গবেষণা-প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বেরিয়েছে। বহুমূত্র ইত্যাদি কোনো-কোনো বিষয়ে তাঁর গবেষণা আছে। কয়েকজন ডাক্তার-বন্ধুর কাছে শুনেছি। হালের বছর দশ-পনর'র ভেতরও কিছু-কিছু গবেষণা বেরিয়েছে।

বাঙালী চিকিৎসা-গবেষকদের যুগ

লেখক—তা হ'লে বাঙালী চিকিৎসা-গবেষকদের "দল" ও "যুগ" নেই বল্‌ছেন কি?

সরকার—ঠিক উল্টা বুঝিলি রাম!

লেখক—কেন?

সরকার—পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রাজ্যে গবেষক-বীরদের দল আছে ও যুগ চল্‌ছে ব'লেছি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও বিলকুল সেই অবস্থা। ঘটনাচক্রে বাঙালী চিকিৎসা-গবেষকদের "দল" দেখা যাচ্ছে মোটের ওপর ১৯২০ সন হ'তে ১৯৪৪ পর্যন্ত বছর পঁচিশেক ধ'রে চিকিৎসা-গবেষণার "যুগ" চল্‌ছে বল্‌তে পারি। বোধ হয় কম্‌সে-কম্ এক-শ বাঙালী ডাক্তার চিকিৎসাবিদ্যার নানা বিভাগে নিয়মিত গবেষণায় বাহাল আছে।

লেখক—এই্‌সব খবর পাওয়া যায় কোথ্‌থেকে?

সরকার—ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নাল পত্রিকার পাতা ওটানো ভাল। অবশ্য আনাড়িরা বুঝ্‌বে না। তবে নামগুলা দেখা যেতে পারে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নাল-পত্রিকাও আছে। এই দুটাই বাঙালী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত। তাছাড়া আছে সরকারী বা নিম-সরকারী ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল

গেজেট। এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক রবি চৌধুরী। ইনি নিজে ফুসফুস, নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-বিষয়ক গবেষণায় মোতায়েন র'য়েছেন।

লেখক—তা হ'লে আজকালকার এই চিকিৎসা-গবেষকদের দল ও যুগের প্রবর্তক কারা?

সরকার—বুঝাই যাচ্ছে যে, তারা সুধাময়, সমর মৌলিক, ব্রজেন ঘোষ, সহায়রাম বসু, নীলরতন ধর, মেঘনাদ ইত্যাদি অন্যান্য বিজ্ঞান-গবেষকদের সমসাময়িক ও জুড়িদার। বয়সে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন-ষাটের কোঠায় পড়্‌বে। বিধানের চেয়ে বছর সাত-আট-বছরের ছোট। বলা যেতে পারে যে, এঁরা ইস্কুল-কলেজে এই অধমেরই দু-চার বছর ওপরে বা নীচে অথবা এমন কি সমান-সমান। ১৯০৫-১৪ সনে এঁরা মেডিক্যাল কলেজে পড়্‌ছেন অথবা পাশ ক'রে বেরুচ্ছেন।

চারু বোস, বিরাজ দাশগুপ্ত, অমূল্য উকিল, হেমেন ঘোষ ও বিজলী সরকারের পরবর্তী চিকিৎসা-গবেষকের দল।

লেখক—এই বার বলুন তা হ'লে সহায়রাম, নীলরতন ধর, মেঘনাদ ইত্যাদি বিজ্ঞানবীরদের সমসাময়িক ও জুড়িদার চিকিৎসা-গবেষণায় বাঙালী বীর কে-কে?

সরকার—সকলের নামই কি জানি? দুএকজনের কথা বল্‌তে পারি। তা ও আহাম্মুকের মতন।

লেখক—তা-ই সই। এ-সব খবর আর কে-ই বা দেবে?

সরকার—মেঘনাদের বয়স একান্ন-বাআন্ন। ট্রপিক্যাল ইস্কুলের বর্তমান ডিরেক্‌টর হচ্ছেন বিরাজ দাশগুপ্ত। এঁকে পঞ্চান্ন-ষাট বছুরে চিকিৎসা-গবেষকদের অন্যতম প্রবর্তক বল্‌তে পারি। প্রত্নপ্রাণ ও পরগাছা (পারাসাইট) ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণায় ইনি দিগ্‌বিজয়ী। চারু বোস জীবাণু-গবেষণায় নামজাদা,—বিরাজের চেয়ে বোধ হয় বয়সে বড়। অমূল্য উকিল যক্ষ্মা ইত্যাদি নানা রোগের গবেষক হিসাবে সুপরিচিত। হেমেন ঘোষ ওষুধ-গবেষক। শারীর-বিদ্যার গবেষক হচ্ছেন বিজলী সরকার। ১৯২০ ২৫-এর ভেতর এঁদের সকলেরই গবেষণা সুরু বলা যেতে পারে। ওষুধ-রাসায়নিক সুধাময় ঘোষ আর ব্রজেন ঘোষ ও এই দলের অন্তর্গত।

লেখক—বিরাজ, চারু, অমূল্য, হেমেন ও বিজলী এই পাঁচজনকে চিকিৎসা-গবেষণার যুগ-প্রবর্তক বল্‌ছেন। এঁদের পরবর্তী গবেষকেরা গুন্‌তিতে অনেক?

সরকার—১৯৩০-৩৫ সনে গবেষণা-প্রবন্ধ প্রচারিত হ'য়েছে বিস্তর চিকিৎসা-গবেষকদের। বর্তমানে তারা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের লোক। বিরাজ, অমূল্য ইত্যাদির চেয়ে বয়সে ছোট।

লেখক—বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বয়সের কয়েক জন চিকিৎসা-গবেষকের নাম করবেন?

সরকার—প্রসব-বিজ্ঞানে সুবোধ মিত্র, প্রবোধ দাশ ও গোরাচাঁদ নন্দী সুপরিচিত। জীবাণু-বিদ্যায় যতীশ রায়, বাত-রোগে উমাপ্রসন্ন বসু, শিশু-চিকিৎসায় ক্ষীরোদ চৌধুরী, যক্ষ্মারোগে প্রফুল্ল সেন ও ক্ষিতীন দে ইত্যাদি গবেষকদের নাম আছে দেখ্‌তে পাই। জীব-রসায়নে হরেন মুখার্জির নাম আছে।

লেখক—আর কেউ চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় ঠিকানা কায়েম ক'রেছে? আপনার পারিভাষিক চালিয়ে প্রশ্ন করছি।

সরকার—রবি চৌধুরীর নাম আগে ব'লেছি। সেই সঙ্গে ফুস-ফুস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষক মন্মথ রায়চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। কালাজ্বর-গবেষক হচ্ছেন প্রতাপ সেনগুপ্ত। জ্বররোগের গবেষণায় নাম আছে চিত্ত দাশগুপ্ত। হৃৎপিণ্ডের গবেষক হিসাবে অমিয় বসু ও যোগেশ ব্যানার্জির প্রবন্ধাবলী দেখা যায়। অস্ত্রচিকিৎসায় গবেষক হচ্ছেন পঞ্চানন চ্যাটার্জি আর প্রেমনীহার রায়। সৌরীন ব্যানার্জি আর রুদ্রেন্দ্র পাল শারীর-বিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষক। মণি দে'কে বৈজ্ঞানিক মহলে জানে রবি চৌধুরী ইত্যাদির মতন অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গবেষক হিসাবে। বেরিবেরি-গবেষক রূপে হয়ত উনি পরিচিত। ওষুধ প্রস্তুত কর্‌বার বিজ্ঞানে গবেষক হচ্ছেন বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, সুধাময় ঘোষ, ব্রজেন ঘোষ ইত্যাদি। বিষ্ণু ত্রিবেদী রোগনির্ণয় সম্বন্ধে গবেষণা ছেপেছেন। সুবোধ মিত্রকে ক্যান্‌সার-গবেষক ব'লেও লোকেরা জানে। সৌরীন ঘোষ যৌন রোগের গবেষক।

লেখক—এই সকল চিকিৎসা-গবেষকদের নাম বাঙলাদেশের বাইরে আছে?

সরকার—আজকাল ফি-বছর ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মেলন বসে। কাজেই আনাগোনা আর দহরম-মহরম চলে। সুতরাং অ-বাঙালী গবেষকেরা বাঙালী গবেষকদের নাম-ধাম-কাম সব কিছুই জান্‌তে পারে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক জানা-জানির আসল বাহন হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় গবেষণা-ছাপাছাপি। কাজেই একালে অজানা কেহ থাকে না। তবে কার গবেষণা টেঁকসই, কোন্ গবেষণাটা উঁচুদরের মাল তার জহুরি চিকিৎসা-গবেষকরা নিজে। বাঙালী গবেষকদের ইজ্জদ অ-বাঙালী গবেষক মহলে কতটা তার সন্ধান দিতে পার্‌বে বিধান, অমূল্য, মণি, পঞ্চানন, রবি ইত্যাদি সমজদারেরা।

চাই ফি-বছর ১২৫ চেলা-গবেষকের ভাত-কাপড়

২৮শে জুলাই ১৯৪৪

লেখক—আপনি গণ্ডা-গণ্ডা গবেষকের নাম ক'রে চ'লেছেন। আগেকার দিনে এত নাম শুনা যেতো না কেন?

সরকার—এরি নাম বঙ্গ-বিপ্লব, একেই বলে বাঙালীর দিগ্‌বিজয়। বাঙালীর বাচ্চা বিজ্ঞান-জগতে দিগ্‌বিজয়ী হবার জন্য পয়সার মুখ দেখা যেতো না।

লেখক—গবেষণার জন্য পয়সা খরচের ব্যবস্থা কোথায়?

সরকার—আজকাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার হ'তে হ'লে কিঞ্চিৎ-কিছু গবেষণা জরুরি হয়। চাক্‌রির আগে গবেষণা, চাকরির সঙ্গে-সঙ্গে গবেষণা, চাকরীর পরেও—অন্ততঃ কয়েক বছর—চাই গবেষণা। চাক্‌রির টানে সকলেই বাপ্-বাপ্ ক'রে কিছু-কিছু গবেষণায় লেগে থাক্‌তে বাধ্য হয়।

লেখক—চাক্‌রির টানে গবেষণা? এই ব্যবস্থা ভাল কি?

সরকার—দুনিয়ার আর কোনো ব্যবস্থা নাই। বিনা পয়সার লোকে লেখাপড়া চালাতে পারে না। এতো অতি-সোজা কথা।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে,—আজকাল টাকাকড়ি ঢালা হচ্ছে ব'লে গবেষণা চল্‌ছে?

সরকার—বিলকুল তাই। ছয়-কোটি নরনারীর দেশে হাজার-হাজার বাঙালী বাচ্চাকে গবেষকরূপে বেঁধে রাখা উচিত। ১৯৪৪ সনেও আমরা র'য়েছি নেহাৎ নিচু ধাপে। আমাদের অবস্থা এখনো বেশ-কিছু কাহিল। তবে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার পেছনে র'য়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা। গবর্মেন্ট খানিকটা ভারতীয় তাঁবে এসেছে। এইজন্য সরকারী শাসন-বিভাগের টাকা কিছু-কিছু গবেষণায় খরচ হচ্ছে। ১৯০৫ সনে গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব সুরু হ'য়েছিল। তাতে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উৎপত্তি। বিজ্ঞান-গবেষণায় ঝাঁজ আর যন্তরনিষ্ঠার দরদ তার অন্যতম লক্ষণ। সেই বিপ্লবেই রাসবিহারী ঘোষ আর তারক পালিতের দান। মনে আছে তো? সেই টাকায়ই মেঘনাদ হ'তে পরম ভাদুড়ী পর্যন্ত বাঙালী বিজ্ঞানবীরদের গবেষণার সূত্রপাত।

লেখক—আপনি মনে করেন যে, বেশী-বেশী টাকা ঢাল্‌তে পার্‌লেই বাঙালীরা বিজ্ঞান-জগতে আর ও বেশী-বেশী গবেষণা দেখাতে পার্‌বে?

সরকার—তবে আর ব'ক্‌ছি কী? তাই তো আসল কথা। চাই লাখলাখ রূপেয়া, কোটি-কোটি টঙ্কা। তাহ'লে বাঙালী বিজ্ঞানবীরদের দৌলতে দুনিয়ায় যুগান্তর এসে যাবে। গবেষকদের দল বাড়াবার উপায় হচ্ছে—রূপেয়া, রুধির, টঙ্কা।

লেখক—আপনি তাহ'লে বাঙলা দেশের জন্য কী চান?

সরকার—যেন এই অধম একটা লোক? তার আবার চাওয়া চাওয়ি? আমি চাইলেই যেন কিছু-একটা দাঁড়িয়ে যাবে?

লেখক—তবুও দিন আপনার পাঁতি।

সরকার—ধরা যা'ক,—আজ বাঙলা দেশের সকল-প্রকার বিজ্ঞান বিভাগ গুন্‌তিতে একশ'। আরও ধরা যাক—যেন প্রত্যেক বিজ্ঞানবিভাগে পাশ হচ্ছে গোটা পঞ্চাশেক। মেডিক্যাল বিভাগগুলাও ধ'রে নিচ্ছি।

লেখক—পঞ্চাশ চিকিৎসক, পঞ্চাশ জন ভূতত্ত্বশাস্ত্রী, পঞ্চাশ জন উদ্ভিদশাস্ত্রী, পঞ্চাশ জন রসায়নশাস্ত্রী ইত্যাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রী ফি-বছর বাঙ্‌লা দেশে বেরুচ্ছে কি?

সরকার—না। ধ'রে নিচ্ছি,—গবেষক-বৃদ্ধির কর্মকৌশল বুঝাবার জন্য। সব শুদ্ধ হাজার পাঁচেক এম-এস্‌-সি, এম-বি ইত্যাদি বিজ্ঞানসেবক আজকাল ফি-বছর বাঙলা দেশে বেরোয় না। বেরোয় শ'পাঁচেকেরও কম। এতে লাফালাফি কর্‌বার কিছু নেই। অবস্থা নেহাৎ শোচনীয়।

লেখক—কী বল্‌তে চাচ্ছেন তাহ'লে?

সরকার—বল্‌ছি যে,—যতগুলা এম এস্‌-সি, এম-বি ইত্যাদি পণ্ডিত বেরোয় তার কমসে-কম আধাআধিই ভালো ছেলে। ভালো ছেলে বললে আমি একমাত্র প্রথম শ্রেণীর পাশ দেখি না প্রথম শ্রেণীর বাইরেও অনেক ভাল ছেলে থাকে।

লেখক—আপনি তো এম-এ ক্লাশে ধনবিজ্ঞান পড়ান। ভাল ছেলে কেমন দেখ্‌তে পান?

সরকার—বার আনা ছেলেই ভালো। তাদের অনেকেই কিন্তু ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে,— এমন কি তৃতীয় শ্রেণীতেও পাশ হয়। কুছ্‌ পরোআ নাই। তৃতীয় শ্রেণীর পাশ-করা ছেলেরাও খাশা গবেষক হ'তে পারে।

লেখক—আচ্ছা তাহ'লে গবেষেণা সম্বন্ধে কী বলতে চান?

সরকার—এম-এস সি, এম-বি ইত্যাদি পরীক্ষায় পাশ-করা ছেলে-মেয়েদের শতকরা পঞ্চাশ জন ফি-বছর গবেষক হবার উপযুক্ত। কিন্তু তাদের শতকরা গোটা-পঁচিশেক চ'লে যায় বড়-বড় সরকারী চাক্‌রিতে অথবা স্বাধীন পেশায় অথবা বিদেশে। বাকী রইলো শতকরা গোটা পঁচিশেক। এই শতকরা পঁচিশ জনকে ফি-বছর গবেষণা-বৃত্তি দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত। এই আমার চাহিদা।

লেখক—আপনার পাঁতিটা বুঝ্‌বার জন্য ধ'রে নিলাম যেন, ফি-বছর শ-পাঁচেক এম-এস-সি আর এম-বি বেরুচ্ছে। এদের আড়াই-শ হচ্ছে ভাল ছেলে। তার ভেতর সরকারী চাক্‌রি ইত্যাদিতে যাচ্ছে ১২৫ জন। আপনার ইচ্ছা যে, বাকী ১২৫ জনকে গবেষক ক'রে বেঁধে রাখা হোক ফি-বছর। এই তো?

সরকার—হিসাবটা আমার ঠিক এই ধরণেরই। ১২৫ জনকে মাথা-পিছু ১০০্ টাকা ক'রে মাসিক তঙ্খা দেওয়া চাই। তা হ'লে বাঙালী জাতের গবেষণার বাজার বেশ-কিছু গম্-গম্ কর্‌তে পার্‌বে। তাতেও অবশ্য ছ'-কোটি বাঙালীব পেট ভর্‌তে পারে না। মনে রাখ্‌তে হবে যে,—এই গবেষকেরা অধ্যাপক নয়। এদেরকে অধ্যাপকেরা চেলা হিসাবে গ'ড়ে তুল্‌বে।

লেখক—বর্তমানে সরকারী-বেসরকারী বিজ্ঞান-বিভাগগুলায় মোটের ওপর কতজন চেলা-গবেষক আছে?

সরকার—আন্দাজে বল্‌বো যে, বোধহয় একশ'র বেশী চেলা-গবেষক তামাম বাঙলা দেশে নাই। আমি চাই ফি-বছর ১২৫ জন নতুন-নতুন চেলা-গবেষকের জন্য ভাত-কাপড়। আমার হাঁক শুনে সকলেই ভয় পাবে।

লেখক—চেলা-গবেষকদেরকে ক'-বছর মাসিক বৃত্তি দেওয়া উচিত?

সরকার—কমসে-কম্ বছর তিনেক। তা হ'লে তৃতীয় বছর থেকে ফি-বছর ৩৭৫ জন চেলা-গবেষক কাজ কর্‌তে পার্‌বে,—অঙ্ক হ'তে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে।

লেখক—এই জন্য খরচ পড়্‌বে কত?

সরকার—গবেষণা-বৃত্তি মাসিক ১০০ টাকা। কাজেই বার্ষিক খরচ মোটের ওপর ৪৯০,০০০ টাকা। ধরা যাক লাখ পাঁচেক মুদ্রা।

লেখক—বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কি ফি-বছর এতগুলা গবেষণা-বৃত্তি দিতে সমর্থ?

সরকার—কতটা সমর্থ তা আমার জানা নেই। তবে আর-একটা কথা মনে রাখা উচিত। যন্ত্রপাতির কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, বিজলীর কারখানা, গ্যাসের কারখানা, ওষুধের কারখানা, রেল-তেল-খনি-বন, আর সরকারী নদী-বিভাগ, খাল বিভাগ ও সড়ক্-বিভাগ ইত্যাদি নানা কর্মকেন্দ্রে ছোক্‌রা বিজ্ঞান-সেবকদেরকে গবেষক বাহাল করা সম্ভব। তার ব্যবস্থা করা উচিতও। একমাত্র ইস্কুল-কলেজের ওপর বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য নির্ভর করা ঠিক নয়।

আগস্ট ১৯৪৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাই রকমারি বিদেশী-সংস্কৃতি-পরিষৎ

২রা আগস্ট ১৯৪৪

হেমেন—আপনি বিদেশী তাঁবে বিদেশীদের সঙ্গে ভারতবাসীর মেলামেশার ব্যবস্থা পছন্দ করেন না কেন?

সরকার—বিদেশীরা কোনোদিনই ভারতবাসীকে মানুষের মতন দেখে না। ভারতীয় নরনারীর সঙ্গে সামনে-সামনে ব্যবহার চালাতে তারা অনভ্যস্ত। (পৃঃ ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৯, ৬৬৫, ৬৬৮)

লেখক—ভারতবাসীরা কি বিদেশীদের সঙ্গে সমানে-সমানে যোগা-যোগ চালাতে অভ্যস্ত?

সরকার—মোটেই না। বিশেষতঃ কল্‌কাতা, বম্বে ইত্যাদি ভারতীয় শহরে কোনো বিদেশীর সঙ্গে প্রায়-কোনো ভারত-সন্তান সমানে-সমানে লেনদেন চালাতে অভ্যস্ত নয়। কোনো-কোনো ভারত সন্তান প্যারিসে, নিউইয়র্কে, বার্লিনে, তোকিওতে, রোমে, মায় লন্ডনেও বিদেশীদের সঙ্গে সমানে-সমানে লেনদেন চালাতে সুপটু। কিন্তু তারাও ভারতবর্ষে বিদেশীদের সঙ্গে লেনদেনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ চালিয়ে চল্‌তে পারে না।

লেখক—এই অবস্থায় কারণ কী?

সরকার—ভারতবর্ষ বিদেশীদের গোলাম। বিদেশী লোকজন প্রায় সকলেই ভারতীয় নরনারীকে গোলাম ছাড়া আর কিছু সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত নয়। তারা চৌরঙ্গি-মহাল্লা ছাড়া অন্য কোনা মহল্লায় দু-এক মিনিটের জন্য যেতে হ'লেও নাক শিঁট্‌কায়।

লেখক—কী ব'ল্‌ছেন?

সরকার—এমন কি মেডিক্যাল কলেজ, ট্রপিক্যাল কলেজ, ট্রপিক্যাল স্কুল, ইনস্টিটিউট অব হাইজিন, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি কেন্দ্রে আসাও বিদেশীরা নিজেদের পক্ষে অপমানজনক বিবেচনা করে। গোলাম নেটিভদেরকে রাজা ক'রে দিয়ে যাবার জন্য তাদের কেউ-কেউ কালে-ভদ্রে হয়ত এদিকে পা মাড়াতে আসে। কিন্তু ভারতীয় বন্ধুদেরকে তারা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে,—এই অঞ্চলগুলা তাদের বদ-হজম সৃষ্টি কর্‌তে বাধ্য।

লেখক—আপনি বিদেশীদের নাড়ী-নক্ষত্র এত দূর জানেন?

সরকার—তাহ'লে আরও বল্‌ছি: এমন কি খৃষ্টিয়ান পাদ্রী সাহেবরাও এই সকল অঞ্চলকে অস্পৃশ্য-পারিয়া-গোলামদের জনপদ সম্‌ঝে থাকে। অথচ পাদ্রীদের পেশা হচ্ছে মামুলি আর গরীব লোকজনের সঙ্গে মেলমেশ করা। বিদেশীদের সঙ্গে সত্যিকার সামাজিক লেনদেন ভারতীয় নর-নারীর পথে বিলকুল অসম্ভব।

লেখক—তাহ'লে আপনি ভারতবর্ষে ভারতীয় নর-নারীর পক্ষে বিদেশী সংস্কৃতির জন্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা অসম্ভব বিবেচনা করেন?

সরকার—অসম্ভব বিবেচনা কর্‌বো কেন? খুবই সম্ভব। বাঙালীর বাচ্চারা বাঙালীর তাঁবে বিদেশী-সংস্কৃতি-পরিষৎ কায়েম ক'রবে। তাতে কোনো বিদেশী স্ত্রী-পুরুষের সংশ্রবে

থাক্‌বে না। দরকার হ'লে রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো উৎসবে বিদেশীদেরকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা চল্‌তে পারে। তারা এলো তো এলো, না এলো তো ব'য়ে গেলো। এইরূপ উচিত বাঙালীর মতিগতি।

লেখক—তাহ'লে বিদেশী সংস্কৃতি-পরিষৎ চল্‌বে কী ক'রে?

সরকার—বিদেশী সংস্কৃতি-পরিষদের নিত্য-নৈমিত্তিক খোরাক হবে বিদেশী ভাষার চর্চা। তাছাড়া বিদেশী বিজ্ঞান, বিদেশী সুকুমার শিল্প ও সঙ্গীত, বিদেশী সাহিত্য, বিদেশী দর্শন, বিদেশী রাষ্ট্রনীতি, বিদেশী অর্থশাস্ত্র, বিদেশী সমাজ-বিজ্ঞান, বিদেশী যন্ত্রবিজ্ঞান ইত্যাদি রকমারি বিদেশী বিদ্যা-কলা বা জ্ঞানবিজ্ঞানের পঠন-পঠন, অনুসন্ধান-গবেষণা আর বক্তৃতা-বিতণ্ডা, পুঁথি-প্রকাশ, পত্রিকা-প্রচার ইত্যাদি কাজ চল্‌তে থাক্‌বে নিয়মিতরূপে। তার জন্য বিদেশীদের সঙ্গে ছোঁআছুঁয়ির দরকার হ'তে পারে না। এই ধরণের স্বাধীন বঙ্গীয়-ফরাসী-পরিষৎ, স্বাধীন বঙ্গীয়-রুশ-পরিষৎ, স্বাধীন বঙ্গীয়-মার্কিণ-পরিষৎ, স্বাধীন বঙ্গীয় জাপানী পরিষৎ ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন পরিষৎ আমি বাঙলা দেশে চাই। বাঙালীর বিদ্যা বাড়ানো আবশ্যক ফ্রান্স-জার্মাণি-রুশিয়া-আমেরিকা-জাপান-ইতালি ইত্যাদি বিদেশ সম্বন্ধে। বাঙালী জাতের অভিজ্ঞতা বাড়াতে হবে এই সকল দেশের কাজকর্ম, লেন-দেন, সু-কু ইত্যাদি সকল প্রকার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে।

লেখক—এই ধরণের রকমারি বিদেশী-পরিষৎ কল্‌কাতায় কায়েম হওয়া সম্ভব কি?

সরকার—ফ্রান্স নিয়ে যদি কয়েকজন বাঙালী উঠে প'ড়ে লাগে তাহ'লে বঙ্গীয়-ফরাসী-পরিষৎ কায়েম হ'তে পারে। আমেরিকা নিয়েও ঠিক সেইরূপ চল্‌তে পারে। ইত্যাদি। কিন্তু আর একটা সহজ উপায় আছে।

লেখক—কী সেটা?

সরকার—বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীনে আট-দশটা স্বতন্ত্র বিদেশী-সংস্কৃতি-পরিষৎ কায়েম করা খুবই সম্ভব।

লেখক—কারণ কী?

সরকার—কেননা মার্কিণ, ফরাসী, জার্মাণ, জাপানী চীনা, তুর্ক, ইরাণী, রুশ, ইতলিয়ান ইত্যাদি নানা দেশও সমাজ সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল অধ্যাপক দু-এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল আছে।

লেখক—এক মাত্র এই কারণ?

সরকার—অধিকন্তু এই সকল দেশ সম্বন্ধে বি-এ, বি-এসসি, এম-এ, এম-এসসি ক্লাসে ছাত্রদেরকে ইতিহাস অথবা সাহিত্য অথবা অর্থকথা অথবা সমাজতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে কিছু-না-কিছু পড়্‌তে হয়। প'ড়ে পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। কাজেই বিশ্ববিদালয়ের আওতায় জাপানী-পরিষৎ, ফরাসী-পরিষৎ, চীনা-পরিষৎ, ইরাণ-পরিষৎ, তুর্ক-পরিষৎ, জার্মাণ-পরিষৎ, রুশ-পরিষৎ ইত্যাদি রকমারি বিদেশী-সংস্কৃতি-পরিষৎ চালানো বেশ সহজেই খাপ-খেতে পারে।

লেখক—এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বেড়ে যাবে না কি?

সরকার—বেশী-কিছু নয়। তবে প্রত্যেক বিদেশী পরিষদের জন্য একটা ঘর লাগ্‌বে। সেই ঘরে বিদেশী সংস্কৃতি বিষয়ক লাইব্রেরি ও পাঠাগারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে।

বিদেশীর সঙ্গে ভারতবাসীর সামাজিক মেলমেশ

লেখক— আপনি তাহ'লে সামাজিক মেলমেশের জন্য বিদেশীদের সঙ্গে ভারতীয় নরনারীর ক্লাব, মজলিশ বৈঠক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পছন্দ করেন না?

সরকার—পছন্দ করি নিশ্চয়। কিন্তু ভারতবর্ষে তা সাধারণতঃ সম্ভব নয়। (পৃঃ ৬৫৫, ৬৬৮, ৬৬৯)

লেখক—সাধারণতঃ সম্ভব নয় কেন?

সরকার—সাধারণ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা বড়-জোর মাসিক শ' আড়াই-চার পাঁচেক টাকা রোজগার করে। উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক, বণিক, বেপারী, ব্যাঙ্কার, বীমা-কর্মী, অধ্যাপক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের আয় সাধারণতঃ এর বেশী যায় না। তাদের পক্ষে আটপৌরে ভাবে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, মার্কিণ, জাপানী ইত্যাদি নর-নারীর সঙ্গে ঘরোআ বৈঠক চালানো অসম্ভব।

লেখক— কেন? অসম্ভব কী জন্য?

সরকার—এই আয়ের বাঙালীর বাচ্চার মোটর নাই। বিদেশীরা যে ধরণের বাড়ীতে বসবাস করে সেই ধরণের বাড়ীতে হেঁটে যাওয়া সামাজিক বৈঠকের পক্ষে অ-শোভন। কল্‌কাতার কোনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, মার্কিণ, জাপানী বেপারী বা চাক্‌রে হাজার দুইয়েকের কম কামায় না। তাদের বাড়ী-ঘর, আসবাব-পত্র, ঝী-চাকর ইত্যাদির ব্যবস্থায় গরীব-গুর্বো বাঙালীরা হতভম্ব হ'তে বাধ্য। শ-পাঁচেক রূপেয়ার বাঙালীর বাড়ীতে হাজার দুইকে রূপেয়ার বিদেশীর আসা যাওয়া অসম্ভব। আবার হাজার-দুয়েকের বিদেশীর ঘর-বাড়ীতে শ-পাঁচেকের বাঙালীর পক্ষে ঘরোআ বোধ করা অসম্ভব। তেলে-জলে কখনো মিশ্‌তে পারে না। সত্যি কথা,— পয়সাওয়ালা বাঙালীর সঙ্গেও গরীব বাঙালীর সামাজিক মেলমেশ অসাধ্য।

লেখক—তা হ'লে বিদেশীর সঙ্গে ভারতীয়ের মেলামেশ কি ঘটে না বল্‌তে চাচ্ছেন?

সরকার—কিঞ্চিৎ-কিছু ঘটে বৈকি। কমসে-কম হাজার-দুইওয়ালা বাঙালী, মারোআড়ি আর অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে হাজার-দুইওয়ালা বিদেশীর আনাগোনা মাঝে-মাঝে ঘ'টে থাকে। তবে বিদেশীদের বাড়ীতে ধনী ভারতবাসীরা বড়-বেশী নিমন্ত্রিত হয় না। ধনী ভারতীয়ের বাড়ীতেও বিদেশীরা ক্বচিৎ-কখনো আসে। সত্যিকার ঘরোআ বন্ধুত্ব বিদেশীতে-ভারতবাসীতে যারপর-নাই কম। ক'জন বাঙালীর বাড়ীতে বছরে ক'জন বিদেশী আসে,— বোধহয় আঙুলে গুনে বলা যায়। আবার বিদেশীদের বাড়ীতেও খুব-কম বাঙালীর পাত-পিঁড়ি প'ড়ে থাকে।

লেখক— তাহ'লে হাজার-দুইওয়ালা বাঙালী ও বিদেশীর যোগাযোগ ঘটে কী ক'রে?

সরকার—গ্র্যান্ড হোটেল, গ্রেট-ঈস্টার্ণ হোটেল, ক্যালকাটা ক্লাব, ফির্পো ইত্যাদি ভোজনালয়ে মেলমেশের ব্যবস্থা করা পয়সাওয়ালা বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় আর বিদেশীদের দস্তুর।

লেখক—তাতে বিদেশীর সঙ্গে ভারতীয়ের বন্ধুত্ব কায়েম হয় কতটা?

সরকার—সত্যিকার বন্ধুত্ব জমে না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের বুঝাপড়া হ'তে পারে মন্দ নয়। তাছাড়া চাকরি-বাক্‌রি, পদোন্নতি, উপাধি-খেতাব

ইত্যাদির ব্যবস্থাও ঘ'টে যায়। কিন্তু বিদেশীরা কোনো দিনই ভোলে না যে,— গোলাম নেটিভি পারিয়ার সঙ্গে তারা কয়েক মিনিট হেসে গল্প করছে। আর বাঙালীরা আর অন্যান্য ভারতীয়েরাও ভুল্‌তে পারে না যে, তারা মনিব জাতের নরনারীর সঙ্গে দু'চার মিনিট হাসাহাসির সুযোগ পেয়ে স্বর্গে উঠ্‌ছে। এসব হাসিখুসি আসল বন্ধুত্বের যোগাযোগ নয়।

লেখক—আপনি কি এই ধরণের সম্বন্ধ পছন্দ করেন?

সরকার—হাঁ। যার-যার পয়সা আছে তাদের সুযোগ থাক্‌লে বিদেশীদের সঙ্গে হোটেলে-রেস্টরান্টে সামাজিক লেনদেন চালানো উচিত। আর যদি বিদেশীদেরকে নিজ-নিজ বাড়ীতে ডেকে আনা সম্ভব হয় তাও করা বাঞ্ছনীয়। পয়সাওয়ালা ভারতীয় নরনারীকে এই ধরণের শল্লা দেওয়া আমার আটপৌরে রেওয়াজ।

বঙ্গে রুশ-আন্দোলনের সূত্রপাত (১৯২১)

জার্মাণ-জাপানী-রুশ চোখে ভারতবাসী

৭ই আগস্ট ১৯৪৪

লেখক—আপনি ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্মাণ, জাপানী ইত্যাদি সকল বিদেশীকে এক দলের ভেতর ফেল্‌তে চাচ্ছেন?

সরকার—ভারতবাসীর সঙ্গে সামাজিক মেলমেশ সম্বন্ধে ইংরেজে-জার্মাণে ফারাক নাই, জার্মাণে-ফরাসীতে ফারাক নাই, মার্কিণে-ইংরেজে ফারাক নাই, মায় জাপানীতে-ইংরেজেও ফারাক নাই। মার্কিণ, ফরাসী, জার্মাণ, জাপানী—এরা সকলেই ভারতবাসীকে ইংরেজের চোখে দেখে। এদের সকলের চোখেই ভারত-সন্তান গোলাম নেটিভ পারিয়া।

লেখক—ইংরেজে-জার্মাণে লড়াই থাকা সত্ত্বেও? ইংরেজ-জাপানীতে লড়াই থাকা সত্ত্বেও?

সরকার—লড়াইয়ের আগে ইংরেজে-জার্মাণে দুনিয়ার সর্বত্র টক্কর চল্‌তো। জাপানীতে-ইংরেজেও টক্কর চল্‌তো। তা সত্ত্বেও জার্মাণরা ভারতসন্তানকে গোলামের জাত্‌ সমঝে চল্‌তো। জাপানীরাও ভারত সন্তানকে গোলাম ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তো না।

লেখক—লড়াইয়ের সময় সে-কথা খাটে কি?

সরকার—আজকাল লড়াই চল্‌ছে। তাতে নতুন এমন কী হ'য়েছে? ইংরেজের সঙ্গে জার্মাণদের কায়েম কর্‌বার জন্যে। তাতে গোলাম ভারতের সঙ্গে জার্মাণদের সমানে-সমানে মানুষের মতন ব্যবহার কর্‌বার প্রয়োজন হয় না।

লেখক—জাপানীতে-ইংরেজেতে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য কী?

সরকার—ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে জাপানীরা। তারাও বাপ্‌কা বেটা। বাপকা বেটা লড়ে বাপ কা বেটার সঙ্গে। সমানে-সমানে লড়াই। দুনিয়ার বিশ্ব-সাম্রাজ্য চায় জাপানীরা। তারা ইংরেজের সমান হ'তে চায়। তাতে ভারতীয় নরনারীকে তারা নিজেদের সমান ভাব্‌তে রাজি হবে কেন?

লেখক—আজকাল ভারতীয় রাষ্ট্রিকদের ভেতর আবার কেহ-কেহ কমিউনিস্ট। তারা রুশ-পন্থী, রুশ-মেজাজী লোক। আপনি কি মনে করেন যে, রুশ কমিউনিস্ট সাম্যবাদীরা ভারতীয় নরনারীর সঙ্গে সমানে-সামনে মানুষের মতন ব্যবহার কর্‌তে রাজি?

সরকার—রুশরা ইংরেজ-জার্মাণ-মার্কিণ-ফরাসী-জাপানীদেরই মাস্‌তুতো ভাই। তারা হয়ত বা "স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ"।

লেখক—রুশদের সম্বন্ধে একথা ব'ল্‌ছেন কেন?

সরকার—রুশরা নিজ সমাজেই আজ পর্যন্ত সত্যিকার সামাজিক সাম্য কায়েম কর্‌তে পারে নি। এরা চিরকালই বাদশাহী, "জার"-ধর্মী অসাম্যের জাত্‌। জাতিভেদের সমাজ মেনে চল্‌তে এরা অভ্যস্ত। এরা স্বদেশী গোলামদেরকেও গোলাম ছাড়া আর-কিছু ভাব্‌তো না। এই হচ্ছে রুশিয়ার সনাতন ধর্ম।

লেখক—বোলশেভিক রুশিয়ার নতুন সমাজ কায়েম হয়নি কি?

সরকার—সোভিয়েট রুশিয়ার ভেতরকার প্রায় আধা-আধি লোক শাদা-রুশদের গোলাম। গোলামদের প্রভু সেই রুশ জাত্‌ ভারতীয় নরনারীর সঙ্গে ব্যবহারে সাম্য-সম্বন্ধ কায়েম কর্‌বে কোথ্‌থেকে?

লেখক—ভবিষ্যতে রুশদের মেজাজ বদ্‌লাবে না কি?

সরকার—আজও রুশ নরনারীর সঙ্গে,—ভারতের চৌহদ্দির ভেতর,—বহুসংখ্যক ভারত-সন্তানের মোলাকাৎ হয় নি। যদি কখনো কল্‌কাতায়-বোম্বাইয়ে ডজন-ডজন রুশের সঙ্গে ডজন-ডজন ভারতবাসীর দেখা-সাক্ষাৎ হয় তখন বোঝা যাবে যে,—হাড়ে হাড়ে রুশরা ইংরেজের মাস্‌তুতো ভাই ছাড়া আর কিছু নয়।

সত্যিকার বিদেশী বন্ধু

লেখক—জার্মাণ, জাপানী, ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ ইত্যাদি নর-নারীর ভেতর দু'একজনও নাই কি যারা কোনো-কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে সত্যিকার বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কায়েম করে?

সরকার—অসম্ভব নয়। আমেরিকায় বহুসংখ্যক মার্কিণ নর-নারী—রঙের গোলমাল থাকা সত্ত্বেও,—বহুসংখ্যক বাদামী ভারতীয়ের সঙ্গে ভাই-বোনের মতনই ব্যবহার করে। জাপানেও অনেক জাপানী লোক ভারতসন্তানের সঙ্গে সত্যিকার বন্ধুত্ব চালাতে অভ্যস্ত। জার্মাণির অনেক ক্ষেত্রেই জার্মাণরা ভারতীয় নর-নারীকে একদম আপনার লোক সম্‌ঝে চলে। ফ্রান্সেও ফরাসীদের অনেকে ভারত-সন্তানকে ঘরোআ আত্মীয়ের মতন দেখে।

লেখক—বিলাতের ইংরেজেরা কিরূপ?

সরকার—এমন কি বিলাতেও ইংরেজের ভেতর বহুসংখ্যক লোক আছে যারা ভারতীয়কে গোলাম ভাবে না,—তাদের সঙ্গে সমানে-সমানে সামাজিক লেন-দেন চালায়। এই কথাটা খাটি সত্য। মজার কথা সন্দেহ নাই। মানুষের চরিত্র রকমারি।

লেখক—কিন্তু কল্‌কাতা, বোম্বাই ইত্যাদি ভারতীয় শহরে কোনো-কোনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, জাপানী, মার্কিণ নরনারী কি ভারতীয় নরনারীর সঙ্গে মানুষের মতন ব্যবহার করে না?

সরকার—এক কথায় সোজা জবাব ঃ—"না"। কালে-ভদ্রে ক্বচিৎ-কখনো হয়ত দু-একটা দিলদেরিয়া মেজাজের ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণ, জাপানী থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। সে-সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

লেখক—তাহ'লে ভারবর্ষে ভারতীয়েরা বিদেশীর সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ চালিয়ে কী ক'র্‌বে?

সরকার—হয়ত কিছু-না-কিছু ভারতবর্ষের উপকার করা সম্ভব। বিদেশী চরিত্র বুঝ্‌তে পারা একটা বড় লাভ। এই সকল মেলামেশায় ইংরেজে-ফরাসীতে কতটা হিংসা-টক্কর-ঝগড়া চলে হয়ত তার আন্দাজ পাওয়া যায়। মার্কিণে-ইংরেজে খাওয়া-খাওয়ি কতটা তাও দখলে আনা সম্ভব। ইংরেজে-ইংরেজে রেষারেষির আর আড়াআড়ির বহরও বুঝ্‌তে পারা যায়,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

লেখক—তাতে লাভ কী?

সরকার—এই সব জানা থাক্‌লে যখন-তখন ভারতীয়েরা ভারতীয় চরিত্রের নিন্দা ক'র্‌বে না। বিদেশী চরিত্রকে স্বর্গীয় চরিত্র সম্‌ঝে রাখার বাতিক ভারতীয় মেজাজ হ'তে খেদিয়ে দেওয়া যাবে।

লেখক—আর-কোনো লাভ আছ?

সরকার—তাছাড়া বিদেশীদের মুল্লুকে নিত্যি-নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন কর্মকৌশল কায়েম হচ্ছে। সেই সব সম্বন্ধে সহজেই ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব। তাতে ভারতীয় আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতির অন্য বেশ-কিছু হদিশ মিল্‌তে পারে। সে-সবও ভারতবর্ষের পক্ষে চরম লাভের কথা।

("রোটারি ক্লাব," "আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ," "শাদায়-বাদামীতে বৈঠকি যোগাযোগ," পৃঃ ৬৫৭-৬৬১, ৬৬৮-৬৬৯)

বেআক্কেল ও সাবধানী

লেখক—বিদেশীদের সঙ্গে ভারতীয়েরা সামাজিক লেনদেনে এলে ভারতীয় চরিত্র বদ্‌লাতে পারে কতটা?

সরকার—ভারতীয় নরনারীর ভেতর প্রধানতঃ দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর লোক কোনো-বিদেশী পরিবারের সঙ্গে আনাগোনা হ'লে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। তারা যেন চোদ্দপুরুষ স্বর্গে উঠ্‌লো এইরূপ ভাবে। তখন তারা স্বদেশী লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে ঠিক যেন বিদেশী মেজাজ পেয়ে বসে। ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করা তাদের আটপৌরে স্বধর্মে পরিণত হয়। ল্যাজ যেন তাদের খুব-মোটা হ'য়ে যায়। পাড়া-পড়শিরা আর কর্মক্ষেত্রের সহযোগীরা তাদের ল্যাজে পা দিতে ভয় পায়। এই শ্রেণীর নর-নারীকে আহাম্মুক, বেআক্কেল আর কাণ্ডজ্ঞানহীন ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

লেখক—দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতবাসী কিরূপ?

সরকার—তারা দেখে যে, দুএকজন ইংরেজ জার্মাণ-ফরাসী-মার্কিণ-জাপানী হয়ত তাদের সঙ্গে মেলমেশ চালাচ্ছে। কিন্তু সেই বিদেশীরাই আবার ভারতীয় কেরাণী-কর্মচারীদের সঙ্গে মানুষের মতন ব্যবহার করে না। ভারতীয় ঝী-চাকর-চাপরাশি-

দ্বারোআন-কুলীরা সেই বিদেশীদের আটপৌরে ব্যবহারে কুকুর-বিড়াল ছাড়া আর কিছু নয়। এই সকল দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার লুকিয়ে রাখা যায় না। সহজেই ধরা পড়ে।

লেখক—তার ফলে কী হয়?

সরকার—বহুসংখ্যক ভারতসন্তান আছে যারা ভারতীয় কেরাণী-কুলীদের সঙ্গে বিদেশীদের এইরূপ ব্যবহারে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারে না। তাদের পক্ষে বিদেশীদের সঙ্গে চা-খাওয়া-খাওয়ি অথবা ক্লাবে গা-ঘেঁশা-ঘেঁশি সত্যিকার মধুর লেন-দেনের সম্বন্ধ বিবেচনা করা অসম্ভব। তারা বিদেশীদের সঙ্গে সামাজিক লেন-দেন চালায় বটে,—কিন্তু বেআক্কেলের মতন তাদেরকে ভারতবন্ধু, বিশ্বপ্রেমিক, চরিত্রবান নরনারী ভাবে না।

লেখক—তাহ'লে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতবাসীরা বিদেশীদের সঙ্গে আদৌ লেন-দেন চালায় কেন?

সরকার—সংসারে চল্‌তে হ'লে দুনিয়ার হরেক রকম লোকজনের সংস্রবে আস্‌তে হয়। নাক শিঁঠকিয়ে কাউকে পুরাপুরি বাদ দেওয়া চলে না। কাজেই ভাল মন্দ সকলের সঙ্গে সাবধানে চলা তাদের দস্তুর। এই ধরণের সাবধানী লোকই বেশী।

রংয়ের প্রভেদ, টাকা-পয়সার অসাম্য ও রাষ্ট্রিক গোলামি

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, ভারতবাসীর রঙ শাদা নয় ব'লে বিদেশীদের সঙ্গে সামাজিক লেন-দেনে গোলাযোগ উপস্থিত হয়? রংয়ের বিভিন্নতা সামাজিক অসাম্য-সম্বন্ধের কারণ নয় কি?

সরকার—রংয়ের প্রভেদ ও অসাম্য সহজেই মালুম হয়। রং-বৈষম্য দুনিয়ার সর্বত্রই সামাজিক অসাম্যের অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে বিদেশীদের মেলমেশে অসাম্যের প্রথম ও প্রধান কারণ শাদা-বাদামী প্রভেদ নয়। আসল কারণ হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রিক গোলামি।

লেখক—রাষ্ট্রিক পরাধীনতার প্রভাব এত বেশী?

সরকার—গোলামি যতদিন র'য়েছে ততদিন কোনো ইংরেজ, জার্মাণ, জাপানী, ফরাসী, মার্কিণ, রুশ বা আর কেহ ভারতসন্তানকে মানুষ ভাব্‌বে না।

লেখক—জাপানীদের সঙ্গে জার্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিণ ইত্যাদি জাতের লোকেরা কিরূপ সম্বন্ধ চালাতে অভ্যস্ত?

সরকার—ভাল প্রশ্ন। জাপানীরা শাদা নয়, কিন্তু স্বাধীন। জাপানীদেরকে জার্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিণ, রুশ ইত্যাদি জাতের নরনারীরা ভয় ক'রে চলে,—কাজেই সম্মান করে,—অতএব ঘৃণা করে। এরি নাম স্বাধীন এশিয়ান—স্বাধীন অ-শাদা, স্বাধীন হল্‌দে, স্বাধীন বোঁচা-নেকো।

লেখক—টাকা-পয়সায় ইংরেজরা, জার্মাণরা, ফরাসীরা, মার্কিণরা বড়। তারা জাপানে জাপানীদের সঙ্গে ব্যবহারে নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা জাহির কর্‌তে পারে না কি?

সরকার—নিশ্চয় পারে। কিন্তু ইংরেজ-জার্মাণ-ফরাসী-মার্কিণ-রুশ আফিসের বড় সাহেবেরা আর বড় মেম সাহেবরা তাদের জাপানী কেরাণী-কর্মচারী-কুলী-চাপরাশি-ঝী-

চাকবদেরকে ভয় ক'রে চলে। গরীব জাপানীদেরকেও তারা সম্মান কর্‌তে অভ্যস্ত। গরীব জাপানীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার চালানো ইংরেজ-জার্মাণ ইত্যাদি ধনীদের পক্ষে অসম্ভব।

লেখক- আর্থিক অসাম্য সামাজিক অসাম্যের কারণ নয়?

সরকার— দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক অসাম্য থাকা সত্ত্বেও সামাজিক সাম্য কিছু-কিছু কায়েম হ'য়েছে জাপানীদের সঙ্গে বিদেশীদের ব্যবহারে। টাকা-পয়সার প্রভেদকে ফুলিয়ে অত্যাধিক সামাজিক শক্তি সম্‌ঝে রাখা ঠিক হবে না। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাও প্রবল শক্তি। এর দৌলতে পয়সাওয়ালা বিদেশীরাও গরীব জাপানীদেরকে "বাবা" বল্‌তে বাধ্য হয়। "গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!"

লেখক— ভারতবর্ষে শাদায়-বাদামীতে যোগাযোগের প্রধান বিঘ্ন তাহ'লে কী?

সরকার—এইখানে একটা "ত্র্যহস্পর্শ" পাচ্ছি। ভারতীয়েরা প্রথমতঃ গোলাম, দ্বিতীয়তঃ গরীব, আর তৃতীয়তঃ বাদামী। এই তিন বিঘ্ন এড়িয়ে আন্তর্মানুষিক মেল-মেশ চালানো অতি-কঠিন। প্রায়-প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ত্র্যহস্পর্শটার আওতা দেখ্‌তে হবে। রাষ্ট্রিক গোলামির প্রভাবই প্রবলতম।

পরজাতি-বিদ্বেষ সত্ত্বেও বিশ্ব-শক্তির সদ্‌ব্যবহার

লেখক—বিদেশের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারে কোনো জাত্‌ স্বাভাবিক মেজাজ বা চরিত্র সাম্‌লিয়ে চল্‌তে পারে কি? বিদেশীদেরকে নিজের জাতের মতন ভাব্‌তে পারে কি?

সরকার—মজার প্রশ্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে,—কোনো দুই জাত্‌ সামাজিক মেলমেশে ঠিক স্বাভাবিক চরিত্র রক্ষা কর্‌তে পারে না। বিদেশীকে আপনার লোক ভাবা অতি-কঠিন।

লেখক— কোনো দেশে এইরূপ দেখেছেন?

সরকার—ফ্রান্সে শাদা ফরাসীরা ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণ ইত্যাদি শাদা পাশ্চাত্য নরনারীর সঙ্গে মেলমেশ চালাতে বেশী অভ্যস্ত নয়। ফরাসীরা বিদেশীদের সম্বন্ধে উঁচ্‌ ধারণা পোষণ করে না, তাদেরকে ছোটজাত সম্‌ঝে চলে। আমেরিকায় মার্কিণ নরনারীও জার্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান ইত্যাদি বিদেশী শাদাদের সঙ্গে বড়-বেশী মেলমেশ চালায় না। পরাজাতি-বিদ্বেষ মার্কিণ মুল্লুকে জবরদস্ত।

লেখক—ফরাসী ও মার্কিণ ছাড়া অন্যান্য জাতের দস্তুরও তাই কি?

সরকার—এই বিষয়ে যাঁহা ফরাসী তাঁহা মার্কিণ, যাঁহা ইংরেজ তাঁহা জার্মাণ, তাঁহা ইতালিয়ান। পরজাতি-বিদ্বেষ জাতিমাত্রেরই রক্তের স্বধর্ম। এ হচ্ছে অতি-গভীর, অতি-সনাতন আর অতি-সার্বজনিক চিজ। সব জাতিই অল্পবিস্তর "ঘর-কুনো"।

লেখক—পরজাতি বিদ্বেষকে এত গভীর ও সার্বজনিক ভাব্‌ছেন? তা হ'লে দুনিয়ায় বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার করা বাঙালীর পক্ষে সম্ভব কি? অন্যান্য ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব কি?

সরকার—আলবৎ সম্ভব। ইংরেজরা কোনো দিন ফরাসীকে, জার্মাণকে, মার্কিণকে, রুশকে, জাপানীকে, তুর্ককে নিজের সমান ভাবে না। বিলাতী সমাজে এইসব জাতের লোক পুরাপুরি বিদেশীভাবে চলাফেরা করে। তা সত্ত্বেও ইংরেজরা মার্কিণকে নিজ কাজে

লাগায়, ফরাসীকে নিজ কাজে লাগায়, তুর্ককে নিজ কাজে লাগায়, রুশকেও নিজ কাজে লাগায়। লড়াই থাম্‌বা মাত্রই আবার জার্মাণকেও নিজ কাজে লাগাবে, জাপানীকেও নিজ কাজে লাগাবে। ইংরেজরা পুরাদস্তুর চালাক-চতুর-শেয়ানা জাত্।

লেখক—অন্যান্য জাত্ ইংরেজদের মতন চালাক-চতুর কি?

সরকার—জার্মাণরাও রুশকে নিজ কাজে লাগাতে জানে, ফরাসীকেও নিজ কাজে লাগাতে জানে, জাপানীকে নিজ কাজে লাগাতে জানে, ইতালিয়ানকে নিজ কাজে লাগাতে জানে। অথচ জার্মাণরা এই সকল জাত্‌কে "ছোটলোক" ছাড়া আর কিছু ভাবে না।

লেখক—জাপানীদের সম্বন্ধে এই কথা খাটে কি?

সরকার—ইংরেজ-জার্মাণ-মার্কিণ-ফরাসী ইত্যাদি জাতের শিষ্য-চেলা-শিক্ষানবীশ হচ্ছে জাপানীরা। এই সকল দেশে জাপানীদের ইজ্জদ খুব কম। জাপানীরা হাড়ে-হাড়ে একথা বুঝে। কিন্তু জাপানীরা স্বাধীন—জবরদস্ত স্বাধীন—ব'লে এই সকল শাদারা জাপানীদেরকে ভয় ক'রে চলে। অধিকন্তু কারু সঙ্গে জাপানীদের সম্বন্ধ আসল বন্ধুত্বে সম্বন্ধ নয়,—এ কথাও জাপানীরা জানে। তবুও জাপানীরা জার্মাণদেরকে নিজ স্বার্থের জন্য সদ্ব্যবহার করে, ইংরেজ-ফরাসী-মার্কিণদেরকেও নিজ স্বার্থের জন্য সদ্ব্যবহার করে।

লেখক—ভারতীয় নরনারী দুনিয়ার যে-কোনো জাতের নরনারীকে ভারতীয় স্বার্থপুষ্টির জন্য কাজে লাগাতে পার্‌বে কি?

সরকার—না পারবার কারণ নেই। পরজাতি-বিদ্বেষ সনাতন হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার সম্ভব। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের পর হ'তে বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহারে ভারতীয় নর-নারী রেজাই কিছু-কিছু পেকে উঠ্‌ছে। বর্তমানে এই অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। ভবিষ্যতে ভারতীয় নরনারীর এইরূপ মতি-গতি, কার্য-ক্ষমতা ও ক্যার্‌দানি যারপরনাই বেড়ে যাবে। দুনিয়ার নরনারীকে ভারতের স্বার্থে কাজে লাগাবার সুফল আরও বেশী-বেশী দেখা যাবে।

ব্যক্তিগত সম্বর্দ্ধনায় ভারতবর্ষ জাতে ওঠে না

১২ই আগস্ট ১৯৪৪

লেখক—কোনো-কোনো ভারত-সন্তানের ইজ্জদ বিদেশে বেশ-সুবিস্তৃত। তার ফলে ভারতীয় নরনারী-সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা উঁচু হয় না কি?

সবকার—১৯৪৪ সনে ভারতীয় নরনারীর ডজন-ডজন লোক ইয়োরামেরিকার নানা দেশে বিখ্যাত। চীন-জাপান-তুর্কী-ইরাণ ইত্যাদি এশিয়ার বিভিন্ন জনপদেও দিগ্‌বিজয়ী ভারতবাসীদের নাম-ডাক আছে। কাজে বিদেশে ভারতীয় গুণী-কৃতী বাপকা-বেটারা বেশ-কিছু ইজ্জদ পায়। তার ফলে কোনো-কোনো বিদেশী লোক ভারতবর্ষেই সেই সকল গুণী-কৃতী ভারতীয় বাপকা-বেটার হয়ত কিছু-কিছু সম্বর্দ্ধনা করে।

লেখক—সেই কতাই তো বল্‌ছি। তার প্রভাবে ভারতবর্ষের লোকজন সম্বন্ধে ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণ, ফরাসী, জাপানী, রুশ, ইতালিয়ান জাত্ নূতন ধারণা পোষণ করে না কি?

সরকার—বোধহয় বেশী না। গুণী-কৃতী বাপ্‌কা-বেটাদের সম্বর্দ্ধনাগুলা ব্যক্তিগত

চিজ্‌। গবেষণা-বীর, বিজ্ঞান-বীর, সাহিত্য-বীর, কর্মবীর ইত্যাদি হিসাবে কোনো-কোনো ভারতীয় নরনারী ইংরেজ জাপানী-মার্কিণ ইত্যাদি লোকজনের বাহ্‌বা পেতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত বাহবায় বাঙালীরা জাত্‌কে জাত্‌ বাহ্‌বার অধিকারী হয় না। একটা গোটা জাত্‌কে "জাতে তোলা" সহজ কথা নয়। চল্লিশ কোটি নরনারীর জাত্‌ হিসাবে আমরা যে-কোনো বিদেশী লোকের চিন্তায় গোলাম, গরীব, নিরক্ষর, অ-সভ্য।

লেখক—তার প্রমাণ কী?

সরকার—অতি-সোজা কথা। ইতালিয়ান,—ফরাসী,—জার্মাণ,—জাপানী—ইংরেজরা তাদের ভারতীয় গাড়োআনের সঙ্গে মধুর সম্ভাষণ চালাতে প্রলুব্ধ হয় না। বেয়োরা, চাপরাশি, দ্বারোআন ইত্যাদি ভারতীয় "চাকর-বাকর"দেরকে তারা সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে ঝুঁকে না। ভারতীয় কেরাণী কর্মচারীরা যে-কে-সেই র'য়ে যায়। এই সকল শ্রেণীর ভারতীয়েরা বিদেশীদের হাতে চরম বে-ইজ্জদ হয়। অথচ দু'চার-দশ-বিশ জন ভারতসন্তানকে তারা হয়ত দুনিয়ার সেরা লোকের অন্তর্গত ভাব্‌তে সমর্থ।

লেখক—আপনি অতিমাত্রায় কড়া কথা বল্‌ছেন না কি?

সরকার—খাঁটি সত্যটা বুঝ্‌বার জন্য চরম কথা বলাই বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার হালচাল বড্ড জটিল। বিদেশী লোকজনের ধরণ-ধারণ এক কথায় চুম্‌রে নেওয়া যায় না। এই কারণে তেতো-কথাগুলা অতি-তেতো, অতি চড়া, অতি-কড়া, অতি-নিষ্ঠুরভাবে সম্‌ঝে নেওয়া আবশ্যক। ঢাক্‌-ঢাক্‌ গুড়্‌-গুড়্‌ চালিয়ে লাভ নেই।

লেখক—নরম সুরে কিছু বল্‌তে রাজি নন?

সরকার—বল্‌বো যে,—হাঁ, ভারতের দু-চার-দশ-বিশ জন বিদেশে ইজ্জদ্‌ পেলে ভারতবর্ষের দিকে বিদেশীদের নজরটা কিছু-কিছু পড়্‌তে সুরু করে। ইতিমধ্যে বিদেশীরা ভারতবর্ষের কথা কিছু-কিছু ভাব্‌তে শিখেছে। দুনিয়ায় "বৃহত্তর ভারত" কায়েম হ'য়েছে। কিন্তু তা ব'লে ভারতীয় নর-নারীকে জাত্‌-হিসাবে সম্মানযোগ্য সম্‌ঝিতে তারা প্রস্তুত নয়। আমাদের সঙ্গে সমানে-সমানে লেনদেন চালানো অতি-দূরের কথা। ব্যক্তিগত সম্বর্দ্ধনাকে জাতের প্রতি সম্মান বুঝে রাখা আহাম্মুকি। জাত্‌কে জাত্‌ আমরা গোলাম ছাড়া আর কিছু নই।

বাঙালীর আমেরিকা-ক্লাব

লেখক—আপনি তো "আন্তর্জাতিক বঙ্গ-পরিষৎ", "বঙ্গীয় দান্তে সভা," "বঙ্গীয় এশিয়া-পরিষৎ" ও "বঙ্গীয় জার্মাণ-বিদ্যা-সংসদ" কায়েম ক'রেছেন। লড়াইয়ের যুগে সেই সব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বন্ধ র'য়েছে দেখ্‌ছি। কিন্তু সেইসবের মারফৎ আপনি বিদেশীদের সঙ্গে ভারতীয়দের বন্ধুত্ব কায়েম কর্‌বার চেষ্টা করেন নি?

সরকার—আমার পরিষদগুলার মতলব লক্ষ্য বিলকুল আলাদা। বিদেশ সম্বন্ধে বাঙালী গবেষকদের লেখাপড়া চালানো একমাত্র উদ্দেশ্য। বাঙালীদেরকে বিদেশী অর্থ, যন্ত্র, রাষ্ট্র, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সঙ্গীত, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি সংস্কৃতির রকমারি বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখক ও গ্রন্থকার তৈরী করানো ছাড়া আর কোনো মতলব নাই। তার আবহাওয়ায় বিদেশী লোকজনের ছায়াপাত নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবে অসম্ভব। ক্বচিৎ-কখনো কোনো

উৎসব উপলক্ষ্যে বিদেশীরা হয়ত এসেছে। কিন্তু সামাজিক লেনদেন এই সকল পরিষদের প্রধান বা মুখ্য মতলব নয়।

লেখক—আপনি ভারতীয় আমেরিকা-পরিষদে যাওয়া-আসা করেন জানি। আজকাল অনেকদিন ধ'রে তার নাম শুন্‌ছি না। তার মতলব কী?

সরকার—মার্কিণ মুল্লুক হ'তে অনেক ভারতীয় ছাত্র বেপারী, ব্যাঙ্কার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ডাক্তার, অধ্যাপক, সাংবাদিক ইত্যাদি হ'য়ে ফিরে এসেছে। তারা কল্‌কাতায় ও বোম্বাইয়ে দু'টা পরিষৎ কায়েম ক'রেছে। দু'টাই মার্কিণ-ফের্‌তা ভারতীয়দের মজলিশে। তাতে বছরে দু'একবার চা-যোগের অথবা নৈশভোজনের ব্যবস্থা হয়। ব্যস্‌। আর কিছু নেই এর ভেতর।

লেখক—তার সঙ্গে কল্‌কাতার ও বোম্বাইয়ের মার্কিণ নরনারীর কোনো যোগ নাই?

সরকার—১৯২৫ সনের শেষে বিদেশ হ'তে কল্‌কাতায় ফিরে এসে দেখেছি বঙ্গীয় আমেরিকা-পরিষৎ চল্‌ছে। তখনকার বৈঠকে দু এক-জন মার্কিণ অতিথি ভাবে হাজির ছিল।

লেখক—আজকাল কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—তারপর আজ পর্যন্ত গোটা আট-দশেক বৈঠক ব'সেছে উনিশ-বিশ বছরে। কখনো দু'একজনের বেশী মার্কিণ পুরুষ-স্ত্রী দেখিনি।

লোক—মার্কিণরা আস্‌তো কী করে?

সরকার—তারা সকলেই পরিষদের নিমন্ত্রিত লোক। মাঝে-মাঝে বিশিষ্ট মার্কিণ পণ্ডিত ভারত পর্যটনে এসেছেন। কল্‌কাতা হ'য়ে যাবার সময় তারা নিমন্ত্রিত হ'য়েছে। কিন্তু মোটের ওপর বল্‌তে হবে যে, কল্‌কাতার এই পরিষৎ প্রধানতঃ বা একমাত্র বাঙালী (ভারতীয়) প্রতিষ্ঠান। এর ওপর মার্কিণ ছায়া অতি-কম।

লেখক—বোম্বাইয়ের আমেরিকা-পরিষদ কেমন?

সরকার—এই ধরণের প্রতিষ্ঠানই বোম্বাইয়ের আমেরিকায়-পরিষৎ। ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে বম্বে-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে বম্বে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে আমেরিকা-পরিষৎ এই অধমকে নৈশ ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রেছিল। গলাবাজির ব্যবস্থা ছিল বলা বাহুল্য। হাজির হ'য়ে দেখি যে, তাতে রকমারি ভারত-সন্তান উপস্থিত। কিন্তু কোনো মার্কিণের টিকি দেখা গেল না।

লেখক—আপনি ভারতীয় ব্যবস্থায় এই ধররে মার্কিণ-পরিষৎ চান?

সরকার—আলবৎ। আগেই ব'লেছি আমি বঙ্গীয় মার্কিণ সংস্কৃতি-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তা এখনো কলকাতায় নাই। আমেরিকা-পরিষৎটা সেই মার্কিণ-সংস্কৃতি-পরিষৎ নয়। এটা বঙ্গীয়-মার্কিণ মেলমেশের মজলিশ নয়। (পৃঃ ৭১৪-৭১৫)

লেখক—তাহ'লে এটা কী?

সরকার—একে সোজাসুজি মার্কিণ-ফের্তা বাঙালীদের পরিষৎ বল্‌বো। এই ধরণের পরিষৎ, মজলি আড্ডা, ক্লাব বা বৈঠকও বাঙালী সমাজে জরুরি। কয়েক বছর এটার চা-চোগ বা নৈশ-ভোজন বন্ধ আছে। আবার সুরু করা উচিত। আজকাল ভারতে বহুসংখ্যক মার্কিণ নরনারী র'য়েছে। লড়াইয়ের হিড়িকে অনেকেই বছর দু'তিনেক কল্‌কাতায় বা আশে-পাশে থাক্‌তে বাধ্য। কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ সেনাপতি ইত্যাদি। এঁদের সঙ্গে মিষ্টি-মুখের ব্যবস্থা চালানো সম্ভব।

লেখক—বাঙালী আমেরিকা-পরিষদের উদ্যোক্তা কে-কে ছিলেন?

সরকার—কে যে মাতব্বর আর কে যে মাতব্বর নয় বলা কঠিন। আগ্রহ সকলেরই সমান মনে হয়। মার্কিণ-ফের্তারা খুবই মার্কিণ প্রিয়। এই অধমও মার্কিণ-ভক্ত।

লেখক—কয়েকজন চাঁইয়ের নাম করুন শুনি।

সরকার—দাঁতের ডাক্তার রফি আহম্মদ আর সুধীর মজুমদার, হোমিওপ্যাথ জিতেন মজুমদার, যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক হীরালাল রায়, বাণেশ্বর দাস ও সুরেন রায়, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের যতীশ দাস, ইণ্ডিয়ান কণ্ডিমেন্ট কোম্পানীর অনাথবন্ধু সরকার, বেঙ্গল ওআটার প্রুফ ওআর্ক্‌সের সুরেন বসু, ক্যালকাটা কেমিক্যাল ওআর্ক্‌সের খগেন দাশ, ইন্ডো-সুইস-ট্রেডিং কোম্পানীর বীরেন দাশগুপ্ত ইত্যাদি মার্কিণ-ফের্তাদেরকে সর্বদাই উদ্যোগী দেখেছি। এঁরা সকলেই মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা লোক।

লেখক—আপনি এসবের ভেতর জোটেন কী ক'রে?

সরকার—আমি গরীব মানুষ। লোকেরা খেতে ডাকে। গুড়ের গন্ধ পেলেই পিঁপ্‌ড়ে গিয়ে হাজির হয়। অবশ্য এই অধম মার্কিণ মুল্লুকেও মুসাফিরি ক'রেছে। সাক্ষী র'য়েছে "ইয়াঙ্কিস্থান" (১৯২৩)।

লেখক—আপনি আমেরিকায় ক'বছর ছিলেন?

সরকার—দুবারে বছর সাড়ে চারেক। সে ১৯১৪ নবেম্বর হ'তে ১৯২০ নবেম্বর পর্যন্ত। ভেতরে দেড় বছর ছিলাম জাপানে ও চীনে,—১৯১৫ মে হ'তে ১৯১৬ নবেম্বর।

সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

মহাবোধি সোসাইটি

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

হেমেন্দ্রবিজয় সেন—মহাবোধি সোসাইটির সঙ্গে আপনার মাখা-মাখি খুব দেখ্‌তে পাই। এঁদের অনেক উৎসবে আপনার যোগা-যোগ। আবার রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায়-সকল অনুষ্ঠানেই আপনি সমানভাবে সহযোগিতা চালাচ্ছেন কী ক'রে অনেকে বুঝ্‌তে পারে না।

সরকার—প্রতিষ্ঠান দুটো বিভিন্ন-মুখো কে বল্‌লে?

লেখক—রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের আন্দোলন চালায়। মহাবোধি চালায় বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের আন্দোলন।

সরকার—আমি দেখ্‌ছি যে, দুই প্রতিষ্ঠানই চালাচ্ছে একটা বা একমাত্র আন্দোলন। দু'য়ের আন্দোলনেরই মুদ্দা হচ্ছে একরূপ। সে নয়া ভারতের জীবন বিস্তর। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্য বা নয়া ভারতের জীবন বিস্তার। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্য বা "বৃহত্তর ভারত" প্রতিষ্ঠা ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন আর মহাবোধি সোসাইটি অন্য কিছু জানে না। দুনিয়ার ভারতীয় নরনারীর কর্মনিষ্ঠার সাক্ষীস্বরূপ খাড়া আছে বিবেকানন্দ আর ধর্মপালের কায়েম-করা এই দুই প্রতিষ্ঠান। দুই ভারত-বীরই চরম মাত্রায় বর্তমান নিষ্ঠ। এঁরা প্রাণে-প্রাণে অতীতের বেপারী নন।

লেখক—মহাবোধির ব্যবস্থায় কী-কী প্রধান ঠাঁই পায়?

সরকার—বুদ্ধদেবের জন্ম, মৃত্যু ও ধর্মচক্র-প্রবর্তন এই তিন ঘটনায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া আছে ধর্মপালের জন্মতিথি আর মৃত্যুতিথি। মোটের উপর এই পাঁচ উপলক্ষ্যে কতকগুলা সার্বজনিক জল্‌সার ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়।

লেখক—এই সকল বক্তৃতায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ছাড়া আর কিছু লাভ হয় কি?

সরকার—ধর্ম, নীতি, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বস্তুর প্রচার কতটা হয় বল্‌তে পারি না। আসল প্রচারিত হয় বুদ্ধ নামক ভারত-সন্তানের জীবন-কথা চিন্তা-সম্পদ আর কর্মপটুত্ব। তা ছাড়া প্রচারিত হয় সিংহলী ধর্মপালের স্বদেশসেবা, ভারত-ভক্তি আর এশিয়া-নিষ্ঠা। বর্তমান যুগের ভারত-সন্তানকে আর এশিয়াবাসীকে দুনিয়ার "ভদ্রলোকদের পাতে দেবার" উপযুক্ত ক'রে তোলা ছিল ধর্মপালের প্রধান বা একমাত্র জীবন-সাধনা। ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩) যুবক বাঙ্‌লার, যুবক ভারতের আর যুবক এশিয়ার চির-প্রণম্য কর্মবীর।

লেখক—ধর্মপালের আর বিবেকানন্দে প্রভেদ কী?

সরকার—বিবেকানন্দ'রও প্রধান বা একমাত্র জীবন-সাধনা ছিল তাই। একজন কর্মী ছিলেন বৌদ্ধধর্মের মারফৎ আর একজন ছিলেন বেদান্তের মারফৎ। তফাৎ মাত্র এইটুকু। মতলব দুয়েরই একরূপ। দেশ-বিদেশে এই মতলব-মাফিক কাজ রামকৃষ্ণ মিশন আর মহাবোধি সোসাইটির দৌলতে বেশ-কিছু সাধিত হ'য়েছে। "বৃহত্তর ভারত" প্রতিষ্ঠার কাজে দু'জনেরই দান বিপুল।

লেখক—কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়?

সরকার—এশিয়া ও ইয়োরামেকিকার নরনারী যুবক ভারতের নানা কর্মবীর ও চিন্তাবীরকে সম্মান কর্‌তে শিখেছে। যে কোন ভারতীয় পর্যটক বিদেশে মুসাফিরি কর্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে। বিদেশে ভারতীয় ইজ্জদ-বৃদ্ধির ফলে ভারতবর্ষের নানা পল্লীতে ও শহরে লোকজনের ভেতর আত্ম-সম্মান বেড়েছে, আত্মচৈতন্য জেগেছে, আত্মকর্তৃত্ব গজিয়েছে। যে-কোনো ভারতসন্তান এই বিষয়ে ওয়াকিব্‌হাল। কাজেই মহাবোধির গোটা-পাঁচেক অনুষ্ঠানের কিস্মৎ আমার বিবেচনায় খুব-বেশী। রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কাজকর্মেরও গুণগ্রাহী আমি এই কারণেই। ধর্মপাল আর বিবেকানন্দ,—দুজনেই ভারতীয় কর্মনিষ্ঠার প্রচারক, ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি।

লেখক—মহাবোধির ব্যবস্থায় আর কিছু পেতে পারা যায় কি?

সরকার—মহাবোধির কর্মকর্তারা লঙ্কার লোক। ধুরন্ধর ছিলেন এতদিন দেবপ্রিয় বলিসিংহ। আজকাল কর্তা র'য়েছেন ভিখ্‌খু জিনরত্ন। লঙ্কা থেকে অনেক সময়ে বেপারী, রাষ্ট্রিক, ধর্মপ্রচারক, আর সরকারী চাক্‌রে কল্‌কাতায় আসেন। তখন মহাবোধিতে এঁদের সঙ্গে বাঙালীদের মেলামেশ ঘটে। এই সূত্রে চীনা, তিব্বতী, বর্মী, জাপানী ও শ্যামদেশীয় নরনারীর সঙ্গেও বাঙালীর বাচ্চারা জল্‌সার সুযোগ ভোগ করে। বাঙালী জাতের "ঘরকুনোমি" কিছু-কিছু কম্‌তে পেরেছে,—মহাবোধির মারফৎ।

লেখক—তাতে কী হ'য়েছে?

সরকার—কম্‌সে-কম্ লঙ্কার সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ বেড়েছে। লঙ্কার লোকেরা ভারতীয় নরনারীর মতনই করিৎকর্মা, ভারতীয় নর-নারীর মতনই স্বদেশ-সেবক, ভারতীয় নরনারীর মতনই মাথাওয়ালা লোক। কল্‌কাতার গোলদীঘিতে বেড়াতে-বেড়াতে বাঙালী

ছেলে-মেয়েরা এই সন্ধান পাচ্ছে।

লেখক—তার কোনো মূল্য আছে কি?

সরকার—এর ফলে বাঙালী জাতের,—কম্‌সে-কম্ যুবক বাঙলার মগজ বাড়তির দিকে যাচ্ছে, কলিজাও বাড়তির দিকে যাচ্ছে। লঙ্কায় না গিয়েও অনেক বাঙালী ঘরে ব'সেই "লঙ্কার সোআদ" পাচ্ছে!

লেখক—আর কিছু সুফল দেখ্‌ছেন?

সরকার—মহাবোধির কর্মকর্তাদের ভেতর অনেক বাঙালীর ঠাঁই আছে। লঙ্কার লোকেরা বাঙলার লোকের সঙ্গে সহযোগিতা চালিয়ে সকল প্রকার কাজকর্ম কায়েম করতে অভ্যস্ত। সিংহলী-বাঙালী যোগাযোগ আটপৌরে জিনিষে পরিণত হ'য়েছে। বাঙলার নরনারীর পক্ষে এই যোগাযোগ একটা মস্ত লাভের জিনিষ। আজকাল প্রেসিডেন্ট শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আগে ছিলেন জজ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

একালের বাঙালী এঞ্জিনিয়ার

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

হেমেন—আজকালকার এঞ্জিনিয়ারদের ভেতর কল্‌কাতার বাজারে সুপরিচিত কারা?

সরকার—কেন? ইমারত তৈরি করবার মতলব আছে না কি? এ যে পয়সাওয়ালা লোকের প্রশ্ন? জবাব দিতে পারে পয়সাওয়ালারা।

লেখক—আপনি সকল প্রকার পেশার মোল্লাগিরি করেন। দেখি এঞ্জিনিয়ারিং পেশার খবর আপনি কতটা দিতে পারেন। বাঙালী সমাজে কোন্ কোন্ এঞ্জিনিয়ারের নাম শুনা যায়?

সরকার— বোধহয় যার ঘরবাড়ী তৈরির কাজে মোতায়েন আছে। কন্ট্রাক্টার-বিল্‌ডার-আর্কিটেক্ট ইত্যাদি নামে তাদের কোম্পানী বা কারবার গুলা চলে। রাজেন মুখার্জির কারবারগুলায়ও একালের বাঙালী এঞ্জিনিয়ারদের ঠিকানা বুঝ্‌তে হবে।

লেখক—কয়েকজনের নাম কর্‌বেন?

সরকার—শশীকান্ত চক্রবর্তী স্যানিটারি এঞ্জিনিয়ার নামে সুপরিচিত। অনন্তকুমার দত্ত জগন্নাথ গাঙ্গুলি, অবিনাশ মুখার্জি, তারকনাথ ব্যানার্জি, চন্দ্রকুমার সরকার, মন্মথ মুখার্জি ইত্যাদি কয়েকজন এঞ্জিনিয়ারিং-ব্যবসায়ী নাম কর্‌তে পারি। এঁরা সকলেই অবশ্য পাশ-করা উপাধি-ধারী এঞ্জিনিয়ার। বাড়ীঘর যাদের আছে তারা অনেকেই এক সকল নাম জানে।

লেখক—সরকারী-চাক্‌রেদের ভেতর কোনো এঞ্জিনিয়ারের খবর রাখেন?

সরকার—সরকারী শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর সতীশ মিত্র। নদী-খাল বিভাগের বড় সরকারী এঞ্জিনিয়ার সতীশ মজুমদার আর মহেন্দ্র ভট্টাচার্য। পোস্ট-টেলিগ্রাফের এঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন অভয় ব্যানার্জি আর হরিপদ ভৌমিক। রেলের এঞ্জিনিয়ার নরেন্দ্রকুমার মিত্র আর সুরেন দত্ত। কল্‌কাতা কর্পোরেশনকে আর ইম্‌প্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে সরকারী বা নিম-সরকারী প্রতিষ্ঠান ধর্‌বো?

লেখক—ধরুন।

সরকার—তাহ'লে বীরেন দে, প্রতাপ বসু, বীরেন ভট্টাচার্য, শরৎ চক্রবর্তী, পরেশ গুপ্ত, প্রমোদ চ্যাটার্জি, সুশীল ঘোষ, নবী বক্স্, কানাইলাল দে, দেবেন চক্রবর্তী ইত্যাদি অনেকের নাম করা সম্ভব। কর্পোরেশনী এঞ্জিনিয়ারদের দু-এক জনমাত্র যান্ত্রিক ওবৈদ্যুতিক, অন্যান্যেরা সিভিল। ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের এঞ্জিনিয়ারদের ভেতর র'য়েছেন জিতেন দাশগুপ্ত, শচীন ব্যানার্জি ইত্যাদি।

লেখক—কল্‌কাতার বাজারে রাজেন মুখার্জির কারবারে কোন্-কোন্ বাঙালী এঞ্জিনিয়ারের নাম আছে? কারু নাম জানেন?

সরকার—ক্ষীরোদ মুখার্জি আর অনুকূল মিত্র এই দুইজনের নাম করতে পারি। তাছাড়া বীরেন মুখার্জি আর প্রভাত ব্যানার্জিও আছেন। এই দুজন অবশ্য কর্তা ব্যক্তি। বুঝতে হবে মার্টিন কোম্পানীর কথা বলা হচ্ছে।

লেখক—যাদবপুর কলেজের পাশ-করা এঞ্জিনিয়ারদের খবর কিছু রাখেন?

সরকার—যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ার আবদুর রশিদের কাজ আছে টালার পাম্পিং স্টেশনে। ভারত ব্যাটারি চলে রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার শচীন সাহার তাঁবে। বম্বে মিউনিসিপ্যালিটির জলের কল বিভাগে বাহাল আছেন শান্তি মুখার্জি। রামপুর স্টেটের বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার আমির আহম্মদ খাঁ। ডাল্‌মিয়ানগরের সিমেন্ট-কারখানায় যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ার জগদীশ বাগ্‌চি। শিলঙের এঞ্জিনিয়ারিং ওআর্ক্‌স্ চালাচ্ছেন কুমুদ পালচৌধুরী (বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার)। ক্যালকাটা টেলিফোন কোম্পানীতে কাজ পেয়েছেন বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার হরিপদ মুখার্জি। ম্যাগ্‌নোলিয়া ডেয়ারি কোম্পানীর কারখানা-পরিচালক হচ্ছেন রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার বিভূতি চক্রবর্তী। রাধা ফিল্‌ম্ কোম্পানীর ধ্বনি-বিভাগে র'য়েছেন বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার কুলেন্দু চৌধুরী। রাওয়ালপিণ্ডির রাসায়নিক কারখানায় এঞ্জিনিয়ার তারিণী পাল। হুগ্‌লির রামপুরিয়া কটন মিলের বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বিরাজমোহন ঘোষ। শক্তি-ব্যাটারি চলে মধু মজুমদারের হাতে। প্রভাতী টেক্‌স্‌টাইল মিলের এঞ্জিনিয়ার ক্ষিতীশ বিশ্বাস। প্রায় হাজার দুই এঞ্জিনিয়ার যাদবপুর হ'তে বেরিয়েছে। অনেকেই স্বাধীন কারখানা-পরিচালক ও বেপারী।

লেখক—যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারেরা বাঙালী সমাজে সুপরিচিত কি?

সরকার—সরকারী ও নিম-সরকারী আর ইমারতের এঞ্জিনিয়াররা সাধারণতঃ সিভিল-বিভাগের ওস্তাদ। যাদবপুরীরা যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক আর রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার। প্রায় সকলেই কারখানা-ফ্যাক্টরিতে বাহাল আছে। এখানো বাঙালীর বাচ্চারা কারখানা-ফ্যাক্টরির লোকজনকে বেশী সামাজিক ইজ্জত দেয় না। অবশ্য যারা কারখানার মালিক বা পরিচালক হ'য়ে বেশ-কিছু মোটা রোজগার করছে তাদেরকে লোকেরা চেনে বৈকি। বাঙালীর বাচ্চারা আজ ১৯৪৪ সনেও কারখানার এঞ্জিনিয়ারদেরকে উকিল-ডাক্তারের মতন চেনে না। এই সকল এঞ্জিনিয়ারদের ইজ্জত বাঙালী সমাজে বেড়ে যাওয়া উচিত।

লেখক—এই এঞ্জিনিয়ারদের ইজ্জত বাড়্‌তে পারে কী উপায়ে?

সরকার—সাংবাদিকদের নজর এদিকে যাওয়া উচিত। ইউনাইটেড প্রেসের বিধু সেনগুপ্ত আর আনন্দবাজার-পত্রিকার সুরেশ মজুমদার ইত্যাদি সাংবাদিক-ধুরন্ধরদের মগজে এই খেয়ালটা ঢুক্‌লে বেশ-কিছু কাজ হ'তে পারে। বিজ্ঞান-গবেষক আর এঞ্জিনিয়ার এই দুই পেশার বাঙালীর বাচ্চাকে দৈনিক-মাসিকের মারফৎ যুবক বাঙলার ভেতর সুপ্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। চাই কারখানা-ফ্যাক্‌টরির এঞ্জিনিয়ারদের জন্য স্বতন্ত্র

প্রচার, স্বতন্ত্র প্রপাগান্ডা।

লেখক—সুরেশ মজুমদার ইত্যাদি কাগজওয়ালাদেরকে আপনার পাঁতি দিয়েছেন?

সরকার—সাংবাদিক-মহলের কারু সঙ্গে দেখা হ'লেই এই ধরণের অনেক-কিছু গেয়ে থাকি। বিধু, সুরেশ ইত্যাদি অনেকেই ঘরে-বাইরে এই অধমের গালাগালি খেতে অভ্যস্ত। বাজারে দাঁড়িয়েও লম্বা গলায় সাংবাদিকদের অসম্পূর্ণতা আর কুঁড়েমি সম্বন্ধে বকাবকি ক'রেছি। আমার "চোপা"খানা সাংবাদিক-সংসারে অজানা নয়। লোকেরা বুঝে নিয়েছে যে, বিনয় সরকারী বুখ্‌নি হচ্ছে গালাগালি আর বকাবকি।

অক্টোবর ১৯৪৪

"এ যুদ্ধের শেষে"র ভূমিকা*

৪ঠা অক্টোবর

প্রবীণ ভারতের অদ্বৈতবাদীরা হিন্দু-মুসলিম দ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত লইয়া মাথা-ফাটাফাটি খেলিতেছে। সেই সময়ে যুবক ভারতের কোনো-কোনো মহলে গুল্‌জার নয়া-নয়া দ্বৈত বাহুত্বের বিশ্লেষণ।

বিমলেন্দু ঘোষের মগজে খাড়া হইয়াছে রাষ্ট্রিক দুনিয়ার ত্রিমূর্তি। এই তিন মূর্তির একটার নাম অ্যাংলো-মার্কিণ ধনতন্ত্রবাদ। আরেকটাকে বলে ইতালিয়ান-জার্মাণ-জাপানী ফাশিবাদ। তৃতীয় মূর্তি পরিচিত কমিউনিস্ট রুশিয়ার সাম্যবাদ নামে। মামুলি ভারতীয় হিন্দু-মুসলমাননের মুড়োয় এই তিন মূর্তি নয়া খিট্‌কেল বা আপদরূপে হাজির হইতে বাধ্য। কী করা যাইবে? যুবক বাঙ্‌লা নানা বৈঠকে এই সকল "বাদের" ভূত নামাইতেছে একালের দুনিয়া এই সবের আলোচনায় মশ্‌গুল। এই ভূতগুলার বোঝা বাঙালীর ঘাড় হইতে বড় শীঘ্র নামিবে না। বাড়্‌তির পথে বাঙালী।

একমাত্র মনু আর মহম্মদে বাঙালীর বাচ্চার আজকাল পেট ভরে না। বঙ্কিমের বাঙালী মাৎসিনি, মিল আর কঁৎ খাইয়াও মানুষ হইত। রাবীন্দ্রিক আর রবিহীন বাঙালীর পাতে পড়িতেছে মার্ক্‌স্‌-লেনিনের মুড়ো। মন্দ কী? বাঙালীর পেটে সবই সয়।

পাতঞ্জল-দর্শন তর্জমা করিলে বা ব্যাখ্যা করিলে বাঙালী গবেষক-লেখকদেরকে দার্শনিক বলা হইয়া থাকে। মার্ক্‌স্‌-দর্শনের গবেষক বা প্রচারক বিমলেন্দুকেও লোকেরা দার্শনিক বলিবে। যোগ-সাংখ্য-বেদান্তের বেপারীরা কতখানি স্বাধীন মাথার দৌড় দেখাইয়া থাকেন? তাহার চেয়ে কম স্বাধীন চিন্তা মার্ক্‌স্‌-লেনিনের সওদাগর বিমলেন্দু দেখাইতেছে না। কথাটা জানিয়া রাখা ভাল।

বিমলেন্দুর বয়স বছর বিশেক। এই ছোকরা-দার্শনিকের পাঁতি অনুসারে "নতুন দুনিয়াতে চাই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" (পৃঃ ৪৯২)। যুগে-যুগে ভারতে হরেক রকমের তন্ত্র জারি হইয়াছে। একালের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র সেকেলে বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের ধারাই

*বিমলেন্দু ঘোষ প্রণীত "এ যুদ্ধের শেষে" বইয়ের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিনয় সরকার; ভূমিকাটা উদ্ধৃত হইল।

বাড়াইয়া চলিতে থাকিবে। বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের কতখানিই বা ভারতের পল্লী-শহরে সত্যি-সত্যি চালু আছে? কাজেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মক্কেল ভারতের কোন্-কোন্ অঞ্চলে কত জন হইবে কে বলিতে পারে? সে কথা আলাদা। সম্প্রতি দেখিতেছি যুবক ভারতে নয়া-নয়া ভাবধারার খেলা বা কস্রৎ।

বিমলেন্দুর মতন ছোকরা-দার্শনিকেরা বাঙালী জাতের জীবন-স্রোতকে নানা তরফ হইতে বৈচিত্র্যশীল, বহুত্বপূর্ণ ও যৌবনময় করিয়া তুলিতেছে। "চন্দ্র-সূর্য"-লেখক কবি-গাল্পিক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে অনেক বাঙালীর বাচ্চাই দেখিতেছে যে,

"ছিন্ন ইতিহাস ওড়ে চৈত্র-রিক্ত বাতাসের ঘায়,
আগামী বৈশাখ চোখে সবুজ বিছায়।"

"এ যুদ্ধের শেষে"-প্রণেতা নয়া বঙ্গ-দর্শনের অন্যতম প্রতিনিধি ও ভগীরথ।

লেখকের অন্যতম বাণী নিম্নরূপ ঃ—

"সমাজের অর্থনৈতিক রূপ-রচনায় যুদ্ধ বহুর ভিতরে মাত্র একটি শক্তি"। "সমর-সাফল্য কোনো সমাজ-দর্শনের সাফল্য নিরূপণের মানদণ্ড নিশ্চয়ই নয়" (পৃঃ ৫)। এই সব খুব পাকা কথা। অন্যান্য পাকা কথাও আছে, যথা—"বর্তমান রুশ সাম্যবাদ মার্ক্সীয় সাম্যবাদের পরিণতাদর্শ থেকে পৃথক্ একটি রূপ পরিগ্রহণ ক'রেছে" (পৃঃ ৯)। আর এক জায়গায় লেখক বলিতেছে ঃ—"জাপ ধনতন্ত্রের বিকাশ অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের চাপে সর্বাঙ্গীন কিংবা দীর্ঘায়ু হ'তে পারে নি" (পৃঃ ২১)

বিমলেন্দু একচোখো দুনিয়া-সমালোচক নয়। প্যারিস-পতন বিষয়ক বিশ্লেষণ (পৃঃ ৩০-৩১) আর অ্যাংলো-সোভিয়েট চুক্তির ব্যাখ্যায় (পৃঃ ৪০-৪৫) লেখকের দশাননী বা বিশ-চোখো দৃষ্টিভঙ্গী সহজে পাকড়াও করা সম্ভব। সেই অধ্যায় দুইটা আগে পড়িয়া দেখা মন্দ নয়। বিশচোখো দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ছোকরা-লেখক দুনিয়ার পায়চারি করিতে অভ্যস্ত। অতএব ভবিষ্যৎ তাহার উজ্জ্বল।

দশাননী দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি চালাইলে ১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস কেমন দেখাইবে? এক ফোঁটা নমুনা দিতেছি মস্কো-বার্লিন মিলন চুক্তিকে। (১৯৩৯) বিমলেন্দু "অনগ্রসর-চুক্তি" বলিতেছে (পৃঃ ২৩-২৫)। হয়ত এটা "অনগ্রসর" বা পেছন-মুখো নয়। বস্তুতঃ স্তালিন-মলতভের বৈঠকে এটা দস্তুরমাফিক প্রগতিপন্থী সন্দেহ নাই। আসল কথা,—চাই বিশ-চোকো বিশ্লেষণ। রুশিয়ায় জার্মাণিব অভিযান (২২ জুন ১৯৪১) আন্তর্জাতিক কারবার। স্তালিনগ্রাদের পরবর্তী জার্মাণির রুশিয়া-বর্জনও (১৯৪৩—৪৪) আন্তর্জাতিক খেলাই বটে। একমাত্র রুশিয়া বনাম জার্মাণির খেলা এখানে নাই। একমাত্র রুশ কমিউনিজ্‌মের সঙ্গে জার্মাণ নাৎসি-নিষ্ঠার পাঞ্জা-কষাকষিও এই আনাগোনার ভেতর দেখিলে ভুল বুঝা হইবে। একমাত্র নাৎসি-নীতির জোরে জার্মাণরা স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত ধাওয়া করে নাই। আবার একমাত্র সাম্যবাদের দৌলতে রুশ পল্টন বুল্‌গেরিয়ার পথে গ্রীস-তুর্কীর দিকে ছায়া ফেলিতেছে না। বিশ্বশক্তির মারপ্যাঁচ জটিল।

সোজা চোখে দেখা যাইতেছে যে,—উত্তরের ফিনল্যান্ড হইতে দক্ষিণের বুল্‌গেরিয়ার পথে প্রায় ঈজিয়ান সাগর পর্যন্ত দেশগুলি জার্মাণি রুশিয়াকে ছাড়িয়া দিতেছে। জার্মাণির এই রাষ্ট্রনৈতিক চাল দুনিয়াকে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াইয়া ছাড়িতেছে। ইহাতে ভার্সাই সন্ধির (১৯১৯) তৈয়ারী-করা ইয়োরোপ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহাতে জার্মাণির লোকসান নাই এক কাঁচ্চাও। লোকসান যা কিছু ফিনল্যান্ড, এস্‌থোনিয়া, লাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলান্ড

রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, তুর্কী, গ্রীস ইত্যাদি দেশগুলার। কাজেই আসল লোকসান জার্মাণির শত্রুদের। ইহাতে বৃটিশ-মার্কিণ সাম্রাজ্য-নীতির রুশ-সমস্যা, বল্কান-সমস্যা ও বাল্টিক-সমস্যা কঠিন আকার ধারণ করিল। সেই সকল সমস্যার বিশ্লেষণ নজর না দিয়া একমাত্র মার্ক্স-লেনিনের দোহাই দিলে দুনিয়ার আবহাওয়া বুঝা যাইবে না।

লেনিন-স্তালিনের রুশিয়ায় একমাত্র দ্রষ্টব্য কমিউনিজ্মের সাম্যদর্শন নয়। লেনিন-স্তালিনের রুশিয়াটা রুশিয়া নামক জনপদও বটে। এই রুশিয়া পিটার-ক্যাথেরিণ-আলেকজান্ডার-নিকোলোসের রুশিয়ারই বংশধর। স্তালিনী রুশিয়ার বাড়্তিকে অ্যাংলো-মার্কিণ মাতব্বরেরা রুশ-বাদশাহির বাড়্তি সম্ঝিতে বাধ্য। রুশ সাম্রাজ্য-বিস্তারের বিপক্ষে ইয়োরামেরিকার সনাতন মেজাজ আবার মাথা চাঁড়িতেছে। সেদিনকার কুইবেকের বৈঠকে রুশ সাম্রাজ্যের অতিবৃদ্ধি হইতে ইয়োরেশিয়াকে বাঁচাইবার কর্মকৌশলই বোধ হয় ছিল একমাত্র বা আসল ধান্ধা। কমিউনিস্ট্ সাম্যধর্মের বাড়্তিই এই মুহূর্তে ইংরেজ মার্কিণ মুরুব্বিদের একমাত্র জুজু নয়। রুশিয়ার কল্পনাতীত কলেবর বিস্তার ঘটাইয়া জার্মাণি অ্যাংলো-আমেরিকান ধুরন্ধরদেরকে জার্মাণ নেতৃত্বের তাঁবে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই হ-য-ব-র-ল'র ভিতর নাক গুঁজিতে না পারিলে রাষ্ট্রদর্শনের হুসিয়ার বেপারী হওয়া অসম্ভব। বিশ্বশক্তির মামুলি বেপারীদের চোখে ধাঁধা লাগিবে।*

সমীপবর্তী ভবিষ্যতের কোষ্ঠী গুনিয়া বিমলেন্দু বলিতেছে ঃ— (১) "যুদ্ধোত্তর ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোনো আশাই নাই" (পৃঃ ৬০)। (২) "বৃটেনের রাজনৈতিক জীবনের গতিও ফাশিবাদের অনুকূলখাতে প্রবাহিত" (পৃঃ ৫৪)। (৩) "চীনের অবস্থাও কোনো মতেই সমাজতন্ত্রের অনুকূলে নয়" (পৃঃ ৫১)। (৪) "ফাশিবাদ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাহায্যেই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা কর্বে ব'লে মনে হয়" (পৃঃ ৬৩, ৬৬)। (৫) "আজকের অ্যাংলো আমেরিকান ধনতন্ত্র ফাশিবাদের সামরিক পরাজয়ই চায়, সম্পূর্ণ অবলুপ্তি নয়" (পৃঃ ৬৯)। বিমলেন্দু বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষক। এই সকল বেপরোআ স্বাধীন চিন্তার ইজ্জদ জুটিবে যে-কোনো মাথাওয়ালাদের মজলিশে। অবশ্য কোনো-কোনো মহলে এসব পছন্দসই নয়।

সমসাময়িক দুনিয়ার তথ্যসমূহ ও চিন্তারাশির ভিতর শক্ত পাঞ্জায় পান্সী ভাসাইতে পারে বিমলেন্দু। আত্মিক বাজারে সে বিচক্ষণ সওদাগর। এই বইয়ের ভিতরকার মালের মতন মালের উপর যাহারা নিজ-নিজ মগজের ঘী ঢালিতে সমর্থ, —প্রধানতঃ বা একমাত্র তাহাদের পক্ষেই ১৯৪৫-৫০ এর ভারতবর্ষের পাকা সমজদার ও সেবক হওয়া সম্ভব। চাই ভারতে এই ধরণের মালের রকমারি বেপারী হাজারে-হাজারে।

বিমলেন্দু নিরেট চিন্তা-সম্পদের মালিক। একসঙ্গে অনেক ঢঙের তথ্য লইয়া একটানা চিন্তা চালাইবার ক্ষমতা এই ছোকরা-দার্শনিকের আছে। বইটা জমাট-বাঁধা রাষ্ট্রিক ভাবধারায় ভরপুর। বিমলেন্দুর মতন দার্শনিকেরাই বাঙালী জাত্কে চিন্তাজগতে অমর করিয়া রাখিবে।

* "লালফৌজের কীর্তি বনাম বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির জয়জয়কার," "আসল দ্বিতীয় রণাঙ্গন," ২৯০-২৯৩ পৃষ্ঠা।

অক্টোবর ১৯৪৪

"উদয়ের পথে"

২০শে অক্টোবর ১৯৪৪

মন্মথ—কে যেন বল্‌লে,—আপনি সিনেমায় জোতির্ময় রায়ের "উদয়ের পথে" দেখ্‌তে গিয়েছিলেন? বাংলা সিনেমা আর কখনো দেখেছেন?

সরকার—আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত,—ইংরেজি, সিনেমাই জীবনে ক'টা দেখেছি। বাংলায় বোধহয় "উদয়ের পথে"ই প্রথম। হিন্দীতে দেখেছি বছর কয়েক হ'লো "রাম-রাজ"। রামায়ণের মাল।

লেখক—হঠাৎ "উদয়ের পথে" দেখা হ'লো কী ক'রে?

সরকার—একদিন শনিবার (১৪ অক্টোবর) গোটা দেড়েকের সময় দাঁতের ডাক্তার রফি আহম্মদ মেয়েদের নিয়ে এসে হাজির। তার মেয়ে আমিনার সঙ্গে আমার মেয়ে ইন্দিরার ভাব। রফি বল্‌লে ঃ—"একটা টিকেট আল্‌গা আছে,—সিনেমার। কখনো সিনেমা-ঠিনেমায় যাওয়া হয় না তো? আসুন,—দেখিয়ে নিয়ে আসি।" ব্যস্‌। আমিও গিয়ে গাড়ীতে বস্‌লাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না। গাড়ী চল্‌লো ভবানীপুরের দিকে। দাঁড়ালো রূপালীর সাম্‌নে। ভিতরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখি "উদয়ের পথে"র বিজ্ঞাপন ডাইনে-বাঁয়ে।

লেখক—কেমন লাগ্‌লো?

সরকার—দেখ্‌লাম,—পালাটা "গাওয়া" হচ্ছে ভাল। লেখাটাও বেশ-কিছু শাঁশাল ও জোরাল।

লেখক—কথাবস্তুটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারেন?

সরকার—কেন? বল্‌বার কী আছে? এতো কল্‌কাতার মামুলি সমাজ। পয়সাওয়ালাদের হামবড়ামি ঠিকই দেখানো হ'য়েছে। গরীবের মেয়েরা ইস্কুল-কলেজে ধনী-মেয়েদের কাছে নাকাল কি কম হয়? তারই একটা ছবি ছিল। অতি-মাত্রায় ফলিয়ে দেখানো হয় নি কিছুই। বড়লোকদের সামাজিক অত্যাচার নিখুঁতভাবে ফুটানো হ'য়েছে।

লেখক—ধনী লোক অভাবগ্রস্ত সাহিত্য-সেবককে দিয়ে বই লিখিয়ে নিলে। তারপর নিজের নামে ছেপে গ্রন্থকার ব'নে গেল। এই দৃশ্যে সত্য ঘটনা মূর্তি পেয়েছে কি?

সরকার—নিশ্চয়। এই অত্যাচার অতি-সনাতন। যখন-তখন ঘ'টছে,—শুধু বাঙলাদেশে বা ভারতে নয়, তামাম দুনিয়ায়ই বিজ্ঞানসেবী, শিল্প-সেবী, সাহিত্য-সেবী, যন্ত্র-সেবী, গবেষক, উদ্ভাবক, গায়ক ইত্যাদি সুধী বা গুণীদের দুরবস্থা ঐরূপ। পয়সাওয়ালাদের কাছে মাথাওয়ালারা, স্রষ্টারা, গবেষকেরা, আবিষ্কারকেরা সর্বত্রই নাস্তানাবুদ হ'য়ে থাকে। কোনো-কোনো সময়ে ধনীরা গোটাকয়েক টাকা দিয়ে সুধীদেরকে কিনে রাখে। তাতে ন্যায্য মজুরি জুটে না। খরচ পোষায় না। অনেক ক্ষেত্রে বিনা মজুরিতে তাদেরকে খাটিয়ে ধনীরা ব'লে দেয়,—"চ'রে খাও গিয়ে।" ধনীদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ চালাবার ক্ষমতা কোন্‌ লেখক-গায়ক-চিত্রশিল্পীরই বা আছে?

("পয়সাওয়ালাদের বর্বরতা," পৃঃ ৬০৬-৬০৭ দ্রষ্টব্য)

লেখক—পুঁজিপতির সঙ্গে মজুরদের যোগাযোগটা দেখাতে গিয়ে "উদয়ের পথে"র

লেখক অত্যুক্তি করেনি কি? বাঙলাদেশে এই রূপ সমাজ গ'ড়ে উঠেছে কি?

সরকার—মফস্বলের বাঙালীরা বোধহয় আধুনিক পুঁজিপতির চেহারা বেশী দেখে না। কিন্তু কল্‌কাতায় এই মূর্তি নতুন-কিছু নয়। মজুরদের জীবন-যাত্রা বাঙলাদেশের ফ্যাক্টরি-কারখানাওয়ালা পল্লী-শহরে সুপরিচিত। স্বদেশ-নিষ্ঠ মজুর-নায়কদের মজুর-সেবাও মাঝে-মাঝে পল্লী-শহরের বাঙালীরা দেখ্‌তে পায়। জ্যোতির্ময় রায়ের হাতে নয়া বাঙলার এই সব চিত্র বিনা গোঁজামিলে ফুটে উঠেছে। লেখার ভিতর অত্যুক্তি একরত্তিও দেখ্‌তে পাইনি। রচনার বাহাদুরি তারিফ-যোগ্য। লেখক "চোখকান-খোলা" লোক,—বেশ বস্তুনিষ্ঠ।

লেখক—আপনি আধুনিক পুঁজিপতি কাদেরকে বল্‌ছেন?

সরকার—পুঁজিপতি দুই প্রকারের ঃ— সেকেলে আর আধুনিক। জমিদারেরা হ'লো সেকেলে পুঁজিপতি। একালের পুঁজিপতি হচ্ছে ব্যাঙ্কার, বীমাদার, কারখানার ম্যানেজার, বহির্বাণিজ্যের ধুরন্ধর, যান-বাহনের মালিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক।

লেখক—আধুনিক পুঁজিপতি বাঙলাদেশে অনেক আছে কি?

সরকার—লাখপতি-ক্রোরপতি অনেক নাই। তবে দশহাজার পতি অনেকগুলা আছে, লাখপতি আছে কয়েকটা, ক্রোরপতি বোধহয় দু'একজন। কিন্তু আধুনিক পুঁজিপতিদের "মেজাজওয়ালা" লোক আজই বাঙালী সমাজে আছে হাজার-হাজার। "উদয়ের পথে"র পুঁজিপতিমশায় আয়ের বহরে কী দরের লোক জানা নাই। তবে এই পুঁজিপতির মানসওয়ালা বাঙালীর বাচ্চা আজকাল যেখানে-সেখানে—মায় মফস্বলেও দেখা যায়। আধুনিক পুঁজিপতির চরিত্র দেখে কাব্য-নাট্য-গল্পের লেখকেরা জ্যোতির্ময়ের কাছে নয়া-নয়া চরিত্র খাড়া কর্‌বার হদিশ পেল,—বলতে পারি। জ্যোতির্ময় পথ-প্রদর্শক।

লেখক—ধনীর মেয়ের পক্ষে গরীব মজুর-নায়কের প্রেমে পড়া বাঙালী-সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা কি?

সরকার—কেন, অস্বাভাবিক কিসে? মেলামেশার সুযোগ থাক্‌লে যে-কোনো বাঙালী মেয়ে যে-কোনো পুরুষকে ভালবাস্‌তে পারে। ভালোবাসাবাসির কারবারে ধনী-নির্ধনের মামলা নাই। "কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" তাছাড়া মজুর-নায়কেরা নকড়া-ছকড়া জীব নাকি? ইস্কুল-মাষ্টার, কেরাণী, উকিল ডাক্তার, সাংবাদিক, হাকিম, জজ, কংগ্রেস-কর্মী, রাষ্ট্রনায়ক ইত্যাদি পেশার লোকেরা যা, মজুর-সেবা-পেশার ছোট-বড়-মাঝারি কর্মীরাও তাই। উনিশ-বিশ কর্‌তে বসা আহাম্মুকি। রোজগারে ছোট-বড় আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যত্বের মাপে, কর্মদক্ষতার মাপে মজুর-নায়কেরা বেশ উঁচুদরের লোক।

লেখক—আজকালকার বাঙালী সমাজে পয়সাওয়ালা পরিবারের মেয়েরা যেচে এসে গরীব স্বদেশ-সেবক আর মজুর-নায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিয়ে কর্‌ছে কি?

সরকার—বাঙলা দেশে ফি-বছর লাখ-লাখ বিয়ে হয়। তার ক'টার খবর তুমি রাখো? কোনো-কোনো মেয়েরা স্বাধীনভাবে বাছাই ক'রে আজকাল বিয়ে করে। হাজারে-হাজারে হয়ত নয়,—শয়ে-শয়েও হয় ত নয়। কিন্তু কয়েক গণ্ডা বিয়ে স্বাধীন-বাছাইয়ের ফলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার ভেতর পয়সাওয়ালী কেউ-কেউ গরীব পুরুষকেও হয়ত বিয়ে কর্‌ছে। এতে চ'মকে যাবার কী আছে? গরীব ব'লেই পুরুষটা সমাজের-ফেলিতব্য মাল নয়। বরং কোনো-কোনো ধনী-ছোক্‌রাই সত্যিকার পারিয়া, অস্পৃশ্য, জানোআর। স্বাধীনভাবে বর-বাছাইয়ের ব্যবস্থা থাক্‌লে অনেক সময়েই ধনী-জানোআরদেরকে ধনী-

মেয়েরাও পছন্দ কর্‌বে না। পয়সাওয়ালীদেরও কেহ-কেহ স্বামীর জন্য সত্যিকার মানুষই চায়।

লেখক—"উদয়ের পথে" বইটাকে বাঙালী সমাজের চিত্র হিসাবে আপনি তা হ'লে গ্রহণ কর্‌তে রাজি আছেন?

সরকার—তাও আবার বল্‌তে হবে? "কবিকঙ্কণ-চণ্ডী" বা "অন্নদা-মঙ্গল"ই কি বাঙালী সমাজের একমাত্র চিত্র নাকি? "নীলদর্পণ" যে-হিসাবে বঙ্গ-সমাজের চিত্র, "বিষবৃক্ষ" যে-হিসাবে বঙ্গ-সমাজের চিত্র, "চরিত্রহীন" যে-হিসাবে বঙ্গ-সমাজের চিত্র, তারাশঙ্করের "দুই পুরুষ" (১৯৪২) যে-হিসাবে বঙ্গ-সমাজের চিত্র, "উদয়ের পথে"ও ঠিক সেই হিসাবেই বঙ্গ-সমাজের চিত্র। "নীলদর্পণ" হ'তে "উদয়ের পথে" পর্যন্ত সাহিত্যের মারফৎ বাঙালী জাতের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক গড়ন নয়া-নয়া আকারে দেখ্‌তে পাচ্ছি। "উদয়ের পথে" বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালী সমাজের অন্যতম স্তম্ভ বা সড়ক-চিহ্ন।

বিজয়া-সম্মেলন

২৮শে অক্টোবর ১৯৪৪

মন্মথ—কাগজ-ব্যবসায়ী রঘুনাথ দত্তর বাড়ীতে বিজয়া-সম্মেলনে গিয়েছিলেন? (৮ অক্টোবর) কোনো-কোনো মাতব্বর লোক নাকি আপনার কথাবার্ত্তায় খুব ক্ষেপে গেছে? কেন, কী ব'লেছেন?

সরকার—কৈ, কিছুই শুনিনি তো? মারাত্মক-হাতী-ঘোড়া কিছুই বলিনি। ওসব আমার মুড়ি-মুড়্‌কি। ব'লেছি যে, মামুলি বর্ণাশ্রমে জাত-পাঁত আর চল্‌বে না। হিন্দু সংস্কৃতির গুণগানে আর বিজয়া-সম্মেলনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় একালে পেট ভরতে পারে না। চাই বিংশ শতাব্দীর মনু। সকলেই জানে যে, আমি পুরোণো মনুর পাঁড় গুণগ্রাহী। সেকেলে মনু বাপকা বেটা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মনুকে দিয়ে হিন্দু বিধান ভেঙে দেওয়া জরুরি। তথাকথিত ছোট জাত্‌, তপশীলভুক্ত জাত্‌, ইতর জাত্‌ ইত্যাদি জাত-ব্যবস্থারও মুণ্ডুপাত করা চাই। বাপ দাদাদের থালা-বাটি, টাকা-কড়ি, বাড়ীঘর বা যন্ত্রপাতিতে ছেলেদের মতনই,—আর ছেলেদের সমান,—অধিকার মেয়েদেরও থাকা উচিত। এই ধরণের কথা বকা গেছে। ("জাতিভেদহীন হিন্দুত্ব", "বিংশশতাব্দীর মনু," পৃঃ ৫৩৩-৫৩৫ দ্রষ্টব্য)

লেখক—এই ধরণের মত আপনার লেখালেখির ভেতর অনেক জায়গায় আছে দেখেছি। কিন্তু সার্বজনিক বক্তৃতায় এসব বলেন কি?

সরকার—আসর অনুসারে বকাবকি,—বুঝ্‌তেই পার্‌ছো। সাধারণতঃ বোধহয় অর্থনৈতিক কথাই বেশী ব'কে থাকি। আজকাল বিজয়া-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্য সামাজিক কথার চর্চা আপনা-আপনি খানিকটা ঘ'টে যায়। 'ইণ্ডিয়া টু-মরো" ক্লাবের বীরেন বসু কলেজ স্কোয়ারের বাজারে বা কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের ঘরে অথবা ভবানীপুরের কোনো সার্বজনিক পূজামণ্ডপে কয়েকবার বিজয়া-সম্মেলনের ব্যবস্থা ক'রেছিল। এই উপলক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর মনুর পাঁতি ঝাড়্‌বার সুযোগ জুটেছে। তাছাড়া

হিন্দু মহাসভার তদ্‌বিরেও বিজয়া-সম্মেলন বসে। সম্পাদক ও কর্মকর্তা থাকেন মণীন্দ্র মিত্র। এই আসরেও দু'একবার বিংশ শতাব্দীর মনুগিরি চালিয়ে এসেছি। গত বছর ব্যবস্থা ছিল নির্মল বড়ালের বাড়ীতে। মণি মিত্র আমাদের সেকেলে লোক। ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম চেলা,—কাজেই আমাদের গুরু-ভাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মনু তাঁর বরদাস্ত হবার নয়।

লেখক—এই ধরণের মত কি আপনি স্বদেশী যুগেও পোষণ কর্‌তেন?

সরকার— কোনো দিনই না। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) আমরা চরম গোঁড়া-পন্থী ছিলাম। ভারতীয় বর্ণাশ্রমের কোনো-কিছুই সমালোচনার বস্তু ভাব্‌তাম না, বোধহয় কাউকে ভাব্‌তে দিতামও না। যা-কিছু হিন্দু তার ল্যাজায়-মুড়োয় সবই ভাল,—সবই বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে। তার সমালোচনা ছিল অচল। সমালোচক মাত্রকেই বোধহয় ব্রাহ্ম ব'লে গাল দেওয়া হতো। ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় সমাজ-সংস্কার ছিল আলোচনার বহির্ভূত মাল।

লেখক—আপনার "নয়া-বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" (১৯৩২) আর "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) বইয়ে হিন্দু জাত-পাঁত্ ভাঙার পাঁতি আছে কি?

সরকার—মনে পড়্‌ছে না। খোলাখুলি বলা আছে কিনা জানি না। তবে ঠারে-ঠারে বোধ হয় সব-কিছুই বলা আছে। কেননা এই অধমের সামাজিক নল-নল্‌চে দুই-ই বিদেশ-পর্যটনের প্রথম যুগেই (১৯১৪-২৫) ব'দ্‌লেছে।

লেখক—বাজারে দাঁড়িয়ে জাতি-ভেদ ভাঙার কথা, বিবাহে ধর্ম রহিত করার কথা, সম্পত্তির ভাগ-বাটোআরায় মেয়েদের পুরুষ-সাম্যের কথা কদ্দিন ধ'রে ব'ল্‌ছেন?

সরকার খোলাখুলি বোধহয় বছর দশেক এই রকম ব'ক্‌ছি। বইয়ের ভেতর "ভিলেজেস অ্যান্ড টাউন্‌স্" (১৯৪১) বোধ হয় প্রথম সাক্ষী। আর সব মনে প'ড়্‌ছে না।

নবেম্বর ১৯৪৪

বাংলা সাহিত্যে লাখ-তিনেকের জীবন-কথা

২২শে নবেম্বর ১৯৪৪

হেমেন সেন—শুন্‌লাম সেদিন অ্যাটর্নি নির্মলচন্দ্র'র বাড়ীতে,—"শনিবারের বৈঠকে"র সভায় (১৯ নবেম্বর ১৯৪৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী দাস ইত্যাদি লেখকদেরকে ব'লেছেন যে, বাংলা সাহিত্যে একমাত্র হিন্দু বাঙালীর কয়েক লাখ লোকের জীবন চিত্রিত হয়। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে আপনি বড় জোর লাখ-তিনেকের সাহিত্য ব'লেছেন? লোকেরা নাকি চ'টে গেছে? কথাটার মানে কী?

সরকার—কী করা যাবে, ভায়া? আহাম্মুকের কথায় যারা চটে তারাও আহাম্মুক। কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের তদ্‌বিরে সভা ব'সেছিল। এই গরুটাকেও তলব করা হ'য়েছিল। পৌঁছোতে দেরি হ'লো। গিয়ে দেখি ঘর " লোকে লোকারণ্য"—তার ওপর মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা। বক্তৃতার পালা প্রায় শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সভাপতি অতুল গুপ্ত বেচারাকে

অসুস্থ অবস্থায় ধ'রে-বেঁধে নিয়ে এসেছিল। তাঁকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু সজনী দাস আমাকে দরজার সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—"বলুন কিছু।" কী আর করা যায়? বকা গেলো।

লেখক—কী বল্‌লেন?

সরকার—বল্‌লাম যে, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, দর্শন-লেখক আর সমালোচক ইত্যাদি সাহিত্যিকদের বাদ দিয়ে যাচ্ছি। বল্‌ছি এক মাত্র কবি, নাট্যকার আর গাল্পিকদের কথা। মধু-বঙ্কিমের পর হ'তে আজ পর্যন্ত আশি-নব্বই বছরে বাংলা সাহিত্যের বিষয়-বস্তু বা আলোচ্য বিষয় আকারে-প্রকারে আর বহরে-গড়নে বেশ-কিছু বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ হ'তে বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশেকের পর ১৯৮০ সনে বাঙালীর বাচ্চারা একালের বাংলা সাহিত্যকে বাঙালী "জাতের" সাহিত্য সম্‌ঝিতে পার্‌বে কি?

লেখক—এই কিম্ভূতকিমাকার প্রশ্ন কর্‌লেনই বা কেন? আর তার জবাবই বা কী?

সরকার—"বাড়তির পথে বাঙালী" বকা হচ্ছে আমার বাতিক। কিন্তু এই অধম সর্বদাই আত্ম-সমালোচক। আমরা আগেকার তুলনায় আজ বেশ-কিছু উন্নত সন্দেহ নাই। কিন্তু "এত উচ্চে উঠেছি তবু উচ্চতমের অনেক দেরি",—এই হচ্ছে আমার উন্নতি-দর্শন আর বাড়্‌তি-নিষ্ঠার সূত্র। কাজেই বর্তমানের দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য আর সঙ্কীর্ণতা ও এক-চোখোমি সম্বন্ধে টন্-ট'নে জ্ঞান নিয়ে চলাফেরা করা আমার দস্তুর।

লেখক—বাংলা সাহিত্যকে ১৯৮০ সনের সমালোচকদের চোখে কিরূপ দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—সেই কথাই তো ব'লেছিলাম। ব'লেছিলাম যে, বাঙালী লেখকেরা প্রধানতঃ হিন্দু। ছয় কোটি বাঙালী নরনারীর প্রায় তিন কোটি মুসলমান। কিন্তু মুসলমানের প্রতিনিধি বাংলা কাব্য-নাট্য-গল্পের লেখকদের ভেতর অতি-কম। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমান নরনারীর জীবন চিত্রিত হয় না বল্‌লেই চলে।

লেখক—কেন? হিন্দুরা কি মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে লেখে না?

সরকার—হিন্দু লেখকদের গল্প-সাহিত্যে বিবৃত লোকজনের ভেতর শতকরা বোধ হয় দু-তিন জনও মুসলমান নয়। মনে হবে যেন হিন্দু গাল্পিকেরা বাঙালী মুসলমানদেরকে একদম চেনে না। আমি বাঙালী হিন্দুর তৈয়ারি কাব্য-নাট্য-গল্পে মুসলমান চরিত্র দেখ্‌তে চাই। ক্বচিৎ-কখনো একজন-আধজন চাষী, বাবুর্চি, মজুরকে দাড়ি নাড়িয়ে হাজির করলে চল্‌বে না। চাই গণ্ডা-গণ্ডা হিন্দু চাষী-মজুর-কেরাণী-উকিল-মাষ্টার-বেপারী-স্বদেশসেবকদের আনাগোনা। তাহ'লে বুঝবো যে,—বাঙালী-হিন্দু লেখকেরা সত্যিকার বাঙালী বাচ্চা,—বঙ্গসন্তান।

লেখক—তাহ'লে লাখ দু-তিনেকের কথা উঠ্‌লো কী ক'রে?

সরকার—আমি ব'লেছিলাম যে, আমাদের গাল্পিকেরা প্রধানতঃ বামুন-কায়েথ-বৈদ্যের ঘর-কন্না আর সুখ-দুঃখের বেপারী। তার ভেতরও আবার যারা শহরে-মফস্বলে ম্যাট্রিক ইস্কুল পেরিয়েছে তাদের জীবন-যাত্রাই একালের লেখকদের প্রধান কথা-বস্তু। আজ কাল বি-এ, বি-এস্-সি, এম-এ, এম-এস-সি ক্লাসের মেয়েরা গাল্পিকদের নজরে প'ড়েছে। তার সঙ্গে মেয়েদের মেস-হস্টেলের আবহাওয়া গল্প-সাহিত্যে ছুঁতে পারা যায়। ছয় কোটি বাঙালীর পল্লী-শহরের জীবনের কতটুকুই বা এই সকল অবেষ্টনে পাকড়াও করা সম্ভব? ঠারে-ঠোরে ব'লে দিলাম,—লাখ দু-তিনেক নর নারীর চলা-ফেরা আর লেনদেন ছাড়া

একালের কবি-নাট্যকার-গাল্পিকেরা বেশী-কিছু বশে আনতে পারে নি। তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে নিয়ে সংখ্যাটা ঝাড়ি নি। এদিকে জরীপ চালানো ভাল। সাহিত্য-সমালোচনার আসর তাহ'লে বেড়ে যাবে। সাহিত্য-বিশ্লেষণে ও সংখ্যাশাস্ত্র (স্ট্যাটিস্টিক্স্) লাগে! কয়েকজন লেগে থাকুকনা এই কাজে।

গল্প-সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা

লেখক—এই সম্বন্ধে সাহিত্য-বিশ্লেষণের অন্য কোনো সমালোচনা প্রণালী বাৎলাতে পারেন?

সরকার—অতি সোজা কথা। ১৯৩০ বা ১৯৪০ সনের পরবর্তী কবিতা, নাটক, গল্প ও উপন্যাসগুলার ফিরিস্তি করা হোক। শ'-তিনেক রচনার ভেতর নাক গুঁজে চরিত্রসমূহের হিসাব চালাতে হবে। আর দেখা চাই স্ত্রী-পুরুষগুলার ধর্ম কী, জাত কী আর আয় কী। চি-চিং ফাঁক হ'য়ে যাবে। বুঝা যাবে আজও বাঙালী আমাদের নজর কত ছোট। বাঙালীর কলিজায় এখনো ছয় কোটি বাঙালী নর-নারীর অতি-সামান্যই ঠাঁই পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের চরিত্রগুলাকে লাখ দুতিনেকেরও প্রতিনিধি বলা চলে কিনা সন্দেহ। আমরা এতই সঙ্কীর্ণ, এতই এক-চোখো।

লেখক—এই সঙ্কীর্ণতার বা এক-চোখোমির কারণ কী?

সরকার—তাও বল্‌তে হবে? আমরা চোখ খুলে চলাফেরা করি না। বোধ হয় চোখই আমাদের নাই? হয়ত বা চোখ আমাদের কুচুটে। আমাদের লেখকেরা রকমারি পেশার খবর রাখে না। লোকজনের সঙ্গে মেল-মেশ কম। পুঁথি-পত্রিকা ঘাঁটা-ঘাঁটি করার রেওআজ নেহাৎ অল্প। ই'ত্যাদি ইত্যাদি।

লেখক—চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে গল্প-লেখকেরা কিরূপ ভুল করে মনে হচ্ছে?

সরকার—মুসলমান চরিত্র দু-একটা ক্বচিৎ-কখনো খাড়া করা হয় বটে। কিন্তু হিন্দু চরিত্রের বিলকুল উল্টা দেখানো যেন লেখকদের মতলব থাকে। হিন্দুতে-মুসলমানে আকাশ-পাতাল ফারাক না থাক্‌লে যেন গল্পটা নির্ভুল হয় না,—বা জমাট বাঁধে না। হিন্দুর দোষ-গুণ আছে আর মুসলমানও দোষে-গুণে মানুষ,—এই মামুলি কথাটা লেখকদের মেজাজে বেশী পাই না।

লেখক—এই ধরণের আর কোনো দোষ গল্প-সাহিত্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

সরকার—মজুর-চরিত্রে দেখানো হয় মনিবের ঠিক উল্টা হাবভাব! চাষী দাঁড়িয়ে যায় জমিদারের বিলকুল উল্টা!! আর নিরক্ষরেরা তো লিখিয়ে-পড়িয়েদের পুরাপুরি উল্টা বটেই!!!

লেখক—এইরূপ অসম্পূর্ণতার কারণ কী?

সরকার— লেখকেরা রক্তমাংসের মানুষকে বাজিয়ে দেখ্‌তে শেখেনি। এইজন্য অলীক মন-গড়া কাল্পনিক ব্যক্তি খাড়া হ'য়ে যায়। লেখকেরা বস্তুনিষ্ঠ নয়। সংসারের অভিজ্ঞতা এদের খুবই কম।

"বিনয় সরকারের বৈঠকে"

লেখক—আপনার নিজের রচনাবলীর ভেতর থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

সরকার—এই অধম কবি-গাল্পিক-নাট্যকার নয়। তবে নিজ লেখা-লেখির ভেতর থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন হবে না। এই যে "বিনয় সরকারের বৈঠকে" বেরুচ্ছে। এই সকল বৈঠকী মোলাকাতের জন্য লেখকেরা প্রশ্ন চালাচ্ছে কোন্ ধরণের?

লেখক—বলুন,—চিত্তাকর্ষক হবে।

সরকার—আজ পর্যন্ত কোনো প্রশ্নকর্তা কল্‌কাতার ধাঙ্গড় মুর্দাফরাস, ঝাড়ুদার আর ম্যাথরদের সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে নি। জিজ্ঞাসা কর্‌লেই জবাব দিতে পার্‌তাম কে বল্‌লে? মজুর আর চাষী এই দুই শব্দ আমার মুখে লেগেই আছে। সোশ্যালিজ্‌ম্ আর কমিউনিজ্‌ম্ কপ্‌চানো আমার অন্যতম পেশা। কিন্তু মজুর-চাষী, অস্পৃশ্য-পারিয়া ইত্যাদি রক্তমাংসের মানুষ সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান আমার একদম শূন্য। এই সকল অসম্পূর্ণতা আর দুর্বলতা খুবই মারাত্মক।

লেখক—"বিনয় সরকারের বৈঠক" বইয়ের আর কোনো অসম্পূর্ণতা আছে?

সরকার—মুচি, চামার, দর্জি, নাপিত, গোআলা, ধোপা, গাড়োআন, দপ্তরী, মুটে, মাঝি, জেলে, পশারী, দোকানদার মোলাকাতীর মগজে প্রশ্ন উঠে নি। জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'তো কিনা সন্দেহ। এই সকল লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আনাড়ি আমার মতন প্রায় সব লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক। কাজেই কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা একচোখে, অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ থাক্‌তে বাধ্য। লাখ তিনেকের জীবনযাত্রার বাইরে আমাদের কারু নজর যায় না।

স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্সের (পাউন্ড-পাওনার) কোষ্ঠী-গণনা

৩০শে নবেম্বর ১৯৪৪

হেমেন সেন—খবরের কাগজে দেখলাম সেদিন সর্বভারতীয় স্বদেশী ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স (দ্রব্য-প্রস্তুতকারীদের) বার্ষিক সভায় আপনি "স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্স" সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রেছেন। (২৮নবেম্বর ১৯৪৪) তাতে সভাপতি ছিলেন মহীশূরের এঞ্জিনিয়ার অর্থশাস্ত্রী স্যার বিশ্বেশ্বর আইয়া। এই জন্যেই তিনি কলকাতা এসেছিলেন।

সরকার—কাগজ-পত্রে সেই বক্তৃতার বৃত্তান্ত কিছু বেরিয়েছে? আমি স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কোষ্ঠি গুনে দিয়েছিলাম। খবরটা সত্যি।

লেখক—অমৃতবাজার পত্রিকা ব'লেছে যে,—আপনার মতে স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্সের এক পয়সাও যুদ্ধের পরবর্তী ভারতবাসীর কাছে আস্‌বে কিনা সন্দেহ। প্রায় সবই খরচ হ'য়ে যাবে। কাজেই যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির জন্য আপনি কারবারীদেরকে স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্সের মায়া পরিত্যাগ কর্‌তে পরামর্শ দিয়েছেন, ইত্যাদি। একটু খুলে বল্‌বেন? স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্সের কোষ্ঠি আপনি কেমন গুনেছেন শুনি।

সরকার—১৯৩৯ সনে লড়াই সুরু। তখন হ'তে আজ পর্যন্ত বৃটিশ গবর্মেন্ট ভারতবর্ষে অনেক মাল কিনেছে। ভারতবাসীরা বৃটিশ গবর্মেন্টের হুকুম মাফিক বৃটিশ

সাম্রাজ্যের জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মাল পাঠিয়েছে। রপ্তানি বেড়েছে, আমদানি কমেছে। কিন্তু বৃটিশ গর্বমেন্ট ভারতবাসীকে নগদ দাম দেয় নি। ভারতবাসীর নামে বিলাতে টাকাগুলা জমা আছে। ভারতীয় পাওনার মজুদকে স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্স বলে। একে "পাউন্ড-পাওনা" বল্‌তে পারি।

লেখক—বেশ তো? এই পাওনা-টাকা ভারতবর্ষ বৃটিশ গবর্মেন্টের নিকট হ'তে একদিন-না-একদিন পাবে। এ কথা আমরা সকলেই সহজে বুঝ্‌তে পারি। আপনি সেই সভায় ব'লেছেন যে,—এই টাকা পাওয়া যাবে না। এর মানে কী? ইংরেজ কি ভারতের নিকট দেয় টাকা শুধ্‌বে না?

সরকার—লড়াই থাম্‌বা মাত্র ভারতবাসী বিলাতে কোটি-কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালপত্র কিন্‌তে সুরু কর্‌বে। যেই বিলাতী মালের আমদানি ভারতে বাড়্‌তে থাকবে তেম্‌নি সুরু হবে বিলাতের নিকট ভারতের দেনা-বৃদ্ধি। মাস কয়েকের ভেতর ভারতের প্রাপ্য বিলাতী দেনা অনেক পরিমাণে শোধ হ'য়ে যাবে। কাজেই স্টার্লিঙ্ ব্যাল্যান্সে একটা বড় হিস্যা মামুলি আমদানি-রপ্তানির বাবদই নাকচ হবার কথা। অন্যান্য কারণও আছে।

লেখক—কী সেই সব কারণ?

সরকার—বৃটিশ সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের খর্চার হিসাবে ভারত গবর্মেন্টের হিস্যা আজ পর্যন্ত র'য়েছে বেশ-কিছু কম। ভারত-গবর্মেন্ট অল্পদিনের মধ্যেই "লড়াইয়ের খর্চার পরিমাণ" বাড়িয়ে দেবে। কাজেই স্টার্লিঙ ব্যাল্যান্সের আর এক দফা নাকচের পালা সহজেই মালুম হচ্ছে। অবশ্য আমি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নই। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী ফল্‌বেই ফল্‌বে,— ভেবে রাখা ঠিক নয়।

লেখক—আর-কিছু আছে যাতে স্টার্লিঙ ব্যাল্যান্স খানিকটা কাটা যেতে পারে?

সরকার—আছে বৈ কি? বৃটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীকে জার্মাণ আর জাপানী দিগ্‌বিজয় থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভারত-গবর্মেন্ট বৃটিশ গবর্মেন্টকে বেশ-মোটা হারে একটা "দান" কর্‌তে এগিয়ে যাবে। এই ভবিষ্য দৃষ্টির কিস্মৎ কতখানি? যার যেমন মর্জি বুঝে নিতে অধিকারী।

লেখক—তা হ'লে তিন দফায় স্টার্লিঙ ব্যাল্যান্সের খরচ দেখতে পাচ্ছেন?

সরকার—বুঝতেই পারা যাচ্ছে। পাউন্ড-পাওনাটা কর্পূরের মতন হাওয়ায় উড়ে যাবে। সুতরাং বিলাতের নিকট পাওনা টাকার লোভে ভারতীয় নরনারীর পক্ষে শিল্পোন্নতির আন্দোলন চালানো আহাম্মুকি। এই মোহ কাটিয়ে ওঠা উচিত।

লেখক—সভায় বক্তা ছিল কে কে?

সরকার—আলামোহন দাশ অন্যতম বক্তা। আর একজন বক্তার নাম ধীরেন সেন। ইনি কাচের কারখানার পরিচালক। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার সুরেন রায় সম্পাদক হিসাবে বক্তা। বোম্বাইয়ের শঙ্করচাঁদ শার বক্তৃতাও শুন্‌লাম।

লেখক—আপনার স্টার্লিঙ ব্যাল্যান্স বিষয়ক মতামত অন্ন কোথাও শুনিয়েছেন?

সরকার—যেখানেই অর্থনৈতিক বা ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক বকাবকির সুযোগ জুটেছে সেখানেই লোকজনেক ব'লেছি,—"সাধু সাবধান, স্টার্লিঙ ব্যাল্যান্সের ওপর ভর ক'রো না, বাবা। স্বাধীন ভাবে নিজ ট্যাকের পুঁজি খরচ করতে যদি পার তা হ'লে লড়াইয়ের পর নয়া-নয়া শিল্প-কারখানা কাম কর্‌তে পার্‌বে।" কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে ব্যাঙ্কের

আওতায়, স্কটিশ চার্চ কলেজ, যাদবপুর কলেজ, রিপন কলেজ, সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় স্টার্লিঙ ব্যাল্যান্সের কোষ্ঠি কেটেছি এই ভাবেই।

ডিসেম্বর ১৯৪৪

চাই তিলি-সাহা-সুবর্ণবণিক্-গন্ধবণিকের মার্কিণ-প্রবাস

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৪

মন্মথ—কোনো কোনো সাংবাদিক মহলে র'টে গেছে, আপনি নাকি শেষ পর্যন্ত বর্ণাশ্রমের স্বপক্ষে হাটে-বাজারে পাঁতি দিয়ে বেড়াচ্ছেন?

সরকার—বর্ণাশ্রমে বিপক্ষে পাঁতি দেওয়াই তো এই অধমের দস্তুর ব'লে জান্‌তাম। বিংশ শতাব্দীর মনুর পেশা হচ্ছে তাই। লোকেরা ত এই জন্যই গালাগালি করে!

লেখক—স্টার্লিঙ্ ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হ'লো এণ্টালি বাজারে (১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৪)। সেই সভায় নাকি আপনি ব'লেছেন যে, হিন্দু সমাজের চির-প্রচলিত জাতিভেদ অনুসারে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো উচিত?

সরকার—রাধামাধব। কী ব'কেছি আর কী র'টেছে? বলিহারি যাই। অনেক সার্বজনিক বৃক্তৃতার বরাত এইরূপ।

লেখক—কেন, ব'লেছিলেন কী? উল্টা র'ট্‌লো কী ক'রে?

সরকার—ব'লেছিলাম বামুন-কায়েথ বৈদ্য আর তথাকথিত শিক্ষিত জাতের লোকেরা চোদ্দ পুরুষে কখনো খেত, খামার, গোআল, দোকান, কারখানা, আড়ৎ, মোকাম, বাজার বা ঐ-ধরণের কোনো কারবার চালায়নি। কাজেই বর্তমান যুগে এদের হাতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজ বেশী দূর এগুতে পার্‌ছে না,—প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও। তাদের সবে-মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যে হাতে খড়ির যুগ চল্‌ছে। ১৮৫৭-১৯০৫ এর আধা-শতাব্দীতে এরা এই সব কিঞ্চিৎ-কিছু ক'রেছিল বটে। কিন্তু এদের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশী-বেশী যা-কিছু তার সবই ১৯০৫ সনের পরবর্তী যুগে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজও এরা নেহাৎ শিশু। অবশ্য তবুও এদের অনেকে কর্মবীর, বাপকা বেটা সন্দেহ নাই। কাজেই আফ্‌শোষ করা উচিত নয়।

লেখক—তাহ'লে আপনি কী কর্‌তে ব'লেছেন?

সরকার—বিলাতে, ফ্রান্সে, জার্মাণিতে, ইতালিতে, আমেরিকায়—এইসব দেশে দেখা যায় প্রায় আমাদের বাঙালী ও ভারতীয় সমাজেরই অবস্থা। লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা—ইস্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপে যারা উঁচু তারা—ঐ সকল দেশে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজে অতি-মাত্র পটু নয়। ওদের সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যে, ব্যাঙ্ক-বীমায়, আমদানি-রপ্তানিতে আসল-পটু লোক হচ্ছে ইহুদিরা। এরা চোদ্দ পুরুষ এই সকল কাজে হাত পাকিয়েছে। কল্‌কাতার ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি, ব্যবসাবিষয়ক ইংরেজ-মার্কিণ কোম্পানীগুলার ভেতর খবর নিয়ে দ্যাখো। দেখ্‌বে যে, বড়-বড় কর্মকর্তাদের অনেকেই লিখিয়ে-পড়িয়েদের আর খৃস্টিয়ানদের ছেলে নয়। জাত্-ব্যবসায়ে পাকা যে ইহুদি-সমাজ তারা সেই ইহুদি-সমাজের প্রতিনিধি,—বিদ্যায় বড়জোর ম্যাট্রিক।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, লিখিয়ে-পড়িয়ে আর খৃষ্টিয়ান লোকেরা ব্যবসা-

বাণিজ্যে সফল হ'তে পার্‌বে না?

সরকার—তা তো বলিনি। বল্‌ছি যে, ইয়োরামেরিকায়ও ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে লিখিয়ে-পড়িয়েদের পক্ষে নয়া চিজ্ আর কঠিন চিজ্। তারা যুগের পর যুগ ধ'রে পুরুত-গিরি, মাস্টারি ইত্যাদি কাজে পাকা। তারা সরকারী চাকরী করে, আফিস চালায়, লড়াইয়ের কাজে ঢোকে, বই লেখে, ছবি আঁকে, গান গায়, কেরাণী হয়, উকিল হয়, ডাক্তার হয় ইত্যাদি। আমাদের দেশেও মোটের ওপর ব্যবস্থা প্রায়-ঠিক তাই। এই ধরণের বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢুকে নতুন-নতুন কর্মক্ষেত্রে হাত পাকাচ্ছে মাত্র। কিঞ্চিৎ কিছু সফলতা চাখ্‌বার সুযোগেও এদের জুট্‌ছে। সবই ভাল কথা। কিন্তু বর্তমানে,—এখনো বহুকাল পর্যন্ত,—চোদ্দ পুরুষ যারা ব্যবসায়ী তাদের ছেলেরাই ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে "বাঘা-বাঘা" কারবারের মালিক বা পরিচালক থাক্‌তে বাধ্য। অবশ্য অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের মতন কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের সকল কাজে জাতে-জাতে মেলমেশ ও সহযোগিতা জরুরি।

লেখক—কথাটা আরও পরিষ্কার ক'রে ব'ল্‌বেন?

সরকার—বাঙ্‌লা দেশের কথা বল্‌ছি। আমাদের তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক্, গন্ধবণিক্, ইত্যাদি জাত হচ্ছে চোদ্দ পুরুষ ধ'রে "ব্যবসায়ী-জাত্"। ১৯৪৪ সনের শেষ দিকেও এই জাতের লোকেরাই কল্‌কাতায় আর মফস্বলে বড়-বড় কারবার চালাচ্ছে। বামুন-কায়েথ-বৈদ্য ইত্যাদি জাতের লোকেরা ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, বীমা, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি কোনো-কোনো কাজে নেমেছে,—সফলতাও দেখিয়েছে। কিন্তু "বাঘা-বাঘা" কারবারগুলা আজও প্রধানতঃ "ব্যবসায়ী-জাত"গুলার হাতেই র'য়েছে। আমি এইজন্য ১৯৪৪ সনেও বাঙ্‌লাদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে "ব্যবসায়ী-জাত"গুলার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বাঙালী সমাজকে সজাগ ক'রতে চাই।

লেখক—বিদেশের "ব্যবসায়ী জাত" সম্বন্ধে আর একটু খুলে বলুন।

সরকার—ও সকল দেশে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা পরিবারেরা সাধারণতঃ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে ওস্তাদ হয় না। যে-সকল ইংরেজ-ফরাসী-জার্মাণ-মার্কিণবাচ্চা ব্যবসা-বাণিজ্যে পেকে ওঠে তারা লেখাপড়ায় উঁচু নয়। "লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণী"কে "ব্যবসায়ী শ্রেণী" হ'তে ফারাক ক'রে দেখা তাদের দস্তুর।

লেখক—ইহুদিদের কথা পাড়্‌লেন কেন?

সরকার—খৃষ্টিয়ানরা ইহুদিদেরকে "ব্যবসায়ী জাত" সম্‌ঝে চলে। সামাজিক হিসাবে তাদেরকে খাটো ভাবা খৃষ্টিয়ান সমাজের সার্বজনিক রেওআজ। ইহুদি-বিদ্বেষ অতি-সনাতন।

লেখক—এইরূপ ভাবা উচিত কি?

সরকার—আমার বিবেচনায় উচিত নয়। তবে আমি খৃষ্টিয়ানও নই,—ইয়োরামেরিকানও নই। পাশ্চাত্যদের মজ্জাগত কুসংস্কার আমার নাই।

লেখক—ইহুদিরা সকলেই কি ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্নসংস্থান করে?

সরকার—না। ইহুদিদের ভেতরও লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণী আছে। লেখা-পড়ায় যে-সকল ইহুদি উঁচু তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সময়েই উঁচু হয় না। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে সে সকল ইহুদি পাকা তারা লিখিয়ে-পড়িয়ে পরিবারের অন্তর্গত নয়। এই হিসাবে যাঁহা খৃষ্টিয়ান তাঁহা ইহুদি। আসল কথা,—ব্যবসা-বাণিজ্যে যে-সকল ইহুদি-

খৃষ্টিয়ান পাকা তারা ইস্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশে উঁচু নয়।

লেখক—আপনি তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক্‌, গন্ধবণিক, ইত্যাদি জাতের জন্য কিরূপ পাঁতি প্রচার ক'রেছেন?

সরকার—আমি এই সকল ব্যবসায়ী জাতের কর্ম-দক্ষতা, শিল্প-দক্ষতা, বাণিজ্য-দক্ষতা, কারবার-দক্ষতা ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যবসা-দক্ষতা বাড়াবার কতা স্টার্লিঙ ব্যাঙ্কের সভায় ব'লেছিলাম। ব'কেছি যে, ইস্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-মাফিক উঁচু উপাধির দিকে নজর দেওয়া ঠিক নয়। কল্‌কাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ইংরেজ, স্কটিশ, মার্কিণ বা অন্য জাতের লোকেরা বড়-বড় কারবারের কর্মকর্তা র'য়েছে। তাদের পৌনে যে ন আনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানা দেখে নি। অধিকাংশই ম্যাট্রিকের কাছাকাছি বিদ্যাওয়ালা লোক। কাজেই তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক্‌, গন্ধবণিক্‌ ইত্যাদি বেপারী, মহাজন ও দোকানদারের ছেলেরা পরীক্ষায় পাশের দিকে বেশী নজর যেন না দেয়। তাদের উচিত,—নয়া-নয়া যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রাসায়নিক মাল, ওষুধ, গ্যাস, খনি, বিজলী, রেডিও, উড়ো-জাহাজ ইত্যাদি জিনিসের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো। "ইস্কুইলা বিদ্যা" বাড়ানো অনাবশ্যক।

লেখক—এইজন্য আপনার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা আছে?

সরকার—আল্‌বাৎ। আমার ব্যবস্থা হচ্ছে অতি সোজা। "ব্যবসায়ী জাত্‌"গুলার "জাত্‌ মার্‌তে" পার্‌লে আমি খুব সুখী হই।

লেখক—কী ব'ল্‌ছেন?

সরকার—ব'লেছি যে,—তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক্‌, গন্ধবণিক্‌ ইত্যাদি জাতের ছোকরারা,—বাইশ-আটাশ বছরের যুবারা—শ'য়ে শ'য়ে আমেরিকা যা'ক। তাদের পেটে কিঞ্চিৎ-কিছু অখাদ্য পড়ুক। তা হ'লেই জাত্‌ যাবে। কেহ মাস ছয়েক, কেহ বছর দেড়েক, কেহ বছর-তিনেক মার্কিণ মুল্লুকের নানা কেন্দ্রে ঘরকন্না ও ভবঘুরেমি করুক। তাহ'লে যন্ত্রনিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠা, বীমা-নিষ্ঠা, বাণিজ্য-নিষ্ঠা, রসায়ন নিষ্ঠা, খনি-নিষ্ঠা, তেল-নিষ্ঠা, বিজলী-নিষ্ঠা ইত্যাদি নয়া-নয়া আধুনিক-নিষ্ঠা বাঙালী সমাজে সহজে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে। "ব্যবসায়ী জাত্‌"গুলার ভেতর হরেক রকমের আধুনিকতা কায়েম করানো আমার অন্যতম নেশা। এই জন্য আমার আসল পাঁতি হচ্ছে তিলি-সাহা-সুবর্ণবণিক্‌-গন্ধবণিক্‌ ছোক্‌রাদের দলে-দলে মার্কিন-প্রবাস।

লেখক—তাহ'লে তথাকথিত লিখিয়ে-পড়িয়ে জাতের জন্য আপনার পাঁতি কী?

সরকার—লিখিয়ে-পড়িয়ে জাতের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে "ব্যবসায়ী জাতের" লোকজনের সঙ্গে সকল বিষয়ে পুরাদস্তুর সহযোগিতা চালানো আবশ্যক। এই ভাবে দোকানদারি, বেপারীগিরি, কারখানার ম্যানেজারি, কোম্পানির ধুরন্ধরি ইত্যাদি কাজ সাম্‌লাতে হবে। টাকা-পয়সার কাজে তিলি-সাহা-সুবর্ণবণি্ক-গন্ধবণিক্‌ ইত্যাদি জাতের সঙ্গে বামুন-কায়েথ বৈদ্যদের বন্ধুত্ব চাই হামেশা ও সর্বত্র। জানোই ত আমি বাঙলাদেশের মারোআড়িদেরকে বাঙালী সম্‌ঝে থাকি? মারোআড়িরা বাঙালী সমাজের অন্যতম "ব্যবসায়ী জাত্‌"। বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়েদেরকে মারোআড়িদের সঙ্গেও পূরাদস্তুর সহযোগিতা কাম ক'রে আধুনিক কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কারবারে হাত দিতে হবে। এই জন্য চাই মারোআড়িদেরও মার্কিণ-প্রবাস,—শ'য়ে-শ'য়ে যদি না হয়,—কম্‌সে-কম্‌ ডজনে-ডজনে। মারোআড়িদেরও জাত্‌ মারা আর তিলি-সাহা ইত্যাদি জাতের জাত্‌ মারা

আমি বাঙলার নর-নারীর আর্থিক উন্নতির অন্যতম মস্ত খুঁটা সমঝে থাকি। মেজাজ আমার বিচিত্র। (পৃঃ ৬৮১-৬৮৪)

ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের চল্লিশ গবেষক

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪৪

মন্মথ—আজকে আপনার প্রায় বছর-বিশেকের অন্যতম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু জেরা চালাতে চাই। বলুন তো,—বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ আর বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষদের ব্যবস্থায় আপনার সঙ্গে কতজন চেলা-গবেষক র'য়েছে?

সরকার—ধনবিজ্ঞানের পরিষদে আছে ৩০ জনের নাম। তুমি তো সকলকেই জানো। ১৯২৬ সনে চেলা-গবেষকের ভর্তি হওয়া সুরু। সমাজবিজ্ঞানের জন্য চেলা-গবেষক প্রথম ভর্তি হয় ১৯৩৭ সনে। আজ পর্যন্ত তারা গুন্‌তিতে ১২ জন। অতএব মোটের ওপর ৪২ জন। এর ভেতর দু-জনের নাম আছে দুই পরিষদেই। সুতরাং গবেষক-সংখ্যা চল্লিশ। ফরাসী পরিষদের পারিভাষিক চালিয়ে বল্‌ছি যে,—এরা হচ্ছে "চল্লিশ অমর" (?) কী বলো?

লেখক—এই সকল চেলা-গবেষকদের কাজ-কর্ম কিরূপ?

সরকার—পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার জন্য ফি-বছর যে-ধরণের ১২৫ জন চেলা-গবেষক চাচ্ছি ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের এই ৪০ জন সেই ধরণের গবেষক নয়। (পৃঃ ৭১১-৭১৩)

লেখক—কেন? তফাৎ কোথায়।

সরকার—এই "চল্লিশ অমরে"র একজনকেও মাসিক বা বার্ষিক এক আধলাও দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া এদের প্রায় কেউই লেখা-পড়ায় বা গবেষণায় ভাত-কাপড় জুটায় না। এদের অধিকাংশের অন্ন-সংস্থান হয় লেখাপড়ার বহির্ভূত কর্মক্ষেত্রে। দু'একজন মাত্র কলেজের অধ্যাপক। কয়েকজন সরকারী চাক্‌রে।

লেখক—চেলা-গবেষকদের কাজ-কর্ম দেখে বাঙলাদেশের গবেষণা-প্রয়াস সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস কিরূপ জ'ন্মেছে?

সরকার—পয়সা খরচ কর্‌তে পার্‌লে গবেষণার আকার-প্রকার খুব বেড়ে যেতে পারে। গবেষকদের দল-বৃদ্ধির প্রধান কর্মকৌশলই হচ্ছে গবেষণা-বৃত্তি।বাঙালীর বাচ্চা গবেষণায় মেতে যেতে পারে। মগজও আছে, দরদও আছে, কর্মক্ষমতাও আছে।

লেখক—আপনার গবেষকদের বিদ্যার পরিমাণ কতটা?

সরকার—এম-এ'র নীচে মাত্র দুএকজন। প্রথম শ্রেণীর প্রথমও কয়েক জন। তা ছাড়া তৃতীয় শ্রেণী পাশ-করা ছোক্‌রাও আছে। বি-এল্‌ উপাধিও আছে অনেকের। দুই বিষয়ে এম-এ আছে পাঁচ ছয় জনের। জন পাঁচেক বিদেশ-ফের্তা। পরীক্ষায় পাশ-ফেল বা উঁচু-নীচুর ওপর জোর দেওয়া আমার বাতিক নয়,—জানোই তো।

লেখক—চেলা-গবেষকদের কাজকর্ম দেখে উৎসাহী হ'লেন কেন?

সরকার—এই চল্লিশ জনের প্রত্যেকেই অ-বৃত্তিক। বিনা-পয়সায়ও লেখাপড়া চালাবার আগ্রহ বাঙালীর বাচ্চার কিছু-কিছু আছে। এরা যে এই অধমের সঙ্গে কথা

বলে তাতেই আমি উৎসাহী। কেননা চাক্‌রি বা টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে লোক জুটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণতঃ ছোক্‌রারা চাক্‌রি-দাতা মুরুব্বির আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করে। ফলতঃ মোসাহেবি করাই অনেক ছোক্‌রার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আমার মতন গরীবের কাছে মোসাহেবি ক'র্‌বে কে?

লেখক—লেখা-পড়ার ফলাফল কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

সরকার—এদের পঁয়ত্রিশ জনের লেখালেখি মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে। কারু-কারু লেখা প্রবন্ধ পুস্তিকার আকারে পাওয়া যায়। তাছাড়া বইয়ের গ্রন্থকারও কয়েকজন। কেউ-কেউ বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়ই বই লিখেছে। অবশ্য পরিষদের প্রধান বাহন বাংলা। ইতালিয়ান ভাষায় লিখেছে একজন (মণি মৌলিক)।

ছোক্‌রা অর্থশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রীর দল

মন্মথ—গবেষকদের নামগুলা এক সঙ্গে বল্‌তে পারেন?

সরকার—হিসাবে ক'রে বল্‌তে হবে। ধনবিজ্ঞান-পরিষদের অবৃত্তিক গবেষকদের প্রথম দলে (১৯২৬) র'য়েছে সুধাকান্ত দে, নরেন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জিতেন সেনগুপ্ত, আর শিবচন্দ্র দত্ত এই পাঁচজন। ১৯৩০-৩৪ সনে ভর্তি হ'য়েছে সুধীশ বিশ্বাস, কামাখ্যা বসু, বিজয় সাহা, মণি মৌলিক, যতীন ভট্টাচার্য, গোপাল রায়, শচীন সেন, সন্তোষ জানা আর আর অতুল সুর,—এই নয় জন। পরবর্তী পাঁচ বছরে (১৯৩৫-৩৯) আটজন এসেছে ঃ— সুবোধ ঘোষাল, শান্তি মৌলিক, হিমাংশু সেন, অমূল্য দাশগুপ্ত, অমরেশ সরকার, অজয় সরকার, শচীন দত্ত, আর প্রফুল্লরতন্‌ বিশ্বাস। হালের পাঁচ বছরে (১৯৪০-৪৪) ভর্তি সংখ্যা আট ঃ— মণি ব্যানার্জি, মদনমোহন আগরওআল, করুণাকর গুপ্ত, দেবরাজ ভাটিয়া, ক্ষিতি মুখার্জি, আনন্দশঙ্কর পোদ্দার, অনিল মুখার্জি আর বস্তুরচাঁদ লালুয়ানি। এই হ'লো ত্রিজন ছোকরা অর্থশাস্ত্রীর ফিরিস্তি।

লেখক—সমাজবিজ্ঞান-পরিষদের তদবিরে চেলা-গবেষক পেয়েছেন কাদেরকে?

সরকার—প্রথম পাঁচ বছরের (১৯৩৭-৪১) গবেষকেরা নাক গুন্‌তিতে ১১। নাম সুশীল দাশগুপ্ত, নবেন্দু দত্ত-মজুমদর, শচীন দত্ত,* সুধীরেন্দ্র কর, অমল সেন, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, রামকৃষ্ণ সরকার, অসিত সরকার, প্রীতীশ দত্ত, ক্ষিতি মুখার্জি* আর রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। ১৯৪২-৪৪ সনে ভর্তি হ'য়েছে মাত্র একজন, অজিতবরণ চক্রবর্তী। ছোক্‌রা সমাজ-শাস্ত্রীদের দল এখনো পুরু নয়।

লেখক—আপনার এই "চল্লিশ অমরদের" ভেতর গ্রন্থকার হ'য়েছে কে-কে?

সরকার—সুধাকান্ত দে, নরেন রায়, ববি ঘোষ, জিতেন সেনগুপ্ত, শিব দত্ত, মণি মৌলিক, শচীন সেন, অতুল সুর, সুবোধ ঘোষাল, অমূল্য দাশগুপ্ত, শচীন দত্ত, প্রফুল্ল বিশ্বাস, মণি ব্যানার্জি, ক্ষিতি মুখার্জি, হেমেন্দ্রবিজয় সেন,—এই পনর জনকে ছোট-বড়-মাঝারি বইয়ের গ্রন্থকার হিসাবে লোকেরা জানে। ব'লে রাখা উচিত যে, এদের

* এই দুই জন এক সঙ্গে দুই পরিষদের গবেষক।

কারু বই ছাপার জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের বা বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের তরফ হ'তে টাকা সাহায্য করা হয় নি। সত্যি কথা, টাকা-পয়সা সম্বন্ধে এই দুই পরিষদের মুরোদ একদম গোল্লা। প্রত্যেকেই নিজ তাগিদে নিজ মেহনতে গ্রন্থকার হ'য়েছে।

লেখক—এই সকল গবেষকের মতামত কিরূপ?

সরকার—এই অধমের মতামতের সঙ্গে অথবা লেখাপড়ার সঙ্গে এই সকল গ্রন্থকারদের মতামতের বা লেখাপড়ার কোনো মিল-অমিল নেই। সকলেই নিজ-নিজ মগজের মালিক। তাছাড়া বইগুলার কোনো অধ্যায় হয়ত পরিষদ্-দুটার কোনো বৈঠকে পড়া হয় নি।

লেখক—চল্লিশ জন গবেষকদের ভেতর পরিষদের বৈঠকে কোনো প্রবন্ধ পড়ে নি এমন ক'জন র'য়েছে?

সরকার—বিশ জন কোনো দিন কোনো প্রবন্ধ পড়ে নি। আধা-আধি বাদ গেছে। কিন্তু তাদের কারুর-কারুর লেখা বেরিয়েছে "আর্থিক উন্নতি"তে। কেউ-কেউ গ্রন্থকার। কারু-কারু রচনা "বাংলার ধনবিজ্ঞান" বইয়ের দুইভাগে (১৯৩৭-৩৯) আর "সমাজ-বিজ্ঞান" বইয়ের প্রথমভাগে (১৯৩৮) ছাপা হ'য়েছে।

লেখক—এই চল্লিশ জনের ভেতর ধনবিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক কে-কে?

সরকার—প্রথম অবস্থায় অধ্যাপক ছিল শিব দত্ত আর শচীন দত্ত,—দাদা-ভাই। বর্তমানে অধ্যাপক র'য়েছে মণি ব্যানার্জি (কল্‌কাতার সরকারী কমার্শিয়াল-ইন্‌স্টিটিউটে), অনিল মুখার্জি (খুলনার দৌলতপুরে), কস্তুরচাঁদ লালুয়ানি (বোম্বাইয়ের পুণায়) আর অজিত চক্রবর্তী (চট্টগ্রামের কাননগুপাড়ায়)। বুঝ্‌তেই পারছো,—কলেজের সাধারণ অধ্যাপকদের পক্ষে গবেষণার জন্য সময় করা এক প্রকার অসম্ভব। মাষ্টারির ওপর টিউশানি আছে প্রায়-সকলেরই।

লেখক—গবেষকদের সম্বন্ধে কোনো খাশ কথা বল্‌তে পারেন?

সরকার—অ-বাঙালী গবেষক র'য়েছে চারজন। মদন আগরওআল কাশীর ছোক্‌রা। দেবরাজ ভাটিয়ার বাড়ী পাঞ্জাবে। দুজনেরই প্রবন্ধ ইংরেজিতে পড়া হ'য়েছে বৈঠকে। আনন্দশঙ্কর পোদ্দার মারোআড়ি। যুক্ত প্রদেশের লোক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-করা,—ধনবিজ্ঞানে আর দর্শনে দুই বিষয়ে এম-এ। ধনবিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য ষোলটা খাতা দিতে হয়। প্রত্যেকটায়ই আনন্দ প্রথম বিভাগের প্রথম হ'য়েছিল। কস্তুরচাঁদ লালুযানিও মারোআড়ি। বাড়ীঘর রাজসাহিতে। ধনবিজ্ঞানের এম-এ-তে প্রথম শ্রেণীর ছোকরা।

লেখক—কস্তুরচাঁদের বাংলা লেখা দেখেছি মনে হচ্ছে।

সরকার—কস্তুর বাংলা লেখে খুব ভাল। এর প্রবন্ধ "আর্থিক উন্নতি"তে নিয়মিত বেরোয়। আজকাল লড়াইয়ের হিড়িকে মাসিক পত্রিকার পাতা ক'মে গেছে। কাজেই বেশী ছাপাছাপি সম্ভব হয় না। ধনবিজ্ঞানের মাল সম্বন্ধে কস্তুরচাঁদের লেখা বাংলা বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখেছি। ছাপা হ'লে বাংলায় ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের খাশা বই পাওয়া যাবে।

লেখক—আর কোনো গবেষক সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চান?

সরকার—অমূল্য দাশগুপ্ত গাল্পিক। এর লেখা গল্প সজনী দাসের "শনিবারের চিঠি"তে আর অন্যত্র ছাপা হয়। আর দুজন গাল্পিক হচ্ছে মণি ব্যানার্জি ও সুধাকান্ত

দে। হেমেন্দ্রবিজয় সেন কবি আর গাল্পিক বটে,—তাড়াছা শ-তিনেক দেশী-বিদেশী লোকের জীবনী-লেখক। ক্ষিতি মুখার্জি রুশ গল্প-সাহিত্যের তর্জমা কর্‌তে অভ্যস্ত।

মন্মথ সরকার, পঙ্কজ মুখার্জি ও নগেন চৌধুরী

মন্মথ—আপনি তো পাঁচ-সাতটা পরিষৎ চালাচ্ছেন। অন্যান্য পরিষদের গবেষকদের সম্বন্ধে কিছু বলুন না?

সরকার—আন্তর্জাতিক বঙ্গ-পরিষৎ ইত্যাদি পরিষদের কাজকর্ম লড়াইয়ের সময় বন্ধ আছে। তবে এই পরিষদের ছয় জন গবেষক উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ-লেখক আর গ্রন্থকার দুই হিসাবেই এদের কয়েকজনের নাম আছে।

লেখক—কে কে?

সরকার—"আদ্যের গম্ভীরা"-লেখক হরিদাস পালিত, মন্মথনাথ সরকার (প্রশ্নকর্তা), মধুসূদন চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পঙ্কজকুমার মুখার্জি আর সুশীলকুমার রায়।

লেখক—এই এই গবেষকদের সম্বন্ধে যা-হোক কিছু বলুন।

সরকার—প্রথমেই বলি তোমার নিজের কথা। বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ব'লে যাচ্ছি। লজ্জা করা উচিত নয়। মন্মথ জার্মাণ কমিউনিস্ট এঙ্গেল্‌সের বইয়ের ইংরেজি তর্জমা হ'তে বাংলা তর্জমা প্রকাশ ক'রেছে। মন্মথ'র বইয়ের নাম "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" (১৯৪৪)। এই জার্মাণ বইয়ের তর্জমাই আমি ছেড়েছিলাম "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামে ১৯২৩-২৬ সনে। মন্মথর তর্জমা আমার তর্জমা হ'তে পৃথক। মন্মথকে স্বাধীনভাবে খাটতে হ'য়েছে। ঠিক তো?

মন্মথ—হাঁ। তবে আপনার বোলচাল আর লাইন কে লাইন আমার বইটার ভেতর জায়গায়-জায়গায় ঢুকে গেছে। আচ্ছা, একালে হরিদাস পালিতের রচনা কিরূপ?

সরকার—"বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর গোড়া এক" বইটা হরিদাসের হাতে বেরিয়েছে। তাছাড়া আর্থিক ও সামাজিক নৃতত্ত্বের মাল পাওয়া যায় এঁর রচনায়। প্রধানতঃ বাংলা ভাষা আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে বর্তমানে হরিদাসের কারবার।

লেখক—নগেন চৌধুরীও তো আপনার স্বদেশী যুগের সহকর্মী, কবি ও প্রাবন্ধিক?

সরকার—নিশ্চয়। হরিদাস পালিত, কুমুদ লাহিড়ী ইত্যাদি "লেখক-সমাজ", "ট্রাজেডীজ অব মডার্ণিজ্‌ম্", "ইকনমিক ডায়ালেক্‌টিকস্" ইত্যাদি বই নগেনের হাতে বেরিয়েছে। "আর্থিক উন্নতি"তে অনেক রচনা এই হাতেরই মাল। পাকা লেখক। সুযোগ পেলে অনেক-কিছু করতে পার্‌তো।

লেখক—মধুসূদন চক্রবর্তীর কোনো রচনা আছে?

সরকার—আবিসিনিয়া সম্বন্ধে বই আছে মধুর। সুশীল রায়ের লেখা বেরিয়েছে "আর্থিক উন্নতি"তে।

লেখক—পঙ্কজ মুখার্জির লেখালেখি কিরূপ?

সরকার—মজুর-বিষয়ক আইন-কানুন সম্বন্ধে পঙ্কজের ইংরেজি বই আছে। তাছাড়া পঙ্কজকে অপরাধ-বিজ্ঞানের ("কৃমিনলজির") গবেষণায় হাত মক্‌স করিয়েছি। কয়েক বছরে কিছু-কিছু লেখা বেরিয়েছে। ধনবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান দুই বিজ্ঞানেই তোমার

মতন পঙ্কজের ও প্রবন্ধ আছে অনেক।

লেখক—তাহ'লে দেখ্‌ছি,—গবেষক-সংখ্যা সত্যি-সত্যি ছেচল্লিশ।

সরকার—তাই বটে। এই হচ্ছে উনিশ বছরের ফিরিস্তি। ছেচল্লিশ জন ছোক্‌রা অর্থশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রীর অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখ্‌লে বাঙালী জাতের উপকার হবে ঢের।

মণি মৌলিক ও নবেন্দু দত্ত-মজুমদার

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৪৪

মন্মথ—আপনার ছেচল্লিশ গবেষকদের ভেতর বিদেশে-ফের্তা কেউ-কেউ আছে ব'লেছেন। কে-কে?

সরকার—আগে বলি যে, বিদেশে যাবার জন্য তৈয়ের র'য়েছে মদন আগরওআল, দেব ভাটিয়া, আনন্দ পোদ্দার আর কস্তুরচাঁদ লালুয়ানি। ট্যাঁকে পয়সা আছে। তবে লড়াই না থাম্‌লে এদের যাওয়া সম্ভব হবে না।

লেখক—বিদেশ ঘুরে এসেছে কারা?

সরকার—সন্তোষ জানা যাদবপুর কলেজের রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার,—বাণেশ্বর দাশের ছাত্র, ইয়োরোপে আমেরিকায় গিয়ে কাগজ তৈরির শিল্প শিখে এসেছে। বস্টনের ম্যাসাচুয়েট্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নলজির পাশ-করা ছোকরা। সুইডেনের কারখানায়ও কাজ ক'রেছে। আজকাল নিজামের মুল্লুকে কাগজের কারখানায় কাজ করছে।

লেখক—আর কেউ আছে?

সরকার—মণি আর শান্তি মৌলিক,—দাদা-ভাই। দুজনেই ইতালি-ফের্তা। "ডক্টর"। রোমের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাশ-করা দুজনেই। মণি মৌলিক ইতালিয়ান ভাষায় বই লিখেছে। তাছাড়া "ইতালিয়ান ইকনমি অ্যান্ড কাল্‌চার" নামক ইংরেজি বইয়ের গ্রন্থকার। বাংলা লেখেও ভাল।

লেখক—আর কেউ?

সরকার—তাছাড়া আছে নবেন্দু দত্ত-মজুমদার। নবেন্দু কল্‌কাতার ডবল এম-এ,—ধনবিজ্ঞনে আর নৃতত্ত্বে। তার ওপর বি-এল। বিলাতের কেম্ব্রিজে ছিল বছর চারেক,—লড়াইয়ের ভেতর। সম্প্রতি ফিরেছে। শারীরিক আর সামাজিক নৃতত্ত্ব হচ্ছে নবেন্দুর গবেষণার মাল। বিলাতী ও মার্কিণ নৃতত্ত্ব-পত্রিকায় প্রবন্ধ আছে।

লেখক—নগেন চৌধুরীর নাম বল্‌লেন না?

সরকার—মার্কিণ-ফের্‌তা নগেন "চেনা বামুন"। সাত বছর ছিল আমেরিকায়।

ছেচল্লিশ গবেষকের অভিজ্ঞতা

লেখক—এই ছেচল্লিশ গবেষকের ভেতর ছোট-বড় বা উনিশ-বিশ কর্‌তে পারেন?

সরকার—উনিশ-বিশ করা খুবই কঠিন। আসল কথা হচ্ছে,—এরা কেউই লেখাপড়া বা গবেষণা নিয়ে জীবন কাটাতে পার্‌লে না, বা পার্‌ছে না। কাটাতে পার্‌লে উনিশ-

বিশ করার প্রশ্ন উঠ্‌তে পার্‌তো।

লেখক—উনিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তাহ'লে গবেষকদের কাজ কর্ম সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান?

সরকার—এই ছেচল্লিশ জনের প্রত্যেকেই বড়-বড় গ্রন্থকার হ'য়ে বাঙালী জাতের ইজ্জদ বাড়াতে পার্‌তো। এজন্য জরুরি ছিল মাসিক ১০০ ক'রে প্রথম তিন বছরের গবেষণা-বৃত্তি। তার পরবর্তী অবস্থায় আবশ্যক হ'তো সরকারী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দস্তুর-মাফিক মাস-মাস মাইনে দেওয়া। শেষধাপে আজকাল ভারতীয় মাইনের হার হচ্ছে মাসিক শ'-পাঁচেক। এদের কপালে এসবের কিছুই জুটেনি। কাজেই এই ছেচল্লিশের কাজকর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করতে বসা নিষ্প্রয়োজন।

লেখক—এই সকল অর্থশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রীদের রচনাবলী কি সমালোচনার বস্তু নয়?

সরকার—নিশ্চয়। রচনাবলী মূল্যবান্ তো বটেই। বাঙালীর চিন্তা-সম্পদে এইসব উচু ঠাঁই অধিকার করবে।

লেখক—তাহ'লে আর কী?

সরকার—এই সকল গবেষকেরা আর্থিক সুযোগের অভাবে মনের মতন কিছু রেখে যেতে পার্‌ছে না,—এই হ'লো ভেতরকার কথা। একমাত্র লেখাপড়ার কাজে বাহাল যে সকল বাঙালী,—তাদের ভেতর সাড়ে তিন শ' হ'তে শ'-পাঁচেক টাকার রোজগারওয়ালা লোক আজকাল অনেক। ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার কোঠে তাদের কাজের খ'তেন করা ভাল। পয়সা-ওয়ালা মাস্টারদের পাশে এই সকল অবৃত্তিক গবেষকদের ধনবিজ্ঞান-চর্চা ও সমাজবিজ্ঞান-গবেষণা চরম তারিফের অধিকারী হবে। বিনা পয়সায় এরা যা-কিছু করতে পেরেছে তার কিম্মৎ লাখ টাকা। এদের অভিজ্ঞতা থেকে নয়া বাঙলার সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ঘরামিদের অনেক-কিছু শেখ্‌বার আছে।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, ইস্কুল-কলেজের আবহাওয়া ছাড়া আর কোথাও ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার গবেষক বাহাল করা সম্ভব নয়?

সরকার—কে বল্‌লে? ব্যাঙ্ক র'য়েছে। বীমা-কোম্পানী র'য়েছে। বহির্বাণিজ্যের দপ্তর র'য়েছে। রেল-কোম্পানী র'য়েছে। খনি র'য়েছে। কাপড়ের কল র'য়েছে। বাঙলা দেশের নানা অঞ্চলে গোটা পঞ্চাশেক বিজলী বাতীর ব্যবস্থা র'য়েছে। রাসায়নিক কারখানা র'য়েছে। যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরীর র'য়েছে। বণিক্-ভবন (চেম্বার অব কমার্স) র'য়েছে। তাছাড়া চাষ, গো-পালন, মাছের ব্যবসা দুধের ব্যবসা ইত্যাদি র'য়েছে।

লেখক—তাতে কী হ'ল?

সরকার—এই সকল কারবারের প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রেই দু-একজন অর্থশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রী মাইনে দিয়ে বাহাল করা সম্ভব। মাসিক একশ' টাকার গবেষণা-বৃত্তি দেওয়া এই সকল কারবারের অনেকের পক্ষে অতি-কিছু নয়। তা'ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি নানা ধরণের পত্রিকায়ও শ'-টাকার গবেষক বাহাল কর্‌লে কাগজওয়ালাদের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। বাঙলা দেশের পক্ষে আজ গোটা শ'য়েক ছোক্‌রাকে বৃত্তি দিয়ে গবেষকভাবে বেঁধে রাখা খুবই সম্ভব। চাই বেপারী-মহলে শিল্পী-মহলে আর্থিক ও সামাজিক গবেষণার দরদ। আনন্দবাজারের সুরেশ মজুমদার ইত্যাদি

ভারতীয় সাংবাদিক-সঙ্ঘের মাতব্বরেরা এদিকে মাথা দিলে কিছু-কিছু কাজ সুরু হ'তে পারে।

সুধাকান্ত হ'তে কস্তুরচাঁদ
(১৯২৬-৪৪)

লেখক—আপনার চেলা-গবেষকদের উৎপত্তির সময়কার কথা কিছু মনে আছে?

সরকার—১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথমবারকার বিদেশ-পর্যটনের পর কল্‌কাতায় ফিরে আসি। সেই সময় ভারতীয় সংবাদ-পত্রসেবী-সঙ্ঘের উদ্যোগে বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার বৈঠকের জন্য উদ্যোগী ছিলেন চিত্তরঞ্জন-প্রবর্তিত "ফরোআর্ড"-দৈনিকের সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্‌সি তাতে "ধনবিজ্ঞান ও সংবাদ বিজ্ঞান" সম্বন্ধে এই অধমকে বক্তৃতা কর্‌তে হ'য়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে বিলাতী অর্থ-শাস্ত্রী রিকার্ডোর তারিফ ক'রেছিলাম। সংবাদ-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধনবিজ্ঞান গাঁথা হ'য়ে গেল। "গ্রীটিংস টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" দ্রষ্টব্য।

লেখক—তার সঙ্গে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষকদের যোগাযোগ কোথায়?

সরকার—সভার কয়েক দিন পর দেখি সুধাকান্ত দে আর শচীন সেন এই অধমের কাছে এসে হাজির। রিকার্ডো-প্রণীত ধনবিজ্ঞান-গ্রন্থের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার বাংলা তর্জমা তাদের হাতে। তখন আমি বালিগঞ্জের গর্চা লেনে থাক্‌তাম হাজরা রোডের মোড়ে।

লেখক—তারপর কী হ'লো?

সরকার—১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে নরেন লাহা, তুলসী গোস্বামী (শ্রীরামপুর), নলিনী রায়চৌধুরী (টেপা, রংপুর), তারক মুখার্জি (উত্তরপাড়া), সত্যচরণ লাহা, গোপালদাস চৌধুরী (ময়মনসিংহ) ইত্যাদি কয়েকজন বন্ধুর দৌলতে "আর্থিক উন্নতি"র প্রথম সংখ্যা বাহির করি। সুধা আর শচীন প্রণীত রিকার্ডো-তর্জমার প্রথম চুট্‌কি তাতে ছাপা হয়। এই হচ্ছে চেলা-গবেষকদের গোড়া-পত্তন পরবর্তী অবস্থা "আর্থিক উন্নতি"র সঙ্গে গাঁথা।

লেখক—রিকার্ডোর তর্জমা-বই পাওয়া যায়?

সরকার—ঘটনা-চক্রে রিকার্ডোর তর্জমা-বইটা আজও বইয়ের আকারে বেরোয় নি। অনেকগুলা অধ্যায় প্রবন্ধের আকারে বেরিয়ে গেছে। বইটা সাহিত্য-পরিষদের তদ্‌বিরে ছাপা হ'চ্ছে।

লেখক—একদম নয়া গবেষক কে?

সরকার—কস্তুরচাঁদ লালুয়ানি।

লেখক—কস্তুরচাঁদের আলোচনায় প্রধান ঠাঁই পাচ্ছে কী-কী?

সরকার—মার্ক্‌স্ আর পিগু ও কেইন্‌স্।

লেখক—গবেষকদের ভেতর কয়েকজন বল্‌লেন সরকারী চাক্‌রে আর কয়েকজন কলেজের অধ্যাপক। অন্য কোনো পেশার লোক আছে?

সরকার—স্বাধীন ব্যবসায় আছে বিজয় সাহা। চাল, ডাল, গুড়, চিনি, তেল ইত্যাদি জিনিষের কেনা-বেচা হচ্ছে তার কাজ। এটা তার জাত্‌-ব্যবসা, পৈতৃক কারবার। অমল

সেন করে শেয়ারের বাজারে কেনা-বেচা। এটাও স্বাধীন ব্যবসা। যতীন ভট্টাচার্য "আর্থিক জগৎ" সাপ্তাহিকের মালিক ও সম্পাদক। অতএব স্বাধীন বটে।

লেখক—অন্য কোনো পেশায় কেহ আছে?

সরকার—অতুল সুর কল্‌কাতার স্টক-এক্‌স্‌চেঞ্জের আপিসে বই লেখালেখির কাজ করে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক সুধীশ বিশ্বাস। শচীন সেন কাজ করে বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে,—জমিদার-সভার সম্পাদক। নরেন লাহার লাইব্রেরিয়ান ও গবেষণা-সহায়ক সুধাকান্ত দে। এই সকল গবেষকদের কাজে বই-ঘাঁটাঘাটি ও মাথা-ঘামানোর দরকার হয়। চব্বিশ পরগণার জমিদার-সভার কর্মচারী মধুসূধন চক্রবর্তী এই হিসাবে কথঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য।

লেখক—খাঁটি ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজে কোনো গবেষকের আর্থিক যোগাযোগ নাই?

সরকার—বীরেন দাশগুপ্তর ইন্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানীর যান্ত্রিক কেনা-বেচায় আর মেরামতী কাজে বাহাল আছে হিমাংশু সেন। সন্তোষ জানা নিজামের রাজ্যে কাগজের কলে কাজ পেয়েছে। আজমীরের জেনার‍্যাল অ্যাশিওরান্স কোম্পানীর কল্‌কাতা-দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ সরকার। ইন্ডিয়ান জুটমিল্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম মজুর-মঙ্গল বিষয়ক কর্মচারী হচ্ছে ক্ষিতি মুখার্জি। বিলাতী চার্টার্ড ব্যাঙ্কের কর্মচারী অজয় সরকার। বার্মা-পেট্রোল কোম্পানীতে আছে সুশীল দাশগুপ্ত। সেটাও বিলাতী আফিস।

লেখক—সাংবাদিক কেউ নেই?

সরকার—স্বাধীন সাংবাদিক যতীন ভট্টাচার্য। "বসুমতী" আফিসে কাজ করে নগেন চৌধুরী। শচীন দত্ত র'য়েছে হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ডে। আর তুমি মন্মথ সরকার তো "মোহম্মদী" নিয়ে আছো।

লেখক—এতগুলা বি-এল আছে বল্‌ছেন? উকিল কেউ নয়?

সরকার—কবি-গাল্পিক হেমেন সেন, কামাখ্যা বসু (আটর্নি) আর পঙ্কজ মুখার্জি।

শিব দত্ত, রবি ঘোষ, সুবোধ ঘোষাল ও প্রফুল্ল বিশ্বাস

লেখক—গবেষকদের লেখা কোনো বাংলা বইয়ের নাম করুন না?

সরকার—"বাংলার ধনবিজ্ঞান" প্রথম ভাগ বেরিয়েছে ১৯৩৭ সনে। দ্বিতীয় ভাগ বেরোয় বছর দুই পর। ১৯৩৮ সনে বেরিয়েছে "সমাজবিজ্ঞান" প্রথম ভাগ। মোটের ওপর হাজার দেড়-দুই পৃষ্ঠা। এই তিন খানা বইয়ে গবেষকদের লেখা অনেকগুলা পাওয়া যায়। এদের বহু-সংখ্যক রচনা "আর্থিক উন্নতি"র পেটের ভেতর র'য়েছে। পয়সা খরচ করতে পার্‌লে তার পেট কেটে অনেক গবেষকের বেশ মোটা-মোটা বই বের করানো সম্ভব। অবশ্য বিক্রী হবে না কিছুই।

লেখক—তবু ও যা-কিছু পুস্তিকা বা বইয়ের আকারে পাওয়া যায় নাম করুন শুনি।

সরকার—শিব দত্ত'র আছে "ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি" আর রবি ঘোষের 'টাকা-কড়ি" ও "লোক-বাহুল্যের আতঙ্ক"। প্রফুল্ল বিশ্বাস লিখেছে "ফরাসী মনীষীদের প্রগতি-দর্শন", সুবোধ ঘোষাল "সমাজচিন্তার বঙ্কিমচন্দ্র," নরেন রায় "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা"

ও "টাকার কথা"। নরেন লাহার সঙ্গে মোলাকাৎ বেরিয়েছে জিতেন সেনগুপ্তর হাতে "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" নামে। নগেন চৌধুরী "মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা" বইয়ের লেখক। "মানুষের স্থূল অভাব" সুধাকান্ত দে'র লেখা।

লেখক—গবেষকদের লেখা ইংরেজি বইয়ের নাম মনে আছে?

সরকার—শিব দত্ত'র "কন্‌ফ্লিক্‌টিং টেন্ডেন্সীজ ইন ইন্ডিয়ান ইকনমিক থট", নগেন চৌধুরীর "ট্র্যাজেডীজ অব মডার্ণিজ্‌ম্" ও "ইকনমিক ডায়ালেক্‌টিক্‌স্", পঙ্কজ মুখার্জির "লেবার লেজিসলেশন ইন বৃটিশ ইন্ডিয়া", মণি মৌলিকের "ইটালিয়ান ইকনমি অ্যান্ড কালচার", সুবোধ ঘোষালের "মেসেজেস অব্ দান্তে", "হার্ডারস্ ডক্‌ট্রিন অব দি ন্যাশন্যাল সোল", শচীন দত্ত'র "সিভিক্‌স" ও "ইকনমিক্‌স্ অ্যান্ড ল অব সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং", সুধাকান্ত দে'র "কটন টারিফ" ইত্যাদি বইয়ের নাম করা যেতে পারে। মণি মৌলিকের "লা পোলিতিকা ফিনান্‌ৎসিয়ারিয়া বৃতানিকা ইন ইন্দিয়া" ইতালিয়ান ভাষায় লেখা। জেনে রাখা ভাল যে,—ইস্কুল-কলেজের টেক্‌স্ট্ বুক-জাতীয় বই গবেষকদের হাতে বেরোয় নি—কি ইংরেজিতে, কি বাংলায়। কাজেই পয়সা-রোজগারের সম্ভাবনা নাই।

লেখক—খুব বেশী-বেশী লেখা ছাপা হ'য়েছে "আর্থিক উন্নতি"তে কোন্-কোন্ গবেষকের?

সরকার—সুধা, শিব, রবি, নগেন, পঙ্কজ, সুবোধ, প্রফুল্ল, মন্মথ—এই আটজনের নাম কর্‌তে পারি। এদের রচনাগুলা একত্র কর্‌লে প্রত্যেকের নামে বড়-বড় বই বেরুতে পারে। মজার কথা,—এদের একজনও ধনবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় লেগে থাক্‌তে পার্‌লে না। গবেষণায় ভাত-কাপড় জুট্‌লো না।

নাম-কাটা গবেষক

লেখক—পরিষদগুলার সঙ্গে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়েছে এমন কোনো গবেষক আছে?

সরকার—পরিষদগুলার দস্তুর হ'চ্ছে এই যে, অবৃত্তিক গবেষক ভাবে একবার কেউ ঢুক্‌লে তার নাম সর্বদাই চল্‌তে থাকে। কিন্তু একজন নিজ ইচ্ছায় পরিষদ্‌গুলার সঙ্গে যোগাযোগ কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি বিদেশে-ফের্তা। নাম-কাটা গবেষক মাত্র সেই তিনি।

লেখক—কী রকম ব্যাপার?

সরকার—বছর পাঁচেক (১৯৩৩-৩৮) তিনি এই অধমের অন্যতম পরিষদে অবৃত্তিক "গবেষক" ছিলেন। "গবেষক" হিসাবে তাঁর নাম ছাপা হ'য়েছে—যেমন অন্যান্যেরও হয়,—অনেক বার। গবেষক রূপেই তাঁকে দিয়ে সার্বজনিক সভায় প্রবন্ধ পড়ানো হ'য়েছে। কল্‌কাতার নানা পত্রিকা, পরিষৎ আর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও করিয়ে দেওয়া হ'য়েছে গবেষক হিসাবে। এই অধমের সঙ্গে ফি হপ্তায় প্রায় তিন দিন ক'রে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। তিনি গবেষক ভাবেই এই বাড়ীতে এই গবেষণা-বিষয়ক কথাবার্তা চালিয়েছেন। "আর্থিক উন্নতি"র কর্মকর্তা সতীশ চক্রবর্তী এই গবেষকের রচনাবলী শুধ্‌রাতে-শুধ্‌রাতে হয়রান হ'য়ে প'ড়েছিলেন। সে-সব তো জানোই।

লেখক—শেষ পর্যন্ত কী হ'লো?

সরকার—এই অধমের নানা বন্ধু মারফৎ তাঁর জন্য একটা চাক্‌রির ব্যবস্থা ঘ'টে গেল। যেই চাক্‌রিটা জুট্‌লো অম্‌নি তিনি খবর দিলেন যে,—তাঁর নাম যেন এই অধমের কোনো পরিষদে প্রকাশিত না হয়।

লেখক—এই কথাটা জানা ছিল না। কিন্তু তাঁর এই রকম মতি-গতি কেন হ'লো?

সরকার—বলা কঠিন।

লেখক—আপনার সঙ্গে মতামত নিয়ে কোনো গোলযোগ বেঁধেছিল?

সরকার—না। ছেচল্লিশ জন গবেষকের ছেচল্লিশ মত। তাদের কারু মতমত আমি জানি না। আমারও কোন্ বিষয়ে কী মত তা অধিকাংশ গবেষকের জানা নাই। জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া পরিষদ্‌গুলার মুরুব্বি আর "আর্থিক উন্নতি"র পরিচালক নরেন লাহা নিজের মতে চলেন। তাঁর সঙ্গেও কোনো গবেষকের বা আমার কতটা মিল আছে কে জানে? আসল কথা,—মতের অমিল বাঁচিয়ে চলাই এই অধমের স্বধর্ম। আমি পুরাদস্তুর বহুত্ব-নিষ্ঠ। ছেচল্লিশ জন বছর উনিশেক ধ'রে এই অধমের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে "ঘর-কন্না" কর্‌ছে।

লেখক—তাহ'লে সেই গবেষক পরিষদ্‌গুলার সঙ্গে যোগাযোগ কাটালেন কেন? এখানকার গবেষক হিসাবেই তো তাঁর যা-কিছু লেখাপড়া, সামাজিক যোগাযোগ, চাক্‌রি-বাক্‌রি?

সরকার—বোধ হচ্ছে, তিনি যে কোনোদিন এই অধমের গোআলে গবেষক ভাবে ঢুকেছিলেন এই কথাটা হয় ত তাঁর অসহ্য।

লেখক—বন্ধুটির বুঝ্‌বার ভুল। "অবৃত্তিক গবেষক" শব্দটা সাহিত্য-সংসারে যারপর নাই গৌরবজনক।

জানুয়ারি ১৯৪৫

"গুলিস্তাঁ"র আসর

৭ই জানুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—"বিনয় সরকারের বৈঠকে"র প্রথম ভাগে প্রমথ বিশীর লেখালেখি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা দেখ্‌লাম। তাঁকে চেনেন কি?

সরকার—না। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল না। সম্প্রতি দেখা হ'য়েছে—ম্যাজিস্ট্রেট-প্রাবন্ধিক ওয়াজেদ আলির বাড়ীতে।

লেখক—ওঃ, সেখানে "গুলিস্তাঁ"র আসর ব'সেছিল। (১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪) জানি। বোধহয় সেই উপলক্ষে?

সরকার—হাঁ। সেই মজলিসে অনেকের সঙ্গে দেখা হ'লো।

লেখক—কে-কে হাজির ছিলেন?

সরকার—ফজলল হক সভাপতি। তা ছাড়া দেশী-বিদেশী গল্পের লেখক সৌরীন মুখোপাধ্যায়, উকিল-সাহিত্যিক কেশব গুপ্ত। "পাঠশালা"র নরেন দেব, ভূতপূর্ব মন্ত্রী

হাসেম আলি, একালের প্রবাসী-সম্পাদক কেদার চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দবাবুর ছেলে), গায়ক আব্বাস উদ্দিন, রেডিও-বক্তা বীরেন ভদ্র, কবি-গাল্পিক প্রবোধ সান্যাল, কবি হাতেম নওরোজি ইত্যাদি সাহিত্যিকদের ছায়া প'ড়েছিল। মুর্গীর সুরুয়া পেটে পড়্‌বামাত্র হিন্দু সাহিত্য-রসিকেরা বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছিল। সবাই বলাবলি কর্‌ছিল,—"ওয়াজেদ আলি দিল্‌দেরিয়া মেজাজের লোক।" আমি ব'লেছিলাম,—এমন দিলদেরিয়া লোক আরও চাই।

লেখক—"গুলিস্তাঁ"র আসরের সুর কেমন মনে হ'লো?

সরকার—গলাবাজির ব্যবস্থা ছিল না। ওআজেদ আলির প্রাণের কথা হিন্দু-মুসলমানের মিলন। তা ছাড়া ওআজেদ আলি পাঁড় বাঙালী। অনেকদিন থেকেই তাঁর সাহিত্যসেবায় এই দুই সু-লক্ষণ দেখে আস্‌ছি।

লেখক—এই দুই সুর তো আপনার খুবই পছন্দসই। নতুন-কিছু পেলেন এই আসরে?

সরকার—বীরেন ভদ্র পড়্‌লেন রবির "যেতে নাহি দিব"। "শ্মশান" শুন্‌লাম প্রবোধ সান্যালের মুখে। প্রমথ বিশীর প্রবন্ধটা পঠিত ব'লে গৃহীত হ'লো।

লেখক—বীরেন ভদ্র'র পড়া আগে কখনো শুনেছেন?

সরকার—হাঁ, বছব কয়েক হ'লো কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-মহোচ্ছব কায়েম হ'য়েছিল। তাতে বীরেনের মুখে শুনি বঙ্কিমের এক রসাল প্রবন্ধ। পড়াটা চিত্তাকর্ষক হয়েছিল মনে পড়্‌ছে।

লেখক—"গুলিস্তাঁ'র আর কোনো উৎসবে আপনি হাজির ছিলেন? এই পত্রিকার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল স্টার থিয়েটারে (২২ অক্টোবর ১৯৪৪)। তাতে আপনাকে ডাকে নি?

সরকার—হাঁ। সেই সভায়ও হাজির ছিলাম। সেখানে হাসেম আলির বক্তৃতা শুনি। স্বদেশী ঝাঁজ পেয়েছিলাম সেই বক্তৃতায়। তা ছাড়া ওআজেদ আলির ভাষণও ছিল। সভাপতি করা হ'য়েছিল একালের আনন্দবাজার-সম্পাদক চপলা ভট্টাচার্যকে।

লেখক—আপনাকে কিছু গলাবাজি কর্‌তে হয় নি?

সরকার—ধ'রে-বেঁধে করালে। কী করা যায়?

লেখক—কী ব'লেছিলেন মনে আছে?

সরকার—মনে পড়্‌ছে না। তবে "গুলিস্তাঁ"র চতুর্থ বৎসর ঘটনাচক্রে রবিহীন বাঙালীর চতুর্থ বৎসর। এই কথাটা মনে হচ্ছিল সভায় ব'সে বার-বার। কাজেই রবিহীন বাঙালীর বাড়্‌তি সম্বন্ধে গেয়ে দিলাম। ("রবিহীন বাঙালী", ৫৬৮-৫৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

লেখক—কী বল্‌লেন?

সরকার—মনে নাই। বোধ হয় ব'লেছিলাম যে, বাঙালী জাতের যে-কোনো তিন-চার বছরের তুলনায় রবিহীন (রবির মৃত্যুর পরবর্তী) এই তিন-চার বছর কোনো অংশে খাটো নয়। বাঙালীর শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্রিক কাজকর্ম, মজুর-আন্দোলন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি সকল বিষয়েই এই কথা খাটে। সভার লোকজনকে সংস্কৃতি-জরীপের কায়দা ও মাপকাঠি সম্বন্ধে ওআকিবহাল হ'তে অনুরোধ জানিয়েছিলাম বোধ হয়।

লেখক—আপনি কি স্টার থিয়েটারের সভায়ই ব'লেছেন যে, সাহিত্য-স্রষ্টাদের দেশ নাই, জাতি নাই, ধর্ম নাই। আর সাহিত্যিকেরা যা সৃষ্টি করে তা সকল দেশের আর

সকল জাতির?

সরকার—সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে এই মতটা আমার ডাল-ভাত বিশেষ। কত জায়গায় কাকে-কাকে ব'লেছি মনে আনা কঠিন। গ্যেটেকে জার্মাণ বলা, মোলিয়েয়ারকে ফরাসী বলা, শেক্‌স্‌পীয়ারকে ইংরেজ বলা আর হুইটম্যানকে মার্কিণ বলা আমার হাড়ে কুলোবে না। এরা সকলেই এক জাতের লোক। সেই জাতের নাম স্রষ্টার জাত। কিন্তু তুমি জান্‌লে কোথ্‌থেকে?

লেখক—বোধ হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সভার বৃত্তান্ত বেরিয়েছিল। ("অ-রৈবিক শক্তি ও সঙঘ" ৫৪৫-৫৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যাদবপুর কলেজের জন্য চাই পাঁচ বছরে লাখ পঞ্চাশেক টাকা

১০ই জানুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—যাদবপুরের কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্‌নলজিতে প্রতিষ্ঠা-দিবসের সভায় (৭ই জানুয়ারি ১৯৪৫) সরোজিনী নাইডুকে আপনি "বাঙাল" ব'লেছেন শুন্‌লাম? এর মানে কী?

সরকার—মানে আর কিছুই নয়। সরোজিনীর বাপের বাড়ী ঢাকার বিক্রমপুরে। মায় আমার গ্রাম সানিহাটির লাগাও ব্রাহ্মণগাঁয়ে হচ্ছে অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা। আর কী চাও?

লেখক—আপনি নাকি ব'লেছেন যে অবাঙালরা সরোজিনীকে বেশী দিন মনে রাখ্‌বে না। এত-বড় মারাত্মক কথা ব'ল্‌লেন কী ক'রে?

সরকার—ঠিক ও-কথা বলিনি। ব'লেছি যে, সরোজিনীর মৃত্যুর বছর পনর পরে বোম্বাইওয়ালারা সরোজিনীকে যতটা মনে রাখ্‌বে তার চেয়ে বেশী মনে রাখ্‌বে বাঙালীরা। মান্দ্রাজীরা (হায়দ্রাবাদীরা) যত দিন মনে রাখ্‌বে তার চেয়ে বেশী মনে রাখ্‌বে পূর্ব্ববঙ্গের (আর বিক্রমপুররের) বাঙাল নরনারী। একেই বলে জলের চেয়ে রক্ত ঘন। সরোজিনীর "বাঙাল"-মূর্ত্তি সুপ্রচারিত হওয়া উচিত।

লেখক—আপনার এই ধরণের কথা বলার মতলব কী ছিল?

সরকার—সুরু ক'রেছিলাম এই কথা ব'লে যে,—"কবি সরোজিনীর কবি-মেজাজটা তাতাতে চাই। তাতিয়ে বাঙ্‌লা দেশের জন্য একটা কাজ হাঁসিল করানো আমার মতলব। সারোজিনীর বাবা রাসায়নিক অঘোরনাথ বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে যুবক বাঙ্‌লার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিশদের করিৎ-কর্ম্মা লোকজনের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম ছিল খুব-বেশি (১৯১০-১৫)। সেই কথাটা সরোজিনীর জানা নাই। তাঁর জেনে রাখা উচিত। তাহ'লে যাদবপুর-কলেজের জন্য তাঁর একটা ব্যক্তিগত মমতা পায়দা হ'তে পার্‌বে। তাছাড়া তাঁর সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, তিনি বাঙালীর বেটী,—বাঙালের বেটী। অতএব তাঁর ওপর যাদবপুর কলেজের দাবী খুব বেশী।"

লেখক—সরোজিনীকে এতখানি তাতাতে চেয়েছিলেন কী বুঝে?

সরকার—সরোজিনীর ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি। বল্‌লাম,—বছর পাঁচেকের ভেতর যাদবপুর কলেজের জন্য চাই লাখ পঞ্চাশেক টাকা। এই বাণী তামাম

ভারতে রটাবার ভার দিয়ে দিলাম সরোজিনীর গলায়। অবশ্য এই ডাক-হাঁক আমি এই সভায়ই প্রথম তুলিনি। যাদবপুর কলেজের বক্তৃতায় আর অন্যান্য সার্বজনিক সভায় কিছুকাল ধ'রে এই বোল ঝেড়ে চ'লেছি। বাঙালী জাতের জন্য যন্ত্রনিষ্ঠা, রসায়ন, বিজলী, উড়ো জাহাজ, খনি, রেডিও ইত্যাদি সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ার চাই হাজারে-হাজারে। এ হচ্ছে আমার আটপৌরে বয়েৎ।

লেখক—যাদবপুর কলেজের ঐ সভায় বক্তৃতা হ'য়েছিল ক'টা? ভীড় হ'য়েছিল কেমন?

সরকার—বলা বাহুল্য,—সরোজিনীর বক্তৃতাই আসল অনুষ্ঠান। সভাপতি ডাক্তার বিধান রায়ের বক্তৃতা হ'লো। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার সুরেন রায় আর জজ চারু বিশ্বাসও বক্তাদের ভেতর ছিলেন। বোধ হয় হাজার দেড়-দুই লোক উপস্থিত ছিল। কারবারী লোকই বেশী। আট-দশ জন মার্কিণ এঞ্জিনিয়ারও হাজির ছিল। তাদের কেহ বা মার্কিণ সেনাবিভাগের কর্ণেল, কেহ বা মেজর, কেহ বা কাপ্তেন ইত্যাদি। এঁদের সঙ্গে আগে আলাপ ছিল।

লেখক—মার্কিণ এঞ্জিনিয়ারদের আগ্রহ কিসে হ'লো?

সরকার—যাদবপুর কলেজের অধ্যাপক ও কর্মকর্তাদের ভেতর কয়েক জন মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার আছে। ঐ সূত্রে এখানে কর্ণেল জার্ণিগান, মেজর মায়ার মেজর ব্রাউন, কাপ্তেন শ্লাইকার, কাপ্তেন ক্রমাক, লেফটেনান্ট শাল্‌ফান্ট ইত্যাদি এঞ্জিনিয়ারদের আনাগোনা।

সরোজিনীর "বাঙাল"-মূর্তি

লেখক—আপনি বিক্রমপুরের লোক হ'লেন কী ক'রে? আপনাকে তো আমরা মালদহের লোক ব'লে জানি। অবশ্য কল্‌কাতার হিসাবে মালদহের লোকেরাও বাঙাল! কিন্তু আপনি আসল বাঙাল কবে থেকে?

সরকার—জন্ম আমার মালদহে। সকলকেই আগে বলি যে, আমি মালদার লোক। তাই আমার সত্যিকার পরিচয়। কিন্তু আসল বাঙাল যারা তাদের দলে আমি নিজেকে খাঁটি বাঙাল ব'লে পরিচয় দিই। অর্থাৎ একসঙ্গেই আমি দুই জানোআর। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) এই অধমের জাতীয় শিক্ষা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, ও সাহিত্য প্রচার বিষয়ক কাজকর্ম মালদহ জেলার সদর ও পল্লীর সঙ্গে সুজড়িত ছিল। সেই সূত্রে বিক্রমপুরের সানিহাটি ন্যাশন্যাল ইস্কুলটাকে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সঙ্গে গেঁথে রেখেছিলাম। লোকেরা এই জন্য আমাকে মালদহবাসী ব'লেই জানে। সানিহাটি হচ্ছে আমার "দেশ",—অর্থাৎ পৈতৃক ভূমি,—"বাপের বাড়ী।"

লেখক—অপনি সরোজিনীর বাবাকে জান্‌তেন?

সরকার—তাঁর বাবা ও মা দু'জনের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় ছিল। কল্‌কাতার বালিগঞ্জের লাভলক স্ট্রীটে তাঁরা থাক্‌তেন। সেখানে গিয়ে আড্ডা মেরেছি আর রসগোল্লা খেয়েছি অনেকবার। সেই সময়ে রাধাকুমুদের সঙ্গে আমি ছিলাম সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে। এখন সেই সড়কের নাম কৈলাস বোস স্ট্রীট। সরোজিনীর নামজাদা ভাই বীরেন

চট্টোপাধ্যায়, —ইয়োরোপ-প্রবাসী। হরীন চট্টোপাধ্যায় কনিষ্ঠ। এও নামজাদা কবি গায়ক।

লেখক— সরোজিনীর সঙ্গে আপনার আলাপ কত-দিনকার?

সরকার—প্রথম চেনা হয় বিলাতে ১৯১৪ সনের মে-জুন মাসে। বোধ হয় লন্ডনের লিসিয়াম ক্লাবে প্রথম মোলাকাৎ। তখনও রাষ্ট্রিক আন্দোলনে সরোজিনীর হাতে-খড়ি হয় নি। মনে পড়ছে,—সেই চা-মজলিশে ব্রিজেস, ঈট্‌স, শ', রাসেল, সেইন্টসবেরি ইত্যাদি বিলাতী কবি ও সমালোচকদের সম্বন্ধে আলাপ হ'য়েছিল। তাজা নোবেলওয়ালা রবি সম্বন্ধেও কথাবার্তা চ'লে ছিল। "ইংরেজের জন্মভূমি" (১৯১৫) বইয়ে তার চিহ্নোৎ আছে বোধ হয়।

লেখক— দেশে ফিরবার পর আপনি সরোজিনীকে প্রথম দেখ্‌লেন কবে? কোথায়?

সরকার—জাহাজ থেকে বোম্বাইয়ে নেমেই তাজমহল হোটেলে হই মারোআড়ি বেপারী রাজা গোবিন্দলাল পিট্টির অতিথি। (সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। যে-ঘরে আমরা ছিলাম তার পাশের ঘরে ছিলেন বম্বে ক্রনিক্‌লের সম্পাদক আবদুল্লা ব্রেল্‌ভি। আর অদূরে সাম্‌নের ঘরে থাক্‌তেন সরোজিনী। এই জন্য সেদিন যাদবপুর কলেজের মাঠে আমার মেয়েকে দেখ্ বা মাত্র সরোজিনী বল্‌লেন—"আরে, তোকে তো আমি দেখেছি খোকা-খুকীদের গাড়ীর ভেতর। এতবড় হ'য়েছিস?" বম্বেতে যখন নামি তখন ইন্দিরার বয়স মাত্র পাঁচ মাস।

লেখক—সরোজিনী ইন্দিরার সঙ্গে বাংলা বল্‌লেন?

সরকার—না, ইংরেজি। বোধ হয় সরোজিনীর পক্ষে বাংলা বলা সহজ নয়। উর্দ্দু হচ্ছে তাঁর আটপৌরে ভাষা।

লেখক—সরোজিনীর "বাঙাল" মূর্তি প্রচার কর্‌লেন কেন?

সরকার—বোধ হয় নিজের বাঙাল-পনা জাহির কর্‌বার জন্য। তা না হ'লে সরোজিনীকে শুধু বাঙালী বল্‌লেই চল্‌তো। তাতেও যাদবপুরের বিশেষ দাবী চালানো সম্ভব হ'তো।

লেখক—বোম্বাইয়ের মারোআড়ি বেপারী রাজা গোবিন্দলালকে চিন্‌লেন কী ক'রে?

সরকার—গোবিন্দলাল আমার কাশীর "ভাইয়া"-শিবপ্রসাদের বন্ধু। শিবপ্রসাদের প্রতিনিধি হিসাবে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের ছোট ছেলে রাধাকান্ত জাহাজে এসেছিল। রাধাকান্ত আমার সেকেলে বন্ধু। মুরুব্বি-বন্ধু ছিলেন মদনমোহন। তাঁর ছেলেরা আর ভাইপো কৃষ্ণকান্ত ছিল অন্তরঙ্গের দলস্থ (১৯১০-১৪)। যাক্,—রাধাকান্তর হুকুমে সোজাসুজি গাড়ী এসে দাঁড়ালো তাজমহল হোটেলে। তার অল্প পরেই আলাপ গোবিন্দলালের সঙ্গে। তার পরে গোবিন্দলালের নিজের বাড়ীতে দু একবার অতিথি হ'য়েছি।

লেখক— বোম্বাইয়ে তখন সরোজিনীর কোনো ভাই-বোনের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল?

সরকার—সরোজিনীর এক মান্দ্রাজী ভগ্নীপতির কথা মনে পড়্‌ছে। তার বোন্‌কেও চিন্‌তাম। ভগ্নীপতির নাম রাজন।

লেখক— রাজনের সঙ্গে কোন্ সূত্রে দেখাশুনা?

সরকার—রাজন্ এসেছিল দৈনিক ইন্ডিয়ান মেইলের জন্য মোলাকাৎ কর্‌তে। মোলাকাৎটা ছাপা হ'য়েছিল। আজকাল "গ্রীটিংস টু ইয়ং ইন্ডিয়া" (১৯২৭) বইয়ে সহজে পাওয়া যায়।

লেখক—রাজনের কাছে সরোজিনী সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হ'য়েছিল?

সরকার—রাজন কথায়-কথায় ব'লেছিল :—"সরোজিনীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত-সার প্রকাশ করা অসম্ভব। সবই কাব্যের ছটা আর ভাষার ফুলঝুরি। তার ভেতর থেকে মাল নিংড়ে বের করা যে-সে সাংবাদিকের পক্ষে সহজ নয়।" আমি ব'লেছিলাম:—"যাহ'ক, কবি বটে। ইয়োরোপেও সাংবাদিকেরা এই কথা ব'লেছে। বস্তুতঃ অনেক সময় রবিবার বক্তৃতাও সাংবাদিকদেরকে হার মানাতে বাধ্য। তার চুম্বক করা অসাধ্য!"

লেখক—বিক্রমপুরের লোকেরা সরোজিনীর বাপের বাড়ীর কোনো খবর রাখে?

সরকার—ব্রাহ্মণগাঁর "নিশিকান্ত চাটাইর্জার" নাম সানিহাটির উকিল-বন্ধু নলিনী কর আর জ্ঞাতি-দাদা অধ্যাপক সতীশ সরকারের (ঢাকা) মুখে শুনেছি। নিশিকান্ত সরোজিনীর কাকা বা জ্যাঠা।

লেখক—নিশিকান্তর কোনো বিশেষত্ব ছিল কি?

সরকার—তিনি সেকালের রুশিয়ায় সেইন্ট পিটার্স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ডক্টর উপাধি পান। কোথায় বিক্রমপুর আর কোথায় রুশিয়া? তাও আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে।

লেখক—ডক্টর হলেন কী ক'রে?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি"তে মজার গল্প আছে। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" নামে কবির লেখা ২১টা কবিতা ছাপা হ'য়েছিল ১৮৮৯ সনে। এই কবিতাসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা নিয়ে নিশিকান্ত ডক্টর হ'ন। শুনেছি তাঁর গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, ভানু সিংহ নামক এক পদ-কর্তা বিদ্যাপতি ইত্যাদি পদাবলী-লেখকদের সমসাময়িক কবি। আর রবি হচ্ছেন তার সংগ্রাহক বা সম্পাদক মাত্র। নিশিকান্ত তুখোর গবেষক!

লেখক—চট্টোপাধ্যায়দের সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন?

সরকার—সরোজিনীর বাপের বাড়ীর সব্বাই তুখোর। ভাইয়েদের ভেতর বীরেন চরমভাবে ভবঘুরে, ত্যাঁদড় আর ডানপিটে, আর হরীনও প্রায়-তথৈব চ। সকলেই "বাপকা বেটা"। কেউ সোজাপথের পথিক নয়। নতুন-কিছুর বেপারী এরা প্রত্যেকে। অঘটন ঘটাবার দিকে মেজাজ খেলে সর্বদা।

লেখক—অঘোর চট্টোপাধ্যায় কেমন লোক ছিলেন?

সরকার—জবরদস্ত স্বদেশ-সেবক। আর সত্যিকার স্বাধীন মগজওয়ালা মানুষ। তা ছাড়া ছট্‌ফটে দিলদেরিয়া খোলতাই মেজাজের লোক। দেখ্‌বামাত্রই মনে হ'তো জ্যান্ত করিৎকর্মা শক্তিযোগী পুরুষ। সরোজিনী ও তার ভাই-বোনেরা সকলেই এই সদ্‌গুণের অধিকারী হ'য়ে জন্মেছে বল্‌তে পারি। এরা সকলেই জীবনের ফোআরা। ইয়োরামেরিকান বন্ধুরা বীরেন সম্বন্ধে আমার মতে সায় দিয়েছে। এমন করিৎকর্মা, তাজামাথাওয়ালা, ছট্‌পটে আর দিল্‌দেরিয়া লোক ভারতীয় নরনারীর ভেতর তারা খুব কম দেখেছে। এইরূপ ছিল তাদের রায়।

লেখক—আশ্চর্য নয় কি?

সরকার—নিশ্চয়। সাধারণতঃ কোনো পরিবারে স্বভাব-চরিত্রের এমন সার্বজনিক সাদৃশ্য দেখা যায় না। খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বীরেন, হরীন, সরোজিনী ইত্যাদিকে

তাদের এই বিশেষত্বের কথা অনেকবার ব'লেছি। এমন কি নানা দেশে বিদেশী বন্ধুদের সাম্‌নেও সরোজিনীর বাপের বাড়ীর এই অদ্ভুত বিশেষত্বের কথা গাওয়া আমার অন্যতম দস্তুর।

লেখক—এই সূত্রে বুঝি আপনার বিক্রমপুরী বাঙালপনাও আবার জাহির করা সম্ভব হয়?

সরকার—বল্‌তে চাও, বল্‌তে পার। কিন্তু আমার প্রাণের কাছে প্রিয়তর হচ্ছে মাল্‌দা। এই জন্য আবার বিক্রমপুরীরা আমার ওপর চটা।

মীজানুর রহমানের সাহিত্য-মজলিশ

১৩ই জানুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—"গুলিস্তাঁ"র কোনো মজলিশে কবি নির্মল দাশের সঙ্গে আলাপ হয় নি?

সরকার—না। চেনা হ'লো এই সেদিন পয়লা জানুয়ারি, কবি-প্রাবন্ধিক মীজানুর রহমানের বাড়ীতে।

লেখক—শুনেছি,—১লা জানুয়ারির বিকালে মীজানুর রহমান সাহিত্য-মজলিশ ডেকেছিলেন। সেখানে কার-কার সঙ্গে দেখা হ'লো?

সরকার—মীজানুরের সঙ্গে আলাপ ছিল না। প্রথমেই দেখা হ'লো তাঁর সঙ্গে। জানা গেল পাঞ্জাবী কবি হালির অনুবাদক ও প্রচারক তিনি। হালি সম্বন্ধে দু-এক কথা "ক্রিয়েটিভ ইন্ডিয়া"(লাহোর, ১৯৩৭) বইয়ে লিখেছি। এই জন্য মীজানুরের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুশী হ'য়েছিলাম। মীজানুর উর্দু-প্রচারকও বটে। নয়া-নয়া ভাষার প্রচারে আমার বাতিক আছে। কাজেই মীজানুরের এই কাজটাও আমার পছন্দসই চিজ। বাঙালী হিন্দুদের ভেতর ও উর্দু-জানা, আরবী-জানা, ফার্শী-জানা লোক চাই কতকগুলা। তা না হ'লে বাঙালীর ইজ্জদ বাঁচানো কঠিন।

লেখক—আর কে-কে ছিলেন?

সরকার—সাহিত্যিক জল্‌সায় যার-যার থাকা সম্ভব তার অনেকেই দেখ্‌লাম। ইস্‌লামিয়া কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকের নাম শোনা গেল। কমিউনিস্ট গাল্পিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গলাভও হ'লো। প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক আবুল মন্‌সুর হাজির ছিলেন। নতুনের মধ্যে চেনা হলো "প্রত্যহ"-ও "পরাগ"-সম্পাদক অজিতশঙ্কর দে'র সঙ্গে। নানা মজলিশের বকেয়া বন্ধু শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়ে শুনালো দ্বিজেন্দ্রলালের "ধনধান্য পুষ্পে ভরা"র ইংরেজি তর্জমা,—বাংলা সুরে। বছর আট-দশেক আগেও এই গানটা তার মুখে শুনেছি,—ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের মাঠে অনুষ্ঠিত বয়-স্কাউট্ দলের উৎসবে।

লেখক—নির্মল দাশের সঙ্গে চেনা হ'লো কী ক'রে?

সরকার—মীজানুর রহমান বল্‌লেন,—আপনাকে একজন একখানা বই উপহার দিতে চায়। বল্‌তে-বল্‌তেই পেয়ে গেলাম এক খানা "ফাঁসির ডাক" কবিতার বই (নবেম্বর ১৯৪৪)। সঙ্গে-সঙ্গে লেখক নির্মল দাশ। দু-চার পাতা উল্টিয়েই ছোক্‌রাকে ব'লে দিলাম,—দেখ্‌ছি নজরুলি শব্দের ছড়াছড়ি। নির্মল জবাব দিলে—"বাঙালী, ভগ্নদূত, পরাগ, নবযুগ ইত্যাদি কাগজে এই ধরণের সমালোচনাই বেরিয়েছে।"

লেখক—মীজানুরের মজলিশে আপনাকে কিছু বল্‌তে হয় নি?

সরকার—হাঁ, হ'য়েছিল বৈ কি।

লেখক—কী সুর গাইলেন?

সরকার—ব'লেছিলাম,—বাঙলা দেশে উর্দু প্রচার চালানো ভালই। এতে হিন্দুরও লেগে যাওয়া উচিত। কিন্তু ফরাসী-প্রচার, রুশ-প্রচার বা জাপানী-প্রচারের চেয়ে উর্দু প্রচারের ফল বড় বেশী হবে কি না সন্দেহ। উর্দু দশ-বিশ-পঞ্চাশ জন পণ্ডিতের মধ্যে আটক র'য়ে যাবে। উর্দু-সাহিত্যে পণ্ডিত হওয়া বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে যারপর-নাই বাঞ্ছনীয়। বাঙলাদেশের শহরে পল্লীতে উর্দুভাষী বাঙালীর বাচ্চা গুন্‌তিতে নগণ্য থাক্‌তে বাধ্য। হিন্দি বলে বা বুঝে যত বাঙালী তার চেয়ে বেশী বাঙালী কোনো দিনই উর্দু বল্‌তে বা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। এইরূপ মনে-হচ্ছে। তা সত্ত্বেও হিন্দুর সঙ্গে-সঙ্গে উর্দু চল্‌তে থাকুক। নয়া-নয়া ভাষা শিখ্‌লে মানুষের মেজাজ শরীফ ও উদার হ'তে থাক্‌বে। কলিজাটা বেড়ে যাবে। তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

লেখক—আর কোনো কথা ব'লেছিলেন?

সরকার—ব'লেছিলাম যে,—হিন্দু গাল্পিকদের মতনই মুসলমান গাল্পিকেরাও গল্প-সাহিত্যের কথাবস্তু সম্বন্ধে বেশ-কিছু সঙ্কীর্ণ-মেজাজী ও একচোখো। মেস-হস্টেলের বা কলেজের মেয়েদের সঙ্গে ছাত্র, উকিল, ব্যারিস্টার ইত্যাদি উচ্চশিক্ষিত ছোকরাদের যোগাযোগ হচ্ছে একালের গাল্পিকদের দৌড়। কি হিন্দু, কি মুসলমান,—কোনো লেখকই বিষয়-বস্তুর চৌহদ্দি বড়-বেশী বাড়াতে পার্‌ছে না। বাড়াবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। মাঝে-মাঝে চাষী, জেলে খালাসী, মজুর ইত্যাদি শ্রেণীর লোকও সাহিত্যে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।

লেখক—কোনো দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন?

সরকার—বোধ হয় ব'লেছিলাম যে,—লেখকেরা চাষীর বা মজুরের চরিত্র আঁক্‌তে ব'সে তাকে কেরাণী, মাষ্টার, উকিল, বেপারী বা সাংবাদিকের চরিত্র হ'তে পুরাপুরি আলাদা জানোআর রূপে খাড়া কর্‌তে অভ্যস্ত। হিন্দু আর মুসলমান দুই লেখকেরই এই ব্যাধি। চাষীরা, মিস্ত্রীরা, ঘরামীরা, জেলার, কুলীরা যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। তাদের কলিজায় যেন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-ব্যারিস্টার ইত্যাদি লোকজনের হৃদয় নাই! কবি-নাট্যকার-গাল্পিকেরা এই ব্যাধিটা কাটিয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করুন। দেখ্‌লাম,—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠোঁটে-মুখে একটুকু হাসির দাগ। ব্যক্তি হিসাবে, চরিত্র হিসাবে নিরক্ষরদেরকে তথাকথিত শিক্ষিতদের বিলকুল উল্টা সম্‌ঝে রাখা কাব্য-নাট্য-গল্পসাহিত্যের চরম আহাম্মুকি।

লেখক—কেউ আপনাকে গালাগালি কর্‌লে না?

সরকার—ফির্‌বার পথে আবুল মন্‌সুরের মুখে শুন্‌লাম,—"যাহ'ক, আপনার চিরকেলে গালাগালির অভ্যাসটা আজও আবার নতুন ঢঙে দেখিয়ে গেলেন। কাজ হবে।"

("বাংলা সাহিত্যে লাখ-তিনেকের জীবন-কথা", "গল্প-সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা", পৃঃ ৭৩৫-৭৩৭ দ্রষ্টব্য)।

নির্মল দাশের কবিতাবলী

১৬ই জানুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—কতকগুলা কবিতার বই দেখ্‌ছি যেন?

সরকার—ঠিক তাই। নির্মল দাশের বইগুলা এক সঙ্গে দেখ্‌বার সুযোগ জুটেছে।

লেখক—দেখি? (১) "বহ্নি-বন্যা" (এপ্রিল ১৯৪২), অজিত শঙ্কর দে'র নামে উৎসর্গীকৃত, (২) "আল-হিলাল (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪), মীজানুর রহমানকে উৎসর্গীকৃত, (৩) "মৃত্যুমাদল" (মার্চ ১৯৪৪), সজনী দাসের ভূমিকা সমন্বিত, জগদীশ ভট্টাচার্যের নামে উৎসর্গীকৃত, (৪) "ফাঁসির ডাক" (নবেম্বর ১৯৪৪), ওআজেদ আলির নামে উৎসর্গীকৃত, "অধুনা বে-আইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দপ্তর সম্পাদক" আফতাব উল্‌-ইস্‌লামের ভূমিকা সমন্বিত। প'ড়েছেন বোধ হয়? কেমন লাগ্‌ছে?

সরকার—সেদিন প্রথম দেখ্‌বা মাত্রই ব'লেছিলাম,—নজরুলি শব্দ পাচ্ছি বেশ-কিছু। কিন্তু নির্মলকে দ্বিতীয় নজরুল বলা চল্‌বে না। নজরুল ঝাঁজাল বেশী। নজরুলের ঝাঁজ নির্মলের বইগুলার বিশেষত্ব নয়। নির্মল নজরুলি-প্রভাবের কবি।

লেখক—নজরুলের ঝাঁজ কিরূপ বুঝতে পার্‌ছি না। খুলে বলুন।

সরকার—নির্মল মাথা দিয়ে লেখে। নজরুল লেখে হৃদয় দিয়ে। এই হিসাবে নির্মল ঠিক যেন সত্যেন দত্ত'র ছোট ভাই। নজরুলি ঝাঁজ সত্যেন দত্ত'রও ছিল না। নজরুল দিগ্‌বিদিক্‌শূন্যরূপে, কাণ্ড-জ্ঞানহীনভাবে, পাগলের মতন হাত-পা ছুঁড়ে, দুনিয়াকে কেটে-ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে। সত্যেন তা পার্‌তো না। নির্মলও তা পারে না, অথবা ততটা পারে না।

("বিনয় সরকারের বৈঠকে", প্রথম ভাগ, ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

লেখক—নির্মলের আর কোনো কাব্য-লক্ষণ দেখ্‌ছেন?

সরকার—উর্দু চালিয়েছে খুব। তাতে লেখাগুলা কোথাও-কোথাও হ'য়েছে জোরাল। কিন্তু অনেক শব্দই পাঠকদেরকে অভিধান দেখে বুঝতে হবে। কাজেই কাব্যের দর খানিকটা কম্‌তে বাধ্য। সুধীন দত্তর সংস্কৃত-প্রাধান্য উর্দু-প্রাধান্যের জুড়িদার।

লেখক—কাব্যের বিষয়গুলা কেমন?

সরকার—সত্যেনের আর নজরুলের বিষয়-বস্তুগুলাতো আছেই। তার ওপর আছে ১৯৩০ বা ১৯৪০ সনের পরবর্তী বাংলা সমাজতন্ত্রী কাব্যের ও গল্পের বিষয়-বস্তু। "আল্‌-হিলাল" (নয়া চাঁদ) বইয়ের 'সমাধি-ফলক' কবিতায় আছে নিম্নলিখিত ধুআ :—

"লাঙল ফলার উগাড়িয়া সব
নামজাদা যত রয়
বেনামা সবায় প্রণতি জানায়ে
লেখা র'ক পরিচয়।"

লেখক—এই ধরণের আর ও কিছু আছে?

সরকার—অনেক কিছুই এই শ্রেণীর মাল। "বহ্নিবন্যা"'র অন্যতম রচনা "কবির প্রতি"। তাতে পড়্‌ছি :—

"মোদের ছন্দ জেগেছে মিলের
হুইশিলে ধীরে ধীরে

কাস্তে, কোদাল, কুঠার, হাতুড়ি
লাঙল-ফলার শিরে ;
সহসা হঠাৎ থেমে পড়ে যাওয়া
গাড়ীর ককানি তানে ;
রিক্সাওয়ালার ঠুং-ঠাং আর
ছাদ-পিটানোর গানে।
মোদের কাব্য জেগেছে বন্ধু
মেশিনের চীৎকারে ;
ভাঁটির মদের উগ্র গন্ধে,
বস্তির ধারে ধারে।
মিঠেল মধুর মাধুরী ভাষায়
রচ গাথা তুমি কবি ;
মোরা জানি বেশ মোদের জীবনে
কবিতা হয়েছে সবি।
লিখি না বন্ধু! কবিতা আমরা
কাগজে কলম টানি'
জীবনের পাতে মোদের অশ্রু
কবিতা বলিয়া জানি।"

লেখক— ছন্দগুলা কেমন মনে হচ্ছে?

সরকার—সত্যেন আর নজরুলের ছন্দ-ধারা নির্মল দাশের কাব্যে বজায় র'য়েছে। এই হিসাবে নির্মল গতানুগতিক। বুদ্ধদেব, সজনী, বিষ্ণু, সুভাষ, কামাক্ষী, শান্তিরঞ্জন ইত্যাদি কবিদের নয়া-নয়া ছন্দের গড়ন নির্মলকে টলাতে পারে নি। কিন্তু জোরাল ছন্দের দৌলতে নির্মল চোদ্দ-আঠারো-বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে তাতাতে সমর্থ। ১৯৫০-৫৫ পর্যন্ত নির্মলের পশার বাড়তির দিকে।

লেখক— নির্মল-কাব্যের শব্দ-সম্পদ্ কিরূপ?

সরকার—যারপরনাই উল্লেখযোগ্য। উর্দু তো আছেই। তার ওপর আছে চল্‌তি মামুলি শব্দের দিগ্‌বিজয়। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে হামদর্দিও মন্দ নয় অধিকন্তু হড়্-হড়্ ক'রে প'ড়ে চলা যায়। এই শোনো "বহ্নিবন্যা"র "কাস্তে-কোদালি-কুড়ুল" :—

"চালারে হাপর, চুলী হ'তে ঐ
ছিটুক অগ্নি-শিখা
সে আগুন যেন ঘরে-ঘরে ফেলে
তাহার দাবীর লিখা।

* * * *

বাটালি, শাবল, গাঁইতি, হাতুড়ী,
র‍্যাঁদা আর কর্ণিক,
আর তোর ঐ কব্জী দুটোকে
রাখ্ মজবুত ঠিক।"

এই ধরণের শব্দ-খিচুড়ি আমার মেজাজ-মাফিক মাল।

লেখক—নির্মল দাশের ভবিষ্যৎ কেমন মনে হচ্ছে?

সরকার—"ফাঁসির ডাক" বইটা বোধহয় নির্মলের শেষ বই,—১৯৪৪-এর নবেম্বরে বেরিয়েছে। এই বইটায় দেখ্‌ছি নতুন বিষয়-বস্তুর কিছু-কিছু প্রভাব।

লেখক—আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

সরকার—প্রথম বই-তিনটায় ছিল প্রচারের ঝোঁক প্রবল। সোজাসুজি বাণী-প্রচারের নেশায় কবি ছিলেন মশগুল। "ফাঁসির ডাক" বইয়ে ডাক-হাঁক মনে হচ্ছে কিছু কম। এর ভেতর দেখ্‌ছি গল্প-সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। কমসে-কম্ ছোট-খাটো অবস্থা বা ঘটনা তৈরি করার দিকে কবির খেয়াল যেন গিয়েছে। একটু-আধটু চরিত্র-সৃষ্টির কাজেও হাত বোধ হয় খেলেছে। এইসব দিকে হাত পাক্‌তে থাক্‌লে নির্মলের ভবিষ্যৎ গৌরবময়। ছন্দের জোর আর শব্দের শাঁস,—দুইই এই বইয়ে মজুদ আছে দস্তুর-মতন।

লেখক—অন্যান্য সাম্যবাদী কবিদের তুলনায় নির্মলকে কেমন মনে হচ্ছে?

সরকার—নির্মলের সাম্যবাদী কাব্যে হেঁয়ালি নাই। কথাগুলা সোজাভাবে পষ্টাপষ্টি বলা আছে। রকমারি পেশার ভেতর ঢুকে বস্তুনিষ্ঠভাবে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলা খুলে ধরা হ'য়েছে। বাহন লাগানো হ'য়েছে বাজারী সহজ চল্‌তি শব্দ আর মন-মাতানো ছন্দ। কাজেই নির্মলের সাম্যবাদ অন্যান্য সাম্যবাদ্‌কে সহজেই হারাতে পার্‌বে। গতিভঙ্গী আশাপ্রদ।

মুক্তাগাছা পপিউলার ব্যাঙ্কের শাখা

২০শে জানুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—দেখ্‌ছি জমিদারের ব্যাঙ্কেও আপনার আনাগোনা আছে?

সরকার—না থাক্‌বার কোনো কারণ নাই। কোনো লোকই এই অধমকে বয়কট করে না। হঠাৎ একথা ব'ল্‌লে কেন?

লেখক—মুক্তাগাছা পপিউলার ব্যাঙ্কের কলিকাতায় শাখা খোলা হ'লো (৮ জানুয়ারি ১৯৪৫)। সভাপতি ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ নন্দী। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নরেন দত্ত বক্তৃতা ক'রেছেন। আপনিও বক্তাদের ভেতর ছিলেন। কাগজে দেখ্‌লাম সভার আসরে জমিদারের আব্‌হাওয়া ছিল না কি খুব বেশী। লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লির ডক্টর নলিনাক্ষ সান্ন্যালও ছিলেন শুন্‌তে পাচ্ছি?

সরকার—জমিদারের আবহাওয়া বাঙাল সমাজের সর্বত্রই বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশ হচ্ছে জমিদারদের দেশ। ১৯০৫-এর পূর্ববর্তী বঙ্গ-সংস্কৃতির যা-কিছু কাজ-কর্ম তার বোধ হয় পৌনে-ষোল আনাই জমিদারদের নেতৃত্বে, সহযোগিতায় অথবা টাকার জোরে সাধিত হ'য়েছে। ১৯০৫-১৪ সনের গৌরবময় বঙ্গবিপ্লবে জমিদারদের নেতৃত্ব, সহযোগিতা আর টাকার প্রভাব ছিল জবরদস্ত। আজও জমিদারদের সাহচর্য আর রূপচাঁদ বাঙালী জাতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, যন্ত্রনিষ্ঠা, সুকুমার শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বেশ-কিছু জরুরি হয়। রাষ্ট্রিক কাজকর্মেও জমিদারেরা

চিরকালই সজাগ আর সক্রিয়।

লেখক—ব্যাঙ্কের কারবারে জমিদারদের হাত উল্লেখযোগ্য কি?

সরকার—১৯০৫-১৯১৪ সনে প্রত্যেক জেলায় ছোট-বড়-মাঝারি লোন অফিস বা ব্যাঙ্ক কায়েম হ'য়েছিল। তার কিছু-কিছু আজও চালু আছে। এইসবগুলার সঙ্গেই স্থানীয় জমিদারদের নিবিড়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর নাম সেকালের ব্যাঙ্ক-বীমার আন্দোলনে আর শিল্প-বাণিজ্যের আন্দোলনে জান্‌তো না কে? তাঁর নামে একালে কায়েম হ'য়েছে মণীন্দ্র-ব্যাঙ্ক,—কাশিমবাজারে আর কল্‌কাতায়। তাঁর ছেলে মহারাজা শ্রীশ সেই ব্যাঙ্কেরই ধুরন্ধর। এই জন্যেই মুক্তাগাছা পপিউলার ব্যাঙ্কের শাখা কায়েম করার উৎসবে তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিক।

লেখক—মুক্তাগাছা পপিউলার ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা কে?

সরকার—মুক্তাগাছার কুমার জীবেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী। এঁর সঙ্গে মহারাজা শ্রীশের ভাব ছেলেবেলা থেকে। জীবেন্দ্রকিশোর রাজা জগৎকিশোরের পৌত্র। মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ জেলায়,—জানো বোধহয়। এঁদের সকলেরই ছেলেবেলায় (১৯১১-১৪) এই অধমের সঙ্গে বেশ কিছু ঘরোআ যোগাযোগ ছিল। (পৃষ্ঠা ১৬২)

লেখক—রাজা-মহারাজাদের সভায় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হালচাল সম্বন্ধে কী বল্‌লেন?

সরকার—কী আর ব'ক্‌বো? শিল্পী-বণিকদের আড়তে আর বেপারী-কেরাণীদের হাটে কিম্বা মাষ্টার-ছাত্রদের আড্ডায় যা বকি রাজা-মহারাজাদের আসরেও তাই ঝেড়ে দিলাম। নতুন বল্‌বার আছেই বা কী?

লেখক—কাগজে কোনো বক্তৃতার সারমর্ম বেরোয় নি। কিন্তু দেশের লোক কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাক্‌রি-বাক্‌রি আর টাকা-কড়ির অবস্থা সম্বন্ধে আপনার সাম্প্রতিক মতামতগুলা শুন্‌তে চায়। বলুন না কী ব'লেছেন?

সরকার—লড়াইয়ের সময়ে নয়া-নয়া ব্যাঙ্ক কায়েম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পুরাণা ব্যাঙ্কের নয়া-নয়া শাখা গজানোও অতি-মাত্রায় মামুলি কথা।

লেখক—কেন? এত স্বাভাবিক আর মামুলি কেন? এই সম্বন্ধে সভায় কিছু ব'লেছেন কি?

সরকার—লড়াইয়ের সময়ে টাকার কারবার চলে খুব বেশী-বেশী। টাকা হাতে-হাতে ঘুরে বেড়ায় অতি ঘন-ঘন। আসল কথা,— মাল-চলা-চলও হয় যখন-তখন আর জোরের সহিত। বেপারীদের কাজকর্ম ফুলে ওঠে। কারখানায় মাল তৈরী হয় রকমারি আর পর্বত-প্রমাণ। চাক্‌রি পায় লোকেরা লাখে-লাখে। টাকা রোজগার হয় দেদার। এরি নাম ইন্‌ফ্লেশন বা স্ফীতি। লড়াই মানেই হ'লো একসঙ্গে হরেক-রকমের ফাঁপানি বা ফুলে-ওঠা। মাল-স্ফীতি, উৎপাদন-স্ফীতি, নিয়োগ-স্ফীতি, চাক্‌রি-স্ফীতি, বেতন-স্ফীতি, যান-বাহনের স্ফীতি, কেনা-বেচার স্ফীতি, দোকানদারির স্ফীতি, লেনা-দেনার স্ফীতি, কর্জ-স্ফীতি, মাশুল-স্ফীতি, মূল্য-স্ফীতি। তা ছাড়া দুনিয়ার সুপরিচিত মুদ্রাস্ফীতি। কাজেই টাকাকড়ির প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাঙ্কও ফেঁপে-ফুলে উঠ্‌তে বাধ্য। একে বল্‌বো ব্যাঙ্ক-স্ফীতি। সুতরাং নয়া-নয়া ব্যাঙ্ক, নয়া-নয়া শাখা। এই সব হচ্ছে লড়াইয়ের আবহাওয়ার মুড়ি-মুড়্‌কি।

লেখক—এইসব কথা আপনি মুক্তাগাছার পপিউলার ব্যাঙ্ক আর অন্যান্য ব্যাঙ্কের

শাখা খুল্‌বার সময় সোজাসুজি ব'লে দিয়েছেন?

সরকার—নিশ্চয়। এসব তো অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তায় অ-আ-ক-খ। ইস্কুল-কলেজ, ব্যবসা-পাড়া, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধনবিজ্ঞান-পরিষদ, বণিক্‌-ভবন (চেম্বার অব কমার্স), বিজ্ঞান-কলেজ, বাণিজ্য-কলেজ, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,—সর্বত্রই বোলচাল ঝেড়েছি আমি এই ধরণের। কল্‌কাতার অনেকেই আমার সাম্প্রতিক বুখ্‌নিগুলাও শুনেছে। লড়াইয়ের অর্থনীতি বা আর্থিক ব্যবস্থা বুঝবার বা বুঝাবার আর কোনো কায়দা আমার নাই। ("লড়াইয়ের অর্থশাস্ত্র", পৃ: ৫০৮-৫০৯)

"ডি-মবিলিজেশন" বা চলাচল-বন্ধ

লেখক—এই সকল নয়া-নয়া ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী ব'লেছেন?

সরকার—ভবিষ্যতের অর্থ লড়াইয়ের পরবর্তী বছর তিন-পাঁচেকের অবস্থা। লড়াই থামামাত্র লড়াইয়ের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-দোকানদারি-যানবাহন সব-কিছুই থাম্‌তে বাধ্য। লড়াইয়ের সময়কার লোক-নিয়োগ-যানবাহন ইত্যাদি চিজ চলে সরকারী টাকায় আর সরকারী তাঁবে। গবর্মেন্ট লড়াই করে,—এইজন্য গবর্মেন্টই লড়াইয়ের কারবারগুলাও চালায়। ধরো,—গর্বমেন্ট লড়াই বন্ধ ক'রে দেবে। তার মানেই হচ্ছে যে, গবর্মেন্ট নিজেই লড়াইয়ের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-দোকানদারি ইত্যাদি সকল কারবারই গুটিয়ে আন্‌বে। এরি নাম "ডি-মবিলিজেশন" বা চলাচল-বন্ধ (চলাচল-গুটোনো)।

লেখক—তার ফল কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—সেই কথাই তো ব্যাঙ্কের শাখা খোলার সময় আর অন্যান্য আবহাওয়ায় ব'কে থাকি। গবর্মেন্ট লড়াইয়ের কারবারগুলা বন্ধ ক'রে দেবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে লাখ-লাখ লোকের চাক্‌রি যাবে। বেশী-বেশী আর রকমারি মালপত্র তৈরি হবে না। যান-বাহনের অতি-কাজ চল্‌বে না। কারখানা, দোকান, কোম্পানী, সঙঘ ইত্যাদি অনেক-কিছু পটল তুল্‌বে। অতএব ব্যাঙ্কের ওপর চোট লাগ্‌বে দস্তুরমতন। আর্থিক হিসাবে "ডি-মবিলিজেশন" বা চলাচল-বন্ধ অতি-মারাত্মক কাণ্ড।

লেখক—আপনি কি ব'লেছেন যে, সব ব্যাঙ্কই পটল তুল্‌বে?

সরকার—তা ও কি কখ্‌নো সম্ভব? টাকাকড়ির পরিমাণ ক'মে আস্‌বে। কেনা-বেচা চল্‌বে আস্তে-আস্তে। মাল-চলাচলের দৌড় হবে ঢিমে-তেতালা। টাকার হাত-ফের ঘট্‌বে ধীরে-ধীরে। কাজেই কর্জ দেওয়ার আর কর্জ লওয়া ঘট্‌বে বেশ-কিছু কৃপণের কায়দায়। সুতরাং যখন-তখন ব্যাঙ্কের ঘরে লোকের ভীড় দেখা যাবে না। ব্যাঙ্ক হাত গুটিয়ে কাজ চালাবে। এই সব হচ্ছে "ডি-মবিলিজেশন" বা চলাচল-বন্ধ'র রকমারি লক্ষণ।

লেখক—ব্যাঙ্কগুলা ফেল মার্‌বে?

সরকার—অনেক কারখানা, দোকান ও কোম্পানী দেউলিয়া হবে। অতএব কোনো-কোনো ব্যাঙ্ক ফেল মার্‌তে পারে। তা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত।

লেখক—ভাবনার কথা নয় কি? সভার লোকেরা আপনাকে পছন্দ করে নি নিশ্চয়?

সরকার—কিন্তু ফেল মারে কে? যার পায়া ভারি নয়,—যার কোমরে জোর নেই।

ব'লে দিয়েছি যে, হুসিয়ার কারবার, হুসিয়ার দোকানদার, হুসিয়ার কোম্পানী, হুসিয়ার বেপারী কখনো দেউলিয়া হ'তে পারে না। ব্যাঙ্কার আর কারবারীদের পক্ষে ঝুঁকি নেবার ওস্তাদি আর কর্মদক্ষতা চাই। তা যার আছে সে দুনিয়া দেউলিয়া হ'লেও নিজের ঘাড় খাড়া রাখ্‌তে পারে। শেয়ানা ব্যাঙ্কার ফেল মার্‌তে পারে না। মানুষ মরে। তার মানে এ নয় যে, দুনিয়ার সব কটা লোকই সব-জায়গায় এক মুহূর্তে মারা পড়ে।

লেখক—কী রকম ব্যাঙ্কের বিপদ্ ঘ'ট্‌তে পারে?

সরকার—লড়াইয়ের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৯ সনে, —যে সকল কারখানা, ফ্যাক্টরি, দোকান, আড়ৎ, ব্যাঙ্ক, বণিক্-দপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান চালু ছিল তাদের অনেকেই টিকে যাবে। ১৯৩৯ সনের পর যেসব প্রতিষ্ঠান বা শাখা কায়েম হ'য়েছে তাদের কারু-কারু বিপদ্ স্বাভাবিক। তাদের সকলেরই চলা উচিত অতি-সাবধানে। অবশ্য পুরানা প্রতিষ্ঠানগুলার পক্ষেও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো চল্‌বে না। সাধু সাবধান। তবে লড়াই এখনো বছর দুই-তিনেক চল্‌বে। কাজেই ব্যাঙ্কারদের ভাবনা সম্প্রতি বেশী-নাই। অধিকন্তু লড়াইয়ের পরবর্তী কালে কতকগুলা শিল্পবাণিজ্য কিছুদিনের জন্য সরকারী ও নিম-সরকারী তাঁবে চালাবার সম্ভাবনা আছে। তাতে অনেকের বাঁচোআ। সভায় এই ধরণের কথাও বকা গেছে।

বিলাতে ও আমেরিকায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক শফর

২৮শে জানুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—বিলাতে ও আমেরিকায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের শফর চল্‌ছে। এর ফলাফল কী হবে মনে করেন?

সরকার—গোটা শয়েক ইংরেজ (ও মার্কিণ) বিজ্ঞান-সেবককে ভারত-সরকার মোটা মাইনের চাক্‌রি দেবে। ভারতখানাকে পুনর্গঠন করা থাক্‌বে এই সকল বিদেশী বিজ্ঞান-দক্ষদের কাজ।

লেখক—ব্যস্? আপনি কী বল্‌ছেন?

সরকার—কী আর বল্‌বো? আমাদের মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি ও শিশির মিত্র র'য়েছেন এই শফর-করা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদলের অন্তর্গত। তা ছাড়া আছেন জীব-রাসায়নিক বীরেশ গুহ। তাঁর শফরও চ'লেছে সরকারী তদবিরে,—যদিও স্বতন্ত্রভাবে। এঁরা দেশে ফিরে এলে মজা দেখা যাবে কয়েক মাসের ভেতর।

লেখক—কী মজা আন্দাজ কর্‌ছেন?

সরকার—বাঙালী বিজ্ঞানবীরেরা বিলাতী ও মার্কিণ ল্যাবরেটরি, ফ্যাক্টরি, টেক্‌নিক্যাল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ দেখে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই দেখ্‌ছে নয়া-নয়া যন্ত্রপাতি, নয়া-নয়া আবিষ্কার, নয়া-নয়া গবেষণা-প্রণালী, নয়া-নয়া শিল্পের জন্ম, নয়া-নয়া জিনিষ-সৃষ্টি, নয়া-নয়া বিজ্ঞান-বীর, নয়া-নয়া এঞ্জিনিয়ারিং-বীর, নয়া-নয়া আবিষ্কার-বীর। বীরে বীরে ধূল পরিমাণ। আর সঙ্গে-সঙ্গে মেঘনাদ ইত্যাদি বেচারাদের চোখ ঝ'ল্‌সে যাচ্ছে। "দেখিয়া নয়নে লাগিছে ধাঁধা"। দেখা মানেই মুখ শুকিয়ে-যাওয়া।

লেখক—কেন? চোখ ঝ'ল্‌সে যাবার কারণ কী। মুখ শুকিয়ে যাবে কেন?

সরকার—হাজার হ'লেও মেঘনাদ ইত্যাদি সকলেই, বাঙালীর বাচ্চা তো? সকলে ভাব্‌ছে,—"হায় হায় আমরা র'য়েছি কোথায়? যে-তিমিরে সেই-তিমিরে র'য়ে গেল বাঙ্‌লা দেশ, র'য়ে গেল ভারতবর্ষ।" বিলাতে আর আমেরিকায় নয়া-বিপ্লব ঘ'টে যাচ্ছে। শিল্প-বিপ্লব, যন্ত্র-বিপ্লব, উৎপাদন-বিপ্লব, যান-বাহন বিপ্লব, কারখানা-বিপ্লব, মাল-বিপ্লব, বিদ্যা-বিপ্লব, বিজ্ঞান-বিপ্লব। বছর শয়েক আগে, বছর পঞ্চাশেক আগে যে-সব যন্ত্র-বিপ্লব আর বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘ'টেছিল সেই-সব এই চোখের সাম্‌নের বিপ্লবগুলার তুলনায় তে-রে-কা-টা সাধা মাত্র!

লেখক—বেশ তো? কিন্তু এতে ইংরেজ আর মার্কিণ বিজ্ঞান-সেবকেরা, যন্ত্র-সেবকেরা এঞ্জিনিয়ারেরা ভারতে মোটা-মাইনের চাক্‌রি পাবে কেন?

সরকার—ইংরেজ সরকার বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞান-সেবকদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ভারতবর্ষ কত নীচে পড়ে র'য়েছে। ঠিক যেন ওরা বল্‌ছে—"দেখ্‌লি? তোরা তোদের বাঙ্‌লা দেশকে আর ভারতখানাকে যদি শিল্পে-বাণিজ্যে-বিজ্ঞানে-বিদ্যায় বড় কর্‌তে চাস্‌ তাহ'লে তোদেরকে আমাদের বিলাতী (ও মার্কিণ?) ওস্তাদ ভাড়া ক'রে নিয়ে যেতে হবে। বিদেশী বিজ্ঞান-বীর আর যন্ত্র-বীরের সাগ্‌রেতি কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ গিয়ে তোদের দেশে ফিরে যাবার পর। দু-চার-দশ জন বিদেশী বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনিয়ার দিয়ে তোদের চল্লিশ কোটি ভারতসন্তানের উন্নতি-সাধন সম্ভব নয়। চাই শ'য়ে-শ'য়ে বিদেশী ওস্তাদ।"

লেখক—এই পরামর্শ শুনে ভারতীয় বিজ্ঞানবীরেরা কী বল্‌বেন,—মনে হচ্ছে?

সরকার—তাদের ভেতর বোধ হয় দুই দল হবে। এক দল এই শল্লা শুন্‌বামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌বে। কোনো মতেই এই পাঁতি বরদাস্ত কর্‌তে চাইবে না। আর এক দল বল্‌বে—"ভায়া, ইংরেজ মুরুব্বি ভারতে-আস্‌বেই আস্‌বে। কেউ রুখ্‌তে পার্‌বে না। কাজেই এই শল্লায় সায় দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এদের সঙ্গে ভাব রেখে চলা উচিত। আমাদের দেশে এমন ওস্তাদ কোথায় ক'জনই বা আছে? বিদেশী ওস্তাদ এলে আমরাও সহজে যা-হোক্‌ কিছু শিখে নিতে পার্‌বো।"

লেখক—শেষ পর্যন্ত ফল কী দাঁড়াবে?

সরকার—গোটা শয়েক পাকা ওস্তাদ ভারতের কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায়-কারখানায়, টাকার বাজারে, রাসায়নিক কারবারে, যান-বাহনের শিল্পে, বিজ্ঞান-গবেষণায়, শিক্ষার আন্দোলনে হাজির হবেন,—বিলাত (ও আমেরিকা) হ'তে। তাঁরা তন্খা পাবেন মাসে-মাসে হাজার তিনেক ক'রে।

লেখক—দেশী বিজ্ঞান-সেবকেরা কী কর্‌বে?

সরকার—তাদের অধিকাংশই হবে বিদেশী ওস্তাদ মশায়দের কুলী-কেরানী দরের সহযোগী। মাইনে মাসিক শ-তিন-পাঁচেক। ভারতীয়-বিজ্ঞান-বীরদের যারা বিলাতী সরকারের পাঁতি-মাফিক কাজের স্বপক্ষে থাক্‌তে রাজি,—তাদের কারু-কারু হবে রোজগার-বৃদ্ধি, কারু-কারু পদোন্নতি, কারু-কারু উপাধি-খেতাব ইত্যাদি-ধরণের যা-হোক্‌-কিছু লভ্যম্‌।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

বর্ষাতির রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার সুরেন বসু

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

হেমেন সেন—আনন্দবাজার পত্রিকায় (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫) দেখ্‌লাম পানিহাটিতে বর্ষাতির কারখানায় ক্ষিতীশ নিয়োগীর সভাপতিত্বে আপনি কারখানার পরিচালক সুরেন্দ্রমোহন বসু সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রেছেন। কোথায় বর্ষাতি আর কোথায় বিনয় সরকার?

সরকার—বকাবকির কোনো বৃত্তান্ত আছে না কি?

লেখক—হাঁ। এই তো। আপনি ব'লেছেন যে, "১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতের শিল্পোন্নয়ন-ক্ষেত্রে যাঁহাদের প্রচেষ্টায় নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল, মিঃ বসু তাঁহাদের অন্যতম। আজ বাঙ্‌লায় এমন বহু লোক রহিয়াছেন,—জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইংলন্ড্‌ আমেরিকা, জার্মাণি ও জাপানের লোকদের সহিত যাঁহারা সমতুল বলিয়া বিবেচিত হইতে পা'রেন।"

সরকার—বেশ তো। বাণীগুলা আমারই বটে। তবে ভাষাটা আমার নয়। কেন, এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য কিছু আছে না কি?

লেখক—ইংলন্ড্‌ আমেরিকা ইত্যাদি দেশের সঙ্গে তুলনাটা সম্বন্ধে কিছু পরিষ্কার ক'রে বল্‌বেন? (পৃ: ৬৬৯-৬৭৩)

সরকার—সোজা কথা। সকলেই জানে যে,—এই অধমের কারবার হচ্ছে মানুষ জরীপ করা। মানুষের মগজ, মানুষের চরিত্র, মানুষের কৃতিত্ব, মানুষের কীর্ত্তি মেপে-জুপে বেড়ানো আমার অন্যতম পেশা। শুধু হাত-পা বা মাংসপেশী মাপার কথা বল্‌ছি না। মুড়ো, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি চিজ মাপা আর তুলনা করা আমার কাজ।

লেখক—মগজ, মুড়ো, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি চিজ সম্বন্ধে বাঙালীকে ইংরেজ, জার্মাণ ইত্যাদি জাতের সঙ্গে সমান বল্‌ছেন কি?

সরকার—ঠিক তাই। সেই সভায় ব'লেছি যে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে, বিজ্ঞান-সাহিত্য-সুকুমারশিল্পে আর রাষ্ট্রিক-সামাজিক কর্মক্ষেত্রে আজ-কালকার বাঙ্‌লাদেশে হাজার দশেক বাঙালী সুরেন বসুর মতন করিৎ-কর্মা বা কর্মবীর। বছর পঞ্চাশেক আগে হয়ত হাজারখানেকও এই দরের বাঙালী ছিল কিনা সন্দেহ। তাছাড়া সেকালে করিৎকর্মা বাঙালীরা হ'তো প্রধানতঃ উকিল, ডাক্তার, সরকারী, চাক্‌রে, সাংবাদিক, মাষ্টার, কবি, গাল্পিক ইত্যাদি ধরণের লোক। কিন্তু সুরেনের পেশা নয়া-ঢঙের। সে যন্ত্রনিষ্ঠ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ বেপারী। আগেকার হাজারখানেকের ভেতর এঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্কার, বীমাদার, কারবারী লোক নেহাৎ অল্প ছিল। একালের হাজার-দশেকের ভেতর বহুসংখ্যক হচ্ছে রাসায়নিক, এঞ্জিনিয়ার, আমদানি-রপ্তানির বেপারী, ফ্যাক্টরি-পরিচালক, বীমাকর্মী, ব্যাঙ্কের কর্ণধার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক। সকল দিক্‌ হ'তেই বাড়্‌তির পথে বাঙালী। একালের হাজার দশেকের ভেতর শিল্প-বাণিজ্যের কর্মবীর বোধ হয় শ-পাঁচেক মাত্র। সুরেন, আলামোহন ইত্যাদি কর্মবীরেরা এই দলের অন্তর্গত।

("শ-পাঁচেক আলামোহন" ৬৭৪-৬৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সুরেন বসুর দেশী-বিদেশী জুড়িদার

লেখক—তাতো বুঝা গেল। কিন্তু ইংরেজ, মার্কিণ, জার্মাণ ইত্যাদি জাতের সঙ্গে বাঙালীর তুলনাটা পরিষ্কার হ'লো না।

সরকার—সুরেনের বয়সের আর সুরেনের পেশার ইংরেজ-জার্মাণ-মার্কিণ-জাপানীকে দাঁড়ি-পাল্লার এক ডালাতে বসানো যাক্। আর এক ডালায় বসানো হোক্ সুরেনকে। দেখ্‌বো যে, ওজনে ওরা সুরেনের চেয়ে ভারী নয়। এই বোল ঝেড়েই তুলনাটা চালিয়েছিলাম সভায়।

("কর্মবীরের জাত বাঙালী", পৃ: ৬৬৯-৬৭০ দ্রষ্টব্য)

লেখক—তাহ'লে বাঙালী জাত্ কি ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণ, জাপানী ইত্যাদি জাতের সমান নয়?

সরকার—না। কোনো মতেই তা বলা চল্‌বে না। সভাতে সোজাসুজি ব'লে দিয়েছিও তাই। কোনো গোঁজামিল রাখিনি।

লেখক—কী ব'লেছেন?

সরকার—ছয় কোটি বাঙালীর দেশে সুরেনের জুড়িদার করিৎকর্মা বা কর্মবীর বাঙালী হচ্ছে সকল প্রকর কর্মক্ষেত্রে, মাত্র হাজার দশেক। কিন্তু পাঁচকোটি ইংরেজের দেশে সুরেনের জুড়িদার ইংরেজ কর্মবীর হচ্ছে কম সে-কম লাখ দশেক। সংখ্যাগুলা আনুমানিক,—ঠারে-ঠোরে বুঝ্‌তে হবে। এইখানেই ইংরেজে-বাঙালীতে আশমান-জমিন ফারাক। ম'রে র'য়েছি কি সাধে? সুরেনের দেশী-বিদেশী জুড়িদার সম্বন্ধে বিশ্লেষণটা চালাতে হবে হুসিয়ার-ভাবে।

লেখক—"আনন্দবাজার পত্রিকা" আপনার বক্তৃতার আরও বৃত্তান্ত দিয়েছে। ব'লেছে, শুনুন পড়ছি,—"গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধক, বিদেশীদের অসঙ্গত প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্র ও ধনিক সম্পদায়ের ঔদাসীন্য এবং আর্থিক সাহায্যের অভাব সত্ত্বেও কিরূপে দেশের শিল্প-সম্পদ্ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় তাহা বর্ণনা করেন।'

সরকার—"পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধক" শব্দটার মতন শব্দ এই অধমেরই বটে। বাধাবিঘ্নকে জুতোনো হচ্ছে বীরত্ব। হিমালয়ের সমান বাধাবিঘ্নকে চুরমার ক'রে দেওয়া হচ্ছে আমারই মামুলি বোল-চালের অন্তর্গত। লড়াইশীল লোককে আমি বলি বীর। সুরেন লড়ুয়া লোক,— সন্দেহ নাই। কিন্তু "ধনিক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য এবং আর্থিক সাহায্যের অভাব" ইত্যাদি বুলি আমার মুখে বেরোয় না।

লেখক—কেন? আপনি কি মনে করেন যে, দেশের ধনী লোকেরা শিল্পোন্নতির কাজে টাকা ঢাল্‌তে রাজি হয়?

সরকার—নিশ্চয়। আসল কথা দেশটা আগাগোড়া নির্ধন, গরীব। পয়সাওয়ালা লোক বাঙালী সমাজে নেহাৎ কম। বাইরে থেকে আমরা মনে করি যে, জমিদারেরা টাকার কুমীর। ভেতরকার কথা উল্টা। লাখ-লাখ টাকার মুখ দেখা তথাকথিত লক্ষপতি জমিদারদের কপালেও বেশী ঘটে না। যে-সকল জমিদারের ট্যাঁকে পুঁজি ছিল বা আছে তারা অনেক সময়েই যন্ত্রি-কৃষি-শিল্প-ব্যাঙ্ক-বীমা-সংক্রান্ত ব্যবসায় কিছু-কিছু টাকা ঢেলেছে। সত্যি-সত্যি টাকা আছে তিলি-সুবর্ণবণিক্-গন্ধবণিক্-সাহা ইত্যাদি জাতের

কোনো-কোনো পরিবারে। তারা ব্যাঙ্ক-বীমা-কল-কারখানা-ফ্যাক্টরি ইত্যাদি কারবারে টাকা ঢাল্‌তে অভ্যস্ত। কাজেই ধনী লোকের বিরুদ্ধে বকাবকি করা সাধারণতঃ আমার দস্তুর নয়। বাঙালী ধনীদের পুঁজিপাটার দৌড় বেশী হ'লে আরও বেশী-বেশী শিল্প-সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

লেখক—আপনার বক্তৃতার বৃত্তান্তে আরও কিছু আছে নিম্নরূপ—"তিনি বলেন যে, মিঃ বসু বাঙলার শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টায় যাঁহারা অগ্রণী বলিয়া গণ্য তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ভারতে রবার-শিল্পের ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাঁহাকে বহু দেশ পরিভ্রমণ করিতে হয়।" কোন্‌-কোন্‌ দেশে সুরেন বসু গেছেন?

সরকার—সুরেন হ'চ্ছে মার্কিণ মুল্লুকের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁকে যেতে হ'য়েছে জাপানে আর জর্মাণিতে। ছাত্রজীবনের পর আমেরিকায়ও মুসাফিরি কর্‌তে হ'য়েছে কারবারের তাগিদে। তা ছাড়া বিলাত, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশেও ভ্রমণ ঘ'টেছে। কাজেই আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে সুরেনের জরীপ ও যাচাই হ'য়েছে দস্তুরমতন।

লেখক—পানিহাটির সভায় কে-কে উপস্থিত ছিলেন?

সরকার—কার নাম কর্‌বো আর কারই বা কর্‌বো না? অনেককেই তো চিনি। কাগজওয়ালাদের ভেতর ছিলেন "যুগান্তর"-দৈনিকের সম্পাদক কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, "অমৃতবাজারের" তুষারকান্তি ঘোষ, আর "আনন্দবাজার" ও "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের" সুরেশ মজুমদার। লেখকদের মধ্যে দেখ্‌লাম অনাথগোপাল সেনকে।

খগেন দাশগুপ্ত, যতীশ দাশ, রফি আহম্মদ, ক্ষিতীশ বিশ্বাস ও তারক দাশ

লেখক—সুরেন বসুর ব্যবসায়ী বন্ধুবর্গের ভেতর কাউকে দেখ্‌লেন?

সরকার—"ব্যবসায়ী-বন্ধুবর্গের" অন্তর্গত কে-কে বলা কি সোজা কথা? সে হচ্ছে ব্যবসার রহস্য। তবে "বাঘা-"বাঘা" ব্যবসায়ীদের অন্যতম ছিলেন খিদিরপুরের বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রভাতী টেক্‌স্টাইল মিলের কর্ণধার ক্ষিতীশ বিশ্বাসকে দেখা গেল। মার্কিণ-ফেরৎ বন্ধুবর্গের অন্তর্গত ক্ষিতীশ সন্দেহ নাই। বয়সে অবশ্য ক্ষিতীশ সুরেনের ঢের পরবর্তী। বছর সাত-আটেক দেশে ফিরেছে।

লেখক—মার্কিণ-ফেরৎ বন্ধুবর্গের ভেতর আর কে-কে ছিলেন?

সরকার—একজন হচ্ছেন দাঁতের ডাক্তার রফিদিন আহম্মদ। রফিও বয়সে সুরেনের অনেক ছোট। সুরেনের সমসাময়িক মার্কিণ-ফেরৎ বন্ধু হচ্ছেন ক্যালকাটা কেমিক্যাল কারখানার কর্মকর্তা খগেন দাশগুপ্ত আর বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিচালক যতীশ দাশ। এঁরা দুজনেই আবার সুরেনের মতন ক্যালিফর্ণিয়ায় তারক দাশের সমসাময়িক। তারক বছর চল্লিশ ধ'রে প্রবাসী,—বর্তমানে নিউইয়র্কে। চার জনেরই বয়স তেষট্টি-চৌষট্টি।

লেখক—দেখ্‌ছি সুরেন বসুর সমসাময়িক বাঙালীদের ভেতর নানা পেশার লোক আছেন?

সরকার—নিশ্চয়। মনে রাখ্‌তে হবে যে, সুরেন ১৯০৫ সনের বঙ্গ-বিপ্লবের যুগের ছোক্‌রা। তখন বোধ হয় বয়স বছর তেইশেক। সেকালের যারা সমান-বয়েসী বন্ধু তাদের কেহ-কেহ যুগপ্রবর্তক কর্মবীর হ'তে পেরেছ। কেহ লেগেছে শিল্প-বাণিজ্যে, কেহ আর-কিছুতে।

লেখক—আপনার সঙ্গে সুরেন বসুর আলাপ হ'লো কোথায়? স্বদেশী যুগে চিন্‌তেন?

সরকার—১৯২৫ সনের শেষের দিকে দেশে ফিরবার পর। তখন সুরেন কলকাতার বেপারী। স্বদেশী যুগে আলাপ ছিল না।

লেখক—বয়সে কে বড়?

সরকার—সুরেন বোধহয় আমার চেয়ে বছর পাঁচ-ছয়েক বড় হ'বে।

লেখক—তারক দাশকেও সুরেন বসুর দলে ফেল্‌লেন কেন?

সরকার—প্রথম কথা,—ক্যালিফর্ণিয়ায় ছিলেন ছাত্রভাবে এক সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ, দুজনেই ঘটনাচক্রে কর্মবীর বাঙালী দাঁড়িয়ে গেছেন।

লেখক—একথা কেন বল্‌ছেন?

সরকার—তারক বিংশ শতাব্দীর "বৃহত্তর ভারতের" অন্যতম মিস্ত্রী, বাস্তুশিল্পী, গঠন-কর্তা,। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তারক অন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিষয়ক বিদ্যায় ওয়াকিবহাল। "বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার"-বিশ্লেষণে সে পাকা লোক। আর কেজো হিসাবে তারক জবরদস্ত লড়ুয়া ও বাপকা-বেটা। তারক দুনিয়ায় বাঙালীকে ও ভারতবাসীকে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে বেশকিছু সাহায্য ক'রেছে। তারকের মতন আরও অনেককে একাজে মিস্ত্রী ও ঘরামি রূপে বাহাল দেখা যায়।

লেখক—বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর ভারতকে তো আপনি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য বলেন?

সরকার—হাঁ। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের গঠন-কর্তা হচ্ছে বহুসংখ্যক ভারত-সন্তান,—বাঙালী ও অবাঙালী, হিন্দু ও মুসলমান। বিবেকানন্দ এই বৃহত্তর ভারতের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৩ সনে এর সূত্রপাত। ১৯০৫-এর যুগে বৃহত্তর ভারত বেড়ে যেতে সুরু ক'রেছে। তারক বৃহত্তর ভারতকে বাড়্‌তির পথে ঠেলে তুল্‌বার কাজে মোতায়েন র'য়েছে,—বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ধ'রে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

সমাজ-চিন্তায় বাঙালী মুসলমান

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—বাঙালী মুসলমানদের সমাজ-চিন্তা সম্বন্ধে আপনি কোনো বইয়ে কিছু লিখছেন?

সরকার—ইংরেজি "ক্রিয়েটিভ ইন্ডিয়া" (স্রষ্টা ভারত, লাহোর ১৯৩৭) বইটা দেখ্‌তে পারো। তাছাড়া আছে বাংলায় "সমাজ বিজ্ঞান" (১৯৩৯)। তার ভেতরও পাবে বাঙালী মুসলমান লেখকদের সমাজ-চিন্তা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর-আলোচনা।

লেখক—কোন্‌-কোন্‌ লেখকের কথা উল্লেখ ক'রেছেন?

সরকার—অত কি আর মুখস্থ আছে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রতিনিধি ভাবে নিয়েছি তিন-চার জনকে। কবি কায়কোবাদ, মোজম্মেল হক, রিয়াজুদ্দিন আর মোশারফ হোসেন এই ক'-জনের নাম করা আমার দস্তুর। তাছাড়া তাশিমুদ্দিন ও আবদুল করিম সম্বন্ধে স্বদেশী যুগেও আমি সজাগ ছিলাম। তখনকার দিনে তাশিমুদ্দিন-সম্পাদিত "ইস্‌লাম" আর এম্‌দাদ আলির "নবনুর" পত্রিকা মাঝে-মাঝে ঘেঁটেছি মনে পড়ছে। করিমকে "পণ্ডিত" ব'লে জান্‌তাম।

লেখক—বিংশ শতাব্দীর কোন-কোন্ মুসলমানকে সমাজ-চিন্তার প্রতিনিধি সম্‌ঝেছেন?

সরকার—বোধহয় ইম্‌দাদুল হকের নাম ক'রেছি। এঁর লেখালেখিতে মুসলমান সমাজের ওপর কড়া সমালোচনা পাওয়া যায়। যুক্তিপন্থী লোক,—মুসলমান সমাজের অন্যতম সংস্কারক। ইস্‌লামবাদি আর আক্রাম খাঁকেও যুক্তিনিষ্ঠ ইস্‌লাম-সমালোচক রূপে উল্লেখ করা আমার দস্তুর। কী লিখেছি মনে পড়ছে না। এঁদের রচনা বঙ্গ-বিপ্লবের যুগের জিনিষ (১৯০৫-১৪)।

লেখক—১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের পরবর্তী যুগে কাকে-কাকে মুস্‌লিম চিন্তার খুঁটা ঠাওরাচ্ছেন?

সরকার—নজরুল, জসিমুদ্দিন, কাদির ইত্যাদি কবিরা উল্লেখযোগ্য,—কবি হিসাবে। সাইদুদ্দিনের "রাজমুকুট" (১৯২৫) হচ্ছে প্রবন্ধের বই। মুস্‌লিম দাবীর ষোল আনা আদায় করা হচ্ছে এই প্রাবন্ধিকের লক্ষ্য। কাজেমুদ্দিন "শান্তিসোপান" (১৯৩০) লিখেছেন ইস্‌লামের আসল দর্শন প্রচার কর্‌বার জন্য। ভাল লেখা। বেশ-বড় বই। আবদুল ওদুদ আর ওআজেদ আলি,—দুজনেই যুক্তিপন্থী বঙ্গ-সেবক। হিন্দু ও মুসলমান, দুই সমাজেরই স্বপক্ষে-বিপক্ষে সমানভাবে সমালোচনা চালাবার ক্ষমতা এঁদের আছে। বছর কয়েক ধ'রে হুমায়ুন কবিরের কলমও দেশ-চিন্তায় লেগে র'য়েছে। এই তিন জনকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-পন্থী লেখকদের দলে ফেল্‌তে হবে। এঁদের কার সম্বন্ধে কতটুকু লিখেছি মনে পড়ছে না। লম্বা-চৌড়া ঢাউস্-কিছু লিখিনি নিশ্চয়। কমিউনিস্ট মুজঃফর আহম্মদ সর্বদাই উল্লেখযোগ্য। অর্থশাস্ত্রী অধ্যাপক আব্দুস সাদেকও যুবক বাঙ্‌লার অন্যতম চিন্তাশীল লেখক। আব্দুসের একটা ইংরেজি বইয়ের (১৯৪১) ভূমিকা লিখেছে এই অধম! বইটা ভারতের শাসন-প্রণালীর মেরামত সম্বন্ধে লিখিত ("ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশন্যাল ট্যাংল্")।

লেখক—আপনি নিজে মুসলমানদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতটা লিখেছেন?

সরকার—আমার প্রত্যেক কলমের আগায়ই হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বেরোয়। এমন কোনো বই নাই যাতে হিন্দুর সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমানের কথা থাকে না। আসল কথা অবশ্য এই যে,—আমার চিন্তায় সব-কিছুই মানুষ-সংক্রান্ত। অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষ নিয়ে কারবার করা আমার পেশা। তাতে হিন্দু বা মুসলমান নামক জানোআরকে আলাদা-আলাদারূপে দেখ্‌বার দরকার হয় না। মানুষের বাচ্চা সম্বন্ধে যা-কিছু বকি তা হিন্দুর বাচ্চার বেলায়ও খাটে আবার মুসলমান-ইহুদি-খৃষ্টিয়ান আর চীনা-জাপানী-মার্কিণ-জার্মাণ-ইংরেজ ইত্যাদি অন্যান্য নরনারীর বাচ্চার বেলায়ও খাটে। আমার ধন-সমাজ-রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর সংস্কৃতি-দর্শন সার্বজনিক ও সনাতন। মুসলমান সম্বন্ধে কোনো স্বতন্ত্র বই লিখিনি।

লেখক—এক কথায় বল্‌তে পারেন,—বাঙালী মুসলমানদের সমাজ-চিন্তার কোনো

বিশেষত্ব আছে?

সরকার—কায়কোবাদ হ'তে কবির ও সাদেক পর্যন্ত বছর পঞ্চাশেকের বাঙালী মুসলমান-চিন্তার ধারাটা চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। মোটের ওপর মামুলি বঙ্গ-সংস্কৃতির আধা-শতাব্দীর ক্রমবিকাশ দেখ্তে পাচ্ছি মুসলমান সমাজ-চিন্তার ভেতর। তথাকথিত ঐস্লামিক হাতী-ঘোড়া এর ভেতর নাই। যাঁহা হিন্দু-বাঙালী তাঁহা মুসলমান-বাঙালী। ধাপে-ধাপে দুই মিঞাই এগুচ্ছে একদিকে,—যুক্তিনিষ্ঠার দিকে, স্বদেশনিষ্ঠার দিকে। তবে দু-জনেই এগুচ্ছে শামুকের গতিতে।

লেখক—আপনি কি সাহিত্য-খোর?

সরকার—কেন বলো তো?

লেখক—মুসলমান লেখকদের নাম আপনি এতগুলা গড়্-গড়্ ক'রে ব'লে গেলেন,— জলের মতন? একটুও ঠেক্‌লো না। অনেক মুসলমান পণ্ডিতও হয়ত এত তাড়াতাড়ি বল্‌তে পার্‌তো কিনা সন্দেহ। আপনার সঙ্গে মুসলমান সুধীদের লেন-দেন খুব-বেশী বোধ হয়?

সরকার—"খুব-বেশী" লেনদেন এই গরীবের সঙ্গে কোনো মিঞারই নয়। আবার দুনিয়ার যে-কোনো লোকের সঙ্গেই ছোঁআছুঁয়ি যৎ-কিঞ্চিৎ আছে। গরীব মানুষ,—দেখ্‌তেই পাচ্ছো—লেনদেন চালাবো কোথ্‌থেকে? তাতে পয়সা লাগে।

লেখক—যাই হ'ক, মুসলমান লেখকের সম্বন্ধে আপনি স্বদেশী যুগেও খবরাখবর রাখ্‌তেন,—দেখ্‌ছি। এর কোনো বিশেষ কারণ আছে?

সরকার—বিশেষত্ব দেখ্‌ছো কেন? আর বিশেষ কারণ চাইছোই বা কেন? বাঙালীর বাচ্চা আমরা আপনি-আপনিই আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান। জ'ন্মে অবধিই আমাদের ডাইনে মুসলমান, বাঁয়ে হিন্দু,—অথবা ডাইনে হিন্দু বাঁয়ে মুসলমান। কাজেই মুসলমান লেখকদের কাজকর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল থাকা যে-কোনো হিন্দু বাঙালীর পক্ষে ডাল-ভাত বিশেষ।

লেখক—এও আপনার আর একটা বিনয় সরকারী মত। খবর নিয়ে দেখ্‌বেন,—আপনার মতটা কার্যক্ষেত্রে অচল। মুসলমান সাহিত্য-সেবীদের রচনাবলী সম্বন্ধে অনেক মুসলমানই ওয়াকিব্‌হাল নয়। হিন্দুর কথা না-ই তুল্‌লাম।

সরকার—তোমাদের সাংবাদিক মহলে কী দেখ্‌তে পাও?

লেখক—সাংবাদিক মহলের খবর বেশি জানি। সেইজন্যই তো বল্‌ছি যে, মুসলমান সাহিত্যসেবীদের কাজকর্ম বাঙালী লেখক-সমাজে বড়-বেশী সুপরিচিত নয়। আচ্ছা, আপনি ছেলেবেলায় কখনো মুসলমান আবহাওয়ায় এসেছিলেন?

সরকার—কোন্ বাঙালী না এসেছে? এই প্রশ্নটার মানে কী? প্রত্যেক হিন্দুর আটপৌরে জীবনে মুসলমান-যোগ আছেই আছে।

মালদহের খবির

লেখক—শুধু আপনার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শুন্‌তে চাচ্ছি।

সরকার—ছেলেবেলার বড় হিস্যা কেটেছে মালদহে। জন্ম অবশ্য মালদহেই। বাচ্চা

বয়সে ঘরবাড়ি আর পাঠশালা ছিল কল্‌কাতার কালীঘাটে। চেত্‌লায় গোপালনগর মাইনর ইস্কুলের ছাত্র। তার পর মালদার জেলা ইস্কুলের শেষ পাঁচ বছর (১৮৯৬-১৯০০)। মালদার প্রত্যেক ক্লাসেই পেয়েছি মুসলমান বন্ধু। অনেক সময়ে তাদের বাবা-দাদা-মামা-চাচাদের সঙ্গেও ভাব। একসঙ্গে মহানন্দায় সাঁতার কেটেছি, ইস্কুলে গিয়েছি, ফুট্‌বল-ক্রিকেট খেলেছি, যাত্রা শুনেছি, মহরমে-গম্ভীরায় নেচেছি—অথবা লাফালাফি ক'রেছি। বয়স নয়-দশ-এগার-বার-তের। বছর পাঁচেকের ঘনিষ্ঠতা। কম নয়।

("বিনয় সরকারের বৈঠকে", প্রথম ভাগ ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠায় "গম্ভীরার সামাজিক মূল্য" দ্রষ্টব্য)

লেখক—সেই সময়কার কোনো মুসলমান ছোকরার নাম মনে আছে?

সরকার—খবিরকে জানো তো?

লেখক—কোন্ খবির?

সরকার—দিল্লীর সেন্ট্র্যাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্ব্লিতে মেম্বার ছিল। ব্যারিস্টার। খুব মোটা। বক্তৃতা কর্‌তে উঠ্‌লেই লোকেরা হাঁস্‌তো। খবিরুদ্দিন আহম্মদ। সে হচ্ছে আমার আতি-ঘরোআ বন্ধু,—নয়-দশ বছর বয়স থেকে। মারা গেছে কয়েক বছর হ'লো। শেষদিন পর্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল।

লেখক—ছেলেবেলার কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—খবিরের বাড়ীতে তাশের আড্ডা বস্‌তো। রাম-নবমীতে জিলিপি খাবার ব্যবস্থা হ'তো। আমের সময় আম তো ছিলই। তা ছাড়া মুড়ি ওখ্‌রা ইত্যাদি বাদ যেতো না। আমার মতন দু'একজন কচিৎ-কখনো এটা-সেটা-মুর্গীটার সদ্‌ব্যবহারও কর্‌তো। ফুটবল-ক্রিকেটের মাঠে পেছনদিক্ থেকে খবির এসে দাঁড়ালে আমরা পরস্পরে বলাবলি কর্‌তাম ঃ—"হাঁরে, ভূমিকম্প হচ্ছে না কি রে? হঠাৎ যেন মাটিটা কেঁঠে উঠ্‌লো?" তারপর পেছনদিকে তাকিয়ে বল্‌তাম,—"ওঃ খবির? কখন এসেছিল? দেখ্‌তে পাইনি তো?" এই ছিল মোটা খবির সম্বন্ধে তার ওজন-বিষয়ক হাসি-ঠাট্টা। একালের খনি-শাস্ত্রী কিরণ সেনগুপ্ত আর জাপান-ফের্তা এঞ্জিনিয়ার প্রবোধ বসু ও রেশম-শিল্পী মন্মথ দে খবিরের সঙ্গে আমাদের সহ-খেলোআড় ছিল।

লেখক—একালের খবির সম্বন্ধে কোনো-কথা মনে আছে?

সরকার—১৯২৬ সনে হাইকোর্টের সাম্‌নের বাড়ীতে ছিল (ওল্ড পোস্ট আফিস স্ট্রীটে)। সবে আমি বিদেশ থেকে ফিরেছি। তার ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। দেখেই বল্‌লে:—"হাঁরে বিনয়, তুই বড্ড ব্যাঙ্ক-ব্যাঙ্ক ব'কে বেড়াচ্ছিস। লোকে কী ব'ল্‌বে জানিস্? বিনয়ের এতদিনে টাকার দরকার হ'য়েছে। তাই দেশের লোককে লুট্‌বার মতলবে ব্যাঙ্ক খাড়া কর্‌বার শল্লা দিচ্ছে। জানিস্ তো সাধারণ লোকেরা অধিকাংশ জননায়ককেই জোচ্চোর ভাবে। খবরদাব, ব'লে দিচ্ছি ওসব পাল্লায় পড়িস্ না।" খবিরের চা-যোগে হাজির ছিল বাণেশ্বর দাশ।

লেখক—এ ত মজার কথা। আপনাকে এতটা সাবধান ক'রে দিয়েছিল? খবির সম্বন্ধে আর কোনো কথা বল্‌তে পারেন?

সরকার—বোধহয় ১৯৩৬ সনে একদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় টেলিফোন কর্‌লে। বল্‌লে রোজার উপোস আছে দিনে। তাই রাত থাক্‌তে খেয়ে নিচ্ছি। মুর্গীটা সাবাড় ক'রেই তোর কাছে আস্‌ছি। একটা জরুরি কথা আছে। সাতটার ভেতর এসে হাজির।

একটা লম্বা ছাপা কাগজ দেখালে। তাতে অনেকগুলা মৌলবী সাহেবদের নাম দেখ্‌লাম। বল্‌লে,—এতে তোর নাম দিতে হবে। প্রথম সইটা তোর হওয়া চাই। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—কেন? বল্‌লে,—অ্যাসেম্বলির বাছাইয়ে দাঁড়াচ্ছি। এইটা আমার ইস্তাহার। আমি বল্‌লাম,—"ভাই, এতো রাষ্ট্রিক কারবার! রাজনৈতিক মহোচ্ছবে আমার যোগাযোগ বিলকুল নাই জানিস্‌। আমার পক্ষে নাম দেওয়া অসম্ভব।"

লেখক—শেষ পর্যন্ত আপনি নাম দিলেন?

সরকার—না। খবির বল্‌লে—"দিবি না? দিবি না? দিবি না? আচ্ছা। তোর মতন আহাম্মুক আর দেখিনি।" আমার স্ত্রীও বল্‌লে—"নাম-সইটা দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যেতো না!"

লেখব—খবিরের সঙ্গে পরেও ভাব ছিল?

সরকার—যাবার সময় ব'লে গেল,—"আচ্ছা সই দিলি না। কুছ পরোআ নাই। মালদা জেলার ভেতর যখন ভোটসংগ্রহের প্রচারে বেরুবো তখন আমার সঙ্গে তোর থাকা চাই। অনেক দিন মালদার পাড়া-গাঁ দেখিস্‌ নি। দেখিয়ে নিয়ে আস্‌বো।"

আমার সঙ্গে কোনো লোকের বনিবনাও আজ পর্যন্ত নষ্ট হয় নি। লোকেরা জানে আমি গো-বেচারা মানুষ। কোনো গণ্ডগোলে যাই না। তাই সবাই মাফ্‌ করে। কেউ কোনো-কিছুতে চটে না।

লেখক—একটা কথা জানা আবশ্যক। খবিরুদ্দিন আপনাকে ব্যাঙ্ক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌তে বারণ করেছিলেন। আপনি তাঁর পরামর্শ শুনেছেন কি?

সরকার—খবির আমার ব্যাঙ্ক-প্রচারের মতলবটা ধর্‌তে পারে নি। ভেবেছিল যে, আমি বুঝি নিজে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা, ডিরেক্টর, কর্মকর্তা ইত্যাদি যা-হ'ক কিছু হ'তে চাই। আমি বোধ হয় পয়সা কামাবার ফিকিরে আছি। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে মেজাজ আমার কোনো দিন খেলে নি। আমার কাজ ছিল ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্বাণিজ্য-কারখানা ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে দেশের লোককে তাতানো। এই সকল বিষয়ে মোল্লাগিরি করা ছিল,—আর র'য়েছেও,—আমার একমাত্র ধান্ধা। বেপারী হওয়া, ব্যাঙ্ক কায়েম করা, কারখানার জন্য পুঁজিপাটা তুলে বেড়ানো কাজ কস্মিন্‌কালেও আমার মাথায় ঢুকে নি। কাজেই খবিরের খবরদারিটা আমার পক্ষে কাজে লাগে নি। তবে বন্ধু হিসাবে খবির চরম শল্লাই দিয়েছিল বল্‌তে হবে। কতটা আত্মীয় হ'লে এমন ভাবে সাবধান করা সম্ভব?

লেখক—খবিরের সঙ্গে কোনো সার্বজনিক কাজে আপনার নাম-লেখানো যোগাযোগ ছিল?

সরকার—"কলিকাতায় মালদহ-সমিতি" কায়েম ক'রেছিলাম ১৯৩৩ সনে। প্রথম সভাটা খবিরের বাড়িতে ডাকা হয়। বাগেশ্বর, অতুল কুমার, ডাক্তার মোহিনী আগরওয়ালা ইত্যাদি মালদহীরা অনেকে হাজির ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সনে খবিরকে এই সমিতির প্রেসিডেন্ট করা হয়,—পর-পর দুই বছর। দু-বছরের বেশী কেউ প্রেসিডেন্ট থাকে না। ডক্টর খলিল আহম্মদকেও দু-বছর প্রেসিডেন্ট করা হ'য়েছিল।

ব্রতচারী দবির ও দাঁতের ডাক্তার রফি

লেখক—কল্‌কাতার কলেজে পড়্‌বার সময় আপনার মুসলমান বন্ধু ছিল?

সরকার—তাও অবার ব'ল্‌তে হবে? তখনকার দিনে ক্যাল্‌কাটা মাদ্রাসার ছেলেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসতো। সেই সূত্রে বোধহয় সব-কটা মুসলমানের সঙ্গেই আমার দহরম-মহরম ঘ'টেছিল। ১৯০১-০৬,—বছর পাঁচ-ছয়েক।

লেখক—দু-এক জনের নাম মনে আছে? তাদের কারু সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে?

সরকার—মেজর দবিরুদ্দিন আহম্মদের নাম শুনেছো বোধ হয়। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিল। আজকাল গুরুসদয়ের ব্রতচারী সমিতির প্রেসিডেন্ট। দবিরের সঙ্গে ভাব প্রেসিডেন্সিতে। ১৯০১ হ'তে।

লেখক—আজকালও দেখা-শুনা হয়? চেনে তো?

সরকার—বাড়ীতে-বাড়ীতে যাওয়া-আসা আছে। তা ছাড়া সার্বজনিক মহোচ্ছবেও দেখা-শুনা হয়। দেখেছি,—গরীবকে এখনো বাজারে দাঁড়িয়েও বন্ধু বল্‌তে লজ্জা করে না। আমার বরাত ভাল। অনেক বড় লোকই এখানে আমাকে চেনে।

লেখক—লেখা-পড়ার পরবর্তী যুগে আপনার মুসলমান-যোগাযোগ কেমন?

সরকার—বুঝ্‌তেই পার্‌ছো,—প্রথমেই গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব (১৯০৫-১৪)। সেই যুগ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-যুগ। বিরোধও ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই যুগটায় হিন্দু-মুসলমানের সমবেত আন্দোলনই প্রধান কথা। কাজেই গণ্ড-গণ্ডা মুসলমানের সঙ্গে লেন-দেন। পরে বছর বার-চোদ্দ দুনিয়া-পর্যটন। বিদেশের পথে-বিপথে বহুসংখ্যক মুসলমানের সঙ্গে দহরম-মহরম। ভারতীয় মুসলমান তো বটেই,—ঈজিপ্ট, ইরাণ, চীন, সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি নানা দেশের মুসলমানদের সঙ্গেও যোগাযোগ ঘ'টেছে।

লেখক—কল্‌কাতার কারু নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—রফিদিন আহম্মদের নাম শুনেছো নিশ্চয়? দাঁতের বেপারী। ডাক্তারি করে দাঁতের। দাঁতের কলেজ কায়েম ক'রেছে। দাঁতের পত্রিকা চালায়। দাঁতের বই লিখেছে। তা ছাড়া দাঁতের হাসপাতালও রেখেছে কলেজের সঙ্গে গেঁথে। আমি রফিকে কর্মবীর সম্‌ঝে থাকি। এই রফির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা মার্কিণ মুল্লুকের বস্টন শহরে (১৯১৭)। তখন সে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়ে বস্টনের এক দাঁতের হাঁসপাতালে কাজ করে। রফির সঙ্গে ভাব চ'ল্‌ছে তখন হ'তে আজ পর্যন্ত সমানভাবে।

লেখক—দেখ্‌ছি একজন ব্যারিস্টার, একজন উঁচু দরের সরকারী চাক্‌রে (ডাক্তার) আর একজন স্বাধীন ও করিৎকর্মা ডাক্তার। তিন ধরণের তিন জন মুসলমানের নাম কর্‌লেন। কিন্তু সাহিত্যসেবী তো এঁদের বোধ হয় কেউ নয়। তবে মুসলমান-রচনাবলীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ এই আবহাওয়ায় পুষ্ট হওয়া খুবই সম্ভব। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে মুসলমান-বন্ধুত্ব অন্যতম বড় তথ্য মনে হচ্ছে। ঠিক এই রকম তথ্য অনেকের অভিজ্ঞতায়ই হয়ত পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, আপনি তো বছর চোদ্দ নানা বিদেশে ঘুরেছেন। সেই সকল দেশে এই ধরণের মেলমেশ ও বন্ধুত্ব কেমন ঘ'টেছে?

সরকার—চরমভাবে। ইয়োরামেরিকায় আর মিশর-চীন-জাপানের কোথাও বিদেশে র'য়েছি মনে হয় নি। সর্বত্র পেয়েছি যেন বাঙালীর বাচ্চাকে।

লেখক—তবুও কোন্ দেশে মাখামাখি বেশী?

সরকার—মার্কিণ নর-নারীকে সর্বদাই একদম নিজের ঘরোআ লোক ভেবেছি। জার্মাণ মুল্লুকেও পেয়েছি ঠিক যেন নিজের ভাই-বোন। অবশ্য বছর চারেক কেটেছিল আর বছর তিনেক জার্মাণিতে,—অন্ততঃ জার্মাণ আবহাওয়ায়।

ওদুদ-প্রণীত "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ"

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

মন্মথ—এবার বড় দিনের ছুটিতে আপনার বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষদে কাজি আবদুল ওদুদ "সমাজচিন্তায় গ্যেটে" সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে গেছেন (২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৪)। তাঁর সম্বন্ধে আপনি মাঝে-মাঝে নানা কথা ব'লেছেন। তাঁর "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ" (১৯৩৬) বইটা প'ড়েছেন?

সরকার—আগে জানা ছিল না। সম্প্রতি বইটা ওদুদের কাছ থেকে পেয়েছি। প'ড়েও ফেলেছি।

লেখক—বইটার মোদ্দা কথাগুলা কী?

সরকার—এই বই প'ড়ে লোকেরা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ হঠাতে পার্‌বে কি না সন্দেহ। কিন্তু ওদুদের চিন্তা-প্রণালীকে তারিফ কর্‌তেই হবে।

লেখক—দু-একটা সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিন না।

সরকার—ওদুদের অন্যতম বাণী শোনো—"এই যে সুপরিচিত সিদ্ধান্ত যে হিন্দু হিন্দুত্বে নিষ্ঠাবান হ'লে এবং মুসলমান মুসলমানত্বে নিষ্ঠাবান্ হ'লে তাদের মিলন সম্ভবপর হবে এর উপরে যাঁদের নির্ভর তাঁরা সাধু-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়েও অন্ধকারে পা বাড়ান।" স্বাধীন-চিন্তার নমুনা দেখ্‌লে? খুব পাকা কথা।

লেখক—তা হ'লে ওদুদ কী চান?

সরকার—"এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তাদের যাচাই করা উচিত—হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব বল্‌তে তাঁরা কী বোঝেন। * * * হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতীতে ও বর্তমানে যে-রূপ পরিগ্রহ করেছিল ও করেছে তাই-ই সে-সবের প্রকৃত রূপ এ কথা অর্থহীন। তার পরিবর্তে এই সব ধর্ম ভবিষ্যতে কি ভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম-শক্তির সূতিকাগার হবে এই-ই হওয়া চাই হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিশেষ সাধনার বিষয়।" ওদুদ সকল প্রকার শাস্ত্র-নিষ্ঠার যম: তাঁর প্রাণের কথা হচ্ছে সৃষ্টিকার্য, সৃষ্টি-ধর্ম। "সৃষ্টির ব্যাপারে স্বদেশ-বিদেশ সবই উপকরণের ক্ষেত্র,—এ কথাও পুরোপুরি স্বীকার কর্‌তে হবে। স্রষ্টা স্বদেশ-দেবতার অর্চনা করেন বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্ব-সৌন্দর্যর আলোকে।"

লেখক—বাঃ, বেশ কথা তো। আরও দু-একটা বাণী শুনিয়ে দিন না?

সরকার—ওদুদের একটা বয়েৎ শোনো—"স্বামী বিবেকানন্দ ব'লেছিলেন—ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক: তার চাইতে এই কথাই বলা ভাল, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ।"

আরও শোনো—"এই খানেই বড় প্রয়োজন সৃষ্টি-ধর্মী নব-নেতাদের। অতীতের প্রতি তাঁরা হবেন শ্রদ্ধান্বিত, তার পূজারী কখনো নয়—তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সেই জন্য সু-প্রাচীন 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'-এর মিলন তাঁদের কাম্য হবে না, কেন না তা অসত্য ও অসম্ভব, তাঁদের কাম্য হবে একটি নবজাতি গঠন।" কথাগুলা জোরাল। এমন শাঁশাল বাণী খুব কম পাওয়া যায়। লোকটা "ফল-বাদী" (প্র্যাগ্ম্যাটিস্ট্)। একটা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টান্তও দেওয়া আছে।

লেখক—কী সেই দৃষ্টান্ত?

সরকার—ওদুদের বয়েৎ হচ্ছে—"সৃষ্টিধর্মী কর্মীদের দৃষ্টি আকৃর্ষণ হওয়া উচিত জাপানের দিকে।" বইটা বাঙালী সমাজ-দর্শনের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন।। বইয়ের ভেতর আর্থিক ও রাষ্ট্রিক তথ্যের বিশ্লেষণ নাই। এই জন্য পাঠকদের পেট ভর্বে না। প্রকৃত কার্য-ক্ষেত্রে সমস্যার মীমাংসায় সাহায্য পাওয়া কঠিন। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ ভবিষ্যপন্থী মুড়োর সরস ভাবধারা যারপর নাই মূল্যবান।

("বিনয় সরকারে বৈঠকে," প্রথম ভাগ, "আব্দুল ওদুদের যুক্তি-নিষ্ঠা", পৃঃ ২৮০-২৮১ দ্রষ্টব্য)

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

মঙ্গলবারের মজলিশ

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

হেমেন—আপনাদের বাড়ীতে একজন ইংরেজকে প্রায়ই যাতায়াত কর্তে দেখ্তাম। পোষাক দেখে মনে হ'তো ভারতীয় ইংরেজ নয়,—বিলাতী পল্টনের লোক।

সরকার—হাঁ। বিলাতী রয়্যাল এআর ফোর্সের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ফি-মঙ্গলবার আমাদের মজ্লিশে হাজির থাক্তো। তখন অবশ্য অন্যান্য দেশী-বিদেশী সব রকম লোকেরই বৈঠক ব'স্তো।

লেখক—বলুন তো এই ইংরেজ মশায় আপনার আড্ডায় এসে জুট্লেন কী ক'রে?

সরকার—১৯৪২ সনের বড়দিনের সময় আমাদের বাড়ীতে প্রথম দেখা। ২৬শে ডিসেম্বর সকালবেলা যোগেশ ভট্টাচার্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল।

লেখক—যোগেশ ভট্টাচার্য কে?

সরকার—সিটি কলেজের ইংরেজ-অধ্যাপক। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশের ছেলে। মহাভারতের বাংলা তর্জমা বেরুচ্ছে পণ্ডিত-মহাশয়ের হাতে কয়েক বছর ধ'রে। তা ছাড়া সংস্কৃত নাটক ইত্যাদি বই লিখেও তিনি প্রসিদ্ধ।

লেখক—আজকাল সেই ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখ্ছি না যেন মনে হচ্ছে?

সরকার—এই বছর ১লা ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের জাহাজে ঘরমুখো ইংরেজ হবার সুযোগ পেয়েছে। ভারতে থাকার মেয়াদ ছিল তিন বছর। তার ভেতর বছর আড়াই কেটেছে কল্কাতায় আর মাস ছয়েক উড়িষ্যায়।

লেখক—তা হ'লে মাস পঁচিশেক আপনাদের বাড়ীতে এসেছে। ভদ্রলোকের নাম কী?

সরকার—হারল্ড এইন্‌সোআর্থ। বাড়ী ম্যাঞ্চেস্টারের নিকটবর্তী বেরি শহরে।

লেখক—মাস পঁচিশেকের ভেতর অন্ততঃ এক-শ' বার এইন্‌সোআর্থের সঙ্গে আপনাদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'য়েছে বুঝা যাচ্ছে। কী রকমের লোক মনে হ'লো? ইংরেজ-চরিত্র কেমন হয় বুঝ্‌তে চাচ্ছি।

সরকার—এক-শ' বারেরও বেশী। কেন-না কোনো-কোনো সপ্তাহে বার দু'য়েকও বৈঠক ব'সেছে। শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়। ইংরেজের সঙ্গে আনা-গোনা আমার এই তো প্রথম নয়। বিলাতে কেটেছে আমার প্রথম বারে (১৯১৪) মাস আষ্টেক (এপ্রিল-নবেম্বর)। তার বৃত্তান্ত আছে "বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "ইংরাজের জন্ম-ভূমি" বইয়ে। শ' ছয়েক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সেই বই। দ্বিতীয় বার বিলাতে ১৯২৯ সনের কয়েক সপ্তাহ। কাজেই ইংরেজ নরনারীর ঘরের কথা আমার জানা-শুনা আছে মন্দ নয়।

লেখক—তবে কাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো?

সরকার—এইন্‌সোআর্থের সঙ্গে আমাদের এই গোআলে অন্যান্য অনেকের আলাপ হ'য়েছে। কেউ-কেউ পাঁচ-সাত-দশবারও দেখেছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে ইংরেজ-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হ'তে পারে।

লেখক—আপনার মজ্‌লিশে যাদের সঙ্গে এইন্‌সোআর্থের মেলা-মেশা ঘ'টেছে এমন কয়েক জনের নাম করুন না?

সরকার—নানা বয়সের আর নানা পেশার লোক। গুন্‌তিতে অনেক সাজিয়ে-গুছিয়ে শ্রেণী-মাফিক ব'লে যাওয়া কঠিন। "আথালি-পাথালি" কতকগুলো নাম কর্‌তে পারি। "বিক্রমপুইরা" শব্দ কায়েম করা গেল।

লেখক—আচ্ছা আথালি-পাথালিই বলুন। যেমন-যেমন মনে আসে। কোনো পেশা মাফিক বা বয়স মাফিক বল্‌তে হবে না।

সরকার—ইন্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানীর বীরেন ও সতীন দাশগুপ্ত, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাশ, ডাক্তার অমূল্য উকিল ও রফিদিন আহম্মদ, মারোআড়ি বেপারী ও ফ্যাক্টরি-মালিক বাবুলাল রাজগড়িয়া, পাঞ্জাবী বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী প্রতাপ সিং ও তার ভগ্নী রাজকুমারী সিং, কৃষি-বিষয়ক অর্থশাস্ত্রী জার্মাণি-ফেরৎ ডক্টর সুধীর সেন, ইতালি-ফেরৎ ডক্টর মণি মৌলিক, কাপড়-ব্যবসায়ী তারক দত্ত, চাউল, কাঠ ও তূলার কারবারী ঋতেন রায়চৌধুরী (চট্টগ্রাম), রেল-চাক্‌রে সুবোধ ঘোষাল, কেম্ব্রিজ-ফেরৎ নবেন্দু দত্ত-মজুমদার, ব্যারিস্টার সত্যেন চ্যাটার্জি, মালদহের উমাপদ ঝা, অধ্যাপক সুভাষ ধর, "প্রভাতী"-সম্পাদক প্রমথ পাল, রেঙ্গুনের উকিল ভূপেন দাশ, মুক্তাগাছার নবযুগ আচার্য চৌধুরী, কর্পোরেশনের মোটর বিভাগের এঞ্জিনিয়ার প্রমোদ চ্যাটার্জি, মার্কিণ-ফেরৎ নগেন চৌধুরী, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচারক অমিয় দত্ত, কেম্ব্রিজ-ফেরৎ তুর্ক-বিশেষজ্ঞ সৌর চৌধুরী, "টাকার কথা"-প্রণেতা নরেন রায়, দাঁতের ডাক্তার সত্যেন নিয়োগী, সজনী দাস, তারাশঙ্কর, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকালের মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর মেয়ে ব্যারিস্টার-পত্নী রেণুকা লাহিড়ী, সুব্রত রায়চৌধুরী (বর্তমানে কেম্ব্রিজের ছাত্র), কবি আবুল হোসেন, মুনসেফ শিবচন্দ্র দত্ত, নৃত্যশিল্পী বিমলেন্দু বসু, লাহোরের পাঞ্জাবী উকিল রমদিত্তা মাল, পার্শী পরিবার দিবেচা, মারাঠা মহিলা বিজুব, ক্যালকাটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের কেম্ব্রিজ-ফেরৎ রাসায়নিক গৌতম ব্যানার্জি, মারোআড়ি বেপারী মোহনলাল লাঠ ও

তাঁর স্ত্রী জ্ঞানবতী লাঠ, প্রত্নতাত্ত্বিক হারীত কৃষ্ণ দেব, জার্মানি-ফেরৎ নৃতত্ত্বশাস্ত্রী কমিউনিস্ট ডক্টর ভূপেন দত্ত, রফির মেয়ে চিত্রশিল্পী আমিনা আহম্মদ—ইত্যাদি অনেকে। দেখা যাচ্ছে,—গুন্‌তিতে মেয়েরা কম।

লেখক—দেখ্‌ছি রকমারি লোক এই আড্ডায় টুঁ মেরেছে। বুঝতেই পার্‌ছি কারু-কারু বিলাতী ও অন্যান্য বিদেশী অভিজ্ঞতা ছিল। অন্যান্যের পক্ষে বোধ হয় এইন্‌সোআর্থের মারফৎই প্রথম বিলাতী মোলাকাৎ?

সরকার—ঠিক কথা।

লেখক—এরা আস্‌তো কী জন্যে?

সরকার—আড্ডা মারা আর এইন্‌সোআর্থের সঙ্গে দেখা করা। তা ছাড়া আর কী জন্যে?

লেখক—আপনি কি এঁদেরকে স্বতন্ত্রভাবে ডাক্‌তেন?

সরকার—না। ক্বচিৎ-কখনো দু'একজনকে হয়তো ডেকে থাক্‌বো। এইন্‌সোআর্থ প্রথমদিনের কথাতেই বল্‌লে ঃ—"আমি সপ্তাহে একদিন ক'রে আস্‌তে চাই।" আমরাও বল্‌লাম ঃ—"বহুৎ আচ্ছা।" মঙ্গলবারের মজলিশ ঠিক করা গেল। ফরাসী ভাষায় একে বলে "জুর্‌ ফিক্‌স্‌" (বাঁধা দিন)। সেদিন আমরা ঘরে থাক্‌বোই।

লেখক—অন্যেরা মঙ্গলবারের মজলিশ সম্বন্ধে খবর পেলে কী ক'রে?

সরকার—এই অধমের দুয়ারে যার যখন মর্জি দয়া ক'রে মাঝে-মাঝে টুঁ মেরে যায়। কেউ সোমবার, কেউ মঙ্গলবার ইত্যাদি রোজই বাইরের আড্ডাধারী কেউ না কেউ থাকে। যারা মঙ্গলবার এসে উপস্থিত তারা দেখ্‌লে,—মজা তো। একজন ইংরেজবাবু নিয়মিত বৈঠকী লোক! কাজেই ফুরসুৎ-মাফিক কেউ-কেউ মঙ্গলবারটা বেছে নিলে। এই হচ্ছে মঙ্গলবারী মজ্‌লিশের তত্ত্বকথা।

লেখক—বাঙালী আর অ-বাঙালী ভারতীয় ছাড়াও অন্যান্য জাতের লোক আপনার বৈঠকে অনেকবার দেখেছি। তাদের নাম কর্‌লেন না তো?

সরকার—সে হচ্ছে প্রধানতঃ মার্কিণ ও চীনা। তাদের তো বাঁধা দিন-ক্ষণ নাই্‌। যার যেমন সুবিধা। মঙ্গলবারের মক্কেল তাদের ভেতর কয়েকজন মাত্র। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর কাছে আসে সুইস, ফরাসী, ইংরেজ, জার্মাণ ইত্যাদি ইয়োরোপীয মহিলা। আমিও থাকি।

লেখক—"জার্মাণ" পেলেন কোথায় লড়াইয়ের সময়?

সরকার—এরা ইংরেজ-বন্ধু জার্মাণ ইহুদি। আমার স্ত্রী খাঁটি রোমাণ ক্যাথলিক কুলীন। কিন্তু ইহুদিদের সঙ্গে ভাব আছে আমাদের চিরকালই। আমরা "বর্ণাশ্রম" মানি না!

লেখক—মঙ্গলবারের মজলিশে কত লোক হ'তো?

সরকার—দু'একদিন আমরা তিন মূর্তি আর এইন্‌সোআর্থ। কিন্তু সাধারণতঃ সবশুদ্ধু জন আষ্টেক। বার-চোদ্দ জনও অনেক সময় জ'মেছে।

লেখক—কতক্ষণ মজলিশ চল্‌তো?

সরকার—এইন্‌সোআর্থ ছটার সময় রাতের খাওয়া সেরেই এসে হাজির হ'তো। সওয়া-দশ, সাড়ে-দশ পর্যন্ত গল্পাগল্পি চল্‌তো। গড়ে ঘণ্টা তিনেকের কম নয়।

লেখক—এতক্ষণ পর্যন্ত গল্প-গুজব চালানো আপনি পছন্দ করেন?

সরকার—নিশ্চয়। এই হ'লো আমার লেখাপড়ার ল্যাবরেটরি। লোকজনের হাসি-

ঠাট্টা, ইয়ার্কি, রসিকতা, তর্কাতর্কি শোনা আর তাদের সঙ্গে কথা কওয়া হচ্ছে ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের আসল গবেষণালয়। মানুষ-বিষয়ক বিদ্যাগুলির হরেক-রকম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় আড্ডা-বৈঠক-মজলিশের আবহাওয়ায়। এই সব হচ্ছে যথার্থ পরীক্ষা-কেন্দ্র। নিউইয়র্ক-প্যারিস-বার্লিন-লন্ডনে কখনো-কখনো রাত্রি দেড়টা-দুটা পর্যন্ত কাট্‌তো মজ্‌লিশে আড্ডায়-বৈঠকে।

লেখক—কাউকে আল্‌গা নিমন্ত্রণ কর্‌লে কবে-কবে ডাকেন? কোনো বাঁধা দিন-ক্ষণ আছে কি? ক-টার সময় সাধারণতঃ তার ব্যবস্থা হয়? বিকালে না রাত্রে?

সরকার—মঙ্গলবার বাদে যে-কোনো দিন। সেই সকল মেলমেশের সময় হচ্ছে বিকাল পাঁচটা হ'তে সাতটা। সেগুলা অবশ্য "জুর্ ফিক্‌স্" নয়। বন্দোবস্ত ঠিক থাক্‌লে তবে বাড়ীতে থাকি।

লেখক—কী রকম লোককে আপনি বিকাল বেলায় ডাকেন?

সরকার—দেশী-বিদেশী। দুই জাতের স্ত্রী-পুরুষ,—বলা বাহুল্য।

বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজের মাখামাখি

লেখক—এইন্‌সোআর্থের ধরণ-ধারণ কেমন ছিল?

সরকার—যোগেশ ভট্টাচার্য এইন্‌সোআর্থের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েই বল্‌লে:—"ইনি বাংলা পড়্‌ছেন।" দেখ্‌লাম বাংলা বল্‌তে পারে। প্রথমেই পরীক্ষা করা গেল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম বলুন তো কী বল্‌ছি? ব'লেই বল্‌লাম ঃ—"রাস্তার ওপর একটা গরু র'য়েছে।" পার্‌লে ব'ল্‌তে মানেটা-ইংরেজিতে।

লেখক—বাংলা শিখ্‌তো কোথায়?

সরকার—বাঙালী মাষ্টার রেখেছিল। হপ্তায় দু-দিন ক'রে প'ড়্‌তে যেতো। পকেটে একটা ছোট্ট খাতা থাক্‌তো। কথা বল্‌তে-বল্‌তে তার ভেতর দু'একটা কিছু টুকে রাখ্‌তো।

লেখক—আপনি কখনো খাতাটা প'ড়ে দেখেছেন?

সরকার—না। কোনো-কোনো সময় দু'একটা কিছু লিখে দেখাতো,—জান্‌বার জন্যে বানানটা ঠিক হ'য়েছে কি না। শেষ দিন পর্যন্ত বাংলা পড়া চালিয়ে গেছে।

লেখক—আর কোনো অভ্যাস লক্ষ্য ক'রেছেন?

সরকার—কখনো কোনো কাফে-রেস্টরান্টে বিলাতী ছোকরাদের সঙ্গে যেতো কিনা সন্দেহ। পছন্দ কর্‌তো বাঙালীদের সঙ্গে যোগাযোগ। অ-বাঙালী অর্থাৎ অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে মেলমেশের চেষ্টা কর্‌তো না মনে হচ্ছে। এমন কি বাঙালী ডাল, ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল ইত্যাদি চিজ্‌ও তার খুব পছন্দসই ছিল। এজন্য দুপুরের খাওয়া খেতো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ভোজনালয়ে। মশলার ঝাল দিয়ে মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদি খাবার তৈয়ের করা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের দস্তুর। মজার কথা—আমাদেরকে বাঙালী রান্নাবান্নার খবর জিজ্ঞেস ক'রে সন্তোষজনক জবাব পেতো না। কেননা আমাদের রান্নায় ঝাল নাই, মশলা নাই। তথাকথিত "কারি"র রেওআজ আমাদের রপ্ত হয় নি। এই বিষয়ে আমরা অ-বাঙালী।

লেখক—বাঙালী মিঠাই কেমন লাগ্‌তো?

সরকার—খুব পছন্দ করতো। এমন কি রসগোল্লা, সন্দেশ, নিম্‌কি, কচুরি, শিঙাড়া ইত্যাদি জিনিষ তৈয়ারি কর্‌বার কায়দা শিখ্‌বার জন্য আজ যোগেশের বাড়ী, কাল রেণুকার বাড়ী, পরশু সজনী দামের বাড়ীতে যাওয়া-আসা ক'রেছে। আরও মজার কথা,—কল্‌কাতা ছেড়ে বিলেত যাবার সময় পাঁচ-সাত কৌটো বাঙালী রান্নাঘরের মশলা বাক্‌সর ভেতর চালান নিয়ে গেছে। বাঙালী ডাল, তরকারি, সন্দেশ, শিঙাড়া, পায়েস, অম্বল ইত্যাদি খাবার তৈয়ারি করবার প্রণালী এইন্‌সোআর্থ তার স্ত্রীকে অনেক চিঠিতে শিখিয়েছে।

লেখক—দেখ্‌ছি অন্যান্য ভারতীয়ের বাড়ীতেও এইন্‌সোআর্থের গতিবিধি ছিল?

সরকার—"ভারতীয়" বল্‌লে প্রধানতঃ বা একমাত্র বাঙালী বুঝ্‌তে হবে। নিয়মিত যেতো যোগেশ ভট্টাচার্যের এক আত্মীয়ের কাছে বাংলা শিখ্‌তে। আমাদের পাড়া হ'তে অন্য পাড়ায় বদ্‌লি হবার পর এইন্‌সোআর্থ এক বঙ্গ-নারীর চাক্‌রি-স্থলে যেতো বাংলা পড়্‌বার জন্য। "শনিবারের চিঠি"-সম্পাদক সজনী দাস তাঁর বাড়ীতে এইন্‌সোআর্থকে ফি-হপ্তায় একদিন ক'রে পেতো। সেখানে তারাশঙ্কর, ব্রজেন, সুবল ইত্যাদি শনিদের দৃষ্টি বা ছায়া তার ওপর পড়্‌তো। ডাকটিকেট-প্রেমিক ব্যারিস্টার সত্যেন চ্যাটার্জির বাড়ীতেও গেছে।

লেখক—আপনি কখনো কোনো লোকের বাড়ীতে এইন্‌সোআর্থকে মোলাকাতের জন্য পাঠিয়েছেন?

সরকার—না। এইন্‌সোআর্থ কোনো-কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ চেয়েছিল। এই জন্যে বোধহয় মহাবোধি সোসাইটির ভিক্ষু জিনরত্ন আর রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচারের স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁদের সভায় যাওয়া-আসা কর্‌তো। চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের কাছেও চিঠি দিয়ে তাঁর প্রদর্শনী দেখ্‌বার জন্য পাঠিয়েছিলাম। বাংলা বক্তৃতা শুন্‌বার আগ্রহ চিল। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষদের সভায় দুএকবার দেখেছি। অ্যাটর্নি নির্মল চন্দ্র'র বাড়ীতে তাঁর ছেলে প্রতাপ চন্দ্র'র প্রতিষ্ঠিত "শনিবারের বৈঠকে"ও যোগ দিত। অমিয় দত্ত'র "ডিসেন্ট" ক্লাবে যেতো (৫৮ ক্রীক রো)। ক্লাবের তদবিরে অনুষ্ঠিত রৈবিক "চিত্রা"'র নাচ-গানেও হাজির ছিল—ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। তাতে আমিও ছিলাম মেয়েকে নিয়ে। মেয়েরা নেচেছিল চুটিয়ে।

লেখক—কল্‌কাতার বাইরে পাড়াগাঁয়ে এইন্‌সোআর্থের গতিবিধি ছিল?

সরকার—বেশী জানি না। একবার গিয়েছিল যশোহর জেলায়,—মনে পড়্‌ছে। পূজার সময়,—এক বন্ধুর বাড়ীতে পূজা দেখ্‌তে। পল্টনের লোক,—ছুটি পেতো না। বছরে বুঝি দিনকয়েক বাঁধা ছিল। সেই সময়ে দুবার গিয়েছিল দার্জিলিঙে। বার দুয়েক গিয়েছিল বোলপুরে,—রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী দেখ্‌তে। লেগেছিল ভাল।

লেখক—এইন্‌সোআর্থের পরিবারের কিছু খবর রাখেন?

সরকার—এঁর স্ত্রীর নাম গ্রেস। মেয়ের বয়স বছর দশেক। নাম নোরীণ। ম্যাঞ্চেস্টারের মাইল দশেকের ভেতর এঁদের বাড়ী। বেরি শহরে। লোক-সংখ্যা তার হাজার চল্লিশকে। এইন্‌সোআর্থের স্ত্রী ও মা আমাদের সঙ্গে চিঠি চালিয়েছেন। "এয়ারগ্রাম" চিঠি পেয়েছি গোটা কয়েক। এই একটা এখনো র'য়েছে। তাঁরা বিলাতী গানের বই আর ওষুধও পাঠিয়েছিলেন আমার স্ত্রী ও মেয়েকে।

লেখক—লড়াইয়ের আগে এইন্‌সোআর্থের পেশা কী ছিল জানেন?

সরকার—বিলাতের বিখ্যাত রং-প্রস্তুতকারী কোম্পানীতে ইনি চাক্‌রে। ব্র্যাডফোর্ড ডায়ার্স অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে কোম্পানীর নাম। কোম্পানীর শাখা গোটা চল্লিশেক। গড়ে মজুর ও কেরাণী সংখ্যা প্রত্যেক শাখায় প্রায় পাঁচ-শ। তূলার কাপড় আর নকল রেশম রং করা এই সকল কারখানা কাজ। অন্যতম শাখায় এইন্‌সোআর্থ হিসাব-রক্ষক। তাঁর স্ত্রীও বর্তমানে সেই আফিসেই কর্মচারী।

লেখক—এইন্‌সোআর্থকে দেখে নেহাৎ ছোকরা মনে হ'তো। বয়স কত?

সরকার—আকারে-প্রকারে ছোটই বটে। বয়স হবে চল্লিশের কাছা-কাছি। ব'লেছিল বোধ হয় ১৯০৬ সনে জন্ম।

লেখক—কল্‌কাতার সার্বজনিক সভায় যাওয়া-আসা কর্‌তো কি?

সরকার—ফুর্‌সুৎ পেলেই সভাসমিতির কিছুই বাদ দিতো না। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের (পঞ্চাশের মন্বন্তরের) সময় কল্‌কাতার অন্যান্য পাড়ার মতন এন্টালি পাড়ায়ও দুঃস্থদেরকে খিচুড়ি খাওয়াবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। এন্টালি ইস্কুলের নিয়মিত খিচুড়ি-পরিবেষকদের অন্যতম ছিল এইন্‌সোআর্থ। সে তখন এই পাড়াতেই জোড়া গির্জার (সেইন্ট জেম্‌স চ্যর্চের) ছাউনিতে থাক্‌তো। পরে ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডের ব্যারাকে উঠে যায়।

লেখক—কোন্‌-কোন্‌ বাঙালীর সঙ্গে মাখামাখি খুব বেশী হ'য়েছিল মনে হয়?

সরকার—বোধ হয় যোগেশ, সজনী, তারক আর ঋতেনের সঙ্গে।

লেখক—তারকই বা কে আর ঋতেনই বা কে? আগেও নাম ক'রেছেন।

সরকার—তারক দত্তর বাড়ী ঢাকা—বিক্রমপুরে। ধনবিজ্ঞানে এম-এ। কল্‌কাতায় এদের কাপড়ের ব্যবসা অনেকদিন ধ'রে। ঈষ্টবেঙ্গল সোসাইটির মালিক তারকের পরিবার। নিজেও বড়বাজারে কাপড়ের কারবার করে। ক্যালকাটা মিল্‌স্‌ এজেন্সির মালিক। ঋতেন রায়চৌধুরী ধনবিজ্ঞানে এম-এ পড়তো। ১৯৪২ সনে কল্‌কাতা-বর্জনের হিড়িকে পরীক্ষা দেয় নি। এর বাবা, কাকা, দাদা ইত্যাদি সকলে ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধ'রে চট্টগ্রামের ব্যবসাদার। তূলা-জিনিং, কাঠ-চেরাই, চা, চাউল, বীমা ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যবসায় এঁদের হাত আছে। বিদেশে তূলা-রপ্তানি আর চা-রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কল্‌কাতায়ও বড় কারবার চলে। তারক আর ঋতেন দুজনেরই বয়স হবে বছর পঁচিশ-ছাব্বিশেক।

লেখক—তারক আর ঋতেনের সঙ্গে এইন্‌সোআর্থের দেখাশুনা হ'তো কোথায়?

সরকার—চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে সরকারী ইন্ডিয়ান কফি-হাউস ছিল। কয়েক সপ্তাহ হ'লো উঠে গেছে (বোধ হয় জানুয়ারির শেষে)। বোধ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে অ্যাল্‌বার্ট হলে কফি হাউসটা আস্‌বে। ঐ কফি-হাউস ছিল এই তিনজনের আটপৌরে আড্ডা। আড্ডায় অন্যান্যেরাও এসে জুট্‌তো। হপ্তায় চার-পাঁচদিন আড্ডা বস্‌তো শুনেছি।

লেখক—দেশী কাগজ পড়্‌তো?

সরকার—মাঝে-মাঝে বল্‌তো এই খবরটা "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় পেয়েছে, অমুক খবরটা "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে" পেয়েছে। আমি কখনো জিজ্ঞাসা করিনি।

এইন্‌সোআর্থের রোজনামচা

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

লেখক—দেখ্‌ছি এইন্‌সোআর্থ বাঙালী জাতের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে গেছে?

সরকার—ঠিক কথা। শুধু তাই নয়। তার স্ত্রী আর মাকেও বাঙালী জাতের নাড়ী-নক্ষত্র জানিয়ে ছেড়েছে।

লেখক—তার মানে?

সরকার—লোকটা ফি-হপ্তায় দুটো-তিনটে চিঠি লিখ্‌তো স্ত্রীর কাছে।

লেখক—এত কী লিখ্‌তো?

সরকার—তাই তো আমিও ভাবি। শেষ পর্যন্ত কথায়-কথায় বুঝ্‌লাম,—এইন্‌সোআর্থ ফি-চিঠিতে তার হর-রোজের সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যার প্রত্যেক কাজ ও চিন্তা লিখে পাঠাতো। চিঠিগুলা ছিল রোজনামচা। ডায়েরি বল্‌তে পারি।

লেখক—লোকটা কি ক্ষ্যাপা?

সরকার—তাই লোকের মনে হবে। ইংরেজদের আড্ডায় যেতো না। ইংরেজের পক্ষে এও আর একটা ক্ষ্যাপামির লক্ষণ নয় কি? বাঙালী জাতের খাওয়া-পরা, নাচ-গান-বাজনা, হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-প্রমোদ, পূজা-পার্বণ, পল্লী-শহর, গলি-ঘোঁচ, ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলমান, ছোটজাত-বড়জাত এই সব নিয়ে জীবন কাটাতো। আর এই সবের খুঁটিনাটিই লিখ্‌তো চিঠিগুলার ভেতর মনে হচ্ছে। আমি ভাবি,—তার স্ত্রীর আর মার ধৈর্যই বা কত? বাঙলার নর-নারীর সুখদুঃখের কাহিনীর ভেতর চটকদার বা চিত্তাকর্ষক কীই বা থাক্‌তে পারে? এ-সব কথা ইংরেজের পক্ষে লেখাও ঝকমারি, আর পড়া তো ঝকমারি বটেই। বাস্তবিক পক্ষে পড়ানোটা ইংরেজ মেয়েদের ওপর অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। তাও ফি-হপ্তায় ডজন-ডজন পৃষ্ঠা,—ছোট হরপের লেখা!

লেখক—বাংলা গানে এইন্‌সোআর্থের সখ ছিল?

সরকার—দেখেছি দু-একটা গান ও শিখেছিল।

"আমি বন বুলবুল গাহি গান", "জনগণ মন অধিনায়ক"—এই দুটো গুন্‌-গুন্‌ ক'রে গাইতো। গেয়ে শুনিয়েছে। বাংলা থিয়েটারে যেতো, গ্রামোফোনের বাংলা গান শুন্‌তো, রেডিও'র বাংলা গান শুন্‌তেও ভালবাস্‌তো। রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাংলা" গানের একটা ইংরেজি তর্জমা লিখে আমি ছেপেছিলাম। সেই ইংরেজি কবিতার ওপর জার্মাণ গানের সুর লাগিয়েছে আমার স্ত্রী ও ইন্দিরা (মেয়ে)। এই ইংরেজি গানটা দলের সঙ্গে সুর মাফিক গেয়ে যেতো এইন্‌সোআর্থ। পিয়ানো বাজাতো স্ত্রী বা মেয়ে। মনে পড়ছে একদিন প্রতাপ সিং, অমিয় দত্ত, ইন্দিরা, স্ত্রী, এইন্‌সোআর্থ ও অন্যান্য কয়েকজন এক সঙ্গে গেয়েছিল। বোধ হয় সেদিন কয়েকজন মার্কিণ আর ক্যান্যাডিয়ান অতিথিও হাজির ছিল। তাদেরও কেহ-কেহ গানে যোগ দিয়েছিল। এই অধম কেবল "সঙ্গত্‌" ক'রেছিল!

লেখক—ইংরেজি লিখ্‌তো কেমন? ওদের দেশী ইস্কুলের পাশ কটা ছিল?

সরকার—গোটা দু-তিনেক চিঠি লিখেছিল দার্জিলিং আর কল্‌কাতা থেকে। দেখেছি বানান ভুল হ'তো না। ব্যাকরণেও ভুলও ছিল না। হাতের লেখা ভাল। রচনা-কৌশল বেশ সরল ও সাদা-সিধে। কখনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে নি। বোধ হয় ম্যাট্রিকও নয়। মামুলি প্রাথমিক পাঠশালার পর বছর কয়েক নৈশ বিদ্যালয়ে বা আর কোথাও

ব্যবসা-সংক্রান্ত বিদ্যা শিখেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বা তারপর কেরাণীগিরি। স্ত্রীর বিদ্যাও সেইরূপ। শর্টহ্যান্ডে আর টাইপরাইটিঙেও দখল আছে। ভারতে নকরিওয়ালা অধিকাংশ ইংরেজেরই বিদ্যা এইরূপ।

লেখক—তার স্ত্রীর কাছে চিঠির ভেতর কী লিখ্‌তো? তার কোনো কথা আপনি জানেন?

সরকার—একদম না। কোনো দিন বলেও নি। আমারও অভ্যাস নয় কাউকে তার ঘরোআ কথা জিজ্ঞাসা করা।

লেখক—চিঠিগুলার সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—আন্দাজে কিছু বলা সম্ভব কি? যা'হক—যাবার দিন (২৭শে জানুয়ারি) সকালে এসেছিল বিদায়ের দেখা কর্‌তে। সঙ্গে ছিল লন্ডনের এক ইংরেজ। সেই সময় কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়্‌লো,—এইন্‌সোআর্থ তিন বছরে তার স্ত্রীকে ১২৮টা পোস্ট কার্ড ঝেড়েছে। খামের চিঠি ও বুকপোস্ট পাঠিয়েছে ৫৮৮টা। অর্থাৎ ১৫৬ সপ্তাহে মোটের ওপর পত্রাঘাত হ'য়েছে ৭১৬ বার। দেখা যাচ্ছে হপ্তায় সাড়ে চার বার। এ এক বিপুল দিনলিপি। কী আর বল্‌বো এ সম্বন্ধে? অবাক হ'য়ে যেতে হয়।

লেখক—কিছু আন্দাজ কর্‌তে পারেন?

সরকার—আচ্ছা, আন্দাজ চালানো যাক। পোস্টকার্ডগুলা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। বুকপোস্ট ধ'রে নিলাম ১৮৮। তাও বাদ দেওয়া যাক। খামের চিঠি তা হ'লে দাঁড়ায় শ-চারেক। চিঠিগুলা বহরে হবে পৃষ্ঠা দশ-বার শুনেছি। মনে করা যাক গড়ে দশ পৃষ্ঠা। তাহলে সবশুদ্ধ হচ্ছে ৪০০০ পৃষ্ঠা।

লেখক—চার হাজার পৃষ্ঠার চিঠিগুলা সবই এইন্‌সোআর্থ-পত্নীর মজুদ র'য়েছে?

সরকার—হাঁ। শুনেছি একটাও নাকি জাহাজ-ডুবি বা হাওয়ায় গায়েব হয় নি।

লেখক—তাহ'লে চার-হাজার পৃষ্ঠার চিঠিগুলা এইন্‌সোআর্থের পরিবারে তার বঙ্গ-স্মৃতি জাগিয়ে রাখ্‌বে?

সরকার—নিশ্চয়। আমার বিবেচনায় এসব হচ্ছে পারিবারিক সম্পদ্। এই ধরণের চিজ কোনো বাঙালী পরিবারের আছে কি না সন্দেহ।

লেখক—আপনি কখনো কোনো লোকের চিঠি জমিয়ে রেখেছেন?

সরকার—কস্মিন্‌কালেও না। ও-বাতিক আমার নাই। কিন্তু চিঠিগুলা এক হিসাবে ইতিহাস বা ইতিহাসের দলল। যারা দশ-বিশ বছরের চিঠি মজুদ রাখে তারা বাস্তবিক পক্ষে পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ইতিহাসের খশড়া বা দলিল বা মাল-মশলার অধিকারী। সাধারণ ভারত-সন্তান একথা বুঝ্‌বে না।

ইংরেজ-চোখে বাঙালী সমাজ

লেখক—আপনি কি প্রকারান্তরে বল্‌তে চান যে, এইন্‌সোআর্থের চিঠিগুলা তার ব্যক্তিগত ডায়েরি বা দিনলিপি মাত্র নয়? এই রোজনামচার ভেতর ঐতিহাসিক মাল-মশলাও আছে?

সরকার—অবিকল তাই ভাব্‌ছি। এই চিঠি-সাহিত্য যার-পর-নাই মূল্যবান। এসব

হচ্ছে ইংরেজচোখে বাঙালী-সমাজ ও বঙ্গ-সংস্কৃতির বৃত্তান্ত। কাট-ছাঁট ক'রে—নেহাৎ ঘরোআ কথা বাদ দিলে, বোধ হয় ছাপার হরপে হাজার আড়াই-তিনেক পৃষ্ঠা হবে। এই কয়েক হাজার পৃষ্ঠায় বাঙ্‌লার নর-নারী সম্বন্ধে তিন বছরের (১৯৪২-৪৫) বস্তুনিষ্ঠ বৃত্তান্ত আছে।

লেখক—এই বৃত্তান্তের মূল্য কতটা?

সরকার—এ-কালের বাঙালী জাত্‌ সম্বন্ধে এমন সাক্ষ্য খুব কমই পাওয়া যাবে। ঘটনাচক্রে সাক্ষীটা পেশাদার ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রিক বা সাংবাদিক হিসাবে এদেশে ছিল না। ছাপ্‌বার মতলবে সে চিঠিগুলা লেখেনি। এইটে হচ্ছে বড় কথা। লেখক হবার আকাঙক্ষা তার কোনো দিনই নাই। লেখক নামে পরিচিত সে কখনো ছিল না। জীবনে কখনো এক-আধলাইনও কোনো দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকে ছাপেওনি।

লেখক—এইজন্য চিঠিগুলার দাম বেড়ছে না কমেছে?

সরকার—লিখেছে মামুলি চিঠি,—নিজের স্ত্রী ও মার কাছে। নিজের নিত্যনৈমিত্তিক কথা তাদেরকে জানানোই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। লোকটা নিরীহ, পরিবার-ভক্ত, সাদা-সিধে মানুষ। এই জন্যে বাঙালীর ১৯৪২-৪৫ সম্বন্ধে যা-কিছু খবর বিলাতী পরিবারে গিয়ে পৌঁছেছে সেই সকল খবর অতি-মাত্রায় ব্যক্তিগত তথ্য, ঘরোআ সত্য। কাজেই চিঠিগুলার দাম আমার বিবেচনায় খুব বেড়েছে। মনে হচ্ছে যে, কাউকে বাড়ানো, কাউকে কমানো, কারু বিরুদ্ধে কিছু বকা, কারু স্বপক্ষে কিছু উকিলি করা এই সকল চিঠির মতলব থাকার কথা নয়।

লেখক—ছাপা হ'লে এই সকল চিঠির দাম কেমন হবে?

সরকার—এইন্‌সোআর্থের রোজনামচাগুলা কোনো দিন ছাপা হ'লে এই সব বঙ্গ-সমাজ ও বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরেজ-লেখা ইংরেজি-সাহিত্যের অদ্ভুত সম্পদ বিবেচিত হবে। আমার মনে হচ্ছে,—এর ভেতর নৃতত্ত্ব, প্রত্ন-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, আর্থিক কথা, রাষ্ট্রিক কথা, অন্তর্জাতিক কথা,—সব কিছুরই কুচো-কাচা অথবা বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে। প্রপাগাণ্ডা-বিহীন, প্রচারের নেশা-শূন্য, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার সোজা ঝরঝ'রে বিবরণ হিসাবে এই চিঠি-সাহিত্য ইংরেজ সমাজে জবরদস্ত ইজ্জদ পেতে বাধ্য।

পেপিসের ডায়েরি ও এইন্‌সোআর্থের চিঠি

লেখক—আপনি মনে করেন যে,—এইন্‌সোআর্থের চিঠিগুলা কোনো দিন ছাপা হ'তে পারে?

সরকার—নিশ্চয়।

লেখক—এত জোরের সহিত ব'ল্‌ছেন কী ক'রে?

সরকার—বিলাতে প্রকাশকের সংখ্যা দু'শ-পাঁচশ' বা হাজার-হাজার। ছোট-বড়-মাঝারি। লাখপতি-কোটিপতি প্রকাশকের দলও বেশ-কিছু পুরু। ইচ্ছা কর্‌লেই যে-কোনো প্রকাশক ডায়েরিগুলা ছেপে দিতে পারে।

লেখক—এইন্‌সোআর্থ বিলাতে পৌঁছোবা মাত্রই ডায়েরিগুলা ছাপার ব্যবস্থা হ'তে পারে কি?

সরকার—রাধা-মাধব! এসব "ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে!"—এত তাড়াহুড়ার কারবার নয়। চিঠি-সাহিত্য, ডায়েরি-সাহিত্য ইত্যাদি চিজ মানুষের বেঁচে থাকবার সময় ছাপা হয় না। সাধারণতঃ লেখকেরা নিজের জীবদ্দশায় রোজনামচার প্রকাশ দেখ্‌তে পায় না।

লেখক—কবে আন্দাজ এইন্‌সোআর্থের রোজনামচা প্রকাশিত হবে মনে হচ্ছে?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর ভেতরে নয়। ২০২৫-৫০ অর্থাৎ একুশ শতকের মাঝামাঝি এইন্‌সোআর্থের চিঠি বিলাতী বাজারে দেখা দেবে বলা যেতে পারে।

লেখক—অত দেরি লাগ্‌বে?

সরকার—চিঠিগুলা তাজা-তাজা ছাপা হ'তে পার্‌তো যদি এইন্‌সোআর্থ কোনো দৈনিক কাগজের প্রতিনিধি হ'তো। এইন্‌সোআর্থ সাংবাদিক হ'লে দৈনিক-প্রকাশকেরা তাড়াতাড়ি ছাপার ব্যবস্থা কর্‌তো। তা ছাড়া এইন্‌সোআর্থ কোনো রাষ্ট্রিক দলের লোক হ'লে সেই দলের স্বার্থ হ'তো চিঠিগুলা শীগ্‌গির-শীগ্‌গির বাজারে ঝাড়্‌তে। কিন্তু এইন্‌সোআর্থের লেখাগুলা সাংবাদিক মালও নয় আর দলীয় পদার্থও নয়। এসব হচ্ছে একদম খেয়ালি-লোকের ঘরোআ দেখা-শুনার বৃত্তান্ত। এতে কোনো ইংরেজ প্রকাশক বা রাষ্ট্রিক দল নিজ স্বার্থ মাফিক সংবাদ, তথ্য, তত্ত্ব বা গবেষণা পাবে কি না সন্দেহ। না পাবারই কথা। সংবাদবিজ্ঞানের ভেতর এসব পড়্‌বে না।

লেখক—ডায়েরি, চিঠি ইত্যাদি সাহিত্যের বিলাতী নজির কিছু আছে?

সরকার—"ভদ্র লোকের পাতে দেবার উপযুক্ত" রোজনামচা লিখে গিয়েছিল সামুয়েল পেপিস (১৬৩২-১৭০৪)। সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। লোকটা চাক্‌রি কর্‌তো বিলাতী নৌবহরের আফিসে। বড় চাক্‌রে ছিল। ন-বছরের (১৬৬৮-১৬৭৭) ডায়েরি পাওয়া যায়। হর-রোজের দেখা-শুনা, ঝগড়া-কোঁদল, গল্পগুজব, পারিবারিক বাক্‌-বিতণ্ডা ইত্যাদি মাল এই রচনার ভেতর মজুদ র'য়েছে। নাটকের কথা আছে, নাচ-গান-বাজনার বৃত্তান্ত আছে। সরকারী কাজ-কর্মের সংবাদ আছে, কেরাণী-জীবনের সু-কু আছে। দেশে ও দুনিয়ার সকল বিষয়েই পেপিস তার নিজ মন্তব্য ঝাড়্‌তেও কসুর করেনি। লেখক দ্রষ্টা মাত্র নয়, সমালোচকও বটে।

লেখক—এইন্‌সোআর্থের ডায়েরিতে ইংরেজরা কোনো মূল্যবান তথ্য পাবে কি?

সরকার—মনে করা যাক্‌, ১৮৫৭ সনের ভারতীয় বিপ্লবের সময়ে কোনো ইংরেজ দিল্লীতে বা লক্ষ্ণৌয়ে ব'সে হাজার-চারেক পৃষ্ঠায় ভরা রোজ-নামচা লিখেছিল। ঘটনাচক্রে সেই রোজনামচা আজ ১৯৪৫ সনে ছাপা হ'লো। তার দাম যতটা, ২০২৫-৫০ সনে প্রকাশিত এইন্‌সোআর্থের বর্তমান চিঠিগুলার দামও হবে ততটা। দাম হচ্ছে ঐতিহাসিক।

লেখক—তুলনাটা কি শুধু সময়ের পরিমাণ দেখে চালাচ্ছেন?

সরকার—প্রথমতঃ তা-ই বটে। ১৮৫৭ সনের পর ১৯৪৫ সন যত দূরে, ১৯৪২-১৯৪৫ সনের পর ২০২৫-৫০ প্রায় তত দূরে। এক-শ' বছরের ফারাক দুই ক্ষেত্রেই দেখ্‌ছি।

লেখক—তা ছাড়া আর কিছু আছে?

সরকার—জবর ভাবেই আছে। ১৯৪২-৪৫ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য চরম ফাঁড়ার ভেতর র'য়েছে। ১৮৫৭ সনের ভারতীয় বিপ্লবে বৃটিশ সাম্রাজের ফাঁড়াটা বর্তমান সময়ের ফাঁড়ার চেয়ে বেশী-মারাত্মক ছিল না। কাজেই ১৯৪২-৪৫ সনের ফাঁড়ার সময়কার ভারতীয় বৃত্তান্ত ইংরেজ-হাতে পাবে ইংরেজ বাচ্চারা।

মার্চ ১৯৪৫

সৈনিক পরিচ্ছদের অন্তরালে*

দা-ছুরি-কাঁচি যেমন মাঝে-মাঝে শানিয়ে নিতে হয় যেন মরীচা না ধরে, তেমনি আমিও কখন-কখন যাই প্রোফেসর বিনয় বাবুর কাছে আমার কাজ-কর্মের উৎসাহকে শানিয়ে নিতে। সেখানে গেলে বুঝতে পারা যায় প্রত্যেকেরই মানুষ হবার আশা করার অধিকার আছে। কারণ কোন কাজে নিরুৎসাহ করা বিনয় সরকারের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

বোধ হয় ১৯৪৪ সনের মাঝামাঝি হবে, সন্ধ্যার কিছু পরে একদিন গিয়ে উপস্থিত হ'লাম পুলিশ হস্পিটাল রোডের সেই বাড়ীতে (৪৫নং)। আমি পৌছোবার আগেই শ্রীযুত ঋতেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুত তারক নাথ দত্ত এবং আরও চারপাঁচজন ভদ্রলোক ও মহিলা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিনয় বাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ইড: সরকার আমার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রতাসূচক দু'একটা কথা দু'এক জনের সঙ্গে হ'য়ে যাবার পর বোধ হয় আমার ভাণ্ডারে আর তেমন কিছু ছিল না বল্‌বার মত। কাজেই নীরব হ'তে হ'লো।

এই দোষটি কেবল যে আমার তা নয়। এদেশীয় অনেকের মধ্যেই এই ক্রটিটুকু বর্তমান। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দৃষ্টি এতই সীমাবদ্ধ এবং আমাদের আলোচনার বিষয় এতই অল্প যে, অনেক ক্ষেত্রেই লোকের সঙ্গে গল্প আলাপ কর্‌তে আমরা পারি না। আমাদের রবিবাবু, আমাদের প্রাচীন-সভ্যতা, আমাদের পরাধীনতা, এই ধরণের কয়েকটি বুলি বাদ দিলে আমাদের মূলধন যা থাকে তা ভদ্র সমাজে অনেক সময়েই অচল। সুতরাং এই শব্দগুলি তোতাপাখীর মত একবার ব'লে যাবার পরও যদি কেহ আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বার ন্যায় অশিষ্ট ব্যবহার করে, তা হ'লে আমরা করি তাদের সঙ্গে মৌনতা-রূপ অহিংস সংগ্রাম। কেবলমাত্র অপর দিক থেকেই তখন আস্‌তে থাকে বাক্যের তরঙ্গ। আমার মত পাথরের কানে এসে আছাড় খেতে। তার কোন কথা হয়ত বুঝি ; বেশীর ভাগ না বুঝেও হয়ত বুঝেছি ব'লে ভাণ করি মুখে একটি হাসির রেশ রেখে। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বল্‌বার দুঃসাহস হ'য়ে উঠে না।

শ্রীযুক্তা সরকার ভিন্নদেশীয় (জার্মাণ) মহিলা। তাঁর গৃহস্থালীর শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেযত্ব আছে। তাঁর পক্ষে ঘরবাড়ীর কাজ করা আর রান্নাবান্নার কাজ করা যতটা স্বাভাবিক ও সহজ—যথা-সময়ে স্বচ্ছন্দে গল্পে যোগদান করাও ততটা সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করা এঁর কাছে সুকুমার-শিল্প বিশেষ। অনবরত একই ধরণের গল্পের পরিবর্তে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন ভাবে গল্পের ধারা বদ্‌লিয়ে দিয়ে গল্প করাতে তাঁর যা কৃতিত্ব তা বাস্তবিকই অনুকরণীয়। তাঁর মেয়ে হ'য়েও কুমারী ইন্দিরা সরকার মায়ের এই গুণটি যেন যথাযথ আয়ত্ত ক'রে উঠতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। বোধ হয় ভারতীয় আবহাওয়াতে বড় হওয়ার দরুণই এ রকম ঘ'টেছে,—জন্ম যদিও তাঁর

* শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাশ কর্তৃক লিখিত। ভূপেনবাবু রেঙ্গুনে উকিল ছিলেন। বর্তমানে কলিকাতার পুলিশ কোর্টে উকিলি করেন। রাসায়নিক শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গল্প ও প্রবন্ধের লেখক হিসাবে ইনি সাহিত্য-সংসারে পরিচিত।

বিদেশেই (ইতালিতে)। মায়ের মত সকলের সঙ্গে তিনিও গল্প করেন, এবং অফুরন্তভাবেই গল্প করেন। কিন্তু লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যাবে, মায়ের গল্প হিমালয়ের হিমানী-বিগলিত মন্দাকিনী ধারার মত স্বাভাবিক আর মেয়ের গল্প বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পাম্প্‌ করা পরিস্রুত জলের মত অনর্গল।

বিনয় বাবুর গল্প করার রীতি স্বতন্ত্র। অনেকটা ঝড়ের মত। মনে হয় যেন,—কড়্‌-কড়্‌ ক'রে বাজ পড়্‌ছে, কখনো বা ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে শীল পড়্‌ছে, অথব ঝুম্‌-ঝুম্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছে। এই কালবৈশেখীর অন্তরালে র'য়েছে নূতন কর্মময় জীবন-সৃষ্টির স্বপ্ন। তাঁর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে র'য়েছে অখণ্ড, মনুষ্যত্ব, অসীম-বীরত্ব এবং অনির্বচনীয় আনন্দের উচ্ছ্বাস।

আমি প্রবেশ করার পূর্বে থেকেই বৈঠকখানায় গল্প চল্‌ছিল। আমার উপস্থিতিতে তা বন্ধ হয় নি। ইন্দিরা পাশের চেয়ারে আর এক জনের সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলেন,—বোধ হয় ইউনিভার্সিটির লেখা-পড়া নিয়ে। এম-এ পড়ছেন ফরাসী সাহিত্যে। তবে ইতিহাস, দর্শন, বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্লাসেও নিয়মিত গিয়ে বক্তৃতা শুনেন। এই জন্য বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে এঁর আলাপ-পরিচয় আছে। কাজেই গল্প-গুজবের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত।

সরকার-পত্নী আমায় বল্‌লেন,—"ভালই হ'লো তুমি আজ এলে। মিষ্টার এইন্‌সোআর্থকে বোধ হয় তুমি ইতিপূর্বে দেখ নি। তিনি একজন ইংরেজ সৈনিক, আমাদের বন্ধু। আজ আসার কথা, কারণ প্রতি মঙ্গলবারেই তিনি এ বাড়ীতে আসেন আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে।" কথাটা হ'লো ইংরেজিতে,—বাংলায় নয়।

শুনে যে আমি আগ্রহান্বিত হ'য়েছিলাম এই সৈনিক পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হ'তে তা' মনে পড়ে না। এমনি বহু বিদেশীয় লোক প্রায়ই আসে এ-বাড়ীতে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে। দেশ-বিদেশে বন্ধুসংখ্যা তাঁর অনেক। কাজেই কত লোকই ত আসে এখানে প্রতিদিন, তাতে আর নূতনত্ব কি? তা ছাড়া একে ইংরেজ, তাতে সৈনিক। তাঁদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ হ'লেই দেখা যায়, তাঁরা আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে চান যে তাঁরা ইংরেজ। তাঁরা যে মানুষ এইটি প্রমাণ করার প্রতি তাঁদের দেখা যায় এক বিরাট উদাসীনতা। এই ঔদাস্য তাঁদের স্বেচ্ছাকৃত কি স্বাভাবিক বলা শক্ত।

কথা আছে, হাতী যে-পথ দিয়ে চল্‌তে একবার কাঁটা ফুটেছে সে-পথ দিয়ে জীবনে চলে না। আমরা অবশ্য সহস্রবার কাঁটা ফুট্‌লেও সে-পথ ত্যাগ করতে পারি না। তা'ব'লে চল্‌বার উৎসাহের অন্তরালে যে অনিচ্ছা গোপন থাকে তাকে অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ। কাজেই মিঃ এইন্‌সোআর্থ কে এবং কী আমার জানবার তেমন অভিলাষ ছিল না। একজন নাগা কি ফিজি-দ্বীপবাসী হ'লেও হয়ত একটা আগ্রহ থাক্‌ত। কিন্তু এই সৈনিক পুরুষের আসা না আসার প্রতি আমার উৎসাহ ছিল কম।

বৈঠকে তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং রাও-বিল নিয়ে সম্ভবত আলোচনা চল্‌ছিল। ঋতেনবাবু ছিলেন বিলের সমর্থক। বল্‌লেন,—"বিলটি পাশ হ'লে মেয়েদের প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে।" ইনি চট্টগ্রামের লোক। বড় ব্যবসায়ীর পুত্র। নিজেও শিল্প-বাণিজ্যে করিৎকর্মা লোক।

আমি বল্‌লাম,—"আইন ক'রে কখনো শ্রদ্ধা বাড়ানো যায় না। বরং তাতে হিন্দুদের যৌথপরিবারে ভাঙ্গন ধ'রে অশান্তি সৃষ্টি কর্‌বে।"

"এখনো হিন্দু পরিবারে খুব শান্তি আছে বলা যায় না," বল্‌লেন তারকবাবু আমার কথা শুনে। ইনিও বড় বেপারী। কল্‌কাতার বড়বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন। এঁর দেশ বিক্রমপুর (ঢাকা)।

সরকার-পত্নী বল্‌লেন,—"যৌথপরিবারবাসে অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে যৌথপরিবারে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। আমি ত ধারণাই কর্‌তে পারি না কি ভাবে তা' চলে।"

আমিই যে ঠিক,—একথা প্রমাণ কর্‌বার জন্য আমি প্রায় তর্ক সুরু কর্‌ছিলাম। এমন সময় বিনয়বাবু হাস্‌তে-হাস্‌তে ইন্দিরার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বল্‌লেন,—"এই যে বাছুরটা, একি পার্‌বে কখনো যৌথ-পরিবারে খাপ খাইয়ে চল্‌তে?" তারপর মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি রে, বিবিলি, পার্‌বি নাকি সবার সঙ্গে এক পরিবারে থাক্‌তে?" বিবিলি হচ্ছে ইন্দিরার আসল (ডাক) নাম।

হিঃ-হিঃ ক'রে হেসে ইন্দিরা উত্তর দিলেন,—"কী ক'রে বলি? সে অবস্থায় পড়্‌লে তখন দেখা যাবে।" বল্‌লেন বাংলায়।

কলেজের ছাত্রী এক কুমারী এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তারকবাবু হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন,—"আজকাল কোনো-কোনো মেয়ে চায় কেবল টাকা"। তাঁকে তাঁর কোনো বন্ধু ব'লেছেন, "আমার বোন্‌টি একবার ব'লেছিল অনেক টাকা থাকে এ রকম একটি বুড়ো বর ওর পছন্দ। এখনো তাই সে কথা নিয়ে বাড়ীতে সবাই ওকে ঠাট্টা করে।" শুনে সকলেই হেসে ফেল্‌ল। বিনয়বাবু কুমারীটিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন,—"তুই কী বলিস্ রে? সবাই কথা বল্‌ছে। তুই কিছু বল্ দেখি, শুনি। দে সকলকে শুনিয়ে। আমি তো সব মেয়েরই স্বপক্ষে। কুছ পরোআ নাই।"

লজ্জাবতী লতাকে লজ্জা দিলেন কুমারীটি। আরক্তমুখে চোখ নীচু করে নির্বাক্ এবং নত হ'য়ে তিনি ব'সে রইলেন। আর আমরা সকলে তাঁর সে অবস্থা দেখে হাস্‌তে লাগলাম। কেবল বিনয়বাবুই তাঁকে বার-বার বল্‌তে লাগলেন ঃ—"বল্ দেখি তোর কী মত? কলেজে পড়্‌ছিস, তোর ও ত একটা স্বাধীন মত আছে? না, যে যা বলে তাই শুন্‌বি? দ্যাখা সকলকে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য। দে তোর দাদাদেরকে টিট্ করে।"

কুমারী নিরুত্তর। অল্পক্ষণ পরেই বাইরে দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হ'ল। সরকার-পত্নী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে যিনি ঢুক্‌লেন বুঝতে পারা গেল তিনিই সে-ব্যক্তি যাঁর কথা খানিক পূর্বেই শুনেছি। সৈনিক-পোষাকাবৃত হ'লেও ভদ্রলোকটির মুখে কোনো হিংসা বা অতি-গাম্ভীর্য দেখা গেল না। কোনো অহংকারের চিহ্নও পাওয়া গেল না। সারা মুখে আকর্ণবিস্তৃত এক হাসি।

প্রথমদিন দেখে তাঁর সেই হাসি বিশ্লেষণ কর্‌বার চেষ্টা আমি করি নি। তবে আজ অনেকদিন পরে যখন চিন্তা করি তখন মনে হয় তাঁর সেই হাসির মধ্যে ছিল এক সরলতা, এক আন্তরিক আনন্দ। তিনি যেন কোন নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এসে একটি তৃপ্তি বোধ করছিলেন।

আবেগ যেখানে অধিক, ভাষা সেখানে প্রায়ই আছাড় খায়। ঋতেন বাবু এবং তারক বাবুর হ'ল সেই অবস্থা। বল্‌বার ইচ্ছা ছিল তাঁদের অনেক। ভাষা যেন তার সাথে সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে পার্‌ছিল না। তাই বরাবরই তাঁদের কথা যাচ্ছিল জড়িয়ে।

গভীর নিশীথে পার্বত্য প্রদেশে ঝরণার জল পড়্‌লে যে রকম শব্দ হয় তেম্‌নি ভাবেই চালাচ্ছিলেন ইন্দিরা তাঁর আলাপ এইন্‌সোআর্থের সঙ্গে। সরকার-পত্নী তাঁর সেই

চিরাভ্যস্ত গল্প আরম্ভ কর্‌লেন ভরা গঙ্গার জোয়ারের স্রোতের মত। বৈঠকখানার আবহাওয়াটা হ'য়ে উঠ্‌ল শরতের প্রভাতের মত স্নিগ্ধ এবং আনন্দময়।

জ্যোৎস্না-রজনীতে রজনীগন্ধা যখন তার সৌরভ ছড়িয়ে দেয় দিগ্‌দিগন্তে, তার মধ্যে থাকে না কোনো শব্দ, কোনো সুর। সুমধুর নীরবতাই তার বিশেষত্ব। কবি নিজের উচ্ছ্বাসে লেখে কবিতা, যন্ত্রী তোলে তার বীণার তান, গানের তরঙ্গ সৃষ্টি করে যারা সুকণ্ঠি,—এই রজনীগন্ধার উদ্দেশ্যে। কিন্তু রজনীগন্ধার দিক্ থেকে বিস্তারিত হয় কথা নয়, ছন্দ নয়, কেবল মাত্র সুরভি। তেম্‌নি এইন্‌সোআর্থ বিতরণ ক'রে যাচ্ছিলেন তাঁর সৌহৃদ্য,— প্রত্যেকেই যখন কথা বল্‌ছিল, কেহ তাঁর পরিচয় দিয়ে, কেউ তার সুযশ প্রচার ক'রে। তিনি নিজে ছিলেন সরলতাপূর্ণ হাসিমুখেই নিস্তব্ধ এবং নীরব।

ভদ্রলোক স্বভাবতই স্বল্পভাষী। এইটি বোধ হয় তাঁর জাতিগত গুণ। প্রয়োজন হ'লে মাথায় লাঠি বসিয়ে দিতে পারে ইংরেজ। কিন্তু শূন্য পাত্রের মত ঢং-ঢং কর্‌তে সে নারাজ। এই আদর্শবাদী ইংরেজ সম্বন্ধে বার্নার্ড শ' এক স্থানে ব'লেছেন,—"আদর্শের দোহাই দিয়ে ইংরেজ না কর্‌তে পারে এমন কাজ নেই। এমন কি তার রাজার শিরশ্ছেদ ক'রে তাকে "গ্লোরিয়াস্ রেভল্যুশন" (গৌরবময় বিপ্লব) আখ্যায় পর্যন্ত ভূষিত কর্‌তে পারে। কিন্তু অনর্থক শব্দ ব্যয় সে করে না। তবে যখন শব্দ ব্যয় করে তখন তার শব্দের অর্থে এবং মনের ইচ্ছায় কোনই পার্থক্য থাকে না।"

এইন্‌সোআর্থ আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—বর্মাদেশ আমার কী রকম লাগ্‌ত। বর্মা সম্বন্ধে আমার একটি দুর্বলতা আছে। বোধ হয় বহুদিন তার নিমক খাওয়ার ফলেই আমার চরিত্রে এই দোষটুকু প্রবেশ ক'রেছে। বর্মার সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লেই আমার মনে হয় আমি সে-দেশের 'ড্রেন ইনস্‌পেক্‌শন্' (নর্দমা পরীক্ষা) কর্‌বার চেষ্টা কোনো কালেই করি নাই। তাই তার দোষগুলি জান্‌লেও আমি বরাবর চাপা দিই। গুণগুলিই বর্ণনা করি মুক্তকণ্ঠে। তা' ছাড়া আমি মনে করি নিজের দোষ এবং পরের গুণ আলোচনায় লাভ আছে। তা'তে হয় নিজের দোষ সংশোধন কর্‌বার সুযোগ এবং পরের গুণ আয়ত্ত কর্‌বার সুবিধা। বল্‌লাম,—"বর্মাদেশকে আমি সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান ব'লে মনে করি। সেখানে জলধির কল্লোল নেই। আছে নিভৃতে মুক্ত-প্রবালের অফুরন্ত ভাণ্ডার। বাড়ীর গৃহিণী এবং দাসী এক টেবিলে ব'সে যে খেতে পারে, এক ভাবে যে পোষাক পর্‌তে পারে, একই রূপে যে চলাফেরা কর্‌তে পারে তা বর্মা দেশেই সম্ভব হ'য়েছে। বোধ হয় অন্যত্র নয়। এমন কি রাশিয়াও এপথে এতদূর অগ্রসর হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

আমিই অবিশ্রাম কথা ব'লে যাচ্ছিলাম। অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেহ-কেহও মাঝে-মাঝে মতামত প্রকাশ কর্‌ছিলেন। কিন্তু এইন্‌সোআর্থ ছিলেন চুপ। আর তাঁর মুখের উপর ছিল একটা প্রফুল্লতাময় হাসি। দম দিলেও ঘড়ী চলে কেবল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তার বেশী চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমারও যেন দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি যখন শেষ ক'রেছি তখন নূতন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আর সময় ছিল না। সেদিনকার মত সভা ভেঙে গেল। যখন বিদায়সূচক করমর্দনের জন্য হস্ত প্রসারিত কর্‌লাম তখনো লক্ষ্য করলাম এইন্‌সোআর্থের মুখে লেগে র'য়েছে সেই হাসি, যা নীরব হ'য়েও ছিল মুখর।

অনেকদিন পরে আবার একদিন দেখা হ'লো সেই মঙ্গলবারের বৈঠকে। সেদিন

লোকজন প্রথমে বিশেষ ছিল না। অবশ্য শেষের দিকে জনসংখ্যা কম পক্ষে বাইশ কি পঁচিশে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনও আমি উপস্থিত হ'য়েছিলাম এইন্‌সোআর্থের আগে। সেই হাসি-ভরা মুখ নিয়ে এইন্‌সোআর্থ যখন প্রবেশ করলেন ঘরে, তখন তাঁর হাতে ছিল একটি ছোট প্যাকেট।

"এটা কী?" প্রশ্ন কর্‌লেন সরকার-পত্নী।

কথা না ব'লে প্যাকেটটি এগিয়ে দিলেন এইন্‌সোআর্থ হাস্‌তে-হাস্‌তে। খুলে দেখা গেল মেয়েদের উপযোগী একটি চীনদেশীয় পোষাক। আমরা সবাই হেসে ফেল্‌লাম। প্রায় সমস্বরেই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"এতে কী হবে?"

"বাড়ী পাঠাব, মেয়ের জন্যে"—আস্তে-আস্তে জবাব দিলেন তিনি। মেয়ের নাম শুন্‌লাম "নোরীন"।

কে যেন প্রশ্ন কর্‌লে, "কেন? অদ্ভুত পোষাক-নৃত্যের সরঞ্জাম বুঝি?" ফ্যান্সিড্রেস-বল বিলাতী সমাজে খুব চলে।

আবার সেই হাসি। বল্‌লেন—"না। এদেশের কিছু-কিছু স্মৃতি আমি নিয়ে যেতে চাই দেশে।" এর চেয়ে অধিক কোনো কথা আর শোনা গেল না তাঁর মুখ থেকে। এডোআর্ড লী নামে একজন চীন দেশীয় তরুণ ছাত্রও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কয়েক মাস রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে তিনি অধ্যয়ন ক'রেছেন। সেইসব নিয়ে অনেক কথাবার্তা হ'লো আমাদের মাঝে।

সৌর চৌধুরীও সেদিন হাজির ছিলেন। বিলাত-ফেরৎ,—কেম্ব্রিজের পাশ-করা যুবক,— ইতিহাসে পণ্ডিত। তুর্কীতে ছিলেন অনেক দিন। শুন্‌লাম ইনি জজ আশুতোষ চৌধুরীর দৌহিত্র। এঁর বাবা উপেন চৌধুরী খনির কাজে এঞ্জিনিয়ার,—জার্মাণ দেশের ডিগ্রীওয়ালা লোক। সৌরবাবু তুর্ক আর ফরাসী ভাষা জানেন। তাঁর সঙ্গে বিনয়বাবুর কথাবার্তা চল্‌ছিল কী এক শব্দের কোষ্ঠী নিয়ে। তখন তাঁরা ভাষাবিজ্ঞানে ডুবে ছিলেন।

আমরাই আবার এইন্‌সোআর্থ যে জামাটি এনেছিলেন তা' নিয়ে হিসাব-নিকাশ করতে লাগলাম। জামাটি বড় হবে কি ছোট হবে ; শস্তা হ'য়েছে কি হয়নি ; এইটিই বাস্তবিক চীনদেশীয় পোষাক কি না। ইত্যাদি ইত্যাদি। বোতামগুলির তারিফ কর্‌লাম। চীনদের শিল্পের প্রশংসা করলাম। সরকার-পত্নী পারেন ত তখনই কিছু বোতাম কিনে নেন আর কি! ইন্দিরার কাছে পোযাকটি কৌতুকের সৃষ্টি কর্‌ল। কিন্তু এ সবের মধ্যে এইন্‌সোআর্থের বিশেষ কোনই সাড়া পাওয়া গেল না। হাসিতে মুখের প্রসন্নতা আরও সুস্পষ্ট ক'রে যেন ডুবে গেলেন কোথায় কোন্ অতলে। নিজেই হয়ত তার জবাব দিতে পারতেন না।

পর-পর দুদিন দেখা হ'ল, কিন্তু ইংরেজের যে-স্বভাবের সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত তার কোনই চিহ্ন পরিলক্ষিত হ'ল না এইনসোআর্থের মধ্যে। ভারতবাসী হাসে না ব'লে তার দুর্নাম আছে। বোধ হয় অন্যান্য গুণের সঙ্গে এই গুণটিও সে আয়ত্ত ক'রেছে ইংরেজেরই কাছ থেকে। আমাদের যাঁরা সুয়েজ খাল পার হ'য়েছেন তাঁরা বলেন,—"ইংরেজ হাসে সুয়েজের ওপারে।" হ'তে পারে তাঁদের কথাই সত্য। বর্ণালী যন্ত্রের সাহায্যে যেমন নক্ষত্র-লোকের স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি তেমন ক'রেই উদ্ধার করতে হয় ইংরেজ জাতির গুণাবলীর তথ্য। তাঁদের মুখে হাসি সোনার মতই দুর্মূল্য। সুয়েজ খালের এপারে আন্‌তে হ'লে আবকারি-সেপাইয়ের হাতে পড়বার

সম্ভাবনা। তা সত্ত্বেও এইন্‌সোআর্থ কী ভাবে যে হাসিটি "স্মাগ্‌ল্‌" (চুরি ক'রে আমদানি) ক'রে নিয়ে এসেছিলেন তা আমার অবোধ্য।

অনেকে মানুষ-জনের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চান কথা বলার জন্য এবং সময় কাটাবার জন্য। নির্বাক্‌ থেকে যাঁরা আমোদ পান, তাঁদের কোনো বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন হয় না। তথাপি স্বজাতীয়দের দল পরিত্যাগ ক'রে এইন্‌সোআর্থ কেন যে আমাদের মত নেটিভ্‌দের দলে এসে যোগ দিতেন তা' তখন বুঝতে পারি নি।

একদিন সরকার-পত্নীর মুখে শুন্‌তে পেলাম, এইন্‌সোআর্থ দেশে ফিরে যাচ্ছেন। যাঁর সম্বন্ধে এত কথা লেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে তখনো সংস্কার-মুক্ত হ'য়ে উঠতে পারি নি। কাজেই তাঁর বিদায়ের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উৎসাহের প্রাবল্য আমার ছিল না। তাঁর বিদায়-দিনে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নি।

আরও কয়েকদিন পরের ঘটনা। এইনসোআর্থ দেশে ফিরে গিয়েছেন। যাবার বেলায় বম্বে থেকে বিদায়ের পত্রখানি দিয়ে গেছেন আমাদের উপহার। বিনয়বাবুর বৈঠকখানার টেবিলের উপর দেখ্‌লাম র'য়েছে চিঠিখানা আমাদেরই প্রতীক্ষায়। বহু আবেগ ও আন্তরিকতার কথায় তা' পরিপূর্ণ।

১লা মার্চ ১৯৪৫

মার্চ ১৯৪৫

তারক দাশ ও "বৃহত্তর ভারত"

৩রা মার্চ ১৯৪৫

মন্মথ—আপনার সঙ্গে কত বার কত বিষয়ে মোলাকাৎ ক'রেছি। আজ জিজ্ঞেস কর্‌ছি—আপনি আমেরিকার তারকনাথ দাশকে চেনেন?

সরকার—নিশ্চয়। কেন? আজ হঠাৎ এই বাতিক চাগ্‌লো কেন?

লেখক—আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস একটা খবর ছেপেছে। তাতে তারক দাশের কথাই প্রধান।

সরকার—মার্কিণ সংবাদ-কোম্পানীর প্রচারে তারক দাঁড়াচ্ছে কেমন?

লেখক—মনে হচ্ছে যে, তিনি একজন করিৎকর্মা লোকই বটে। আপনার পারিভাষিক ব্যবহার কর্‌লাম।

সরকার—খবরটা কিরূপ? কোন্‌ কর্মক্ষেত্রের?

লেখক—"আনন্দবাজার পত্রিকা" (৫ ফেব্রুয়ারি ৪৫) হ'তে পড়ছি শুনুন, খবরটা বেরিয়েছে নিউইয়র্ক হতে—৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের। চিরকুট কেটে রেখেছি। আপনাকে দেখাবো ব'লে।

সরকার—প'ড়ে চলো।

লেখক—"ওআতুমল ফাউন্ডেশন অ্যাড্‌ভাইসরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডক্টর তারকনাথ দাশ জানাইতেছেন যে, মার্কিণ কোম্পানীতে ভারতীয় শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক ট্রেনিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আই-টি-এ) ও ওআতুমল ফাউন্ডেশনের মধ্যে এক

আলোচনা চলিতেছে।"

সরকার—বেশ, ভাল কথা। বুঝ্‌লে,—গোবিন্দরাম ওআতুমল গুজরাতী বেপারী। হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে কারবার। বিস্তর টাকা দিয়েছে ভারতীয় ছেলেমেয়েদেরকে মার্কিণ মুল্লুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। ওআতুমলকে আমি বৃহত্তর ভারতের আর-এক কর্মবীর সম্‌ঝে থাকি। সত্যিকার "বাপকা বেটা"।

লেখক—আপনি ওআতুমলকে জান্‌তেন?

সরকার—মনে পড়ছে না। হনলুলুতে দেখা হ'য়ে থাক্‌বে ১৯১৫-১৬ সনে। যাই-হ'ক,—ওআতুমল একটা কাজের মতন কাজ ক'রেছে। তার ধনভাণ্ডারটা ফাউন্ডেশন নামে পরিচিত। তারকের সঙ্গে এই ফাউন্ডেশনের যোগাযোগ ঠিকই হ'য়েছে। তারক এই ধরণের কাজে চিরকালই চরম উৎসাহী ও কর্মনিষ্ঠ।

লেখক—কেন? আগে কখনো তারক দাশ বিদেশে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপাড়া সম্বন্ধে কোনো কাজ ক'রেছেন কি?

সরকার—বিদেশে বিদেশীদের সঙ্গে ভারত-সন্তানের যোগাযোগ কায়েম করানো হচ্ছে তারক দাশের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। এই জন্যেই তো তারককে বলি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম গঠনকর্তা ও কর্মবীর। তারক বৃহত্তর ভারতের পাকা ঘরামি বা বাস্তুশিল্পী।

লেখক—কোথায়-কোথায় এই ধরণের কাজ আছে তারক দাশের?

সরকার—মার্কিণ মুল্লুকের নানা শহরে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা, বেপারীরা, অধ্যাপকেরা, সাংবাদিকেরা তারক দাশের মারফৎ নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি বা অন্য কোনো সাহায্য ভোগ করা ভারতীয়দের পক্ষে সহজসাধ্য হ'য়েছে তারক দাশের তদবিরে। মার্কিণ-ফের্তা ভারতবাসী সাক্ষ্য দিতে পার্‌বে যে, মার্কিণ শিল্প-বাণিজ্যের কারবারেও তারই সাহায্য অনেকের ঢোকা সম্ভবপর হ'য়েছে। অন্যান্য ভারতসন্তান ও তারকেরই মতন এই ধরণের কাজে হাত দেখিয়েছে।

লেখক—তারক দাশ আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনো দেশের খবর রাখেন কি?

সরকার—তারক দাশ জাপান, জার্মাণি, তুর্কী ও ইতালি এই চার দেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোক। এই চার দেশের নরনারীর সঙ্গে তার মাখামাখি বিস্তর। এই চার দেশেই কাটিয়েছে নানা বারে অনেক দিন। আর এই চার দেশেই তারক ভারতীয় নরনারীর জন্য রকমারি-সুযোগ তৈরি ক'রেছে। এই সকল কাজে অন্যান্য ভারত-সন্তানও তারকের সহকর্মী ছিল। অনেকগুলা বাপকা বেটা বাঙালীর বাচ্চা (ভারত-সন্তান) বিদেশে মোতায়েন আছে। কথাটা সকলেরই জেনে রাখা উচিত।

লেখক—তারক দাশের ইংরেজি রচনা দুটা-একটা কয়েক বছর আগে কাগজে প'ড়েছি মনে হচ্ছে। কিন্তু এই ধরণের কাজকর্ম সম্বন্ধে তো কিছুই কখনো শুনিনি।

সরকার—যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর ত্রিগুণা সেনকে চেনো? চিকিৎসক-ডাক্তার শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসুর নাম শুনেছো বোধ হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষকে বোধ হয় দেখেছো? এই ধরণের আরও অনেকে জার্মাণিতে গিয়ে তারকের সাহায্য পেয়েছে। অবশ্য অন্যান্য দেশের মতন জার্মাণিতেও তারকের জুড়িদার আর সহযোগী অন্যান্য কেজো ভারত-সন্তানও ছিল।

লেখক—জার্মাণিতে তারক দাশের সাহায্য পাওয়া গেল কী ক'রে?

সরকার—জার্মাণির মিউনিক শহরে জার্মাণ তদ্‌বিরে কায়েম হ'য়ে-ছিল "ডয়চে

আকাডেমী" (জার্মাণ পরিষৎ)। সেই পরিষদের একটা ভারত-বিভাগ ছিল। তার মারফৎ বোধ হয় শ'-খানেক ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী জার্মাণিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েছে, ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছে, ব্যাঙ্কে-বীমায় কাজ শিখেছে। জার্মাণ পরিষৎ আর ভারতবাসীর জার্মাণ বৃত্তিভোগ সম্বন্ধে তারকের হাত দেখ্‌তে হবে বিশেষভাবে। অবশ্য অন্যান্য ভারতীয় হাতও আছে। জার্মাণি-ফের্তা অনেকেই তারকের নিকট ঋণ স্বীকার কর্‌তে বাধ্য।

লেখক—আপনি অনেক সময় সার্বজনিক সভায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য, বৃহত্তর ভারত, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন জানি। লোকেরা ধর্‌তে পারে না। মনে করে—আপনি আজগুবি ব'ক্‌ছেন। দেশ-বিদেশে ভারতীয় নর-নারী কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ কর্‌ছে এইরূপ ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু দেখ্‌ছি তারক দাশের মতন বঙ্গসন্তান সম্বন্ধে আমরা নেহাৎ অজ্ঞ। এঁর কাজ বাস্তবিকই অতি উঁচুদরের। ওআতুমলের কাজও কী বিরাট!

সরকার—কী দেখ্‌লে? পত্রিকায় কিছু আছে না কি?

লেখক—শুনুন। "নিউইয়র্ক সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর দাশ বলেন, ফার্মেসি, ইলেক্‌ট্রিসিটি, মেকানিক্‌স্‌, রেডিও ও হাইড্রো-ইলেকট্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্যকরী শিক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্রদিগের নিকট হইতে অনেক দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দরখাস্তের মধ্য হইতে ফাউন্ডেশন এই প্রথমবার কয়েক জনকে পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষা সফল হইতে কার্য-তালিকা স্থায়িভাবে গ্রহণ করা হইবে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইবে। বৃত্তির জন্য এক হাজারেরও বেশী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। চার জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য আগামী গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য ভারত হইতে আনয়ন করা হইবে এবং কৃষি, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। মার্কিণ ও ভারতীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইয়াছে।"

সরকার—বুঝতে পার্‌লে,—"বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার" কাকে বলে? তারক দাশ বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার-বিদ্যায় ওস্তাদ্‌ কিনা? বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার হাজার-মুখো ও হাজার-ঢঙের কাজ। রকমারি কাজে রকমারি ভারত-সন্তান দেশ-বিদেশে বাহাল আছে। তারকও রকমারি কাজে নিজেকে মোতায়েন রেখেছে। বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে এই অধমের "বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর তের খণ্ডে (১৯১৪-৩৫) নানা সাক্ষ্য পাবে। তা ছাড়া "ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া" (১৯২২) বইটার ভেতর বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। আজকাল বইটার নাম হ'য়েছে "সোশিঅলজি অব রেসেজ্‌, কাল্‌চার্স অ্যান্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস" (১৯৩৯)।

লেখক—তারক দাশের গোড়াকার কথা কিছু জানেন?

সরকার—তারক গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের (১৯০৫) অন্যতম প্রথম চিহ্নোৎ। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন তখন কায়েম হব'-হব'। তার জন্য শহরে-মফস্বলে মুষ্টিভিক্ষার রেওয়াজ দেখা যেতো। প্রত্যেক জেলায়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য মুষ্টিভিক্ষা চালু ছিল। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির কাজে ও মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিলাম (১৯০৭)। ছেলেবেলায় তারক জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে মুষ্টিভিক্ষার ব্রতচারী ছিল। বোধ হয় ১৯০৬-০৭ সনেই সে জাপান হ'য়ে মার্কিণ মুল্লুকে হাজির হয়।

লেখক—আপনার সঙ্গে তারকের আলাপ আছে? কবে চেনা হ'লো? কোথায়?

সরকার—প্রথম দেখা ১৯১৫ সনে। জাপানের তোকিও শহরে। তখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৎসর।

লেখক—তারক দাশের বয়স কত হবে?

সরকার—বোধ হয় আমার চেয়ে বছর তিন-চান বড়। একষট্টি-বাষট্টি হবে মনে হচ্ছে।

লেখক—তারক দাশের স্ত্রীপুত্র কিরূপ?

সরকার—ছেলে-পিলে নেই। স্ত্রী মার্কিণ মেয়ে। স্ত্রীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় তারকের কাজ অনেক-কিছু সম্ভবপর হ'য়েছে। তারক মার্কিণ প্রজা।

লেখক—লেখালেখির কারবারে তারক দাশের হাত কেমন?

সরকার—"মডার্ণ রিভিউ", "ক্যালকাটা রিভিউ" ইত্যাদি মাসিকে বিস্তর লেখা বেরিয়েছে। তা ছাড়া বই আছে। প্রথম বইটা আন্তর্জাতিক জাপান বিষয়ক। ১৯২২ সনে বেরিয়েছিল। বইটা নিবেদিতার নামে উৎসর্গীকৃত। ছেলেবেলায় অর্থাৎ ১৯০৫-০৭ এর যুগে, তারক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দর্শনে হাতেখড়ি দেয়। মায় গেরুয়াও প'রেছিল শুনেছি।

লেখক—অন্যান্য বইয়ের নাম জানেন?

সরকার—"ইন্ডিয়া ইন্ ওয়ার্ল্ড্ পলিটিক্স্" (১৯২৩), "সাভারেণ রাইট্স্ অব ইন্ডিয়ান প্রিন্সেজ্" (১৯২৫), "বৃটিশ এক্স্প্যান্শন ইন টিবেট" (১৯২৭), আর "ফরেণ পলিসি ইন দি ফার ঈস্ট" (১৯৩৬)।

ডাক্তার-কবিরাজের একাল-সেকাল

৫ই মার্চ ১৯৪৫

মন্মথ—এইবার একটা কিম্ভূতকিমাকার বিষয়ে মোলাকাৎ চালাবো। আজকালকার ডাক্তারদের ভেরত সার্বজনিক কাজে পাওয়া যায় কাকে-কাকে?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) ডাক্তারদের সমিতি, পরিষৎ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান একপ্রকার ছিল না। সবে তে-রে-কা-টা সাধা হচ্ছিল মাত্র। একালে ডাক্তার-পরিষৎ চল্‌ছে বেশ জোরের সহিত। কাজেই কল্‌কাতায় তো বটেই,—মফস্বলেও,—ডানপিটে ডাক্তারের অভাব নাই। আন্দোলন চালাবার কাজে তাঁরা লেগে র'য়েছেন। মামুলি রাষ্ট্রিক, আর্থিক বা সামাজিক আন্দোলনের কথা বল্‌ছি না। সে তো আছেই। তার ওপর সরকারী চোখে আর সরকারী মাপে ডাক্তারি পেশার উন্নতি সাধন করানো হ'চ্ছে এই সকল পারিষদিক সমিতিওয়ালাদের প্রধান ধান্ধা।

লেখক—কয়েকজনের নাম কর্‌বেন?

সরকার—সেকালে সার্বজনিক রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক আন্দোলন চালাতেন ডাক্তারদের ভেতর নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য আর সুন্দরী মোহন দাশ। সুন্দরী ছিলেন বিপিন পালের বন্ধু। আজও বেঁচে র'য়েছেন। সার্বজনিক কাজে একালেও তাঁর গলা শোনা যায়,—কলমও দেখা যায় কখনো-কখনো।

লেখক—এই ধরণের সার্বজনিক কাজ আজকাল কোন্-কোন্ ডাক্তার কর্‌ছেন?

সরকার—প্রথমেই বল্‌তে হবে—বিধান রায়। তারপর বোধ হয় অমূল্য উকিল। সমাজ-সেবাবিষয়ক নানা আসরে এঁদের দুজনেরই ডাক পড়ে। অধিকন্তু রাষ্ট্রিক আন্দোলনে বিধানের যোগাযোগ বোধ হয় সেকালের নীলরতনের চেয়েও বেশী। রাষ্ট্রিক কারবারে অমূল্যকে বড়-একটা দেখা যায় না।

লেখক—মাত্র দু'জনের নাম কর্‌ছেন?

সরকার—আগেই ব'লেছি,—ডাক্তারি পেশার ইজ্জদ বাড়াবার জন্য অনেকেই উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। মাত্র কয়েক জনের নাম ক'রে লাভ না'ই। তা ছাড়া সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্মীদের ভেতর কল্‌কাতায় ও মফস্বলে অনেক ডাক্তার সার্বজনিক মঙ্গলের কাজে বেশ-কিছু সময় ও মগজ দিতে অভ্যস্ত।

লেখক—স্বাস্থ্য বিষয়ক কয়েকটা আন্দোলনের নাম করুন না?

সরকার—যাদবপুরের যক্ষ্মা-হাসপাতাল খাড়া ক'রেছেন ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়। অমূল্য উকিলের সঙ্গে ব্রতচারী সমিতির পল্লী-সেবায় ব্রতী র'য়েছেন ডাক্তার দবিরুদ্দিন আহম্মদ। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের পরিচালক কর্ণেল অনিল চ্যাটার্জি সরকারী তাঁবে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য-ও-সেবার শিক্ষালয় কায়েম কর্‌বার জন্য অনেক দিন ধ'রে মাথা ঘামিয়েছেন। এই জন্য সরকারী কমিটি কায়েম হ'য়েছিল। গোটা পনের-বিশ বৈঠক ব'সেছিল। তাতে বিধান রায়, সুন্দরী দাশ ইত্যাদি ডাক্তারদের সঙ্গে এই অধম ও হাজির থাকতো (১৯৩৯-৪১)। যেখানে-সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্য-প্রচার চালানোর দিকে অনিলের মেজাজ খেল্‌তো। আজকাল ডাক্তার সৌরীন ঘোষ যৌন-ব্যাধির দৌরাত্ম্য হ'তে আত্মরক্ষার আন্দোলনে দেশের লোককে সজাগ ক'রে তুল্‌ছেন। সুবোধ মিত্র নিজ জেলা যশোহরের সার্বজনিক কাজে সময় দিয়ে থাকেন।

লেখক—আপনার ইস্কুল-কলেজের বন্ধুদের ভেতর কল্‌কাতার ডাক্তার কে-কে?

সরকার—আসল ছেলেবেলার অতি-নিকট ঘরোআ বন্ধু হচ্ছে দীনেশ চক্রবর্তী। অস্ত্রচিকিৎসক,—মেডিক্যাল কলেজের সার্জন, ক্যামবেলের প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু দীনেশ কোনো দিন সার্বজনিক আন্দোলনে মাথা খেলায় নি। কাজেই পেশার বাইরে দীনেশের নামডাক বোধ হয় খুবই কম। আমার বয়স যখন দশ-এগার (১৮৯৮) তখন আমরা একসঙ্গে মালদহের জেলা ইস্কুলে প'ড়েছি। দীনেশের বাবা গোলক চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের হেড্‌মাস্টার। ডাক্তার সত্যেন রায় আর দবিরুদ্দিন আহম্মদের সঙ্গে ভাব ১৯০১ সন থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিকে একসঙ্গে ছিলাম। ১৯০৩ সনে ইডেন হিন্দু হস্টেলের বাসিন্দা ছিল চারু সান্যাল ও হেমেন বক্‌সি। হেমেন সহপাঠী ও বটে। তা ছাড়া গিরীন্দ্রশেখর বসুও ঐ সময় হ'তেই প্রেসিডেন্সিতে এক আড্ডার ইয়ার।

লেখক—কলেজ ছাড়ার পর এঁদের সঙ্গে আপনার ভাব ছিল?

সরকার—নিশ্চয়। এরা প্রত্যেকেই আমাকে—আমার কাজে—সাহায্য ক'রেছে নানা উপায়ে। দীনেশ, সত্যেন, দবির, চারু আর গিরীন,—এরা সকলেই স্বদেশী যুগে (১৯০৫-'১৪) আমার পরিচিত যে-কোনো ছেলে-বুড়োর ডাক্তার-বন্ধু ছিল। আমার নাম নিয়ে তাদের কাছে হাজির অনেকেই হ'তো। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির নাম ক'রেও কেউ কল্‌কাতায় এলে এরা তাদেরকে বন্ধুভাবে দেখ্‌তো-শুন্‌তো। ঠিক এই রকমের আর একজন ডাক্তার-বন্ধু ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলি। সেকালের এঁর কাছে মালদহ-চিহ্নিত অনেকেই উপকার পেয়েছে। প্রতুল অবশ্য বয়সে বেশ-কিছু বড়।

লেখক—নামজাদা কবিরাজদের ভেতর সার্বজনিক কাজে পাওয়া যায় কাকে-কাকে মনে করেন।

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে পাথুরিয়াঘাটার দ্বারিকানাথ সেন ছিলেন নামজাদা কবিরাজদের নং ১। তাঁর ভাইপো সত্যেন আমার সহপাঠী ছিল প্রেসিডেন্সিতে প্রথম বার্ষিকে (১৯০১)। তাঁর ছোট ছেলে যতীন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে আমাদের ছাত্র ছিল (১৯০৭)। তাঁর বড় ছেলে যোগীনের সঙ্গে স্বদেশী-স্বরাজ নিয়ে অনেক সময়ে আমার বাক্-বিতণ্ডা চল্‌তো। যোগীন আর যতীন দুজনেই্ কবিরাজ। দ্বারিক কবিরাজ নিজে বোধ হয় কোনো সভাসমিতিতে হাজির হন নি। মনে প'ড়্ছে না।

লেখক—একালের কবিরাজেরা সার্বজনিক কাজে কতটা অগ্রণী?

সরকার—আমার বিশ্বাস,—অনেক কবিরাজই্ আজকাল দেশের কাজে মাথা দিচ্ছেন। ১৯২৫-এর শেষে দেশে ফিরবার পর প্রথমেই নাম শুনি কবিরাজ শ্যামাদাসের। চিত্তরঞ্জনের বন্ধু ও সহকর্মী হিসাবে তাঁর অন্যতম ইজ্জদ ছিল। তাঁকে স্বরাজ-সাধক স্বদেশসেবক রূপেই্ দেখ্‌তে পাই। আমার "পণ্ডিতজী" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মারফৎ তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর ছেলে কবিরাজ বিমলানন্দ বাপের স্বরাজী-আদর্শেই্ জীবন চালাতে অভ্যস্ত। শ্যামদাস-বৈদ্য-শাস্ত্র-পীঠের সংশ্রবে অনেক কবিরাজ সার্বজনিক কাজের আওতায় এসেছেন। কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেনের সঙ্গে নানা আসরে মোলাকাৎ হয়। কল্‌কাতা কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলার হচ্ছেন কবিরাজ সত্যব্রত সেন। তিনিও সার্বজনিক। আবার রোটারি ক্লাবের সভ্যও বটে।

লেখক—স্বদেশী যুগে আপনার সঙ্গে ডাক্তার নীলরতনের চেনা-শোনা ছিল?

সরকার—নীলরতন ছিলেন ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু। কাজেই্ সতীশবাবুর চেনা হিসাবে নীলরতনের হাতে ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেয়েছি অনেকবার। সেকালে তিন-সাড়েতিন বছরে (১৯০৭-১১) বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট বার ম্যালেরিয়ায় প'ড়েছি। প্রত্যেক বারই মেয়াদ ছিল দিন দুই-তিনেক। সতীশবাবুর খাতিরে ডন সোসাইটির হারাণ চাক্‌লাদার, রাধাকুমুদ, রবী ঘোষ ইত্যাদি অনেকেরই ডাক্তার-মুরুব্বি ছিলেন নীলরতন।

লেখক—কবিরাজী চালাতেন না?

সরকার—নিশ্চয়। দ্বারিক কবিরাজের ওষুধ পেতাম সোজাসুজি অথবা যোগীন কবিরাজের মারফৎ। একালে,—অর্থাৎ ১৯২৫-এর পর তেমনি শ্যামাদাস আর বিমলানন্দ হচ্ছেন এই অধমের পক্ষে কবিরাজীর স্তম্ভ। সেকালে যামিনী কবিরাজের ওষুধও ঘরে এসে জুট্‌তো মনে পড়ছে।

লেখক—হোমিওপ্যাথির সাহায্য নিতেন না?

সরকার—মনে পড়্‌ছে না। তবে হোমিওপ্যাথির স্বপক্ষে মতিগতি সেকালেও ছিল। একালেও আছে। নাক্‌স্ ভূমিকা, অ্যাকোনাইট, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া ইত্যাদি ওষুধের নাম-কাম জানি বোধ হয় ১৯০৫ সন হ'তেই। শিবচন্দ্র দত্ত'র মামা ক্ষেত্রনাথ বসু একালে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসায় আমাদের বাড়ীতে নাম ক'রেছেন। তাঁর হাত-যশ ছিল আমার স্ত্রীর কাছে খুব বেশী। মজার কথা। কিন্তু জার্মাণরা জার্মাণিতে হোমিওপ্যাথির খবর রাখে না।

লেখক—তখনকার দিনে নামজাদা হোমিওপ্যাথ কে-কে ছিলেন?

সরকার—প্রতাপ মজুমদার আর দ্বারিকা রায়। দ্বারিকা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাদের অধ্যাপক প্রসন্ন রায়ের ছোট ভাই। প্রতাপ মজুমদারের ছেলে জিতেন একালের সুপরিচিত হোমিওপ্যাথ। আজকাল হোমিওপ্যাথির কলেজ হ'য়েছে,—হাসপাতাল হ'য়েছে। দেশে হোমিওপ্যাথির বাড়তি বাঞ্ছনীয়।

মার্চ ১৯৪৫

বাঙালী এঞ্জিনিয়ারদের দল

৯ই মার্চ ১৯৪৫

সুবোধ—রেলের চাক্‌রে হবার পর লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির দিকে নজর যেতে সুরু ক'রেছে। আচ্ছা বলুন তো বাংলাদেশে এঞ্জিনিয়ারদের কাজ-কর্ম কিরূপ?

সরকার—উকিল আর ডাক্তারদের সমান করিৎকর্মা এঞ্জিনিয়ার আজও নাই। অবশ্য খনিতে-ফ্যাক্‌টরিতে এঞ্জিনিয়ারদের দল বাড়্‌ছে। সরকারী ইমারত আর রাস্তাঘাট বিভাগে কতকগুলা বাঙালী এঞ্জিনিয়ার কাজ করে। অনেকদিন হ'তেই জলসেচ বিভাগে আর রেল-বিভাগেও বাঙালী এঞ্জিনিয়ারদের টিকি দেখা যায়। তা ছাড়া কল্‌কাতা কর্পোরেশনের নানা বিভাগে এঞ্জিনিয়ার বাহাল আছে। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং পেশাটা এখনো বাঙালী সমাজে যেন পেকে ওঠে নি,—মনে হচ্ছে। তবে বাড়্‌তির দিকে র'য়েছে।

লেখক— এঞ্জিনিয়ারদের নাম বড়-একটা শোনা যায় না কেন?

সরকার—তার প্রধান কারণ, এঞ্জিনিয়ার যারা হয় তারা সার্বজনিক সভায় গলাবাজি কর্‌তে অভ্যস্ত নয়। ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার-পরিষৎ কায়েম হ'য়েছে। বোধহয় বছর বিশ-পঁচিশ হ'লো! তাতে বাঙালীর ঠাঁইও আছে। এই পরিষদের বৈঠকে বকাবকি-হাতাহাতি নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সে-সবে জনসাধারণের নজর যাওয়া সম্ভবপর নয়। তার সংবাদ খবরের কাগজে বেরুলেও লোকেরা তার সন্ধান রাখে না।

লেখক—কেন?

সরকার—কারণ অতি সোজা। এঞ্জিনিয়ারদের পেশা হচ্ছে যন্ত্র-ঘটিত, লোহা-লক্কড়-সংক্রান্ত। বাঙালী সমাজের লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা সাহিত্য বোঝে, আইন বোঝে, মাস্টারি বোঝে, ডাক্তারি-কবিরাজি-হোমিওপ্যাথি বুঝে। কিন্তু ইস্পাত, ধাতু, সড়ক-মেরামত পুল-তৈয়ারি, গ্যাস, বিজলী, নদীর মোড়-ফেরানো, খাল বাঁধা ইত্যাদির কারচুপী বাঙালীর মহা-মহাদিগ্‌গজ পণ্ডিতেরাও বুঝে-সুঝে না। কাজেই সংবাদিকেরাও এঞ্জিনিয়ারদের চলাফেরা, বাক্‌বিতণ্ডা, সভা-সমিতি ইত্যাদি কারবার সম্বন্ধে অনেকটা নির্বিকার। যদি বা কাগজে কিঞ্চিৎ-কিছু ছাপা হয়, তারদিকে মাথা খেলাবার পাঠকও খুবই কম। তবে সাংবাদিকরা ইচ্ছা কর্‌লে এই সকল দিকে পাঠকদের নজর দেওয়াতে পারে। তার চেষ্টা করা উচিত। চপলা ভট্টাচার্য আর সুরেশ মজুমদার ইচ্ছা কর্‌লে "আনন্দবাজার" এই দিকে লোক-শিক্ষিত হ'তে পারে।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, বাঙলা দেশে এঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা অনেক?

সরকার—নিশ্চয়ই কম। বেশী হ'লে বাঙালী জাতের চেহারা ব'দ্‌লে যেতো। অধিকন্তু যে-কটা এঞ্জিনিয়ার বাঙালী সমাজে আছে তার অধিকাংশই "সিভিল" অর্থাৎ ঘরবাড়ী-রাস্তাঘাট-সংক্রান্ত লোক। যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক, ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা আজও নগণ্য। খনি, অটোমোবিল, রেডিও ইত্যাদি সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ার নাই বললেও চলে। শিল্পের সকল বিভাগেই এঞ্জিনিয়ারের দুর্ভিক্ষ।

লেখক—সংখ্যা বাড়্‌তে পারে কী ক'র্‌লে?

সরকার—বাঙালীর বাচ্চা শয়ে-শয়ে নানা ঢঙের এঞ্জিনিয়ার হবার সাধনা করুক। ম্যাট্রিক ক্লাস হ'তেই—তার আগে হ'তেই ছেলেরা দলে-দলে ছোট-বড়-মাঝারি এঞ্জিনিয়ারিং -ইস্কুলে ঢুক্‌তে থাকুক। অর্থাৎ আজই দেশের ভেতর রকমারি এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল-কলেজ চাই। তার ব্যবস্থা যদ্দিন না হ'চ্ছে তদ্দিন বাঙ্‌লার নরনারীর রক্ত সাফ্ হবে না। যন্ত্রপাতির শালসা পরিবেষণের বয়েৎ ঝেড়ে চ'লেছি আজ বছর চল্লিশ ধ'রে,—নানা ঢঙে, নানা উপলক্ষ্যে।

চাই শ-তিনেক এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল

সুবোধ—টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব কিরূপ?

সরকার—কত জায়গায় এ বিষয়ে ব'কেছি-লিখেছি তার ঠিক নাই।

লেখক—এঞ্জিনিয়ার গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য কী করা উচিত,—দু-এক কথায় বলুন। ("চৌদ্দ-আঠার বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য পেশা-পাঠশালা", পৃঃ ৬৯২-৬৯৩)

সরকার—ধরা যাক,—বাঙলাদেশে আজকে হাজার সাড়ে-তিন ম্যাট্রিক ইস্কুল আছে। বর্তমানে আমার বিবেচনায় কম্‌-সে-কম শ'তিনেক টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল থাকা উচিত। গড়ে ফি-জেলায় প্রায় গোটা বারো। যন্ত্রপাতি ঘাঁটা-ঘাঁটি করায় আর গ্যাস-বিষ ঢালাঢালি করার রেওয়াজ চাই চোদ্দো-ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের। তাহ'লে তাদের হাত-পা আর চোখ-নাক তৈয়ের হ'য়ে যাবে। তার পর মনে রাখা উচিত যে, একালে ম্যাট্রিক পাশ হয় হাজার পঁচিশেক। এদের ভেতর যার-যার পয়সা আছে তারা সব্বাই আই-এ বা আই-এসসি কলেজে ঢোকে। এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

লেখক—আপনি কী চান? আর একটু পরিষ্কার ক'রে বল্‌লেন?

সরকার—ছয় কোটি বাঙালীর জন্যে চাই আজ ঃ—(১) শ' তিনেক ম্যাট্রিকদরের এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল, (২) গোটা ত্রিশেক বি-এ, বি-এস্‌-সি দরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর (৩) গোটা ছয়েক যাদবপুর ও শিবপুর দরের এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজ। তাহ'লে বাঙলায় এঞ্জিনিয়ারিংয়ের আবহাওয়া কায়েম হ'তে পারে। এসব অবশ্য দেশের বর্তমান অবস্থায় আশমানের চাঁদ বিশেষ। হবার সম্ভাবনা নাই।

যন্ত্রপাতির আবহাওয়ার অভাব

লেখক—কেন? বর্তমানের অবস্থা কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—আজকাল ম্যাট্রিক ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা লাখ ছয়েক (৬০০,০০০)। তথাকথিত টেক্‌নিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় হাজার আষ্টেক (৮০০০) মাত্র। এই আট হাজারকে আমার পাঁতি-মাফিক যন্ত্রপাতির সাধক বলা চল্‌বে না। যাহ'ক তবুও মন্দের ভাল। কিন্তু ছ-লাখ মামুলি ছেলে-মেয়েদের পাশে আটা হাজার টেক্‌নিক্যাল ছেলে-মেয়ে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কাজেই যন্ত্রপাতির আবহাওয়া বাঙালী সমাজে গ'ড়ে উঠ্‌বে কী ক'রে? যন্ত্রনিষ্ঠার ছোকরা প্রতিনিধি চাই অগণিত।

লেখক—উচ্চশিক্ষার আবহাওয়ায় যন্ত্রপাতির আবহাওয়া কেমন পাওয়া যায়?

সরকার—আই এ-আই এস সি হ'তে এম এ-এম এস সি পর্যন্ত ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা নাক গুন্‌তিতে প্রায় হাজার চৌত্রিশ (৩৪,০০০)। শিবপুরের সরকারী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করে শ-আড়াই (২৫০) মাত্র। ব্যস্‌। যাদবপুরের হাজার-বারশ' বাদ দিয়ে যাচ্ছি। ফি-বছর হাজার চারেক (৪০০০) বি এ-বি এস সি, এম এ-এম এস সি বেরোয়। শিবপুর ছাড়ে মাত্র ৩৪ জন এঞ্জিনিয়ার-গ্র্যাজুয়েট।

লেখক—হাজার আষ্টেক ছেলে-মেয়েদের জন্য বাঙ্‌লা দেশে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল আছে কটা?

সরকার—সরকারী সংখ্যা-দপ্তরের হিসাবে ১৬৫। আবার ব'লে রাখ্‌ছি আমি যে-ধরণের ৩০০ যন্ত্রপাতির ইস্কুল চাই সেই ধরণের ইস্কুল বোধ হয় গোটা পঁচিশেকও আছে কি না সন্দেহ। আমাদের অবস্থা নেহাৎ "সঙ্গীন্‌"। এ জাত্‌কে ঠেলে তোলা মুখের কথা নয়।

ফ্যাক্‌টরি হচ্ছে এঞ্জিনিয়ারদের আসল ইস্কুল-কলেজ

১২ই মার্চ ১৯৪৫

সুবোধ—এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল-কলেজে কোন্‌-কোন্‌ বিষয় শেখানো উচিত?

সরকার—টেক্‌নিক্যাল বা এঞ্জিনিয়ারিং শব্দে কখনো-কখনো আমি হরেক-রকম পেশা সম্ঝে থাকি। চাষ, গো-পালন, পাখী-পোষা, সমাজ-সেবা, ধাত্রীবিদ্যা—ইত্যাদিও বুঝ্‌তে হবে। অপর দিকে খনির কাজ, ওষুধ তৈরীর কাজ, রেডিও, অটোমোবিল ইত্যাদিও এই সবের ভেতর পড়্‌বে। সে-সম্বন্ধে বর্তমানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে একটা কথা এখনি বল্‌তে চাই। ফ্যাক্‌টরি-কারখানায় ছেলেদেরকে হাতে-কলমে কাজ করানো জরুরি। ইস্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরি-কারখানায় যতটুকু হাতে-কলমের কাজ হয় তাতে চল্‌বে না। সর্বদাই চাই পেশাদার কারখানা ফ্যাক্‌টরির সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল-কলেজের নিবিড় যোগাযোগ। খাঁটি কারখানায় আর ফ্যাক্‌টরিতে কাজের সুযোগ পেলে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল-কলেজে না পড়্‌লেও চলে। এই ধরণের চরমপন্থী মত ঝাড়া আমার দস্তুর। আজও এই মত চালাতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রাণের কথা হচ্ছে কারখানায় কাজ। ফ্যাক্‌টরি হচ্ছে যন্ত্রপাতি আর এঞ্জিনিয়ারিংয়ের আসল ইস্কুল-কলেজ।

লেখক—কখনো কোনো সার্বজনিক সভায় এই মত ঝেড়েছেন?

সরকার—হালের কথা বল্‌ছি। সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের সাতষট্টি বৎসর চল্‌ছে,—এই উপলক্ষ্যে উৎসব হ'লো (৫ই জানুয়ারি ১৯৪৫)। সভাপতি ছিলেন জজ বিজন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য অনেক কথার ভেতর পাঁতি ঝাড়া গেল যে,—কারখানা হ'চ্ছে এঞ্জিনিয়ারিংয়ের আসল ইস্কুল। ব্যাঙ্কের আফিস, বীমার আফিস, বহির্বাণিজ্যের আফিস সেইরূপ হচ্ছে বাণিজ্য-বিদ্যার আসল পাঠশালা। গ্রেট স্বদেশী এম্পোরিয়ামের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে ২৬শে ফেব্রুয়ারি। তাতে বক্তা ছিলেন কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডক্টর শান্তি দত্ত, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের চেয়ারম্যান সুরেশ রায়, হুগলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ধীরেন মুখার্জি, সর্বভারতীয় কাচ-প্রস্তুত-কারক সমিতির প্রেসিডেন্ট ধীরেন সেন, আর বঙ্গীয় লেজস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লির সভ্য ডক্টর নলিনাক্ষ সান্ন্যাল। এই সভায়ও ব'কেছি ঠিক ঐ ধুআয়। তা ছাড়া কাল মজুম.্াার ব্যাটারীজ কোম্পানীর নবগৃহে প্রবেশ হ'লো (১১ মার্চ)। সেই উপলক্ষ্যে স্যানিটারি এঞ্জিনিয়ার শশী চক্রবর্তী, কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী আর ইস্টার্ণ অ্যাক্‌কিউমিউলেটার কোম্পানীর মালিক রবীন্দ্রনাথ কুমার ইত্যাদি কয়েকজন বক্তা ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সভায়ও কারখানা-ফ্যাক্‌-টরিকেই এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যার পীঠস্থান ব'লেছি।

লেখক—কারখানায় আর ইস্কুলে আপনি এত তফাৎ ক'র্‌ছেন কবে থেকে?

সরকার—ইস্কুল-কলেজের চেয়ে কারখানাকে বড় বিবেচনা করার মেজাজ পায়দা হ'য়েছে ১৯০৫-৭ সনে। আমার শিক্ষাবিজ্ঞান-গ্রন্থাবলীর আসল বনিয়াদই এইখানে। চিরকালই এই অধম "কেজো" দর্শনের স্রষ্টা বা প্রবর্তক। আগেকার মেজাজ আজও র'য়েছে। চোদ্দ বৎসর বিদেশী অভিজ্ঞতার ফলে মেজাজটা আরও জমাট বেঁধেছে বল্‌তে পারি। বর্তমান লড়াইয়ের ধরণ-ধারণ দেখে এই মেজাজ চরম ভাবে পাকা-পোক্ত হ'য়ে গেল।

লেখক—স্বদেশী এম্‌পোরিয়াম আর মজুমদার ব্যাটারীজ কোম্পানীর উৎসবে সভাপতি কাকে করা হ'য়েছিল?

সরকার—এই অধমকে।

লেখক—স্বদেশী এম্‌পোরিয়ামের কর্মকর্তা কে?

সরকার—দুজনকে প্রধান করিৎকর্মা লোক মনে হ'লো। এক জনের নাম প্রেমনীহার নন্দী। আর একজন তারাপদ চ্যাটার্জি। বঙ্গ-বিপ্লব আর স্বদেশী যুগের ঝাঁজ এঁদের দুজনেরই কাজকর্মে মালুম হয়।

লেখক—মজুমদার ব্যাটারীজ-এর করিৎকর্মা লোক কে?

সরকার—প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন কালীপদ মজুমদার। তিনিই বর্তমানে কর্মকর্তা র'য়েছেন।

চাষ, বাণিজ্য ও এঞ্জি

লেখক—আপনি এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুলের কথা বল্‌লেন এত? চাষ-আবাদ আর ব্যবস্যা-বাণিজ্য বিষয়ক ইস্কুল-কলেজ সম্বন্ধে আপনার পাঁতি কিরূপ?

সরকার—আর্থিক উন্নতির প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে সম্প্রতি কথা বল্‌ছি না। বক্‌ছি

একমাত্র কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, লোহা-লক্কড়, গ্যাস-বিষ, সোডা-অ্যাসিড ইত্যাদি বস্তুবিষয়ক কারখানা, ফ্যাক্টরি, পঠন-পাঠন, ইস্কুল-কলেজ-পরিষৎ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে। চাষ-আবাদ, গো-পালন, মুর্গীর চাষ, মধুর চাষ, ব্যাঙ্ক, বীমা, বহির্বাণিজ্য, যান-বাহন, দোকানদারি, বাজার-বিদ্যা, টাকাকড়ি ইত্যাদি বস্তুও এই অধমের বকাবকিতে অনেক ঠাঁই পেয়ে থাকে।

লেখক—এখন বল্‌ছেন না কেন?

সরকার—সে-সব বর্তমানে আলোচ্য নয় ব'লে বাদ দিয়ে যাচ্ছি। অধিকন্তু যখনই আমি শিল্প-নিষ্ঠা, যন্ত্র-নিষ্ঠা, শিল্পোন্নতি, শিল্প-বিপ্লব ব'কে থাকি তখনই চাষ-নিষ্ঠা আর বাণিজ্য-নিষ্ঠা তার আনুষঙ্গিকরূপে ধ'রে নিই। কৃষি-বিপ্লব আর বাণিজ্য-বিপ্লব শিল্প-বিপ্লবের অর্ন্তগত,—এই আমার চিরকেলে মত। সব বইয়েই এই ধুআ চালিয়েছি। সুতরাং যন্ত্র-নিষ্ঠা আর এঞ্জিনিয়ারিং-নিষ্ঠা, কারখানা-নিষ্ঠা আর ফ্যাক্টরি-নিষ্ঠা বাড়্‌তে থাক্‌লে চাষের উন্নতি, পশু-পালনের উন্নতি, দুধের উন্নতি, ব্যাঙ্কিং-ব্যবসার উন্নতি, বীমা-ব্যবসার উন্নতি ইত্যাদি রকমারি কৃষি-বিষয়ক ও বাণিজ্যিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

লেখক—অবশম্ভাবী ব'লে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নাই?

সরকার—এই সকল উন্নতি অবশ্য গৌণ কথা,—তবে পরিমাণে কম নয়। চাষ-আবাদের উন্নতির জন্য চাই সার, জলসেচের যন্ত্রপাতি, হালের উন্নতি, গাড়ীর উন্নতি, রাস্তার উন্নতি। এই সবই এঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে সুজড়িত। কাজেই এঞ্জিনিয়ারদের বাড়্‌তিতে চাষের বাড়্‌তি অনেক সময়েই হাতের পাঁচ বিশেষ। কিন্তু বর্তমানে আম চাষ-বিদ্যালয় আর বাণিজ্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোনো কথা বল্‌ছি না। স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে আলবৎ।

লেখক—চাষ আর বাণিজ্য-বিষয়ক উন্নতি সম্বন্ধে আপনি কোন্-কোন্ উপলক্ষ্যে স্বতন্ত্র পাঁতি দিতে অভ্যস্ত?

সরকার—যখনই কোনো বাণিজ্য-কলেজে এই অধমকে ডেকে নিয়ে যায় তখনই ব্যাঙ্ক-বীমা, আমদানি-রপ্তানি, যান-বাহন, টাকার বাজার ইত্যাদি বিষয়ে ব'ক্‌তে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে চাষ-আবাদের কথাও পাড়ি আবার যন্ত্রপাতি-কলকব্জার কথাও বলি। এই আমার আটপৌরে দস্তুর। কেননা চাযের ফসল আর লোহা-লক্কড়ঘটিত জিনিযপত্রই বাজারে কেনা-বেচা হয়। আমদানি-রপ্তানির সামগ্রীই হ'লো এই সব বস্তু। কাজেই বাণিজ্য-বিদ্যালয়ের উন্নতি অসম্ভব যদি না সঙ্গে-সঙ্গে চাষের উন্নতি আর ফ্যাক্টরি-কারখানার উন্নতি হয়।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে বাঙ্‌লা দেশে কৃষি-বিদ্যালয় আর বাণিজ্য-বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট?

সরকার—নিশ্চয়ই না। তবে লড়াইয়ের হিড়িকে বাণিজ্য-বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেশ-কিছু বেড়েছে। সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, রিপণ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিভাগ বেশ-কিছু ফুলে উঠেছে। কিন্তু কৃষি-বিদ্যালয় বা কৃষি-কলেজের খবর বাঙলাদেশে বেশী পাওয়া যায় না। তবে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, চাষের উন্নতি আর যন্ত্র-নিষ্ঠার বাড়তি না ঘ'ট্‌লে বাণিজ্য-বিষয়ক পড়ুয়া আর পাশ-করাদের হাতে লক্ষ্মী ধরা দেবে না। বাণিজ্যের জন্য চাই চাষ, চাই শিল্প।

ষাট জন মজুরের জন্য ফ্রান্সে এক-এক জন এঞ্জিনিয়ার

লেখক—বাঙ্‌লা দেশে কতগুলা এঞ্জিনিয়ার থাক্‌লে আপনার বিবেচনায় বাঙালী জাতের যথোচিত অভাবপূরণ হ'তে পারে?

সরকার—মেপে-জুপে বলা সহজ নয়। তবে অভাব আর জোগান-জরীপ করার কায়দাটা বাৎলাতে পারি।

লেখক—বাৎলিয়ে দিন। দেখি কোথায় আমরা র'য়েছি।

সরকার—র'য়েছি চরম দুর্দশায়,—অতল গভীরে। শুধু একটা বিদেশী দৃষ্টান্ত দেবো। একটা "বাঘা"-দেশের দৃষ্টান্ত। তার কাছা-কাছি যাওয়া বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে—ভারত-সন্তানের পক্ষে—কোনো দিন সম্ভব কিনা সন্দেহ।

লেখক—তবুও শুনি আপনার বাঘা-বাঘা দেশের মাপকাঠি কিরূপ।

সরকার—কয়েক বছর হ'লো—এই লড়াইয়ের আগে আর বিংশ-শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের (১৯১৪-১৮) পরে ফ্রান্সে একবার এঞ্জিনিয়ারদের আদমসুমারি লওয়া হয়। বোধ হয় ১৯২১-২২ সনে।

লেখক—কী দেখা গেলো?

সরকার—ফ্রান্সে তখন ছিল ফ্যাকটারি-কারখানায় ৫,০০০,০০০ মজুর। এতগুলা মজুরের ওপর বৈজ্ঞানিক আর যান্ত্রিক কর্তৃত্ব চালাবার জন্যে এঞ্জিনিয়ার ছিল ৮,০০০।

লেখক—এতে কী বোঝা যায়?

সরকার—জরীপ থেকে বুঝা গেল যে, ফি ৬০ জন মজুরের জন্য দরকার হয় এক-এক জন এঞ্জিনিয়ারের। তামাম ভারতে ১৯৩০-৩৫ সনে মজুর-সংখ্যা ছিল ২,৫০০,০০০। অতএব ফরাসী মাপে ভারতে এঞ্জিনিয়ার থাকা উচিত ছিল ৪০,০০০। বাঙ্‌লা দেশের মজুর-সংখ্যা যদি লাখ পাঁচেক (৫০০,০০০) হয় তাহ'লে এঞ্জিনিয়ার চাই ৮০০০। আছে কি?

লেখক—ফরাসী এঞ্জিনিয়ার-জরীপের আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়?

সরকার—ফি-বছর ফ্রান্সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়-দরের টেক্‌নিক্যাল কলেজ হ'তে মার্কামারা এঞ্জিনিয়ার বেরুতো ২০০০। ফ্যাক্‌টারি-কারখানা হ'তে সেই দরের এঞ্জিনিয়ার পাওয়া যেতো শ-পাঁচেক (৫০০)। লোকসংখ্যার মাপে বাঙ্‌লা দেশ ফ্রান্সের চেয়ে বেশ-কিছু বড়। কাজেই যাদবপুর-শিবপুরের দরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হ'তে ফি-বছর কম্‌সে-কম হাজার দুই (২০০০) এঞ্জিনিয়ার পাওয়া চাই।

লেখক—পাওয়া যায় কত জন?

সরকার—এই দুই কলেজের বার্ষিক ফলাফল দেখ্‌লেই মালুম হবে।

লেখক—সংখ্যাটা আপনার জানা আছে কি?

সরকার—যাদবপুরের চারপাশ নিয়ে বেরোয় বোধ হয় গোটা ৭০-৭৫। আর শিবপুরের পাশ-করা হয়ত গোটা বিশ-পঁচিশ। অর্থাৎ যেখানে হওয়া উচিত কম্‌সে-কম হাজার দুই (২০০০) সেখানে পাওয়া যায় বড়-জোর গোটা শয়েক (১০০)। তাছাড়া বাঙ্‌লা দেশের কারখানা হ'তে যাদবপুরী আর শিবপুরী মার্কামারার দরের এঞ্জিনিয়ার বেরোয় কতজন? আন্দাজ কর্‌তে পারে যার যেমন মর্জি।

প্রবোধ বসু, মন্মথ দে, আদি সেন, শান্তি রায় ও তারাপদ ব্যানার্জি

সুবোধ—আপনার সহপাঠীদের ভেতর কেউ এঞ্জিনিয়ার হ'য়েছে?

সরকার—মালদহের বন্ধুদের ভেতর প্রবোধ বসু আর মন্মথ দে জাপানে গিয়েছিল। প্রবোধ এন্ট্র্যান্স পাশ ক'রে (১৯০১) শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যায়। তার পর জাপান হ'তে যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ার হ'য়ে ফেরে (১৯১১)। সেই বছরই বড়োদায় যায় রেলের চাক্‌রিতে। মন্মথ জাপানে শিখেছিল রেশম-বিদ্যা বা রেশম-শিল্প। বর্তমানে বাহাল আছে ভাগলপুরের সরকারী সিল্ক ইন্‌স্টিটিউটে দেখা যাচ্ছে যে,—এরা দুজনেই বিশেষত্বশীল। বাঁধা-পথে লেখাপড়া করে নি। এরা ত্যাঁদড় আর ভবঘুরে সন্দেহ নাই।

লেখক—প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠীদের ভেতর কেউ এঞ্জিনিয়ার হয় নি?

সরকার—দেখ্‌ছি না। উকিল হ'য়েছে অতুল গুপ্ত। চা-ব্যবসায়ী হ'য়েছে শান্তি নিধান রায়। এটা অবশ্য একটা নতুন-কিছু বটে। অ্যাটর্ণি হ'য়েছিল বিজয় বসু,—যথা সময়ে কল্‌কাতার মেয়র (১৯২৭)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মনোরঞ্জন মৈত্র আর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার হ'য়েছে সত্যেন রায়, দবিরুদ্দিন আহম্মদ, হেমেন বক্‌সি, আর গিরীন বসু। অঙ্কের অধ্যাপক ছিল নরেশ ঘোষ। দর্শনের অধ্যাপক র'য়েছে খড়্‌গ্‌ সিংহ ঘোষ। ইংরেজির অধ্যাপক গৌহাটির প্রফুল্ল রায়। প্রত্নতত্ত্বে আর ইতিহাসে নামজাদা হ'য়েছে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন ঘোষাল প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি, রাজস্বনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যাপক ও গবেষক। কিছুই হয় নি—অর্থাৎ জমিদারি চালাচ্ছে বেহালার অমর ও সৌরীন রায়, কল্‌কাতার সরোজেন্দ্রকুমার বোস (ভোস্‌) আর দেওঘরের দেবেন লাহিড়ী। আমাদের সঙ্গেকার কেউ জজ হয় নি। জজ অশোক রায় এক বছর আগেকার আর জজ চারু বিশ্বাস দু-বছর পরের ক্লাসে ছিল। ব্যারিস্টার যোগীন মজুমদারও দু-বছর পরের ছোক্‌রা। কৈ, এঞ্জিনিয়ার তো খুঁজে পাচ্ছি না?

লেখক—আশ্চর্য নয় কি? ভাবুন না?

সরকার—ঢাকার আদিনাথ সেন গ্ল্যাসগো গিয়েছিল। সেখানকার বি-এস্‌সি। কল্‌কাতার সরকারী শিল্প-বিভাগে চাক্‌রি করে। সরকারী টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলসমূহের তদবির করাও তার কাজ। যন্ত্রপাতির কারবারে আদির হাত খেলে। সেকালেও হাত খেল্‌তো। ছোক্‌রা চিরকালই কেজো লোক। আমাদের দলের ভেতর বোধহয় আদিই একমাত্র যান্ত্রিক। কারখানার পরিচালক হ'লে ধাঁ ক'রে ব'লে দিতাম আদি এঞ্জিনিয়ার বটে। মাস্টার-ইন্‌স্পেক্‌টারকে সহজে এঞ্জিনিয়ার বল্‌তে ইচ্ছা করে না। যাহ'ক,—কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি চিজ সম্বন্ধে সে কয়েকটা বইও লিখেছে। তাছাড়া রেশমের চাষ হ'তে শিল্প-বাণিজ্য পর্যন্ত সব-কিছু তার রচনাবলীর ভেতর পাওয়া যায়।

লেখক—আদিনাথ সেনকে "ঢাকার" লোকভাবে উল্লেখ কর্‌লেন কেন?

সরকার—আদির সঙ্গে এক কলেজে বা ক্লাসে পড়ি নি। সে ঢাকার ছাত্র। পরে কল্‌কাতায় আসে। বোধ হয় দু-এক ক্লাস নীচে পড়্‌তো। নরেশের সঙ্গে তার ভাব ছিল। সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও ভাব পরে জান্‌তে পারি যে, আদি সেকালের নামজাদা ইস্কুল-ইন্‌স্পেক্টর দীননাথ সেনের ছেলে। যন্ত্রপাতির আর লোহা-লক্কড়ের বিদ্যা-প্রচারে দীননাথের আগ্রহ ছিল জবরদস্ত।

লেখক—একথা কেন বল্‌ছেন?

সরকার—টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল কায়েম কর্‌বার প্রস্তাবে বাঙালী জাতের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন দীননাথ সেন। এই সম্বন্ধে ১৮৭৫ সনে তিনি এক মোসাবিদা তৈরি করেন। খসড়াটা আদির "এডুকেশন্যাল রি-অর্গ্যানিজেশন ইন ইন্ডিয়া" (১৯৪৪) বইয়ে ছাপা আছে।

লেখক—দেখ্‌ছি বাপের কাজ চালাচ্ছে ছেলে।

সরকার—হাঁ। আদির দাদা প্রিয়নাথ পাটের চাষ সম্বন্ধে লেখা-লেখি আর গবেষণা চালাতে অভ্যস্ত। দুজনেই কেজো লোক। স্বদেশী যুগে "ঢাকা হের‍্যাল্ড" দৈনিক তার তদবিরে চল্‌তো। একালের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক হেম নাগ তখন তার সম্পাদক। হেম নাগও নরেশের বন্ধু। এই জন্য নরেশের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও তাকে "হ্যামচন্দ্র দাদা" ব'লে ডাকি। নরেশ বেচারা কয়েক বছর হ'লো মারা গেছে। শেষ বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিল।

লেখক—বড়ই আশ্চর্যের কথা,—আপনার সহপাঠীদের ভেতর থেকে এঞ্জিনিয়ার আর ব্যবসাদার খুঁজে বের কর্‌তে এত বেগ পেতে হচ্ছে?

সরকার—১৯০১ হ'তে ১৯০৬ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে, ইডেন হিন্দু হস্টেলে আর ডন সোসাইটিতে ডজন-ডজন ছেলের সঙ্গে মাখা-মাখি ছিল। কোনো দিন কোনো ছোকরা বলেনি—"আমি এঞ্জিনিয়ার হবো", অথবা "ফ্যাকটারি-কারখানার কাজ চালাবো", অথবা "ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বা কেরাণী হবো", অথবা "ব্যবসা কর্‌বো" বা "দোকানদারি কর্‌বো"। মনে পড়্‌ছে—প্রেসিডেন্সি প্রথম বার্ষিকের তারাপদ আর হেম ব্যানার্জির কথা।

লেখক—এঁদের সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান্?

সরকার—কার্সিয়াঙে তাদের বাবার দোকান ছিল। কাজেই ব্যবসার কথা দুএকবার হয়ত তাদের মুখে শুনে থাক্‌বো। ঘটনাচক্রে তারাপদ ব্যবসায়ী র'য়ে গেছে। দার্জিলিঙের হ্যাপি ভ্যালি টী-এস্টেট হচ্ছে তার চা-এর বাগান। একালের বাঙালী বণিক্ বা ব্যবসাদারদের ভেতর চা-ব্যবসায়ী তারাপদ নামজাদা। জলপাইগুড়ির শান্তিনিধানকেও চা-ব্যবসায়ী ব'লেছি। কিন্তু তার পক্ষে এই ব্যবসায় "দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়া" চরম বাহাদুরির কাজ। কেন না লোকেরা তাকে উকিলির জন্য প্রস্তুত দেখেছিল। অপর দিকে তারাপদ'র ভাই হেম ব্যবসায় লাগেনি। হ'য়েছে উকিল।

এঞ্জিনিয়ার শরৎ দত্ত, রমা রায় ও উপেন চৌধুরী

লেখক—সত্যিকার এঞ্জিনিয়ার তাহ'লে আপনাদের ছেলেবেলায় কেউ ছিল না?

সরকার—মনে পড়ছে,—১৯০২ সনে শরৎ দত্ত জার্মাণি গেল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার জন্য,—১৯০৭ সনে বার্লিনের ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এলো। কোনো কারখানায় এঞ্জিনিয়ার হয় নি,—বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের মাস্টার হ'য়েছিল। পরে অবশ্য আমদানি-রপ্তানির কাজে লেগেছিল।

লেখক—পাকা এঞ্জিনিয়ার তাহ'লে কাকে দেখ্‌লেন?

সরকার—১৯০৫ সনে জাপান থেকে এঞ্জিনিয়ার হ'য়ে ফিরে এল শ্রীহট্টের রমাকান্ত

রায়। তার বিদ্যা ছিল খনির কর্মসংক্রান্ত। স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবময় যুগে রমাকান্ত দেখা দেয় বঙ্গ-বিপ্লবের খাঁটি স্বার্থত্যাগী কর্মী রূপে। বেচারা বছর দু-একের ভেতরই মারা যায়। রমাকান্ত সত্যিকার স্বদেশ-সেবক।

লেখক—তাছাড়া আর কেউ?

সরকার—১৯০৭ সনে জার্মাণি থেকে খনির এঞ্জিনিয়াররূপে ফেরৎ আসেন উপেন চৌধুরী। ইনিও শ্রীহট্টের লোক। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যতম প্রবর্তক ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর জামাই ডক্টর উপেন চৌধুরী। বছর দু-এক হ'লো তাঁর ছেলে (সৌর) কেম্‌ব্রিজ আর তুর্কী হ'তে ফিরেছে বর্তমান জগতের হাল-চাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হ'য়ে। সৌর তুর্কভাষা জানে আর ফরাসী জানে।

নগেন রক্ষিত

লেখক—১৯০৫-০৭ সনে তাহ'লে এঞ্জিনিয়ার বল্‌তেন কাকে?

সরকার—বোধ হয় কাউকে না। মফস্বলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এঞ্জিনিয়ারেরা ছিল আর কল্‌কাতায় ছিল কর্পোরেশনের এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু এদেরকে বাঙালীর বাচ্চারা এঞ্জিনিয়ার রূপে সম্বর্দ্ধনা কর্‌তো না মনে হ'চ্ছে। রাজেন মুখার্জিকে লোকেরা এঞ্জিনিয়ার বল্‌ত কি না সন্দেহ। তাঁকে ধনী ব্যবসাদার বল্‌তো বোধ হয়। এঞ্জিনিয়ার নামক জীব বাঙালী সমাজে একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল।

লেখক—তাহ'লে আপনাদের ন্যাশন্যাল কলেজ সুরু হ'লো কী ক'রে?

সরকার—১৯০৭ সনে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে নগেন রক্ষিত এসে আমাদের দলস্থ হ'লো। তখন ঠিক যেন একটা নয়া জানোআর হাতে এলো ভেবেছিলাম। অবশ্য একমাত্র আমার অভিজ্ঞতা ব'লে যাচ্ছি। ("বিনয় সরকারের বৈঠকে" প্রথম ভাগ ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

লেখক—কেন, এরূপ ভাব্‌বার কারণ কী?

সরকার—নগেনকে আমি এঞ্জিনের বীর বল্‌তাম, "লেদ্‌"-বীর বল্‌তাম। যেখানে-সেখানে যা-হ'ক-একটা অদ্ভুত ক্ষমতাওয়ালা যন্ত্রবীর, ইস্পাত-বীর, কারখানা-বীর নামে তাকে চালাতাম। তখন আমার বয়স বছর বিশেক। প্রথম নজরে পড়্‌লো একটা বাঙালীর বাচ্চা যে লোহা-লক্কড় চাঁছতে পারে, এঞ্জিন মেরামত কর্‌তে পারে, চাকা ঘুরাতে পারে, ধোঁআ ওড়াতে পারে, ইত্যাদি। আমার চোখে যন্ত্রপাতির কারখানা ছিল একটা নয়া দুনিয়া আর নগেন তার অবতার, পয়গম্বর বা ঐ ধরণের কিছু। তখন তার বয়স বোধহয় বছর বাইশ-তেইশ! এই হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সূত্রপাত, শৈশব, ছেলে-খেলা,—এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে।

লেখক—আর আজ বছর চল্লিশের ভেতর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদেরই যাদবপুর কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং থেকে এঞ্জিনিয়ার বেরিয়েছে কেমন?

সরকার—হাজার দুই-আড়াই ছোট-বড়-মাঝারি এঞ্জিনিয়ারের ফিরিস্তি পাওয়া যায়। কেউ যান্ত্রিক, কেউ বৈদ্যুতিক আর কেউ রাসায়নিক। অবশ্য পাশ-করা নয় সকলেই। কলেজের ছাপ-মারা এঞ্জিনিয়ার গুন্‌তিতে কম। তবুও সে-কালের তুলনায় একালে একটা

বিপ্লব ঘ'টে গেছে বাঙালী সমাজে,—বলা যেতে পারে। দেশী-বিদেশী ইস্কুল-কলেজের পাশ-করা আর রকমারি কারখানার অভিজ্ঞতাওয়ালা বাঙালী এঞ্জিনিয়ার আজকাল আরও আছে। তবুও ছয় কোটি বাঙালীর পক্ষে সকলপ্রকার এঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা নগণ্য।

প্রমোদ চ্যাটার্জি ও শরৎ চক্রবর্তী

১৩ই মার্চ ১৯৪৫

সুবোধ—আপনার বাড়ীতে মাঝে-মাঝে কর্পোরেশনের একজন এঞ্জিনিয়ারকে দেখি। ইনি কি যাদবপুর কলেজের পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার?

সরকার—প্রমোদ চ্যাটার্জি হচ্ছে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার। আজকাল কর্পোরেশনের মোটর বিভাগ চল্‌ছে এঁর হাতে। "ক্লীনার ক্যাল্‌কাটা" অর্থাৎ কল্‌কাতা-সাফ রাখার কাজে একে বাহাল রাখা হ'য়েছে। যন্ত্রপাতির খেলায় প্রমোদের হাত পাকা। বিজলীর বাতী, পাখা, জলের কল, পাম্প ইত্যাদি ঘরোআ কাজ সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য প্রমোদের বন্ধুভাবে সাহায্য পাই যখন-তখন। কর্পোরেশনের এঞ্জিনিয়ারদের কথা উঠলো যখন,—একটা মজার গল্প বলি।

লেখক—এঞ্জিনিয়ারদের সম্পর্কে মজা আবার কী?

সরকার—শরৎ চক্রবর্তী কর্পোরেশনের একজন বড় এঞ্জিনিয়ার। জল-বিভাগের কলগুলার অন্যতম কর্তা। একদিন আমাদের এই বাড়ীতে এসেছিল। কী বল্‌লে শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হবে।

লেখক—বলুন, শুনে আশ্চর্য হই।

সরকার—বল্‌লে যে,—১৮৯৩-৯৫ সনে সে আর আমি নাকি এক পাঠশালায় পড়্‌তাম।

লেখক—কী? আশ্চর্যের কথা তো বটেই। আপনি জান্‌তেন না?

সরকার—সেই দিনই প্রথম আলাপ আমাদের এই বাড়ীতে। কালীঘাটের গঙ্গার অপর পারে চেৎলা। পুল পার হ'য়ে যেতে হয় আলিপুরে। জেলখানটার কিছু এগিয়ে গেলেই বাঁ-দিকে পাওয়া যেতো সেকালে গোপালনগর। আজকাল যেখানে আলিপুরের আদালত প্রায় সেইখানে নাকি ছিল গোপালনগর মাইনর ইস্কুল।

লেখক—আপনি গোপালনগর মাইনর ইস্কুলে প'ড়েছিলেন ঠিক তো?

সরকার—অবিকল ঠিক। শুন্‌বামাত্র আমার মেজাজ চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে পড়লো সেকালে একটা পুল তৈরি হ'য়েছিল,—বোধ হয় ১৮৯৪ সনে। তখন আমার বয়স বছর সাত-আট। মনে আছে, একবার গঙ্গায় মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। পাঁকের ভেতরকার ভাঙা কাচের টুক্‌রো ফুটে ছিল বাঁ পায়ে। কেটে রক্ত প'ড়েছিল। অনেক দিন ভুগেছিলাম। সেই কাটার দাগ আজও রয়েছে পায়ের তলায়। এই যে দ্যাখ্‌। র'য়েছি একদম "দাগী" হ'য়ে।

লেখক—আর কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—শরৎ চক্রবর্তী তারপর বল্‌লে। ইস্কুলের রাস্তায়—ওপারে—একটা গাছ ছিল। সেই গাছের তলায় ব'সে এক বুড়ো (অন্ধ) হাঁড়ি বাজাতো। শরৎ, আমি আর

কয়েক জন ছোঁড়া মিলে সেই বুড়োর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমাদের নাক বাজিয়ে তার নকল কর্‌তাম। এতে বুড়ো যেতো চ'টে।

লেখক—কী হ'লো?

সরকার—একদিন আমি একা নাক বাজাচ্ছিলাম,—বেফাঁস ভাবে একদম বুড়োর হাতের সীমানার ভেতর দাঁড়িয়ে। আর যাবে কোথায়? তৎক্ষণাৎ আমার কোঁচা ধ'রে ঘাড় পাকড়াও কর্‌লে। আর মুখ থুবড়িয়ে মাটির ওপর ফেলে উত্তম-মধ্যম।

লেখক—এই ঘটনাটা মনে আছে?

সরকার—আগাগোড়া ঠিক। এই কথা বলাতে বিশ্বাস হ'লো যে,—শরৎ আর আমি বাস্তবিক এক পাঠশালারই পড়ুয়া। অতএব ডাক্তার দীনেশ চক্রবর্তীর চেয়েও শরৎ হচ্ছে বেশী পুরোণো সহপাঠী। কেননা গোপালনগরের পর মালদহে যাই ১৮৯৬-৯৭ সনে। যা'হক,—সহপাঠীদের ভেতর শরৎ চক্রবর্তী হচ্ছে অন্যতম এঞ্জিনিয়ার। এটা অবশ্য নেহাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জোরে আবিষ্কৃত হ'য়েছে বছর কয়েক হ'লো। কিন্তু ১৯০৭ পর্যন্ত— অর্থাৎ নগেন রক্ষিতের উদয় পর্যন্ত—এঞ্জিনিয়ার নামক জানোআর এই অধমের জীবনে ছায়াপাত করেনি। সেকালের বাঙালী সমাজকে মোটের ওপর এঞ্জিনিয়ার-হীন বলা চল্‌তে পারে। এঞ্জিনিয়ার-হীন সংস্কৃতিতে এঞ্জিনিয়ার-শীল রূপে দুনিয়ার ভদ্রলোকের পাতে দেবার উপযুক্ত ক'রে তোলাই ছিল বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম সাধনা।

("মালদহের খবির", ৭৭২-৭৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মার্চ ১৯৪৫

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

১৮ই মার্চ ১৯৪৫

হেমেন—আপনার টেবিলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাও র'য়েছে দেখ্‌ছি। ব্যাপার কী। আপনি এই কাগজও পড়েন? এর ভেতর আপনার খাদ্য কী থাক্‌তে পারে?

সরকার—কেন? বাংলা ভাষা আর বাংলা সাহিত্য কি এই অধমের জমিদারির বাইরে?

লেখক—জন্ম-হার, মৃত্যু-হার, টাকার বাজার, সমাজ-বীমা, যন্ত্র-নিষ্ঠা, ভিটামিন-ক্যালরি, যান-বাহন, পশু-পালন, ট্রাক্‌টর, বহির্বাণিজ্য, শ্রেণী-লড়াই, সমাজ-বিপ্লব এই সব নিয়ে আপনার কারবার জানি। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই সব আর্থিক ও সামাজিক মাল পাওয়া যায় কি?

সরকার—ভাষার শব্দগুলা আগাগোড়াই নৃতত্ত্বের মাল। আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ ছাড়া ভাষা গ'ড়েই উঠ্‌তে পারে না। কাজেই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ভাষা-বিষয়ক প্রত্যেক রচনাই সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত,—ফলতঃ এই অধমের খাদ্য। তার ওপর আছে বাঙালী জাতের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক, ও মুসলমান নর-নারীর চলা-ফেরা, গতি-ভঙ্গী, লেন-দেন, মেল-মেশ। এই সবের কোন্‌টা নৃতত্ত্বের বাইরে,—সমাজ-বিজ্ঞানের এলাকার বহির্ভূত? এই সকল সওদার সব-কিছুই আমার হাটে

বিকোয়,— আটপৌরে ভাবে।

লেখক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার রচনাবলী এই চোখে দেখা সম্ভব—আগে কখনো ভাবিনি। আর-কিছু পান এই পত্রিকায়?

সরকার—তাছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্য-বীরদের জীবন-বৃত্তান্ত বেরুচ্ছে। ব্রজেন ব্যানার্জি খুঁটে-খুঁটে গোটা পঞ্চাশেকের সন-তারিখ জুগিয়েছে। সন-তারিখগুলা আমার কাজে লাগে চৌপর দিন-রাত। এতগুলা বাঙালীকে সহজে কব্জার ভেতর পাচ্ছি। তাও আবার চরম বস্তুনিষ্ঠরূপে। সুতরাং এই পত্রিকার কিস্মৎ যে-কোনো বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে খুবই বেশী।

লেখক—দেখি, হাতের কাছের সংখ্যাটা? ৫১শ ভাগ, —প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। পত্রিকাধ্যক্ষ দেখ্ছি শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) সম্বন্ধে ব্রজেন ব্যানার্জির একটা লেখা দেখ্ছি। বেশ তো? রাজকৃষ্ণ রায়ের আমি ভক্ত। আপনি এঁর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

সরকার—বোধ হয় খুবই কম। মনে পড়্ছে ১৯০১-০৫-এর যুগ। কল্‌কাতার রাস্তায়-রাস্তায় থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে "প্রহ্লাদ-চরিত্র", "লয়লা-মজনু", "ঋষ্যশৃঙ্গ", "নরমেধ-যজ্ঞ" ইত্যাদি নাটকের বোধ হয় নাম দেখ্‌তাম। এই সবের লেখক ব'লে সেকালে বোধ হয় রাজকৃষ্ণের নাম শুনে থাক্‌বো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাঁর খবর একদম জানা ছিল না বলা চলে। অবশ্য থিয়েটার-খোর আমি কোনো দিনই নই। কাজেই আমার পক্ষে রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে আনাড়ি থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়।

লেখক—রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বাঙলা-সাহিত্যের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয় কি?

সরকার—নিশ্চয়। সেই জন্যেই তো অনেক সময় ব'লেছি, যে ব্রজেনের "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" (গোটা পঞ্চাশেক জীবনবৃত্তান্ত) যুবক বাঙ্‌লাকে বঙ্গ-সচেতন ক'রে তুলেছে। রাজকৃষ্ণ রায় বিষয়ক প্রবন্ধ-পুস্তিকার সাহায্যেই বাঙালী বাচ্চারা নয়া-নয়া আলোচনা-সমালোচনায় মাথা খেলাতে ঝুঁক্‌বে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গজীবন যুবক বাঙ্‌লার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌বে। ব্রজেন, সজনী, যোগেশ বাগল ইত্যাদি গবেষকদের রচনাগুলা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাকে বীরপূজার বাহনরূপে গ'ড়ে তুলেছে।

"নাট্য সাহিত্য-কোথায় গেল?"

লেখক—দেখ্‌ছি প্রথম প্রবন্ধে আপনার গুরুদেব যদুনাথ সরকার প্রশ্ন তুলেছেন—"নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল?" আপনি কি বিবেচনা করেন যে,—একালের বাঙালী নাট্যকারেরা অপদার্থ?

সরকার—আমি থিয়েটার-খোর নই। কাজেই মাস-মাস কেমন নাটক বেরুচ্ছে তার খবর আমার জানা নেই। কিন্তু ১৯২৫-এর পর দেশে ফিরে এসে দেখেছি যে, যোগেশ চৌধুরীর "সীতা" ও "দিগ্‌বিজয়ী" ইত্যাদি নাটকের পশার ছিল খুব। এসব একালের কথা। অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীকে এই নাট্যকারের প্রচারক দেখেছি। "কারাগার"-লেখক মন্মথ রায় একালেরই নাট্যকার। শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত "তটিনীর বিচার" আর "আবুল

হাসান" একালেই বেরিয়েছে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের "পুনর্মূষিকোভব", রবীন্দ্র মৈত্রের "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল", প্রথম বিশীর "ঋণং কৃত্বা", তারাশঙ্করের "দুই পুরুষ" (১৯৪২) ইত্যাদি নাটকগুলাও হালের পাঁচ-সাত-দশ বছরেরই চিজ। এই সব কি নাট্য-সাহিত্যে ফেলিতব্য-বর্জনীয় মাল?

লেখক—তাহ'লে যদুনাথের মতন আরও অনেকে একালের বাংলা সাহিত্যকে নাট্য-শিল্পে দরিদ্র ভাব্‌ছেন কেন?

সরকার—তাঁরা বোধ হয় দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ও "সধবার একাদশী", গিরিশ-ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যাবলী, রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী", "বিসর্জন", "চিরকুমার সভা" ও "চিত্রাঙ্গদা" কিম্বা অমৃতলাল বসুর "বিবাহ বিভ্রাট", "খাশদখল" ও "তাজ্জব ব্যাপার" ইত্যাদি রচনার পরবর্তী কোনো-কিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। কী করা যাবে?

রবীন্দ্র মৈত্র

লেখক—ভাল কথা, আপনি রবীন্দ্র মৈত্রের নাম কর্‌লেন। সেদিন আপনার পাড়ায় এন্টালি অ্যাকাডেমি-ইস্কুলে রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উদ্‌যোগে সভা হ'লো। তাতে গিয়েছিলেন?

সরকার—না। যাওয়া সম্ভব হয় নি। সেদিন আর এক জায়গায় পেশাদারি তলব ছিল। সেই ডাকে হাজিরা দিতে গিয়ে পাড়ার ডাকে অনুপস্থিত হ'তে হ'য়েছিল। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ ভট্টাচার্য, ধীরেন মুখোপাধ্যায়, বীরেন ভদ্র, সজনী দাস ইত্যাদি অনেকের বক্তৃতার শুন্‌বার ইচ্ছা ছিল। উদ্যোক্তারা এদের নাম ব'লে গিয়েছিল। যাব ঠিক ক'রেছিলাম।

লেখক—আপনি রবীন্দ্র মৈত্রকে চিন্‌তেন?

সরকার—মনে পড়ছে না। কুমুদ লাহিড়ী আর রবি মৈত্র দুজনের মৃত্যু হ'য়েছে বছর বারো হ'লো,—প্রায় একই সময়ে।

লেখক—রবি মৈত্র সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ তাহ'লে কী জন্যে?

সরকার—রবি মৈত্র একালের অর্থাৎ ১৯২০-এর পরবর্তী লেখক,—ছোক্‌রা বয়সে মারা গেছে। তার গুণগ্রাহীদের মেজাজ চেখে দেখ্‌তে আমার আগ্রহ প্রচুর। যুবক বাঙলার ইজ্জদ যুবক বাঙলা দিতে রাজি কিনা বা কতটা রাজি তাই বুঝতে চাই।

লেখক—তা হ'লে শুনুন,—আপনার মন-মাফিক কথাই বোধ হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩ মার্চ ১৯৪৫) ছাপা হ'য়েছে।

সরকার—কার লেখা?

লেখক—এন্টালির সভায় সজনী দাসের ভাষণ কী ছিল শুনুন।

সরকার—আচ্ছা, শোনা যাক্‌।

লেখক—"দিবাকর শর্মা নামের ছদ্মবেশে "শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্র মৈত্র যে সকল ব্যঙ্গ রচনা পাঠাইতেন তাহার তুলনা ছিল না। 'মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল' রচনা করিয়া নাটক রচনার যে-আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, বাংলা ভাষা যতদিন থাকিবে ততদিন সেই আদর্শ ও তাঁহার দানের কথা স্বীকৃত হইবে। অন্তরের অনুভূতি দিয়া দরিদ্র জনসাধারণের

জন্য তিনি গল্প রচনা করিতেন। সাহিত্যিক, দেশকর্মী ও সমাজ-সংস্কারক ছাড়াও তিনি ছিলেন ঋজু দৃঢ় চরিত্রের লোক।"

সরকার—বেশ ব'লেছে। শোনাচ্ছে ভাল।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

লেখক—আপনি সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত আছেন?

সরকার কেন থাক্‌বো না? ভাষাবিষয়ক আলোচনা-সমালোচনা-বিতণ্ডা-প্রশ্নাপ্রশ্নি সবই নৃতত্ত্বের মাল আর সমাজ-বিজ্ঞানের মাল। আগেই ব'লেছি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উপলক্ষ্যে। সুনীতির বাংলা ও ইংরেজি রচনাবলীর ভেতর ঠাঁই পেয়েছে হাড়-মাসের মিশ্রণ, রক্তের মিশ্রণ, জাতের মিশ্রণ, আচার-ব্যবহারের মিশ্রণ, সংস্কৃতির মিশ্রণ।

লেখক—এই সব মিশ্রণের কথা বল্‌ছেন কেন?

সরকার—ভাষাবিজ্ঞানের মারফৎ সকল প্রকার মেলমেশ, লেনদেন, আনাগোনো, যোগাযোগ হাতে-হাতে ধরা দেয়। বর্ণ-সঙ্কর বস্তুনিষ্ঠ-রূপে প্রমাণিত হয় ভাষা-বিষয়ক আন্তর্মানুষিক লেনদেনের বিশ্লেষণে। সুনীতির গবেষণাগুলার ফলে বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় পাঠকেরা বিনা বাক্যব্যয়ে হরেক রকম সাংস্কৃতিক বর্ণসঙ্কর পাকড়াও কর্‌তে পার্‌ছে। দো-আঁস্‌লামির বড়-প্রচারক সুনীতি।

লেখক—তার ফলাফল কিরূপ?

সরকার—ভারতীয় নরনারীর প্রায়-সবকয়টা লোকই—আর আমাদের বাঙালীর বাচ্চা প্রত্যেকেই দোআঁসলা। খাওয়া-দাওয়ায়, চালচলনে, রীতি-নীতিতে, কাপড়-চোপড়ে, বোলচালে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সব-কিছুতেই আমরা দোআঁস্‌লা। এই দোআঁস্‌লামি বা বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে সচেতন হ'চ্ছে ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে। সুনীতির লেখালেখিগুলা এই জন্য আমার বিচারে যারপরনাই মূল্যবান। চিন্তা-মেরামত আর সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি কাজে সুনীতিকে জবরদস্ত বাস্তুশিল্পী সম্‌ঝে থাকি। অবশ্য বাজারে সমাজ-সংস্কারক হিসাবে সুনীতির নামডাক আছে কিনা জানি না।

লেখক—সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলীর আর কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—নৃতত্ত্ব আপনা-আপনিই সুনীতির ভাষা-বিষয়ক লেখা-লেখির ভেতর এসে প'ড়েছে। তা ছাড়া আছে দেশ-বিদেশের তথ্য। দুনিয়ার নানা সমাজের রীতিনীতি, আচার-সংস্কৃতি ও গল্প-গুজব আলোচনা করার দরকার হয় ভাষা-বিজ্ঞানের আখড়ায়। সুনীতি এই হিসাবে আন্তর্জাতিক চর্চায় মোতায়েন র'য়েছে। "বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার"-বিদ্যাটা কিছু-কিছু তার এলাকার অন্তর্গত। "বৈদেশিকী" (১৯৪৩) নামে একটা বই আছে। তার ভেতর পাওয়া যায় আইরিশ হ'তে আফ্রিকান আর মেক্‌সিকান "কথা-সরিৎ-সাগর"।

স্বদেশী যুগের শিল্প-প্রদর্শনী
(১৯০৫-২৫)

২২শে মার্চ ১৯৪৫

হেমেন—চিত্র-শিল্প ও ভাস্কর্য-শিল্পের প্রদর্শনী আজকাল হয় না?

সরকার—কেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন?

লেখক—আগে দেখ্‌তাম সুকুমার-শিল্পের-প্রদর্শনী বসতো। আর সেই উপলক্ষ্যে আপনার বক্তৃতা অথবা মন্তব্য ছাপা হ'তো দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে। ইংরেজিতে ও বাংলায় পড়া যেতো।

সরকার—কোন্ কোন্ প্রদর্শনীর কথা মনে আছে?

লেখক—ভারতীয় প্রাচ্যকলা সমিতির বার্ষিক প্রদর্শনী ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলি ইত্যাদি শিল্পীরা কর্তা থাক্‌তেন। তাছাড়া ছিল সরকারী আর্ট ইস্কুলের প্রদর্শনী। মুকুল দে বোধ হ'চ্ছে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। আজকাল প্রিন্সিপ্যাল কে?

সরকার—এই দুই প্রদর্শনী আজকালও অনুষ্ঠিত হয়। লড়াইয়ের গোলমালে কয়েক বছর বন্ধ ছিল। তবে হালে আবার সুরু হ'য়েছে কাঠখোদাইয়ের চিত্রশিল্পী রমেন চক্রবর্তী বর্তমানে আর্ট ইস্কুলের কর্তা বা প্রিন্সিপ্যাল।

লেখক—দেখছি লড়াইয়ে হিড়িকে শিল্প-বিষয়ক খবর কানে আস্‌ছে কম। আচ্ছা আপনি কি মনে করেন যে, লড়াইয়ের যুগেও (১৯৩৯-এর পর হ'তে) বাঙালী শিল্পীরা ছবি আঁকায় আর মূর্তি গড়ায় মেজাজ খাটাচ্ছে?

সরকার—আলবৎ। কি চিত্রশিল্প, কি ভাস্কর্য (মূর্তিশিল্প) দুই শিল্পের ক্ষেত্রেই বাঙালী চ'লেছে বাড়তির পথে।

লেখক—নমুনা?

সরকার—আজকাল কি-বছর মাত্র দুটা শিল্প-প্রদর্শনী বসে না। প্রায় ডজনখানেক শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে পায় কল্‌কাতার নরনারী বার মাসে। শিল্পীদের দল পুরু হ'য়েছে। গুনতিতে এরা বেড়ে চ'লেছে। শিল্পরীতিতেও বৈচিত্র্য-বিভিন্নতা এসেছে। কোনো তথাকথিত রীতিকে খাঁটি ভারতীয় বা খাঁটি বাঙালী রীতি সম্বো রাখার রেওয়াজ ক'মে আস্‌ছে। তার ওপর অসিত হালদার লক্ষ্ণৌয়ে, সমর গুপ্ত লাহোরে, সারদা-রণদা-বরদা উকিল দিল্লীতে-কাশীতে আর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি মাদ্রাজে শিল্প-পাঠশালার মাথায় র'য়েছেন। কাজেই সুকুমার শিল্পে বাঙালীর দিগ্‌বিজয় চলছে। এঁরা অবশ্য প্রধানতঃ বা মূলতঃ "অবন"-পন্থী।

লেখক—কিছু ভেঙে-চুরে বলুন। এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল তো নই যে,—ঠারে-ঠোরে বল্‌লেই ধাঁ ক'রে বুঝে নেব।

সরকার—১৯০৫-১৪ সনের (বঙ্গ-বিপ্লবের) যুগে আমরা গগন ঠাকুর আর অবনী ঠাকুরকে জান্‌তাম চিত্রশিল্পের দুনিয়ায় "সবে ধন নীলমণি"। গগন বোধ হয় বেশী লোকপ্রিয় ছিলেন না। "অবনের" চিত্রশিল্পকে বল্‌তাম খাঁটি স্বদেশী চিজ, ষোল আনা জাতীয় মাল, পুরাপুরি ভারতাত্মার প্রতিমূর্তি। সেকালে প্রদর্শনী ব'ললে বুঝতাম অবন-প্রবর্তিত শিল্প-মেলা। তাঁর চেলারাই ছিল আমাদের একমাত্র চিত্রশিল্পী। নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি ইত্যাদি শিল্পীরা সেই যুগের, সেই

মেজাজের আর সেই সাধনার প্রতিনিধি। চিত্রশিল্পী অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলি ছিলেন সেই রীতির ব্যাখ্যাকার, সমজদার, ঐতিহাসিক।

লেখক—আজকাল কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—বাঙালী জাত বেড়ে গেছে অনেক-পরিমাণে। ১৯২২ সনে জার্মাণির বার্লিন শহরে এই গগন-অবন-নন্দলাল-অর্দ্ধেন্দ্র-পরিচালিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীই বসিয়েছিলাম। তখনকার বাঙলায় আর কোনো নতুন রীতির রেওয়াজ বোধ হয় পেকে ওঠে নি। ১৯২৫-এর শেষে—প্রায় বার বৎসর পর—দেশে ফিরে এসে দেখি সেই অবস্থা। "ভারতীয় চিত্রকলা"র বাজার তখনও কল্‌কাতায় গুলজার। তিন বছরে শিল্পীদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্প-রীতি মোটের ওপর অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত খাতেই চল্‌ছিল। পরবর্তী বিশ বছরের নতুন-কিছু দেখ্‌ছি।

প্রতিকৃতি-শিল্পী অতুল বসু

লেখক—তাহলে আবার নতুন-কিছু পেলেন কোথায় আর কবে?

সরকার—১৯৪৫এর আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য বড়-শিল্পী অতুল বসু। অতুল জ্যান্ত মানুষের ছবি আঁকার সুদক্ষ কারিগর। প্রতিকৃতি-শিল্পটা খুবই কঠিন। সাধারণ লোকেরা এই কারিগরি সহজে ধর্‌তে পারে না। এই শিল্পের ওস্তাদি বিশ্লেষণ করা সহজ নয়।

লেখক—অতুল বসুর গুরু কে?

সরকার—অতুল খোলাখুলি বিদেশী-পাশ্চাত্যগুরুদের সাক্‌রেতি ক'রে থাকেন। ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় নেই। কয়েক মাস হ'লো অতুলের হাতের কাজ স্বাধীনভাবে আল্‌গা প্রদর্শিত হ'য়েছে। অতুলের কাজকর্ম অবশ্য বোধ হয় দশ-বার বছর ধ'রে দেখে আস্‌ছি। বয়সে নেহাৎ ছোকরা নন। স্বদেশী যুগে ইনি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই অধমও নাকি তার অনত্যম মাষ্টার ছিল।

লেখক—অতুল বসুর তারিফ কর্‌ছেন। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে বাজারে নাম আছে কি?

সরকার—প্রতিকৃতি-শিল্পীদের বাজার হচ্ছে পয়সাওয়ালা লোকেরা, সৌখীন লোকেরা। নিজের ছবি আঁকাবার খেয়াল নেশা বা বাতিক হচ্ছে টাকাকড়ির খেলা। ধনীদের মজলিশে ঘুরাফিরা কর্‌লে জানা যাবে কল্‌কাতায় প্রতিকৃতি-শিল্পী ক'জন আর অতুল বসুর কিস্মৎ কতটা। ছবির বাজার অবশ্য আলু-পটলের বাজার নয়।

লেখক—মাসিক বা দৈনিক পত্রে অতুল বসু সম্বন্ধে লেখালেখি দেখেছেন কি?

সরকার—প্রতিকৃতি-শিল্প সম্বন্ধে লেখালেখি চালানো বেশ-কিছু কঠিন। তার কারণ,—এই সবের ফটো দৈনিক বা মাসিক পত্রিকায় ছাপানো চলে না। ছাপলেও কতকগুলা পরিচিত-অপরিচিত নরনারীর ছবি দেখা যাবে মাত্র। এই সব হচ্ছে চরম বস্তুনিষ্ঠ চিজ। তার জন্য পত্রিকা-সম্পাদক, পত্রিকা-পাঠক কেহই বিশেষ আগ্রহান্বিত নয়।

লেখক—অন্যান্য শিল্পীদের বেলা কী বল্‌লেন?

সরকার—তাদের কাজকর্মের ফটো পত্রিকায় ছাপা হওয়া সহজ। সেই সব কাজে

কল্পনা থাকে, শিল্পীর নতুন-নতুন সৃষ্টি থাকে। সুতরাং ফটোর সাহায্যে সমলোচনা, উৎকর্ষ-বিশ্লেষণ, দোষ দেখানো ইত্যাদিও সম্ভব। এইজন্য অতুল ইত্যাদি প্রতিকৃতি-শিল্পীদের নিয়ে পত্রিকা-জগতে ঘোঁটমঙ্গল না হবারই কথা। অধিকন্তু আমাদের দেশের সাংবাদিকেরা এখনো চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি সুকুমার শিল্প সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেনি। সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল অনেকেই। শিল্প সম্বন্ধে সাংবাদিকদের জেগে ওঠা উচিত।

লেখক—অতুলের ওস্তাদি কোথায়?

সরকার—যে-লোকটা ছবির জন্য বস্‌লো তার অবিকল নকল তৈরী ক'রে দেয় অতুল। লোকটাকে বসানো-সাজানো, ইত্যাদি কাজে নৈপুণ্য মালুম হয়। তাছাড়া রঙের কম-বেশী দেওয়ায় আর রকমারি রঙ-লাগানের কারবারে ও দক্ষতা দেখা যায়। রেখার টানগুলা দেখ্‌লেই গড়নের কায়দা ধরা পড়ে।

লেখক—এতে বাহাদুরি কী?

সরকার—অসংখ্য শিল্পী এই "অবিকল নকলে"র কাজে ফেল মারে। তারা হাত-পা-ভুঁড়ি, গায়ের রং, জামা-জুতো ইত্যাদি সবই আঁকে ঠিক। চিৎ হয় মুখটা আঁক্‌তে গিয়ে। চোখ, মুখ, ঠোঁট, কান, কপাল, গলা, ঘাড়—এইসব ঠিক্‌ঠাক নকল করা যারপরনাই কঠিন। ইয়োরামেরিকায় দেখেছি,—সবই ঠিক হয়, যত গণ্ডগোল চাঁদ-বদনখানা নিয়ে। ভাস্করেরাও এই গোলে পড়ে চিত্র-শিল্পীদেরই মতন। গড়ন-বিদ্যায় দক্ষতা লাভ খুবই কঠিন।

লেখক—আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?

সরকার—আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্মাণিতে কোনো-কোনো ভাস্করের পাল্লায় প'ড়েছিলাম। চিত্র-শিল্পীরাও ভজিয়েছিল। অবশ্য এই গরীবের কাছে তারা পয়সা আশা করেনি। মজা দেখেছি,—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বন্ধুরা দেখে ব'লেছে ঃ—"ভায়া, এ যে বিনয় সরকার তা বুঝা যাচ্ছে না।" অথচ শিল্পীরা নেহাৎ নকড়া-ছকড়াও নয়। কাজেই অতুলের হাত-সাফাইকে জবরদস্ত বল্‌তে রাজি আছি।

যামিনী-শিল্পের ধরণ-ধারণ

লেখক—বর্তমানে নয়া রীতির প্রতিনিধি আর কাউকে দেখ্‌ছেন?

সরকার—যামিনী রায়কেও নয়া পথের পথিক বল্‌বো। তথাকথিত প্রাচ্য বা ভারতীয় শিল্পরীতি যামিনীর হাতে ফুটেনি। অবন-নন্দলালের পথ মাড়াতে যামিনীর আগ্রহ নেই।

লেখক—যামিনী রায়ের বিশেষত্ব কী?

সরকার—গোটা কয়েক মোটা রেখা টেনে ছোট-বড়-মাঝারি মূর্তি খাড়া করা যামিনীর বিশেষত্ব। আর একটা বিশেষত্ব আছে। মূর্তির বিষয়গুলা আসে অনেকাংশে পাড়া-গাঁ থেকে। আদিম বুনো-পাহাড়ী গড়ন হচ্ছে যামিনী-শিল্পের অন্যতম প্রধান সওদা। সেকেলে বাঙালী ইটকাঠের খোদাই, আর কালীঘাটি পট-শিল্পের পোঁছ যামিনীর রূপ-রঙে একটু-আধটু ধরা যায়।

লেখক—যামিনী-শিল্প তা হ'লে খাঁটি স্বদেশী?

সরকার—না। সত্যিকার কথা হচ্ছে—যামিনী বেশ-কিছু পাশ্চাত্য-পন্থী। যামিনী

"অশিক্ষিতপটুত্ব"ওয়ালা "লোকশিল্পী" নন। ইয়োরামেরিকার বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থীরা আফ্রিকান, মেক্‌সিকান, পাপুয়ান ইত্যাদি আদিম ও "অ-সভ্য" নরনারীর শিল্পরীতি নয়া-গড়নে চালু ক'রেছে। সেই সকল আদিম রীতির কিছু-কিছু প্রকাশ পেয়েছে যামিনী-শিল্পে। মনে রাখা ভাল যে, যামিনী সরকারী আর্ট-ইস্কুলের পাশ-করা ছাত্র। আধুনিক পাশ্চাত্য কায়দাগুলা তাঁর রপ্ত আছে। যামিনীর আদিম আঙ্গিকগুলা পাশ্চাত্য শিল্পের মারফৎ আমদানি হ'য়েছে। অধিকন্তু মনে রাখা ভাল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী খোদাই-শিল্পে আর পটশিল্পে ইংরেজ-ফরাসী শিল্পীদের প্রভাব কিঞ্চিৎ-কিছু ছিল। কাজেই কালীঘাটি রীতির প্রচারক হিসাবেও যামিনী বিদেশী-মেজাজী আর বিদেশী-ঘেঁষা শিল্পী।

লেখক—নবীনতম পাশ্চাত্যরীতির প্রতিনিধিও ভারতে আছে?

সরকার—খুব জবরভাবেই আছে। ইয়োরামেরিকার নবীনতম শিল্প-রীতির ভারতীয় আমদানিকারক হচ্ছেন গগন, সুনয়নী দেবী, আর রবি। এই তিনজন অবশ্য নয়া-পাশ্চাত্যের তিন বিভিন্ন পথে চ'লেছেন। যামিনীও একটা নয়া পথ কেটে চল্‌তে অভ্যস্ত। এই পথটা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই,—আমার পছন্দসই বটে।

রকমারি শিল্প-প্রদর্শনী (১৯৩৫-৪৫)

লেখক—যামিনী রায়ের কাজকর্ম কোনো প্রদর্শনীতে দেখানো হয়?

সরকার—নিশ্চয়। বছর দশেকের (১৯৩৫-৪৫) কথা বল্‌ছি। যামিনীর স্বতন্ত্র মেলা বসে। আগে বস্‌তো এখানে-ওখানে। কয়েক বছর ধ'রে তাঁর নিজ বাড়ীতে (বাগবাজারে) প্রদর্শনী খোলা হ'চ্ছে।

লেখক—আর কোনো চিত্রশিল্পীর স্বতন্ত্র প্রদর্শনী বসে কি?

সরকার—ভাস্কর ক্ষিতীশ রায়ের বাজার আছে স্বতন্ত্র। শুভো ঠাকুরের স্বতন্ত্র চিত্র-প্রদর্শনী বসে। শৈলজ মুখোপাধ্যায়েরও আল্‌গা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেকালের শিল্পগুরু নন্দলালের স্বতন্ত্র প্রদর্শনী কয়েক সপ্তাহ হ'লো বসানো হ'য়েছিল নির্মল চন্দ্র'র বাড়ীতে। "শনিবারের বৈঠক" ব্যবস্থা ক'রেছিল। অধিকন্তু আছে দিল্লীতে সারদা বরদা ও রণদা উকিলদের "অবনপন্থী" চিত্র-প্রদর্শনী।

লেখক—আর কোনো উল্লেখযোগ্য চিত্র-প্রদর্শনী আছে?

সরকার—কয়েক বছর ধ'রে "আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি" নামে মেলা বসানো হ'চ্ছে। বার্মাশেল কোম্পানী নামক বিলাতী পেট্রোল কোম্পানী এই শিল্প—বাজারের ধুরন্ধর।

লেখক—এই প্রদর্শনীর সার্থকতা কী?

সরকার—বিজ্ঞাপন আর প্রচার-কার্যে শিল্পকলার প্রয়োগ দেখানো এই মেলার মতলব। অনেক বাঙালী ও অ-বাঙালী চিত্রশিল্পী এই হিড়িকে ব্যবসা-বাণিজ্য-দোকানদারি সম্বন্ধে প্রচার চালাবার উপযুক্ত ছবি আঁকবার বিদ্যায় পেকে উঠেছে।

লেখক—এতে লাভ কী?

সরকার—তারা টাকা রোজগারের একটা নতুন পথই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে, বল্‌তে পারি। তথাকথিত "সুকুমার" শিল্পে শিল্পীদের পেট ভরা কঠিন। ইয়োরামেরিকায়ও চারুশিল্পীদের ঘরে হাঁড়ি চড়ে না। অতি-কষ্টে চলে তাদের সংসার।

লেখক—আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন?

সরকার—দুবেলা আঁচানো তাদের অনেকের পক্ষে অসম্ভব। নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম ইত্যাদি শহরের অসংখ্য সুকুমার-শিল্পী ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক বিজ্ঞাপনের জন্য ছবি এঁকে গেরস্থালি চালায় অথবা নিষ্পরিবারভাবে দিন কাটায়। কাজেই "আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি"র বাজার ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের পক্ষে ভাত-কাপড়ের বড় পথ বিবেচিত হ'তে বাধ্য।

লেখক—আপনি সুকুমার শিল্পীদেরকেও বিজ্ঞাপনের শিল্পে মেতে যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন?

সরকার—আমার দস্তুর তাই। দুনিয়া নির্দয়। সংসারে খুব কম লোক দেখা যায় যারা নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি, গবেষণা, আর সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে কাজ কর্‌তে-কর্‌তে পয়সা কামাতে পারে। সৃষ্টিশক্তির খেলা চলে এক দিকে, পয়সা-রোজগার চলে আর এক দিকে। গবেষক অথবা কবি-গাল্পিক-নাট্যকার হিসাবে পরিবার চালানো খুবই কঠিন। সেইরূপ চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদির পেশায় স্বছন্দে ভাত-কাপড় জুটানো সোজা কথায় নয়। এই বিষয়ে গোঁজামিল রাখা বেআকুবি।

লেখক—তাহ'লে কবিরা, শিল্পীরা ভাত-কাপড় জুটায় কী উপায়ে?

সরকার—তারা কেরাণী হয়, ইস্কুল-মাষ্টার হয়, দোকানদারের হিসাব-রক্ষক হয়, প্রুফ-রীডার হয়, সরকারী চাক্‌রে হয় ইত্যাদি। কবিতা বেচে পেট ভরানো দৃষ্টান্ত খুব কম। কাজেই চিত্রশিল্পীদের পক্ষে বিজ্ঞাপন-শিল্পে লেগে গেলে লজ্জার কথা, দুঃখের কথা অপমানের কথা নাই। শিল্প-সাধনা অতি-কঠোর।

"ছবি-মূর্তি কিন্‌তে শিখুন"

লেখক—চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনি কখনো সার্বজনিক আলোচনা চালিয়েছেন?

সরকার—নিশ্চয়। যেখানেই কোনো শিল্প-প্রদর্শনীতে লোকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ব'কেছি তখনই দর্শকদেরকে ব'লেছি—"পয়সাওয়ালা বাবারা, ছবি ও মূর্তি কিন্‌তে সুরু করুন। ছবি ও মূর্তিগুলার তারিফ ক'রেই ঘরে ফির্‌বেন না। কিনুন, কিন্‌তে শিখুন।"

লেখক—"কিন্‌তে শিখুন" বলেন কেন?

সরকার—ছবি আর মূর্তি যে কিন্‌তে হয় তা আমাদের পয়সা-ওয়ালা-পয়সাওয়ালীরা এখনো জানে না। তারা বাড়ীঘরে টাকা খরচ করে, গাড়ীতে টাকা খরচ করে, জামা-জুতো-কাপড়ে টাকা খরচ করে, থিয়েটার-সিনেমায় টাকা খরচ করে। ঘর সাজাবার জন্য টেবিল-চেয়ারেও কেউ-কেউ টাকা খরচ করে। কিন্তু শিল্পীদের গড়া ছবি ও মূর্তি দিয়ে টেবিল সাজাতে হয়, দেওয়াল সাজাতে হয় একথা অনেক ধনীর মগজে এখনো ঢুকেনি। আমি চাই মাছ-তরকারি, ঘী-দুধ, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি জিনিষের মতন ছবি-মূর্তির জন্যও বাজার-সৃষ্টি, কেনা-বেচার ব্যবসা।

লেখক—ছবি-মূর্তির কেনা-বেচা বাড়্‌তে পারে কী ক'রে?

সরকার—ধরা যাক্, কল্‌কাতায় হাজার পঁচিশ-ত্রিশ দিয়ে কোনো লোক বাড়ী তৈরি

কর্‌লে বা কিনলে। তার পক্ষে হাজার দেড়-দুই অথবা এমন কি হাজারখানেক খরচ করা উচিত ছবি-মূর্তির জন্য। এই রেওআজ বাঙালী সমাজে কায়েম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখক—এই সম্বন্ধে কোনো কার্যপ্রণালী বাৎলাতে পারেন?

সরকার—ঘর-বাড়ীর এঞ্জিনিয়ার-কন্ট্রাক্টারদের সঙ্গে চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের যোগাযোগ রেখে চল্‌লে ভাল হয়। বাড়ী তৈরির ফরমায়েস পাবা মাত্র তারা ধনীকে শল্লা দেবে যে,— গোটা খর্চার একটা হিস্যা ছবি-মূর্তির জন্য লাগ্‌বে। এতে সুকুমার-শিল্পীদের জন্য মালের বাজার গ'ড়ে উঠ্‌তে পার্‌বে মনে হ'চ্ছে।

লেখক—আজকাল শিল্পীদের রোজগার হয় কোন্‌ পথে?

সরকার—বোধ হয় কোনো চিত্রশিল্পী বাড়ীতে কোনো-কোনো ছেলে-মেয়েকে ছবি আঁক্‌তে শেখায়। তাতে পয়সা রোজগার হয়। আজকাল অনেক পরিবারে ছেলে-মেয়েদের জন্য গান-বাজনার মাষ্টার রাখা হয়। নাচের মাষ্টারও কোথাও-কোথাও দেখা যায়। ছবির মাষ্টার, মূর্তির মাষ্টারও কোনো-কোনো পরিবারে বাহাল হ'চ্ছে।

লেখক—আর কোনো পথ নেই?

সরকার—বিজ্ঞাপন-প্রচারের জন্য ছবি এঁকে কোনো-কোনো শিল্পী ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা কর্‌তে অভ্যস্ত। দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকার জন্যও ছবি আঁকবার ফরমায়েস আসে। প্রকাশকেরাও বইয়ের জন্য ছবি চায়। তাছাড়া পয়সাওয়ালারা নিজেদের ছবি আঁকায়, মূর্তি গড়ায়। কিন্তু শিল্পীদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের যুগ আসেনি। এখনো অনেক দেরি।

প্রদ্যোৎ ঠাকুরের সুকুমার শিল্প-পরিষৎ

২৫শে মার্চ ১৯৪৫

হেমেন—কোনো শিল্প-প্রদর্শনী একালে নামজাদা হ'য়েছে?

সরকার—"অ্যাক্যাডেমি অব ফাইন আর্ট্‌স" (সুকুমার শিল্প-পরিষৎ) নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের তদবিরে ফি-বছর ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শনী বসে। লড়াইয়ের আবহাওয়ায় দু-এক বছর মেলা বসেনি। এবার জানুয়ারি মাসে প্রদর্শনী খোলা হ'য়েছিল। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর (১৮৭১-১৯৪২)। বছর বার হ'লো পরিষৎ কায়েম হ'য়েছে। কল্‌কাতার শিল্প-সংসারে এই পরিষদের দান প্রচুর।

লেখক—অ্যাক্যাডেমির প্রদর্শনীর কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—প্রদ্যোৎ ঠাকুরের ব্যবস্থায় ভারতীয়-অভারতীয় তফাৎ নাই। তাছাড়া স্থাপত্য-শিল্পের দিকে নজর আছে পুরা-দস্তুর। অধিকন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক বিজ্ঞাপনও-শিল্পও বাদ যায় না। মহারাজা একচোখো শিল্প-সমজদার ছিলেন না। তাঁর মেজাজ ছিল "দশাননী" অর্থাৎ বিশ-চোখো। তিনি মারা গেছেন ১৯৪২ সনে। এবারকার মেলায়ও দেখ্‌লাম তাঁর প্রবর্তিত "দশাননী" অর্থাৎ ব্যাপক রীতি বজায় আছে।

লেখক—অ্যাক্যাডেমির শিল্পীদের ভেতর কারু নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—শ'য়ে-শ'য়ে শিল্পী এই বাজারে নামজাদা। কার নাম করি? যামিনী

গাঙ্গুলির নাম কর্‌ছি এই জন্য যে ইনি সম্পাদক। এঁর প্রধান কাজ প্রতিকৃতি-শিল্পে। অতুল বসুর শিল্পক্ষেত্রেই তাই। প্রতিকৃতি-শিল্পী বল্‌লে আজকাল লোকেরা এই দুই জনকেই জানে। অ্যাক্যাডেমির প্রতিষ্ঠায় অতুলেরও সাহায্য আছে।

লেখক—শিল্প-চর্চার আর কোনো লক্ষণ দেখ্‌ছেন?

সরকার—হোটেল-রেস্টর‍্যান্ট-কাফে ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বছরে দু-চারবার নানা ঢঙের শিল্প-মেলা বস্‌ছে। এ-সব উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু জাপানী, ইতালিয়ান, ইংজের, মার্কিণ, ইহুদি, চেক, পোল, চীনা ইত্যাদি জাতের লোকেরা ছবি এঁকে বাজার বসাচ্ছে। সেই সবের সঙ্গে বাঙালী-অবাঙালী ভারতসন্তানের যোগাযোগ আছে। ১৯৩৫ সনের সম-সম কালে এই ধরণের বিদেশী প্রদর্শনী সুরু। এতে ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে বিশ্বশক্তির পরিচয় সাধিত হচ্ছে সন্দেহ নাই। তাছাড়া চিত্রশিল্পী দেবাংশু রায়চৌধুরীর তদ্‌বিরে চল্‌ছে ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল (ধর্মতলায়)। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রীতিমত শেখাবার ব্যবস্থা আছে। দিল্লীতে বরদা উকিল একটা বড়গোছের পরিষৎ কায়েমের চেষ্টায় আছেন। বালিগঞ্জে কায়েম হয়েছে একটা শিল্প-মজ্‌লিশ। তার নাম "ক্যাল্‌কাটা গ্রুপ"।

"কল্‌কাতার শিল্প-মজ্‌লিশ"

লেখক—"ক্যাল্‌কাটা গ্রুপ" আবার কী?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে অবন-প্রবর্তিত শিল্প-মজ্‌লিশকে ফরাসীরা বল্‌তো "একল্ দ্য কালকুত্তা" (কল্‌কাতার রীতি)। একালের "একল্ দ্য কাল্‌কুত্তা" বল্‌তে পারি এই ক্যালকাটা গ্রুপকে। একে "কল্‌কাতার শিল্প-মজ্‌লিশ" বলা যাক্।

লেখক—এই গ্রুপে আছে কোন্-কোন্-শিল্পী?

সরকার—এই মজলিশের মাতব্বর শুভো ঠাকুর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন্দ্র মৈত্র, গোপাল ঘোষ, নীরোদ মজুমদার, প্রদোষের পত্নী কমলা (দক্ষিণ ভারতীয় কোচিন দেশের মেয়ে) ইত্যাদি শিল্পীরা।

লেখক—এঁদের কাজকর্ম দেখেছেন?

সরকার—এই তো সেদিন (১৫ মার্চ) মেলা খোলা হ'য়েছিল সরকারী আর্ট ইস্কুলের এক ঘরে। দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।

লেখক—কার-কার হাতের কাজ দেখ্‌লেন?

সরকার—শুভো হ'তে কমলা পর্যন্ত সকলেরই কিছু-কিছু দেখা গেল। প্রদোষ ও কমলা দু'জনেই ভাস্কর। চিত্রশিল্প এঁদের ক্ষেত্র নয়। অন্যান্যেরা চিত্রশিল্পী।

লেখক—ক্যালকাটা গ্রুপের বিশেষত্ব কী?

সরকার—ঘরে ঢুক্‌বা মাত্র মনে হ'লো যেন বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পী আর ভাস্কর্য-শিল্পীদের বাজারে প্রবেশ ক'রেছি। প্যারিসে ফি-বছর বসে "সালোঁ দোতোন" আর "সালোঁ অ্যাঁদপাঁদা'র তদ্‌বিরে দুটো বড়-বড় শিল্প-মেলা।

লেখক—এই দুই মেলায় কী দেখা যায়?

সরকার—তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে আধুনিকতা, নবীনতা, চরমপন্থিতা ইত্যাদি। কল্‌কাতার মজলিশকে এই দুই ফরাসী "সালোঁ"'র মাসতুতো ভাই বল্‌তে চাই।

লেখক—আপনি খুশী আছেন?

সরকার—দেখে বুঝ্‌লাম,—আবার বাড়তির পথে বাঙালী। ১৯০৫-১৪ সনের শিল্প-যুগ অনেক পেছনে। আজ সত্যিকার নয়া বাঙলার ভরা জোআর।

রৈবিক "চিত্র-লিপি"র বিশ্লেষণ

লেখক—বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী পাশ্চাত্য শিল্প-রীতির প্রতিনিধি কাকে বলা উচিত?

সরকার—এই রীতির প্রবর্তক হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির লোক। ফরাসী ওস্তাদদের ভেতর সেজান, গোগ্যাঁ, রেণোআ, মাতিস্ ইত্যাদি চিত্রশিল্পী আর রদ্যাঁ ইত্যাদি ভাস্কর্য-শিল্পীকে নব্য রীতির জন্মদাতা বলা যেতে পারে। ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী ভ্যান গখ্‌ও অন্যতম জন্মদাতা। বলা বাহুল্য, জার্মাণ, ইতালিয়ান, ইংরেজ, মার্কিণ, রুশ ওস্তাদও জন্মদাতাদের ভেতর আছে।

লেখক—চরমপন্থী পাশ্চাত্য শিল্পীদের রীতি সম্বন্ধে সহজে কিছু বল্‌তে পারেন?

সরকার—গগন, সুনয়নী, রবি ও যামিনী এই চারজনকে নয়া পাশ্চাত্য শিল্পরীতির চার বিভিন্ন প্রতিনিধি সম্‌ঝেছি। ক্যালকাটা গ্রুপের প্রত্যেককেই অন্যান্য প্রতিনিধি সম্‌ঝে রাখ্‌লে সহজে বুঝা যাবে নবীনতম পাশ্চাত্য রূপদক্ষদের ধরণ-ধারণ।

লেখক—এই রীতি সম্বন্ধে আপনি কিছু লিখেছেন?

সরকার—হালের লেখা হচ্ছে 'টাগোর দি পোয়েট অ্যাজ পেইণ্টার" ("ক্যালকাটা রিভিউ", জুলাই ১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"র (১৯৪০) প্রত্যেক ছবি বিশ্লেষণ ক'রেছি এই রচনায়। তার ভেতর সেজান ইত্যাদি আধুনিক শিল্প-সংসারের ঠাকুরদাদাদের কথা ত আছেই। তাদের নাতীদের কাজকর্মও উল্লেখ ক'রেছি।

লেখক—আপনি দুটো ফরাসী শব্দ ব্যবহার করলেন—মানে কী?

সরকার—অতি সোজা। "সালোঁ" হচ্ছে মজ্‌লিশ, বাজার, বৈঠক, মেলা। "দোতোন" শব্দের অর্থ শারদীয় আর "অ্যাঁদপাঁদা"র মানে স্বাধীন। প্রথমটা হ'লো শারদীয় বাজার, মেলা বা প্রদর্শনী। দ্বিতীয়টার নাম স্বাধীন বৈঠক, বাজার বা মেলা। এই অধমের "প্যারিসে দশ মাস" (১৯৩২) বইটা ঘেঁটে দেখা মন্দ নয়। তাতে ১৯২০-২৫ সনের ফরাসী বৃত্তান্ত আছে।

চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ ও নীরোদ মজুমদার

২৮শে মার্চ ১৯৪৫

হেমেন—ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের সম্বন্ধে দু-একটা ব্যক্তিগত কথা বল্‌বেন?

সরকার—গোপাল ঘোষ আর নীরোদ মজুমদার—দুজনের কাজেই যামিনী-শিল্পের ছায়া প'ড়েছে মনে হবে। গোটা কয়েক রেখায় সুস্থ-সবল মূর্তি খাড়া করা এই দুইজনেরই দস্তুর। দুয়ে অবশ্য-ফারাকও আছে। তবে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার আবহাওয়া গোপাল আর নীরোদের রচনায় সত্যি-সত্যি ঢুঁড়ে পাওয়া যাবে না। এঁরা বিলকুল নয়া বাঙলার রূপদক্ষ কারিগর। অবন-নন্দলালের প্রভাব প্রায়-একদম এখানে নাই। অবশ্য এঁদের হাত

ভবিষ্যতে কোন্ দিকে যাবে আজও বলা যাচ্ছে না। বয়সে ছোক্‌রা।

লেখক—আপনি ব'লেছেন যে, সেকালের গগন আর একালের রবি অবন-পন্থী নন। তা হ'লে গোপাল আর নীরোদকে গগন-পন্থী বা রবি-পন্থী বলা চল্‌বে কি?

সরকার—না। অবন-পন্থীদের বাইরে যারা তাদেরও কাজ রকমারি। তারা নানা ঢঙের শিল্পী। গগন পুরামাত্রায় জ্যামিতিক-কিউবিস্ট গড়নের কারিগর। গোপাল-নীরোদ সেই ছাঁচের মূর্ত্তির দিকে হাত খেলাতে অভ্যস্ত নন,—মনে হচ্ছে। অপর দিকে রবি প্রায়-চরম মাত্রায় কল্পনা-বিলাসী। তাঁর হাতে জ্যামিতিক রূপগুলাও একদম রূপহীন রংয়ের খেলায় পরিণত। গোপাল ও নীরোদকে রৈবিক অ-রূপ গড়নের পথে দেখা যাচ্ছে না। দুজনেই মানুষ ব'লে চেনা-যায় এমন লোকজনের ছবি আঁক্‌তে রাজি। যামিনী-শিল্প বোধ হয় নীরোদের গড়নগুলায় বেশী পরিস্ফুট।

লেখক—আবার জিজ্ঞেস কর্‌ছিল,—যামিনীকে দেশী রীতির প্রতিনিধি ব'ল্‌ছেন, না বিদেশী রীতির প্রতিনিধি বল্‌ছেন?

সরকার—যামিনীকে ব'লেছি দুই রীতিরই প্রতিনিধি। জোর দিয়ে বল্‌বো যে, নবীনতম পাশ্চাত্যের অন্যতম ঢঙই যামিনী-শিল্পে গুলজার। যামিনী-শিল্পকে সোজাসুজি তথাকথিত "লোকশিল্প" বলা চল্‌বে না। নবীনতম পাশ্চাত্য ঢঙেরই নয়া-নয়া আকার-প্রকার দেখা যাচ্ছে ক্যালকাটা গ্রুপের চিত্রাবলীতে।

অস্থিবিদ্যা-মাফিক মাপজোকের ধ্বংস-সাধন

লেখক—মানুষ ব'লে চেনা-যায় এমন লোকের ছবি আঁকে গোপাল-নীরোদ। এই কথার মানে কী?

সরকার—যামিনী-শিল্পে লোকজনকে মানুষ ব'লে চেনা যায়। রৈবিক মানুষের চিত্রাবলীতে অনেক সময়ে মানুষের চেহারাকে চেহারাই লোপাট। গোপাল-নীরোদের মানুষগুলা মানুষই বটে। তবে বায়অলজির সুপরিচিত মানবীয় অস্থিবিদ্যায় (অ্যানটমিতে) হাড়-মাসের মাপজোক, অনুপাত ও পরস্পর-সম্বন্ধ সুনির্দিষ্ট। সেই মাপ-জোক যামিনী-গোপাল-নীরোদের মানুষগুলা জানে না। রবির মানুষ তো জানেই না।

লেখক—এ আবার নতুন কট্-মট ঢুকাচ্ছেন দেখ্‌ছি?

সরকার—সেকালের গগন আর সুনয়নীর মানুষগুলাও অস্থি-বিদ্যার মাপ-জোক জান্‌তো না। আসল কথা,—নবীনতম পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের খাঁটি স্বধর্মই হচ্ছে অ্যানাটমি-বধ।

লেখক—কী বল্‌ছেন বুঝা যাচ্ছে না।

সরকার—হাড়-মাংসের স্বাভাবিক মাপজোক ভেঙে দেওয়া আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ অস্বীকার করাই সেজান-গোগ্যাঁ-ভ্যানগখ্ ইত্যাদি শিল্প-গুরুদের প্রধান কীর্তি। তাঁদের বিশ্বাস,—প্রাচীন শিল্পকলা, আদিম শিল্পকলা আর দেশ-বিদেশের "লোক-শিল্প" সবই হচ্ছে অস্থিবিদ্যাকে কলা দেখিয়ে আত্মপ্রকাশ করার নিদর্শন। সেই অস্থি-বিদ্যাহীন লোকশিল্পের আর আদিম-শিল্পের পুনরুদ্ধার করাই সেজান আর সেজান-পন্থীদের আসল মতলব।

লেখক—অস্থিবিদ্যা-বিরোধী চিত্রকলা ভারতে আছে?

সরকার—অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের উদ্ধার-কর্তা। সেই হিসাবে তিনি স্বদেশী যুগের চিত্রশিল্পীদেরকে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিবিদ্যমাফিক মাপজোক ধ্বংস কর্তে শিখিয়েছেন। গগন, অবন, নন্দলাল, রবি, যামিনী, নীরোদ, গোপাল ইত্যাদি অস্থিবিদ্যা-বিরোধের প্রতিনিধিরা সকলেই প্রকারান্তরে এক-গোত্রের অন্তর্গত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধ পর্যন্ত,—রেণেসাঁসের পর হ'তে শ'আড়াই বছর ধ'রে ইয়োরোপে অ্যানাটমির দিগ্‌বিজয় চ'লেছিল। সেজান-গোগ্যাঁ-ভ্যান্‌গখ্ এই দিগ্‌বিজয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব কায়েম করে। তাদেরই বংশধর দেখা দিয়েছে ভারতে।

লেখক—বিংশ শতাব্দীর বাঙালী চিত্রকলাকে আপনি সেজান-গোগ্যাঁর বংশধর ভাব্‌ছেন।

সরকার—সেই সেজানী-বিপ্লবেরই অন্যতম ধারা দেখ্‌তে পাচ্ছি অবন-প্রবর্তিত তথাকথিত ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুদ্ধারে (১৯০৫-২৫)। তারই অন্যান্য ধারা আবার চ'লেছে গগন (১৯০৫-২৫), যামিনী (১৯৩০-৩৫), রবি (১৯৩০-৩৫) আর ক্যালকাটা গ্রুপের (১৯৪৫) কারিগরিতে। পূব চল্‌ছে পশ্চিমের পেছন-পেছন,—শিষ্য ভাবে।

এপ্রিল ১৯৪৫

চিত্রশিল্পে দেশী-বিদেশী

২রা এপ্রিল ১৯৪৫

হেমেন—আপনি অবন-গগন হ'তে যামিনী-নীরোদ পর্যন্ত বাঙালী চিত্রশিল্পীদের কারিগরিতে প্রাচ্য, ভারতীয় বা বাঙালী বস্তু টুঁড়ে পান না? এই বছর চল্লিশ-পঞ্চাশেকের সব শিল্পই আগাগোড়া বিদেশী?

সরকার—ব্যাপারটা বুঝ্‌তে হবে মাত্রা বা "ডোজ" হিসাবে। প্রত্যেক সৃষ্টিটাই কয়েক-মাত্রা স্বদেশী আর কয়েক-মাত্রা বিদেশী। সব-কিছুই দেশী-বিদেশীর খিচুড়ি। মিশ্রণ, দোঁআশলা, বর্ণসঙ্কর, ইত্যাদি পারিভাষিক চালিয়ে বুঝ্‌তে হবে প্রথমতঃ, অবনকে আর অবন-পন্থী সকলকে, আর দ্বিতীয়তঃ গগনকে আর গগন-পন্থী সব্‌বাইকে। গোঁজামিল রাখ্‌লে চল্‌বে না। স্বদেশী যুগের অবন-ধারা আর গগন-ধারা দুই ধারাই ছিল দোআঁশ্‌লা,—স্বদেশী-বিদেশী মিশ্রণ-প্রসূত মাল। খিচুড়ি খেয়ে যুবক বাঙ্‌লার চিত্র-শিল্পীরা স্বদেশী যুগে মানুষ হ'য়েছে। খিচুড়িতে ভিটামিন পাওয়া যায় প্রচুর।

লেখক—মাত্রার তফাৎ বুঝ্‌বো কী ক'রে?

সরকার—অবন আর অবন-পন্থীরা বেশীমাত্রায় স্বদেশী। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে নানা ঢঙের নয়া পুরাণা ভারতীয় (ও বাঙালী) কায়দা আমদানি করা এঁদের বিশেষত্ব। অপরদিকে খোলাখুলি বিদেশী কায়দা দখল করা হচ্ছে গগন, রবি, গোপাল, নীরোদের কারবার।

লেখক—চিত্রশিল্পের ভেতর স্বদেশী লক্ষণ আর বিদেশী লক্ষণ ফারাক করা যায় কী ক'রে?

সরকার—কোনো বিদেশী স্ত্রীপুরুষ বাঙালী ছবিগুলা দেখুক। অম্‌নি তাদের নজরে

পড়বে মোগ্‌লাই দাড়ি, ফার্সি রংয়ের বাহার, বাঙালী শাড়ীর এক কোন, সাঁওতালী খোঁপার গড়ন, রাজপুত চোখ, কাশ্মীরি নাক, পাহাড়ী আঙুল, কোল-মুণ্ডা-ভিল-নেপালী মুখের আকার, জাপানী ঢেউ, চীনা পাহাড়, হিন্দুস্থানী নেংটি, আর মারোআড়ি পাগ্‌ড়ি। সঙ্গে-সঙ্গে তারা দেখ্‌তে পাবে চালার ঘর, কলার গাছ, রোগা গরু, বলদের গাড়ী, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি। এই সব বস্তুনিষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে বাঙ্‌লামি, প্রাচ্যামি বা ভারতাত্মার প্রতিমূর্তি। অবন-শিল্পে এইই সবের মাত্রা খুব-বেশী। অপর দিকে গগন-রবি-যামিনী-নীরোদের কাজকর্মে এই সব উঁকি-ঝুঁকি মারে মাত্র।

লেখক—বিদেশী লক্ষণ এই সব শিল্পে আন্দাজ করা যাবে কী দেখে?

সরকার—পাশ্চাত্য শিল্প-সমজদারেরা ছবিগুলার বিবৃত, মুখাকৃতি, টেঁড়ি, পাগ্‌ড়ি-খোঁপা আর দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দারিদ্র্য ইত্যাদি বস্তুগুলা নিয়ে মাতামাতি করে না। এ সব হচ্ছে চিত্রশিল্পের গল্প, কাহিনী, কিচ্ছা। ভূগোল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থকথা ইত্যাদির চর্চায় সময় কাটানো খাঁটি শিল্প-সমজদারদের পেশা নয়।

লেখক—তাহ'লে অবন হ'তে নীরোদ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙালী চিত্র-শিল্পকে বিদেশী দর্শকেরা পাশ্চাত্য রীতির শিল্প ব'ল্‌বে কিসের জোরে?

সরকার—তারা দেখ্‌বে যে, শিল্পীরা কাগজটা, রেশমটা, আর কপড়টা ভাগাভাগি ক'রেছে পাশ্চাত্য কায়দায়। পুরুষ-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে. গরু, ঘোড়া, গাছ, পাথর, আকাশ, তারা, সব-কিছুই গ'ড়ে তোলা হ'য়েছে পাশ্চাত্য রীতির রেখা চালিয়ে। প্রত্যেক তরুলতা, নদী-পাহাড়, জীবজন্তু, আর মেয়ে-পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ সাজানো হ'য়েছে পাশ্চাত্য গড়ন-সমাবেশের নিয়মে। রংগুলা লাগানো হ'য়েছে, রূপসমূহকে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে, রংয়ে-রূপে সামঞ্জস্য করানো হ'য়েছে পাশ্চাত্য কায়দায়। এই সকল বিষয়ে বাঙালী পট বা হাঁড়ি-কুড়ি, রাজপুত-পাহাড়ী দেওয়াল-চিত্র, মোঁগল-ফার্সি কেতাবী-ছবি অথবা চীনা-জাপানী পর্দার নক্‌সা হ'তে যারপর-নাই কম মাল আমদানি করা হ'য়েছে। সেকেলে ভারতীয় ও প্রাচ্য আঙ্গিক বেশ-কিছু অন্য ঢঙের হ'তো। সবই খুঁটে-খুঁটে বিশ্লেষণ করা চাই।

লেখক—আপনি বল্‌ছেন যে, বিষয়বস্তুগুলা স্বদেশী আর শিল্পরীতিটা বিদেশী?

সরকার—প্রায় ঠিক তাই। আঙ্গিক সমূহের প্রায় ষোল আনাই পাশ্চাত্য,—নবীনতম পাশ্চাত্যের নিকট ঋণী। আঙ্গিক হচ্ছে চিত্রশিল্পের প্রাণ বিশেষ, গল্পগুলা গৌণ। এই জন্যই আমি হাজার বার হাজার উপলক্ষে ব'লেছি, বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রায় সব-কিছুই হচ্ছে ইয়োরামেরিকার চোরাই মাল। ডালভাত খাই বটে, ধুতী-শাড়ীও পরি সন্দেহ নাই। কিন্তু লক্ষ্যটা, প্রাণটা, মেজাজটা আমাদের বিদেশী!

দোআঁশ্‌লামির সাহিত্য ও চিত্রশিল্প

লেখক—বাংলা সাহিত্যের নজিরে বুঝিয়ে দেবেন অবন হ'তে নীরোদ পর্যন্ত বাঙালী চিত্রশিল্প দোআঁশ্‌লা কী অর্থে?

সরকার—সকলেই জানে যে, মধুসূদনের রচনায় রামায়ণ আছে। এই হ'লো স্বদেশী ডোজ। কিন্তু বিদেশী ডোজ কী? আর কতটা? প্রায় সবই। রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার লিখ্‌লে

মধুকে কেউ পুছতো না। পাশ্চাত্য দস্তুল আছে প্রচুর,—আঙ্গিকে আর আদর্শে। বঙ্কিম বাংলায় লেখক। অতএব বাঙালী। ব্যস! কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যের আঙ্গিক বা প্রাণটা কোথায়? স্কট-ডিকেন্সের হাতে। কথাসরিৎসাগরের আধুনিক সংস্করণ বঙ্কিম-সাহিত্য নয়। কালিদাস-বিদ্যাপতি আর কবিকঙ্কণের শব্দ, উপমা, ঝঙ্কার রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঢুঁড়ে পাওয়া যায় বটে। তাছাড়া তার ভেতর আম, জাম, বকুল, পারুল, রজনীগন্ধা ইত্যাদি নিয়ে সোনোর বাঙলা ধরা দিয়েছে। কিন্তু তার দৌলতে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"ও গড়ায় না আর "চিত্রা" বা "বলাকা"ও বেরোয় না। শরৎ-সাহিত্যের "পল্লীসমাজ" আর তারাশঙ্করের "গণদেবতা" খাড়া করতে "কাদম্বরী" ছাড়া আরও অনেক কাঠ-খড় জরুরি হয়। মধু হ'তে নজরুল-কামাক্ষী-সুভাষ-শান্তি-নির্মল পর্যন্ত প্রত্যেকেই "অল্প-বিস্তর" বাঙালী। কিন্তু প্রত্যেকেই আবার পুরাদস্তুর,—বিশেষতঃ প্রাণে-প্রাণে পাশ্চাত্য।

লেখক—চিত্রশিল্পের বেলায় কী বল্‌ছেন?

সরকার—বল্‌তে কিছু বাকী আছে? নামাবলী বা ধুতী-চাদ্দর প'রে ব্যারিস্টারি চালানো সম্ভব। তাতে বাঙালী-পনা জাহির হ'তে পারে। কিন্তু ব্যারিস্টারি পেশার প্রাণটা অ-বাঙালী। বাঙালী আমরা শুকুতুনি, ছেঁচকি, পুঁইশাকের চচ্চড়ি, পিঠে-পুলি, গুড়ের পায়েস কোনো দিনই ছাড়তে রাজি নই। কিন্তু তাব'লে ন্যাশন্যালিস্ট-সোশ্যালিস্ট-কমিউনিস্ট হওয়াকে বাঙ্‌লামি, আর্য্যামি, প্রাচ্যামি বা ভারতাত্মার জয়জয়কার বলা চল্‌বে না। পিঁড়িতে ব'সে কমিউনিস্টরা ডালের বড়ি আর বেলের মোরব্বা খায়,—টোপর মাথায় দিয়ে বিয়েও করে। তা ব'লে তাদের কমিউনিস্ট বক্তৃতাগুলা স্বদেশী চিজ নয়। বাইরের কতকগুলা লক্ষণ আমাদের সুপরিচিত বাঙালী, ভারতীয় বা হিন্দু-মুসলিম চিজ এই পর্যন্ত। কিন্তু প্রেরণা, জীবন, প্রাণবস্তু প্রায়-সবই বিদেশী। অবন হ'তে নীরোদ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্প এই অর্থে একই সঙ্গে বাঙালীও বটে আবার বিদেশীও বটে।

("বিনয় সরকারের বৈঠকে", প্রথম ভাগ, পৃ: ৩৬০-৩৬২)

লেখক—আপনার বিশ্লেষণে বঙ্গ-সংস্কৃতি ব'লে কোনো জিনিষ আছে?

সরকার—বঙ্গ-সংস্কৃতি আগাগোড়াই স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর মেলমেশে তৈরি,—দোআঁশ্‌লা মাল। বিদেশী-হীন বঙ্গ-সংস্কৃতি কোনো দিনই ছিল না। আজও নাই। তা সত্ত্বেও আমার বিচারে বিংশ-শতাব্দীর বঙ্গীয় চিত্রশিল্প বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামগ্রী।

শিল্প-সমালোচনার নয়া রীতি (১৯২২)

লেখক—আপনি যে-প্রণালীতে চিত্রশিল্পের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা চালালেন সেই প্রণালীর বিশদ বৃত্তান্ত কোনো বইয়ে লিখেছেন?

সরকার—"বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর তের খণ্ডের ভেতর (১৯১৪-৩৫) নানা জায়গায় পাশ্চাত্য সুকুমার শিল্পের একাল-সেকাল সম্বন্ধে বৃত্তান্ত ও ব্যাখ্যা আছে। এই অধমের প্রচারিত শিল্প-সমালোচনারীতি পাওয়া যাবে "রূপম্" পত্রিকায়। ১৯২২ সনের জানুয়ারি সংখ্যায় "এস্‌থেটিক্‌স্ অব ইয়ং ইন্ডিয়া" প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেছিলাম। প্রবন্ধটা লিখেছিলাম প্যারিসে বসে। সম্পাদক ছিলেন তখন অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি। আমার বিরুদ্ধে জবর লড়াই চ'লেছিল। তাই নিয়ে ১৯২২-২৪ সনে বাগবিতণ্ডা আর তক্কা-তক্কি রুজু

ছিল। তাতে হিস্যা নিয়েছিলেন স্টেল্লা ক্রামরিশ, বারীন ঘোষ আর প্রমথ চৌধুরী ("বীরবল")। পরে প্রবন্ধটা স্বতন্ত্র বইয়ের আকারে বেরোয়। আজকাল সহজে পাওয়া যাবে "সোশিঅলজি অব রেসেজ্, কাল্‌চার্স অ্যান্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস" বইয়ের এক অধ্যায়ে (বার্লিন ১৯২২, কলিকাতা ১৯৩৯)।

লেখক—ক্যালকাটা গ্রুপের চিত্র-প্রদর্শনী দেখে মোটের ওপর কী মনে হ'লো?

সরকার—স্বদেশী যুগের "একল দ্য কাল্‌কুত্তা" (১৯০৫-১৪) ছিল ঘোরতর প্রাচ্য, ভারতীয়, স্বদেশী। একালের "ক্যালকাটা গ্রুপ" (১৯৪১-৪৫) হচ্ছে পুরাদস্তুর পাশ্চাত্য, বিদেশী, সার্বজনিক। তারা ছিল যখন-তখন যেখানে-সেখানে আর্যামি, প্রাচ্যামি, স্বদেশ-নিষ্ঠা, স্বজাতি-প্রেম, স্বধর্ম, আর ভারতীয় আদর্শ প্রচারের নেশায় মশগুল। আর একালের এরা নিজেদেরকে বাঙালী, ভারতীয়, প্রাচ্য, স্বদেশী বা জাতীয়-নিষ্ঠ জাহির কর্‌তে রাজি কি না সন্দেহ। বোধ হয় এরা নিজেদেরকে দুনিয়ায় পরিচিত করাতে চায় একমাত্র শিল্পীরূপে, স্রষ্টারূপে, রূপদক্ষরূপে।

লেখক—আপনি কী পছন্দ করেন?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে আমি স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, প্রাচ্যামি, ভারতীয় আদর্শের পাঁড় ভক্ত ছিলাম। সেই আমিই ১৯২১-২২ সনে সুকুমার শিল্পের দুনিয়ায় প্রাচ্যামির মুণ্ডুপাত ক'রেছি। কাজেই ১৯৪৫-এর "কলকাতার শিল্প-মজলিশ" এই অধমের মেজাজ-মাফিক পথেই চল্‌ছে। বাঙালীর বাচ্চাকে আমি দেখ্‌তে চাই শিল্পীভাবে অর্থাৎ স্রষ্টারূপে। তারা বাঙালী না অ-বাঙালী, ভারতীয় না অ-ভারতীয় তার বিশ্লেষণে সময় দেওয়ায় আমার মতি-গতি হামেশা খেলে না। অবশ্য নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্রে এই সব তথ্যের খতেন কর্‌তে রাজি আছি।

বাঙালী ভাস্করের দল

লেখক—ক্যাল্‌কাটা গ্রুপের ভাস্কর্যগুলা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যুবক বাঙলার কাজ-কর্ম পরিমাণে-বহরে খুবই কম। চল্লিশ বৎসরেও এই দিকে বেশী শিল্পীদের নজর পড়ল না। ভাস্কর্যের আদমসুমারিতে বাঙালীরা গরীব।

লেখক—স্বদেশী যুগের ভাস্কর কে-কে?

সরকার—সেকালে কাউকে দেখেছি কি না সন্দেহ। কুমারটুলীর পালেরা সেকাল-একাল সকল কালেই পূজার জন্য প্রতিমা গড়্‌তে অভ্যস্ত। একালের গোপেশ্বর পাল ইতালি-ফের্তা রূপদক্ষ। তাঁর সার্বজনিক নাম হ'য়েছিল। কয়েক বছর হলো মারা গেছেন। হিরন্ময় রায়চৌধুরী "অবন"পন্থীভাবে ভাস্কর্য সুরু করেন। নন্দলালের সাক্‌রেত ও সুহৃৎস্বরূপই বিলাতে গিয়েছিলেন—ভাস্কর্যে ওস্তাদ হ'তে। লন্ডনে দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে ১৯১৪ সনে। দেশে ফিরে আস্‌বার পরও দু-একবার দেখা হ'য়েছে। কিন্তু তাঁর হাতের কাজ কখনো দেখিনি।

লেখক—সেকালে কোনো ভাস্কর ছিল না?

সরকার—মান্দ্রাজের দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী আগে ছিলেন অবন-পন্থী চিত্রশিল্পী। পরে

দেখা দিয়েছেন ভাস্কররূপে। ক্ষিতীশ রায়কে একালের বাঙালী ভাস্করদের ভেতর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দেখ্‌ছি। চিত্রশিল্পী অতুলের মতন ক্ষিতীশ খোলাখুলি পাশ্চাত্য রীতির প্রতিনিধি। ক্যাল্‌কাটা গ্রুপের প্রদোষ দাশগুপ্তকে নয়া ভাস্করদের অন্যতম দেখ্‌ছি। আমার পক্ষে প্রদোষ একটা আবিষ্কার বিশেষ।

ভাস্কর প্রদোষের "মাতৃ-মূর্তি"

১০ই এপ্রিল ১৯৪৫

লেখক—প্রদোষের কোনো কাজ এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয় নি?

সরকার—প্রদোষের "মাতৃমূর্তি" জবরদস্ত সৃষ্টি। দেখেই মনে হ'লো,—এই শিল্পে বিপ্লব এনেছেন প্রদোষ।

লেখক—বিশেষত্ব কী?

সরকার—না দেখা থাক্‌লে বুঝানো কঠিন। তার একটা ফটো থাক্‌লেও বুঝানো সহজ হ'তো।

লেখক—তবুও বুঝাতে চেষ্টা করুন না?

সরকার—একটা মেয়ে মানুষের ভঙ্গী গড়া হ'য়েছে গরু, ছাগল বা কুকুরের আকারে। চতুষ্পদ আর কি? দুটা শিশু দুদিক্ থেকে মায়ের দুধ খাচ্ছে উপুর হ'য়ে শুয়ে,—ঠিক যেমন কুকুরের বা বিড়ালের বাচ্চারা দুধ চুষে তাদের মায়ের বুকের। তৃতীয় শিশু একটার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে চুষবার জন্য। মা পুরাপুরি উপুর হ'য়ে হাত-পা ছড়িয়ে সহজ ভঙ্গীতে শোআ নয়। বুক্-ডন কর্‌বার সময় মানুষের পেছনটা যতখানি উঁচু থাকে প্রদোষের হাতে মেয়েটার পেছন প্রায় ততখানি উঁচুতে র'য়েছে। তার হাত-দুটো সাম্‌নে রয়েছে নীচু মাথার ভরস্বরূপ। বিলকুল মেয়ে-জানোআর এই মাতৃমূর্তি। অবশ্য অ্যানাটমির (অস্থিবিদ্যার) মাপজোক টুঁড়লে চল্‌বে না।

লেখক—এই জানোআর গ'ড়েছে ব'লে আপনি প্রদোষকে ভাস্কর্যে বিপ্লব-প্রবর্তক বল্‌ছেন?

সরকার—ঠিক তাই।

মানুষ-জানোআর

লেখক—কেন? মানুষকে জানোআর মূর্ত্তিতে দেখায় বাহাদুরি কী?

সরকার—মানুষ হাজার-কিছু বটে। কিন্তু অন্যান্য যাই হই,—মানুষের বাচ্চা আমরা গোড়ায় জানোআর,—আগায় জানোআর,—ভেতরে জানোআর,—বাইরে জানোআর। এই সত্যটা শিল্পের মারফৎ চোখে-আঙুল দিয়ে দেখানো খুবই ওস্তাদির লক্ষণ।

লেখক—ওস্তাদিটা কোথায়?

সরকার—প্রথম ওস্তাদি কল্পনায়, খেয়ালে, চিন্তায়, বাণীতে, দর্শনে। মানুষকে জানোআর ভাবে বুঝ্‌তে পারাটাই ওস্তাদি। সঙ্গে-সঙ্গে জানোআরকে মানুষ ভাবে বুঝ্‌তে

পারাও কম ওস্তাদি নয়। গরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি জীবজন্তুর মাতৃত্ব মানুষের মাতৃত্বেরই জুড়িদার। এই কল্পনা-যে-সে কল্পনা নয়। এ হচ্ছে চরম সত্য।

লেখক—কী বল্‌ছেন?

সরকার—কেন? "রামেদের বুধী গাই প্রসব হইল"—কবিতাটা ছেলেবেলায় পড়েনি কে? তার ভেতর রস আছে কোন্ ধরণের? "আপনি ধুখিছে তবু চাটে প্রাণ-পণে।" মনে নাই? কুকুরের বাচ্চা হওয়া অনেকে দেখেছে। বিড়ালের বাচ্চা হওয়াও অনেকে দেখেছে। বাচ্চা সম্বন্ধে জীবজন্তুর শিশু-স্নেহ অল্পমাত্র মালুম হয় কি? কুকুর-মা বিড়াল-মা, গরু-মা, ছাগল-মা, আর মানুষ-মা একই মা।

লেখক—দেখছি, আপনি হঠাৎ জানোআর-ভক্ত হ'য়ে পড়লেন? নিরামিষ ধ'রেছেন না কি?

সরকার—মানুষের বাচ্চা আমরা ছেলেবেলা থেকে এইরূপই দেখে শুনে ভেবে আস্‌ছি। তবে বোধ হয় সাধারণতঃএই সত্যটা নিয়ে লাফালাফি করি না,—বকাবকি করিনা,—কবিতা লিখি না—ছবি আঁকি না।

লেখক—আর কোনো লোক এই ধরণের চিন্তা করে?

সরকার—আজকাল, চিত্তবিজ্ঞান-বিদ্যা যারা আলোচনা করে, তারা জানোআর চিত্ত-বিশ্লেষণ কর্‌তে অভ্যস্ত। পরীক্ষামূলক আর তুলনামূলক চিত্তবিজ্ঞানের গবেষকেরা গরু, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির চিত্তে মানুষের সুপরিচিত হিংসা, ভালবাসা, দরদ, কৃতজ্ঞতা, স্মৃতিশক্তি, আক্রোশ, টক্কর ইত্যাদি প্রবৃত্তির ও শক্তির সন্ধান রাখে। সেই চিত্তবিজ্ঞান-মাফিক ভাস্কর্যই খাড়া হ'য়েছে প্রদোষের "মাতৃমূর্তি'তে। এই হিসাবে প্রদোষেব কৃতিত্ব অদ্ভুত।

লেখক—মানুষকে জানোআর ভাবে দেখ্‌লে মানুষের কোনো লাভ আছে?

সরকার—আছে বৈ কি? কথায়-কথায় মানুষকে দেব-দেবী ইত্যাদি হাতী-ঘোড়া বিবেচনা কর্‌বার বাতিক চাগ্‌বে না। তাছাড়া একটা বড় কথা আছে,—স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির তরফ থেকে। তার কিম্মৎও লাখ টাকা।

লেখক—সে আবার কী?

সরকার—প্রত্যেক মানুষের পক্ষে উচিত চব্বিশ ঘণ্টার কয়েক মিনিট জানোআরের মতন চলাফেরা করা। একদম ন্যাংটা ভাবে দু-চার মিনিট এক্‌লা-ঘরে খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো শক্তি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে যারপরনাই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া ডন-কসরৎ-ব্যায়াম ইত্যাদির জন্য দু-চার মিনিট জানোআরি ভঙ্গী নকল করা প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষেই মঙ্গল-জনক। পুরাপুরি চতুষ্পদ জানোআর হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তার কিছু-কিছু কয়েক মিনিটের জন্য নকল করা স্বাস্থ্যকর কাজ। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে এই হচ্ছে আমার অন্যতম পাঁতি।

লেখক—কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে কথা ব'লে দেখেছেন?

সরকার—কবিরাজ-ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখা মন্দ নয়। তাঁদের বিচারে মানুষের মাংসপেশী, হাড়-মাস, চোখ-কান, মুড়ো, স্নায়ু ইত্যাদি বস্তুকে খানিকটা অ-মানুষিক ঢঙে চালানো বুদ্ধিমানের কাজই বিবেচিত হবে। চব্বিশ ঘণ্টা খাড়া চলাফেরা করা ঠিক নয়। চাই কিছু-কিছু জানোআরি ভঙ্গী, জানোআরি ঢঙ্। জানোআরিতে ফিরে যাওয়া মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম উপায়। বিদেশে কোনো-কোনো ডাক্তারমহলে এই ধরণের গল্পাগল্পি চালিয়েছি।

প্রদোষের রূপ-দক্ষতা

লেখক—প্রদোষের "মাতৃমূর্তি'র ভেতর আর কোনো ওস্তাদি দেখেছেন?

সরকার—নিশ্চয়। এতক্ষণ তো মাত্র কল্পনার কথা, বাণীর কথা, দর্শনের কথা উপদেশের কথা বল্‌ছি। শিল্পীর পক্ষে আসল ওস্তাদি কল্পনা, বাণী, উপদেশ, দর্শন, বক্তব্য বা কাহিনীটা নয়। শিল্প-সৃষ্টির আসল কথা রূপ, গড়ন, রং, ছাঁচ, আকার-প্রকার। রূপের খেলা আর রংয়ের খেলা ছাড়া চিত্রকরেরা আর কিছু জানে না।

লেখক—প্রদোষের "মাতৃমূর্তি'তে শিল্প-বিষয়ক ওস্তাদি কী দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

সরকার—প্রদোষ মেয়েটার বিভিন্ন অংশ সাজিয়েছেন অতি-নিপুণ-ভাবে। উঁচু-নীচু গড়নগুলা, বাঁকা-চোরা গড়নগুলা, লম্বা-চৌড়া গড়নগুলা সবই চোখে ঠেকে মোলায়েম। তা ছাড়া এ-গুলার পরস্পর-যোগাযোগও সাধিত হ'য়েছে যারপরনাই মোলায়েমভাবে। আবার বল্‌ছি,—অস্থিবিদ্যার মাপজোক এখানে নাই। গড়নসমূহের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে প্রদোষের জ্ঞান খুবই উল্লেখযোগ্য। না দেখ্‌লে বুঝা যাবে না। এসব হচ্ছে চোখের খেলা।

লেখক—গড়ন-সামঞ্জস্য এত মূল্যবান?

সরকার—মূর্তিগুলা দেখ্‌বার পর জান্‌বার দর্‌কার হয় না এ-সব মেয়ে মানুষ আর মানুষেব বাচ্চা, না কুকুর-মা আর কুকুরের বাচ্চা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মধুর-সামঞ্জস্যশীল ছোট-বড়-মাঝারি রূপগুলার জ্যান্ত সমাবেশ। প্রাণে ঘা লাগায় সরসভাবে মাঝারি আকারের এক মূর্তি-স্তূপ। এই ওস্তাদি না থাক্‌লে একমাত্র মানুষ-জানোআরের মাতৃমূর্তি আমাকে মাত্ কর্‌তে পার্‌তো না। প্রদোষ সত্যিকার রূপদক্ষ শিল্পী। তা ছাড়া শক্তি, স্বাস্থ্য, তেজ, জীবনবত্তা এই সব হচ্ছে প্রদোষের গড়নগুলার আবহাওয়া।

লেখক—প্রদোষের হাতের আর কোনো কাজ ছিল না?

সরকার—গোটা দশ-বার দেখলাম। প্রত্যেকটাতেই মনে হ'লো প্রদোষ খুঁটিনাটির দিকে নজর দিতে অভ্যস্ত নন। খুব আদিম জিনিষ নিয়ে তাঁর কারবার। মোটা-মোটা দু-চারটা গড়নের সাহায্যে কাজ শেষ করা হয়। যামিনী-শিল্পের চিত্রগুলায়ও এইরূপ মোটা-মোটা দু'চারটা সরল রেখার ক্যারদানি দেখা যায়। দুয়ের কৃতিত্বই তারিফ-যোগ্য।

লেখক—দু'একটার কিছু-কিছু মনে আছে?

সরকার—বার-চোদ্দ জন স্ত্রী-পুরুষ-ছেলে-মেয়ের সারি দেখা গেল একটাতে। অম্‌নি মনে প'ড়লো ফরাসী ভাস্কর রদ্যাঁ-সৃষ্ট "প্যারিসের নাগরিক-দল"।

লেখক—বিশেষত্ব কী?

সরকার—ছোট-বড়-মাঝারি মূর্তিগুলাকে সাজানো হ'য়েছে বেশ কায়দার সহিত। হাত-পা'র গড়নের সঙ্গে মাথা-ঘাড়ের গড়নে খাপ খেয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিটার ভেতর একটা সামঞ্জস্য ফুটে উঠেছে। অধিকন্তু খানিকটা গতিভঙ্গীর আন্দাজ করা যায়। অথচ স্থিতিই প্রধান কথা। না দেখ্‌লে এসব কথা বুঝা কঠিন। ব'কে বুঝানো ঝক্‌মারি।

লেখক—আর কোনো ভাস্কর্যের সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—একটাতে কোনো মেয়ে তার ছেলে নাচাচ্ছে। নারী-মূর্তি পিঠের ওপর শোআ। শিশুকে রাখা হ'য়েছে হাঁটুর নীচে পায়ের ওপর। বলা বাহুল্য, দৃশ্যটা বাঙালী, অবশ্য অ-বাঙালীও বটে। এই সৃষ্টিতেও ভাস্করের হাতে ধরা দিয়েছে স্থিতির সঙ্গে গতির যোগাযোগ। তা ছাড়া মূর্তিগুলার বিভিন্ন অংশে রূপ-সামঞ্জস্য ধরা পড়ে।

লেখক—আগে জান্‌লে দেখে আস্‌তাম।

সরকার—ছবি, মূর্তি ইত্যাদি চিজ সম্বন্ধে বক্‌বার কিছু নাই। এসব জিনিষ চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হয়। রূপদক্ষতা বিশ্লেষণ কর্‌তে হ'লে রূপটার, গড়নটার, ছাঁচটার, ঢালাইটার সাম্‌নে দাঁড়ানো আবশ্যক। চাই চোখ, চোখের ব্যবহার।

সেজানের "নাতীর দল"

লেখক—আপনি অনেকবার সেজানের নাম ক'রেছেন। সেজান কবেকার লোক?

সরকার—সেজানের জন্ম ১৮৩৯ সনে আর মৃত্যু ১৯০৬ সনে। তাকে শিল্পী হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে (১৮৭৫-১৯০০) ফেল্‌তে হবে। অর্থাৎ আজকাল যাদের বয়স পঁচিশ-ত্রিশ তাদের গুরুর গুরু সেজান। বস্তুতঃ ১৯১৪-২৫-এর যুগে প্রথমবারকার বিদেশ-পর্যটনের সময়ে যে-সকল ছোকরা চিত্রশিল্পের সঙ্গে ইয়োরামেরিকায় মোলাকাৎ ঘ'টেছে তারাও সেজানকে ঠাকুরদাদা বল্‌তো।

লেখক—১৯১৪-২৫ সনের যুগে সেজানের যে-সকল নাতীদের কাজকর্ম দেখেছেন তাদের দু-এক জনের নাম কর্‌বেন?

সরকার—প্রথমেই বল্‌বো—মার্কিণ চিত্রশিল্পী ম্যাক্‌স্ ওয়েবার। তার সঙ্গে আমার মাখামাখি ছিল গলায়-গলায় (১৯১৪-২০)। ফরাসী শিল্পীদের ভেতর নাম কর্‌বো রেণোআ, গ্লেই, দেরাঁ্যা ইত্যাদি চিত্রশিল্পীর (১৯২০-২১)। জার্মাণিতে নামজাদা ছিল কান্ডিন্‌স্কি, নোল্‌ডে, ক্লে, মার্ক্, কোকোশ্‌কা, মারে ইত্যাদি অনেকে। এদের কারু-কারু সঙ্গে দহরম-মহরম চ'লেছে বিস্তু (১৯২১-২৫)। এইসব মার্কিণ-ফরাসী-জার্মাণ রূপদক্ষদের সঙ্গে তাদের কর্মশালায়ও অনেক সময় কাটিয়েছি। ওয়েবারকে দিয়ে নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে-মিউজিয়ামে ছবির সামনে, মূর্ত্তির সামনে বকিয়ে ছেড়েছি বহুবার।

লেখক—পাশ্চাত্য সুকুমার শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে আপনার ব্যাখ্যা মাফিক কোনো বই আছে? নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—মার্কিণ লেখক চেনী-প্রীতি "এ ওয়ার্লর্ড্ হিস্ট্রি অব্ আর্ট্' (নিউইয়র্ক ১৯৩৭)।

লেখক—স্পষ্টাস্পষ্টি জান্‌তে চাই। বলুন তো আপনি কি অবন, গগন, রবি, যামিনী, গোপাল, নীরোদ ইত্যাদি চল্লিশ বছরের বাঙালী শিল্পীদেরকে প্রকারান্তরে ফরাসী শিল্পগুরু সেজানের বাঙালী নাতীর দল বল্‌ছেন?

সরকার—ঠিক তাই। আর প্রদোষ ফরাসী রদ্যাঁর নাতী। এই হচ্ছে আমার মেজাজে বাঙালীর আধ্যাত্মিক বংশ-লতিকা।

লেখক—জোর্‌সে ঝাড়ছেন এই মত?

সরকার—আলবৎ। হামেশাই ব'কে চ'লেছি যে, বর্তমান ভারতের সব-কিছুই দোআঁশ্‌লা। একালের ভারতীয় সংস্কৃতি ষোলআনা বর্ণসঙ্করের সন্তান ও সুফল। একমাত্র অজন্তা, সাঁচি, কাঙড়া, রাজপুতানা, দিল্লী, মাদুরা, সিংহল, কোনারক, আর কালীঘাটের মাল খেয়ে বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে "অবন"-শিল্প পায়দা করা সম্ভবপর হ'তো না। আর গগন-অতুল-যামিনী-রবি-প্রদোষ-নীরোদ ইত্যাদি শিল্পীদের চিত্র-ভাস্কর্যের তো কথাই নাই। এই সৃষ্টিগুলা খোলাখুলি বাজারে দাঁড়িয়ে নিজেদের দোআঁশ্‌লামি জাহির ক'র্‌ছে।

এপ্রিল ১৯৪৫

মেঘনাদ, জ্ঞান মুখার্জি, শিশির মিত্র ও জ্ঞান ঘোষের বৈজ্ঞানিক অভিযান

১৫ই এপ্রিল ১৯৪৫

মন্মথ—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা বাঙালী বিলাত-ফের্তা ও আমেরিকা-ফের্তা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্‌বার জন্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন (২৯ মার্চ ১৯৪৫)। আপনিও সেই চা-সভায় উপস্থিত ছিলেন শুন্‌লাম। বৈজ্ঞানিকদের কে-কে এসেছিলেন বাঙলা দেশের শিল্পোন্নতির জন্য তাঁরা কিরূপ পরামর্শ দিলেন?

সরকার—বিলাতে ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক অভিযান চালাবার জন্য গবর্মেণ্ট সাত জন ভারতীয় বিজ্ঞান-বীরকে পাঠিয়েছিল। তাদের ভেতর চার জন্য হচ্ছে বাঙালী ঃ— মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আর শিশিরকুমার মিত্র। এঁদের ভেতর জ্ঞান ঘোষ হ'চ্ছেন বাঙালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর। তিনি নরেন লাহার চা-সভায় হাজির হ'তে পারেন নি। আর তিন জন উপস্থিত ছিলেন। এঁরা তিনজনেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগে বাহাল আছেন।

লেখক—কে কী বল্‌লেন?

সরকার—বিলাতে ও মার্কিণ মুল্লুকে লড়াইয়ের যুগে নয়া-নয়া উৎপাদন-প্রণালী কাজে লাগানো হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার হচ্ছে দেদার। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-যানবাহনের সব-কিছুই ব'দ্‌লে যাচ্ছে, রূপান্তর ঘট্‌ছে, যুগান্তর আস্‌ছে ইত্যাদি। বাঙালীর বাচ্চারা ঘরে ব'সে এই সম্বন্ধে দুনিয়ার অনেক-কিছুই আন্দাজ কর্‌তে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু মেঘনাদ, শিশির আর জ্ঞান নিজ চোখে এইসব নয়া শিল্প-বিপ্লব দেখে এসেছেন। এই হ'লো মোটা কথা।

লেখক—এই সব কথা আপনার "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ আমরা ১৯২৬ সন হ'তে রোজই শুনে আস্‌ছি। কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। তাছাড়া আপনার "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (১৯৩০-১৯৩২) "ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট" (১৯২৬, ১৯৩২) আর "ইকুয়েশন্‌স অব ওয়ার্লড-ইকমমি" (১৯৪৩) বইয়ের পাতাগুলা বিলাত, জার্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব", নয়া শিল্প-বিপ্লব, তৃতীয় শিল্প-বিপ্লব ইত্যাদি সাম্প্রতিক আর্থিক বিপ্লবের কথায় ভরপুর। এসব জেনে-শুনে আমাদের লাভ হয় কতটা?

সরকার—একজনের মুখে বারে-বারে শুন্‌লে কথাগুলা তেতো হ'য়ে যায়। এই জন্য রকমারি মুখে, রকমারি বোলে, রকমারি ঢঙে একই কথা বার বার শুনা মন্দ নয়। বিশেষতঃ—একদম তর-তাজা খবর পাওয়া যারপরনাই উপকারী। অধিকন্তু মেঘনাদ পদার্থশাস্ত্রী, জ্ঞান রাসায়নিক আর শিশির রেডিও-বৈজ্ঞানিক। কাজেই নজর এঁদের বেশী যায় যান্ত্রিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন ইত্যাদি গুলার দিকে। এঁরা এঞ্জিনিয়ার নন। কিন্তু আবিষ্কার সমূহ বুঝ্‌বার ক্ষমতাও এঁদের আছে। এইজন্য নরেন লাহার পক্ষে বঙ্গীয়-বণিক্-সভার লোকদেরকে ডেকে এনে মেঘনাদ ইত্যাদি কথা শুনিয়ে দেওয়া খুবই বুদ্ধিমানের কাজ

হ'য়েছে।

লেখক—তা তো ভালই,—বিশেষতঃ চা-মজলিশে বক্তৃতা শোনার চেয়ে উপাদেয় আর কী হ'তে পারে? কিন্তু আপনি তো বছর পঁচিশেক ধ'রে ইয়োরামেরিকার নয়া শিল্প-বিপ্লব, নবীনতম, যন্ত্রনিষ্ঠা, শিল্প-গবেষণা, ব্যাঙ্ক-গবেষণা, বাণিজ্য-গবেষণা, অর্থনৈতিক গবেষণা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ব'কে চ'লেছেন। তার ফলে বাঙালী জাতের কৃষি-কর্মে, শিল্প-কর্মে, ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্বাণিজ্যের ব্যবসায় নতুন-কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে কি? আমরা তো সংবাদপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করি, মজুর-পাড়ায়ও চলাফেরা করি,—লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজনের সঙ্গে ঘোঁটমঙ্গল করি। কিন্তু কোথাও শুন্‌তে পাই কি যে, বাঙালী কারবারীরা দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের কোনো-কিছু জিনিষ বাঙালীর তাঁবে আন্‌তে পেরেছে?

সরকার—লেখাপড়া, বক্তৃতা, বাক্-বিতণ্ডা, বই-লেখা, গবেষণা-চালানো ইত্যাদি চিজের মতলব বুঝ্‌তে তোমার গোল বাঁধ্‌ছে দেখ্‌ছি। লেখাপড়া কর্‌তে গেলে অনেক-কিছু জানা যায়, শোনা যায়, শেখা যায়। কিন্তু দুনিয়ার নানা দেশে মানুষেরা যা জানে তার কতটুকু তারা কাজে পরিণত কর্‌তে পারে? কোনো দেশের পক্ষে বেশী-কিছু, গবেষণা, বিদ্যাপ্রচার, বিদ্যা-বৃদ্ধি বন্ধ করা উচিত কি? ইংরেজ-মার্কিণ-জার্মাণ জাতের নরনারী আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে প্রতিমুহূর্তেই ডজন-ডজন। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই সেই সকল ডজন-ডজন আবিষ্কার কাজে লাগাতে পারে কি? অনেক জিনিষই আকাশ-কুসুম থেকে যায়,—ওসব দেশেও।

লেখক—তা'হলে কী ব'ল্‌ছেন?

সরকার—মেঘনাদ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকদের নয়া-নয়া অভিজ্ঞতাগুলা বাঙালীর বাচ্চার জানা উচিত। বিশেষতঃ বণিক, বেপারী, কারখানা-পরিচালক, ব্যাঙ্কার ইত্যাদি লোকেরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মেলামেশা করুক। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আগাগোড়া এই মেলামেশা চালিয়ে এসেছে। বস্তুতঃ সেদিনকার চা-সভায় ঠিক যেন বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদেরই অন্যতম বাক্-বিতণ্ডা অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। "নরেন লাহার বারান্দায়" এই ধরণের বণিক্-বৈজ্ঞানিক বৈঠক নতুন-কিছু নয়। এসব লেগেই আছে। আর-একটা হ'লো। মন্দ কী?

লেখক—এই তিনজন বৈজ্ঞানিকের পাঁতির ভেতর কোনো প্রভেদ দেখ্‌তে পেলেন?

সরকার—সত্যিকার প্রভেদ কিছুই নাই। শিল্পোন্নতির জন্য মোটের ওপর তিনজনের পাঁতিই একরূপ। তবে এক জন রেডিও বুঝে বেশী, একজন বুঝে রাসায়নিক মাল বেশী, আরেক জনের মাথা খেলে বেশী বিজলী-শক্তি ইত্যাদির আখ্‌ড়ায়। এই যা। তিন জনের জোর ছিল তিনটা আলাদা-আলাদা দিকে। অবশ্য সে-সবও বাঙালীর চিন্তায় নতুন-কিছু নয়। তবে শুনে লাভ হয় বৈকি।

শিল্প-গবেষণা ও শিল্পোন্নতি

লেখক—শিল্পোন্নতির জন্য মেঘনাদ সাহার পাঁতি এক কথায় বল্‌তে পারেন?

সরকার—প্রত্যেক স্বদেশ-সেবকেরই পাঁতি অনেকগুলা। মেঘনাদ সাহার অন্যতম প্রধান চাহিদা হচ্ছে শিল্প-গবেষণার জন্য পরিষৎ। তার প্রতিষ্ঠাতা হবে শিল্প-কারখানার

মালিকেরা। একমাত্র ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের ওপর শিল্প-মালিকদের নির্ভর করা উচিত হবে না। এই কথাটার ওপর জোর প'ড়েছে।

লেখক—এই বিষয়ে আপনি ও তো বোধ হয় এইরূপ কথাই ব'লেছেন অনেক বার? নতুন-কী পাচ্ছি?

সরকার—অনেক দিন ধ'রেই অনেক জায়গায় এই পাঁতি ঝাড়া আমার দস্তুর। যাদবপুরের কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিংয়ে এঞ্জিনিয়ারিং-বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা নাই। এই অসম্পূর্ণতার কথা আমি নানা উপলক্ষ্যে ব'লেছি। তার জন্য স্বতন্ত্র লোক চাই, স্বতন্ত্র টাকা চাই। কিন্তু মেঘনাদের বর্তমান প্রস্তাবে ইস্কুল-কলেজের ভেতরকার গবেষণার ওপর নজর নাই।

লেখক—নজর তা হ'লে কোন্ দিকে?

সরকার—ইস্কুল-কলেজের বিজ্ঞান-মাস্টাররা যা-কিছু গবেষণা করে তাতেই বাঙালী জাতের সন্তুষ্ট থাকা চল্‌বে না। বাঙালী কারখানার মালিকেরা রাসায়নিক শিল্প, যান্ত্রিক শিল্প, বৈদ্যুতিক শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা না কর্‌লে বাঙালী জাতের শিল্পোন্নতি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চল্‌তে বাধ্য। এই মতটার ওপরই জোর প'ড়েছে মেঘনাদের সেদিনকার বক্তৃতায়। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মিল ষোল আনা। কারখানা, ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কারবারে যখনি বকাবকি করবার সুযোগ পেয়েছি তখনই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত এই ধরণের শিল্প-গবেষণার, আর এঞ্জিনিয়ারিং-গবেষণার পাঁতি ঝেড়েছি।

লেখক—কিন্তু মেঘনাদ-বাঞ্ছিত শিল্প-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান বাঙালীরা খাড়া কর্‌তে পার্‌বে কি?

সরকার—কল্‌কাতার মারোআড়িরা পার্‌বে। এখনো বাঙালীর মুরোদ হবে কিনা সন্দেহ। বাঙালীরা বড় জোর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক জন গবেষক বাহাল কর্‌বে ৭৫-১৫০-৩০০্ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়ে। হয়ত বা যাদবপুর কলেজেও যন্ত্র-গবেষণা বা শিল্প-গবেষণার জন্য কিছু টাকা খরচ করা হ'তে পারে। কিন্তু শিল্প-গবেষণার জন্য বড়-গোছের স্বাধীন কেন্দ্র বাঙালী বেপারীদের তাঁবে এখনো আশা করি না। তবে মারোআড়িদেরকে আমি বাঙালী বলি। এই হিসাবে মেঘনাদের পাঁতি বাঙালী সমাজে চল্‌তে পারে।

লেখক—শিল্প-গবেষণায় খরচের মেজাজ সম্বন্ধে বাঙালীতে মারোআড়িতে প্রভেদ কর্‌ছেন কেন?

সরকার—সোজা কথা। মারোআড়িরা বড়-বড় কারখানা চালাচ্ছে। বাঘা-বাঘা ফ্যাক্টরির মালিকানা আর পরিচালনা করা তাদের আটপৌরে কাজ। কাজেই কারখানার কোথায় গলদ আর কোন্ পথে উন্নতি এই সম্বন্ধে তাদের মুড়ো সজাগ। শিল্প-পতি আর শিল্প-নিষ্ঠ ব'লেই তাদের পক্ষে শিল্পোন্নতির জন্য খোঁজ-খবর, অনুসন্ধান, গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবার ধান্ধা আছে।

লেখক—কিন্তু বাঙালীদের মগজ বা মেজাজ কিরূপ?

সরকার—আগে বড়-বড় শিল্পের, কারখানার, ফ্যাক্টরির মালিক হ'তে অভ্যাস করুক বাঙালীর বাচ্চারা। তার পর আপনা-আপনিই শিল্প-গবেষণার, ফ্যাক্টরি-গবেষণার, যন্ত্রপাতি-গবেষণার তাগিদ আস্‌বে। গবেষণা-ঠবেষণা শিল্প-পতিদের কাছে বাতিকের জিনিষ নয়। এসব তাদের পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা। যাদের শিল্প নাই অথবা নেহাৎ নগণ্য শিশু, তাদের আবার শিল্প-গবেষণা কী? এজন্য তাদের মগজ খেল্‌তেই পারে না।

বাঘা-বাঘা কারখানা ও শিল্পোন্নতি

১৮ই এপ্রিল ১৯৪৫

মন্মথ—জ্ঞান মুখার্জির মতে শিল্পোন্নতি সম্ভব কোন্ পথে?

সরকার—জ্ঞান মুখার্জির বল্‌ছেন—"কারখানার মতন কারখানা চালাতে হ'লে বাঙালী শিল্পীদেরকে কোটি-কোটি টাকার পুঁজি ঢাল্‌তে হবে। ছোট-খাটো কারবারে শিল্পোন্নতি সম্ভবপর নয়। চাই বাঘা-বাঘা ফ্যাক্‌টরি। দেড় কোটি-দুকোটির কমে ভদ্রলোকের পাতে দেবার উপযুক্ত কারখানা খাড়া করা অসম্ভব।" শব্দগুলা আমার।

লেখক—জ্ঞান মুখার্জির সঙ্গে আপনার মতের মিল আছে?

সরকার—বর্তমান জগতের চরম উন্নতিওয়ালা দেশের ডাক-হাঁক এইরূপই। তার মাপে বাঙালী জাত্‌কে শিল্পনিষ্ঠায় পাকিয়ে তুল্‌বার জন্য প্রবন্ধে লিখ্‌তে বা বক্তৃতা কর্‌তে চাও? যাদের মতলব প্রবন্ধ লেখা তারা জ্ঞান মুখার্জির পাঁতি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য। দুনিয়ায় আজকাল বাঘা-বাঘা কারবারের যুগ। অনেক দিন ধ'রেই এসব কথা ব'কে আস্‌ছি। আমার মতিগতি সম্বন্ধে তুমি নিজেই সে-কথা আগে ব'লেছো। বাংলায় বা ইংরেজিতে যে-কয়টা বই ঝেড়েছি তার ভেতর "একালের ধনদৌলত"-বিষয়ক আকার-প্রকার ও বহর সম্বন্ধে গোঁজামিল রাখিনি। বাঘা-বাঘার সঙ্গে টক্কর দেওয়া সম্ভব এক মাত্র বাঘা-বাঘার পক্ষে। কাজেই জ্ঞান মুখার্জির বাণী হুসিয়ারের বাণীই বটে। কথাগুলা ফেলিতব্য মাল নয়।

লেখক—তা'হলে বাংলাদেশের জন্য জ্ঞান মুখার্জির পাঁতি আর আপনার পাঁতি কি এক?

সরকার—একরূপ নয়। বাঙালীর বাচ্চার মুরোদ হচ্ছে আজ হাজার পঞ্চাশেক, লাখ, দেড় লাখ, আড়াই লাখ পর্যন্ত। লাখ পাঁচেক পুঁজি যদি কোনো বাঙালী কারবার দেখাতে পারে তাহ'লে তাকে আমরা মাথায় নিয়ে নাচা-নাচি করি। লড়াইয়ের মরশুমে দু-একটা বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ লাখের কোঠায়ও উঠেছে। ভাগ্যকুলের রায়-পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রেমচাঁদ জুট মিলের আবহাওয়া হচ্ছে লাখ চল্লিশেকের। ব্যস্।

লেখক—তাহ'লে আপনার গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের কৃতিত্ব কতটুকু?

সরকার—১৯৪৫ সনে আজ চল্লিশ বছর বঙ্গ-বিপ্লব আর স্বদেশী আন্দোলন চালাবার পরও বাঙালী বেপারীদের পুঁজির দৌড় বাঘা-বাঘার দৌড় নয়। শিল্প-বাণিজ্যে আমরা আজও হরিণ বা ছাগল অর্থাৎ পাঁঠা জাতীয় নর-নারী। নেহাৎ দুর্বল আমাদের আর্থিক হাড়-মাস। এই জন্য আমাকে অনেকে নৈরাশ্যবাদী বলে। আবার যারা আমার "বাড়তি" কথাটা শুনে তারা বলে অতিমাত্রায় আশাবাদী,—এমন কি আহম্মক বা গরু।

লেখক—বাঙালী পুঁজিপতিরা বর্তমানে কি বাঘা-বাঘা কারখানা, ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, বীমা, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক কারবার চালাতে পারে না? চালানো অসম্ভব কি?

সরকার—কী পারে আর কী না পারে তা "ফলেন পরিচীয়তে"। ১৯০৫-এর পরবর্তী বছর চল্লিশেকের ধারা দেখে খানিকটা আন্দাজ করা চলে। এই সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী কর্‌তে বসা অতি-পাণ্ডিত্য হ'য়ে পড়্‌বে। বাঙালী পুঁজিশক্তির ঝোঁক বা গতিটা খুব-জোর ঠারে-ঠোরে বুঝা সম্ভব। গা-জুরি ক'রে কোনো-কিছুকে অসম্ভব ব'লে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে ঢোঁক গিলে-গিলে বলা উচিত।

বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পুঁজি

লেখক—বাঙালীর পুঁজিশক্তির ধারা বা গতি দেখে আপনি আগামী ভবিষ্যতের ঝোঁক কিরূপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—একটা বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ হাতে-হাতে পাই বাঙালী ব্যাঙ্কগুলার জীবন-কথায়। ১৯৪২-৪৪ সনের ব্যাঙ্ক-বিষয়ক সরকারী ইস্তাহার বেরিয়েছে (বম্বে ১৯৪৪)।

লেখক—তাতে কী বুঝা যাচ্ছে?

সরকার—বিশ লাখের বেশী পুঁজিওয়ালার বাঙালী ব্যাঙ্ক গুন্‌তিতে গোটা পাঁচেক। এই পাঁচটা ব্যাঙ্কের সমবেত পুঁজি সওয়া কোটির কম। কাজেই বাঙালী জাতের পুঁজি বিষয়ক মুরোদ বর্তমানে বেশ-কিছু সামান্য। লাফালাফি কর্‌বার কিছু নেই।

লেখক—তাহ'লে আপনি যখন-তখন বাঙালীকে বাড়্‌তির পথে দেখ্‌ছেন কী ক'রে? বাঙালী জাত্‌কে বীরের বাচ্চা সর্বদা বলেন কেন?

সরকার—কারণ অতি-সোজা ও অতি-স্পষ্ট। বাঙালীর বাচ্চারা হামেশা বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে ওস্তাদ। এই জন্যই বীর। তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা দেখ্‌ছি,—বাঙালীর বাচ্চা আমরা কী ছিলাম আর কী হ'য়েছি। ১৯৩৯ সনে লড়াই যখন সুরু হয়, অর্থাৎ বছর পাঁচ-ছয়েক আগে সেই পাঁচটা বাঙালী ব্যাঙ্কের পুঁজি কতখানি ছিল?

লেখক—বলুন না।

সরকার—লাখ চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাত্র। সেই অবস্থা থেকে আমরা উঠেছি বর্তমানে এক কোটি পঁচিশ লাখ পর্যন্ত। বাড়্‌তি আর কাকে বলে? অধিকন্তু আজ ১৯৪৫ সনে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই পুঁজি-শক্তি বেশ-কিছু বেড়েছে। এই বাড়্‌তিটাও লক্ষ্য করা কর্তব্য। হয়ত আগামী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কিছু-কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু অ-বাঙালী ভারতীয় ব্যাঙ্কের অবস্থা কিরূপ? সেই মাপে বাঙালীর বাচ্চা নেহাৎ শিশু। আমাদের দৌড়ের মাত্রা নেহাৎ কচ্ছপের গতির সমান।

লেখক—একটু বিশদ ক'রে বলুন।

সরকার—ধরা যাক বোম্বাইওয়ালাদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। এই ব্যাঙ্কের পুঁজি হচ্ছে প্রায় এক কোটি সত্তর লাখ (১৯৪৩)। অর্থাৎ পাঁচ-পাঁচটি বাঙালী ব্যাঙ্কের সমবেত পুঁজির চেয়ে বেশী পুঁজি এই এক অ-বাঙালী ভারতীয় ব্যাঙ্কের। ১৯৪৫ সনে এর পুঁজি আড়াই কোটির ওপর। আর এই ব্যাঙ্কটা লোকজনের কাছ থেকে আমানত পায় কত?

লেখক—বলুন শুনি।

সরকার—পঞ্চান্ন কোটির চেয়ে বেশী ছিল ১৯৪৩ সনে। বর্তমানে আমানতের পরিমাণ প্রায় নব্বই কোটি। পাঁচটা বাঙালী ব্যাঙ্কের আমানত কত? বিশ কোটির চেয়ে কম (১৯৪৩)। সহজেই মালুম হ'চ্ছে,—অ-বাঙালী ভারতীয়ের মাপে বাঙালীর বাচ্চা আমানতের বহরে নগণ্য। কিন্তু তবুও বাঙালীর মাপে বাঙালীর বাড়্‌তি জবরদস্ত্‌। বাড়্‌তিগুলা আপেক্ষিক।

লেখক—কেন?

সরকার—বছর পাঁচ-ছয়েক আগে এই পাঁচটা বাঙালী ব্যাঙ্কের তাঁবে সমবেত আমানত ছিল পাঁচ কোটিরও কম। পাঁচ কোটির কাছাকাছি থেকে বিশ কোটির কাছাকাছি পর্যন্ত ওঠা জবর বাড়্‌তির লক্ষণ সন্দেহ নাই। আমার হিসাব সংখ্যানিষ্ঠ আর তুলনামূলক।

লেখক—আপনি সংখ্যানিষ্ঠ আর তুলনা-মূলক ব্যাঙ্ক-গবেষণার জন্য যে-ধরণের বই লিখেছেন সেই-ধরণের রচনা একালের বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের হাতে বেরুচ্ছে?

সরকার—কোন্ ধরণের বইয়ের কথা বল্‌ছো?

লেখক—"দুনিয়ার মাপে বাঙালীর ব্যাঙ্ক" ইত্যাদি প্রবন্ধ দেখেছি আপনার "বাড়্‌তির পথে বাঙালী (১৯৩৪)" আর 'ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট (১৯২৬-১৯৩২) ইত্যাদি বইয়ে। সেই ধরণের বইয়ের কথা বল্‌ছি।

সরকার—সরোজ বসু আর বিমল ঘোষ এই দুই জনের ব্যাঙ্কবিষয়ক লেখালেখিতে সংখ্যানিষ্ঠ গবেষণা আছে। দুজনেই ইংরেজি বইয়ের গ্রন্থকার।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙালীর ভবিষ্যৎ

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, বাঙালীরা আগামী কয়েক বৎসরের ভেতর দেড় কোটি, আড়াই কোটি, পাঁচকোটি পুঁজি ঢেলে ফ্যাক্টরি-ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদি কারবার চালাতে পারবে না?

সরকার—আমি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নই। আমার জবাব হবে, "দেখা যাক। সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে" ইত্যাদি। কিন্তু পার্শী, মারোআড়ি, গুজরাতী ইত্যাদি অ-বাঙালী ভারতীয়েরা এখনি গোটা কয়েক বাঘা-বাঘা কারবার ফাঁদতে পারে। ফেঁদেছে বস্তুতঃ কয়েকটা বাঘা-বাঘা কারবার তাদের হাতে আজই চল্‌ছে। তাদের কেহ-কেহ আড়াই কোটি-পাঁচকোটিব হাঁক ছেড়ে ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, বীমা, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি কারবার চালাতে পারবে। এদিক্-ওদিক্ না তাকিয়েই ব'লে দিচ্ছি। হাতগুনে বলার দরকার হচ্ছে না।

লেখক—জ্ঞান মুখার্জির পাঁতিটা তাহ'লে নেহাৎ অগ্রাহ্য করা উচিত নয়?

সরকার—নিশ্চয় নয়। অ-বাঙালী ভারত-সন্তানের পক্ষে এই পাঁতিতে অতি-কিছু নেই। খুবই সময়োপযোগী ও কাজের কথা। এই ধরণের মত আমার সর্বদাই র'য়েছে। এই সূত্রে আবার ব'লে রাখ্‌ছি যে, কল্‌কাতার ও বাঙলা দেশের মারোআড়িদেরকে আমি অ-বাঙালী বলি না। তারা আমার বিবেচনায় বাঙালী।

লেখক—মারোআড়িদের বাঘা-বাঘা কারবারে বাঙালীদের কোনো ঠাঁই আছে কি?

সরকার—মারোআড়িরা বাঙালীদেরকে অংশীদার হিসাবে সাধারণতঃ পছন্দ করে না। ভবিষ্যতে ও করবে কি না সন্দেহ। তথাপি তাদের সঙ্গে বাঙালীদের অন্যান্য সহযোগিতা আছে। ভবিষ্যতেও সেই সহযোগিতা থাক্‌বে। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী জাতের পক্ষে মারোআড়িদের সহযোগিতা রেখে চলা বাঞ্ছনীয়।

লেখক—মারোআড়িরা অনেকে আড়াইকোটি-পাঁচকোটির কারবার ফেঁদে বস্‌ছে। আর আমরা বাঙালীরা লাখ-পঞ্চাশেকের কারবারও দু-একটা পার্‌বো না?

সরকার—সত্যি কথা,—১৯৪৪-৪৫ সনের মরশুমে বাঙালী কারবারের পুঁজি দু-তিন ক্ষেত্রে পঞ্চাশ-লাখের কোঠে এসে পৌঁছেছে। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ব্যাঙ্কের পুঁজি ১৯৪৩-এর পর বেশ-কিছু বেড়ে গেছে। পঞ্চাশ-লাখওয়ালা, পঁচাত্তর-লাখওয়ালা ব্যাঙ্ক ১৯৪৫ সনে বাঙালীর কব্‌জায় আছে। ব্যাঙ্কের পুঁজি বাঙালী

তাঁবে লড়াইয়ের যুগেই আরও হয়ত বাড়্বে মনে হচ্ছে। কোটি টাকার পুঁজিওয়ালা বাঙালী ব্যাঙ্ক দু-একটা হয়ত কয়েক-বছরের ভেতরই দেখ্‌তে পাবো।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, লড়াইয়ের হিড়িকে বাঙালীরা কারবারী, বেপারী, শিল্পনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে?

সরকার—নিশ্চয়। অনেক বাঙালীর জীবনেই ফ্যাক্টরি, কারখানা, দোকানদারি, ব্যাঙ্ক-ব্যবসা, বীমার কারবার, যন্ত্রপাতির কেনা-বেচা ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজ এই কয় বছরে বেশ-কিছু ঘর ক'রে ব'সেছে। তবে "কিন্তু" আছে। (পৃঃ ৫৫২, ৬৭৮, ৭৬৪-৭৬৫)

লেখক—কেন? গোলযোগ কোথায়?

সরকার—লড়াই থেমে গেল পর এই ধরণের বহুসংখ্যক বেপারী, কারবারী, ব্যাঙ্কার, বণিক, কারখানা-পরিচালক বিপদে পড়্বে। ফেল মার্‌বার সম্ভাবনা র'য়েছে অনেকের। কিন্তু আবার কেহ-কেহ মাথা খাড়া রেখে চলা-ফেরা কর্‌তে পার্‌বে সন্দেহ নাই। লড়াইয়ের যুগের শিল্পনিষ্ঠা, বাণিজ্যনিষ্ঠা বাঙালী সমাজে কিছু-কিছু মোটা শিকড় গাড়্তে পেরেছে। এইরূপ আমার বিশ্বাস। ভবিষ্যৎ অনেক ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল। তবে বর্তমানে প্রত্যেক বেপারীর পক্ষেই হুসিয়ারভাবে সাবধানে চলা আবশ্যক।

স্বদেশী গবর্মেন্ট ও শিল্পোন্নতি

লেখক—শিশির মিত্র শিল্পোন্নতির জন্য প্রধান ভাবে কী চান?

সরকার—শিশির মিত্র সোজাসুজি ব'লে গেলেন যে, গবর্মেন্ট যদি দেশের লোকের স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা-মাফিক না চলে তা হ'লে বাঙালীর বা অন্যান্য ভারতবাসীর পক্ষে যথোচিত শিল্পোন্নতি আশা করা আহাম্মুকি।

লেখক—এই মতটা কেমন?

সরকার—দুনিয়ার কোন্ লোকটা এই মতের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে? ইংরেজরাও জানে, মার্কিণরাও জানে। জার্মাণরাও বুঝে, রুশরাও বুঝে। আর ভারত-সন্তান তো হামেশাই হাড়ে-হাড়ে বুঝে। বাঙালী আমরা যতই ম্যাড়াকান্ত হইনা কেন, এটুকু বুঝ্‌বার মতন আক্কেল আমাদের সকলেরই আছে।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, স্বদেশী লোকজনের স্বার্থমাফিক স্বদেশী গবর্মেন্ট ভারতে কায়েম হ'তে পারে?

সরকার—না। বরং ইংরেজের এক্‌তিয়ার, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ভারতে আরও বেড়ে চল্‌বে। কাগজে-কলমে হয়ত ভারতীয় নরনারী নতুন-নতুন রাষ্ট্রিক অধিকার পাবে। কিন্তু ইংরেজদের সত্যিকার ক্ষমতা আরও বাড়্বে ছাড়া কম্‌বে না। কাজেই ভারতীয় নরনারীর স্বার্থ পুষ্ট কর্‌বার মতন গবর্মেন্ট ভারতে কায়েম হওয়া অসম্ভব।

লেখক—ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় ইংরেজের ক্ষমতা আরও বেড়ে যাবে এরূপ ভাব্‌ছেন কেন?

সরকার—ক্লাইভের আমল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় ইংরেজের আসল ক্ষমতা কোনো দিনই কমেনি। কাগজে-কলমে ভারতীয় নরনারী কতকগুলা তথাকথিত স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পেয়েছে। ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন-বিষয়ক আইনে

সেই অধিকারসমূহ আকারে-প্রকারে বেশ-পুরুও বটে। শাসন-বিজ্ঞানের পরিভাষায় একটা "বিপ্লব" ঘ'টে গেছে বলা চলে।

লেখক—তা হ'লে দুঃখ কিসের?

সরকার—কিন্তু লন্ডনের ইংরেজ নরনারী আর তাদের দিল্লী-সিমলার প্রতিনিধিরা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যতখানি একতিয়ার ভোগ কর্‌তো আজ ও ঠিক ততখানি একতিয়ার ভোগ করে। আজ-কাল গোটা-কয়েক বাদামী ভারত-সন্তান কতকগুলা চলনসই বড়-বড় পদে বাহাল হ'য়েছে,—একথা ঠিক।

লেখক—ভবিষ্যতে কি উঁচু চাক্‌রিতে ভারতসন্তান থাকবে না?

সরকার—ভবিষ্যতে হয়ত আরও কিছু বেশী-বেশী বড়-চাক্‌রি ভারতীয় নরনারীর কপালে জুটবে। অধিকন্তু, ছোট-বড়-মাঝারি ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, কাউন্সিল, আসেম্ব্লি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ভারতের লোকেরা বেশী-বেশী প্রতিনিধিও পাঠাতে থাক্‌বে। কিন্তু দেশের আসল বাদ্‌শা যে কে সেই র'য়ে যাবে। কাজেই ইংরেজের একতিয়ার, আধিপত্য, ক্ষমতা স্বদেশী লোকের অধিকারে তুলনায় কম্‌তে পারে না। "শাঁশ" বা "ক্ষমতা" যা-কিছু সবই শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কব্জায় থাক্‌তে বাধ্য। (পৃষ্ঠা ৮৩৮-৮৩৯)

লেখক—ইংরেজের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, এক্‌তিয়ার ইত্যাদি চিজ বেড়ে যাবে কেন মনে হচ্ছে?

সরকার—দুনিয়ায় বৃটিশ জাতের বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি লড়াইয়ের পর খুব-বেশী বেড়ে যাবে। ভারতীয় নরনারীর বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য আর রাষ্ট্রশক্তিও কিছু-কিছু বাড়্‌বে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজ জাতের বাড়্‌তির হার থাক্‌বে ভারতীয় বাড়্‌তির হারের অনেক গুণ বেশী। কাজেই ভারতীয় নরনারীর রাষ্ট্রিক অধিকার,—নয়া শাসনবিষয়ক কানুনের জোরে—যতই বাড়ুক না কেন, ইংরেজের তুলনায় সে সব যারপরনাই খাটোই থেকে যাবে,—হয়ত আরও বেশী খাটো হবে। সুতরাং ভারতের কর্মক্ষেত্রে ইংরেজ এখনকার চেয়ে বেশী প্রতাপশালী থাক্‌বে। আরও দু-একটা দিকে নজর ফেলা আবশ্যক।

ইংরেজের ক্ষমতা-বৃদ্ধি

২৫শে এপ্রিল ১৯৪৫

মন্মথ—ইংরেজের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে সেদিন কয়েকটা নতুন দিকে নজর ফেল্‌তে ব'লেছেন। কোন্‌-কোন্‌ দিকে?

সরকার—বর্তমান লড়াইয়ের আবহাওয়ায় ইংরেজ, মার্কিণ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ ফৌজ ভারতবর্ষে হাজার-হাজার জারজ সন্তান পায়দা কর্‌ছে। এইসব জারজ ভারতীয়েরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইয়োরেশিয়ানদের দল পুরু কর্‌বে।

লেখক—তাতে কী হ'লো?

সরকার—এই সকল জারজ ছেলেমেয়েদেরকে পুষ্‌বার জন্য, লেখাপড়া শিখাবার জন্য, চাক্‌রি দেবার জন্য, খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের গণ্ডা-গণ্ডা কর্মকেন্দ্র র'য়েছে ভারতের নানা জনপদে। বলা বাহুল্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'চ্ছে ভারতীয় নরনারীর বিঘ্ন-বৃদ্ধির

সামিল। এরা ইংরেজের ক্ষমতা, একতিয়ার আর প্রতিপত্তি বাড়াবার জবর যন্ত্র। তা ছাড়া ভারতে খাঁটি ইংরেজদের সংখ্যাও বাড়্‌বে।

লেখক—ভারতের ইংরেজদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কী?

সরকার—দুই কারণ। প্রথমতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে বহু-সংখ্যক ইংরেজ ফৌজ রাখ্‌বে। একদিকে বর্মা-চীন-তিব্বতের সীমানা মজবুদ করা হবে। আর একদিকে মজবুদ করা হবে আফগানিস্তান-ইরাণ-রুশিয়ার সীমানা। এই সামরিক কারণে খাঁটি ইংরেজ পল্টনের বহর ভারতের নানা কেন্দ্রে চূড়ান্ত বাড়্‌তির দিকে যেতে বাধ্য।

লেখক—দ্বিতীয় কারণ কী?

সরকার—ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রেল, খনি, বন, নদী, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, শাসন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক ইংরেজ "ওস্তাদ" বাহাল করা হবে। তারা ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেই ভারতীয় নর-নারীর ওপর কর্তৃত্ব কর্‌বে। ভারতের লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা ইংরেজ "এক্‌স্‌পার্ট"দের কুলী-কেরাণী হ'য়ে থাক্‌তে বাধ্য হবে। সকল দিক্‌ হ'তেই ভারতে ইংরেজের আধিপত্য বাড়্‌তির দিকে। সুতরাং ভারতবাসীর চিরবাঞ্ছিত স্বদেশী-স্বার্থ-পোষণকারী স্বদেশী গবর্মেন্টের টিকি দেখা যাবে না। শিশির মিত্র'র, আকাঙ্ক্ষা কাজে পরিণত হ'তে পার্‌বে না।

লেখক—জার্মাণরা হার্‌বে একথা ১৯৪০-৪১ সনেই আপনার মাথায় ঢুক্‌লো কী ক'রে? তখন তো তারা ফ্রান্স দখল ক'রে ইয়োরোপে দিগ্‌বিজয় চালাচ্ছিল!

সরকার—বিজলীর গতিতে লড়াই জেতা দেখে জার্মাণির সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হ'য়েছিল প্রবল। নেহাৎ অপদার্থ, শক্তিহীন, সুযোগহীন জাত্‌কে "ব্লিট্‌স্‌" (বিজ্‌লী) লড়াইয়ে চিৎ করা সম্ভব। কিন্তু যে-জাতের রসদ আছে, মাল-মশলা আছে যন্ত্রপাতির কারখানা আছে, টাকার জোর আছে তাকে ধাঁ ক'রে কুপোকাৎ করা সম্ভব নয়। সে-জাত জ্যুজুৎসুর প্যাঁচে ধপাস হ'তে পারে না। ধপাস্‌ হ'লেও আবার খাড়া হয়।

লেখক—কেন? এইরূপ প্রভেদ ক'র্‌ছেন কেন?

সরকার—সুযোগশীল, রসদশীল, যন্ত্রনিষ্ঠ, পুঁজিনিষ্ঠ জাত্‌ হয়ত লড়াইয়ের জন্য যোলআনা প্রস্তুত নয়। কিন্তু সময় পেলেই তোড়জোড় সম্পূর্ণ ক'রে সে আবার মাথা খাড়া ক'রে লড়ায়ের ময়দানে দাঁড়াতে পারে। "বিজ্‌লীওয়ালা" রাতারাতি দুনিয়া দখল কর্‌বার কায়দা নিয়ে চলাফেরা করে। কিন্তু ভারি-ভার্তিক জাত্‌ তার হাম্‌লায় দিশেহারা হয় না। তারা তাদের মালপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে এখান-ওখান থেকে লোকজন জোগাড় ক'রে যথাসময়ে বিজলীওয়ালাকে ঢিট্‌ কর্‌তে এগোয়। এই হচ্ছে বনেদি লোকের দস্তুর।

লেখক—পৃথিবীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক্‌তিয়ার বেড়ে যাবে বল্‌ছেন কেন?

সরকার—১৯৪১ সনের ১২ জানুয়ারি কমলালয় স্টোর্সের তদ্‌বিরে হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্ক্‌স্‌ খোলা উপলক্ষ্যে একটা সার্বজনিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ব'লেছিলাম—"বর্তমান লড়াইয়ে জার্মাণরা জিত্‌বে না। জিত্‌বে ইংরেজ। আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা বেড়ে যাবে,—প্রথমতঃ আফ্রিকায় আর দ্বিতীয়তঃ এশিয়ায়।" তখনও জাপান লড়াইয়ে নামে নি। আমেরিকাও নামে নি।

লেখক—আপনি কি বল্‌ছেন যে, আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ফ'লে যাচ্ছে?

সরকার—আফ্রিকাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি ইতিমধ্যেই বেড়ে গেছে। এশিয়ায় বৃটিশ এক্‌তিয়ার আজ জবরদস্ত আকারে দেখা যাচ্ছে ইরাকে, ইরাণে আর আরবে। সম্প্রতি

বর্মায় ইংরেজ আবার ঢুক্‌লো। মাণ্ডালে দখল হ'য়েছে। জাপানীরা যদি বর্মা পুরাপুরি ছেড়ে দেয় তা হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রথমতঃ ঢুক্‌বে শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডে আর দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে। ইংরেজরা একবার যেখানে ঢুকে যায় সেখানেই তাদের স্থিতি। ১৯৪১ সনের জানুয়ারির বক্তৃতায় এত সব কথা উহ্য ছিল।

লেখক—বর্তমান লড়াইয়ের চরম অবস্থা কিরূপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—ইয়োরোপের লড়াই আগে খতম হবে না, এশিয়ার লড়াইও পরে খতম হবে না। দুই লড়াইই খতম হবে এক সঙ্গে।

লেখক—ফলাফল কিরূপ? (পৃঃ ৮৪০)

সরকার—চরম অবস্থায়—অর্থাৎ সন্ধির সময়—ইংরেজরা জার্মাণদের বন্ধু থাক্‌বে। জাপানীদেরকেও ইংরেজরা বন্ধু ক'রে নেবে। রুশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্য আত্মরক্ষার জন্য জার্মাণিও জাপানের সাহায্য নিতে বাধ্য থাক্‌বে। তাতে জাপানেরও লোকসান নাই, জার্মাণিরও লোকসান নাই, বৃটিশ সাম্রাজ্যের তো লোকসান নাই-ই। মজার লড়াই। বুঝ্‌তে হবে যে, মারামারি-রক্তারক্তির যে-শর্তে খতম হয় ঠিক সেই শর্তে সন্ধির কাগজ সই হয় না। সন্ধির সময়ে অনেক নতুন-নতুন মাল ঢুকে যায়। কাজেই কাটাকাটির শেষ দেখে লড়াইয়ের চরম অবস্থা (অর্থাৎ সন্ধি-পত্র) আন্দাজ করা সম্ভব নয়। দুনিয়া বিচিত্র, জটিলতায় ভরা।

লেখক—এই চরম অবস্থা কি স্থায়ী অবস্থা?

সরকার—পৃথিবীর কোনো-কিছুই স্থায়ী নয়। বলছি শুধু যে, বর্তমান লড়াই-নাট্যের শেষ অঙ্ক হচ্ছে ইংরেজের দুস্তি জার্মাণির সঙ্গে আর জাপানের সঙ্গে। তার পাঁচ-সাত বৎসর পর কী হবে তার আলোচনা আলাদা।

লেখক—এই লড়ায়ের শেষ কবে? (পৃঃ ৮৪০)

সরকার—এখনো বোধ হয় বছর তিনেক। তার ভেতরই হয়ত রুশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিণ-ইংরেজ-জার্মাণ একসঙ্গে লড়াই চালাতে পারে। বর্তমান লড়াইয়ের শেষ অঙ্ক এখনো যাচ্ছে না।

ভারতের ভবিষ্যৎ (১৯৬৫)

২৮শে এপ্রিল ১৯৪৫

মন্মথ—আচ্ছা, এই ফাঁকে আপনাকে দিয়ে আবার দু-একটা ভবিষ্যবাণী করিয়ে নিই। বলুন তো শেষ পর্যন্ত ভারতের ভবিষ্যৎ কেমন দেখ্‌ছেন? হয়ত আগেই ব'লেছেন। তবুও শুনি।

সরকার—আজ ১৯৪৫-এর এপ্রিল তো? আগামী বিশ বছরের কথা শুন্‌তে চাও? প্রথমতঃ বল্‌ছি যে, আর্থিক হিসাবে অর্থাৎ কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের কোঠে ভারতীয় নারনারীর অবস্থা গড়-পড়্‌তা "কিঞ্চিৎ-কিছু" উন্নত হবে। দ্বিতীয় কথা,—সাংস্কৃতিক হিসাবেও— অর্থাৎ লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রে—ভারতবর্ষের লোকজন মাথা-পিছু "খানিকটা" উঁচিয়ে যাবে। কাজেই ১৯৬৫ সনের ভারতীয় আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা আজকালের তুলনায় ভালই,—অল্প-বিস্তর উল্লেখযোগ্য।

লেখক—তাহ'লে তো খুবই সুখের কথা?

সরকার—কিন্তু অপর দিকে ১৯৩৯-৪৫ সনের ছ-বছরে ইংরেজের আর্থিক ও সাংস্কৃতির অবস্থা "যারপরনাই" উঁচিয়ে গেছে,—আর আগামী বিশ বছরে অতি মাত্রায়" উঁচিয়ে যাবে। ভারতীয় উন্নতির চেয়ে "অনেক-গুণ" বেশী উন্নতি দেখা যাবে বিলাতী নরনারীর সমাজে। সুতরাং ইংরেজের মাপে ভারতীয় নরনারী ১৯৬৫ সনেও ১৯৪৫ সনেরই অধম, অক্ষম, অবল আর অসভ্য অবস্থায়ই র'য়ে যাবে। যাঁহা সুখ, তাঁহা দুঃখ। অতএব আপেক্ষিক হিসাবে ভারতের ভবিষ্যৎ সুখময় নয়।

লেখক—রাষ্ট্রিক হিসাবে ভারতের অবস্থা ১৯৬৫ সনে কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লি ইত্যাদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সংখ্যা প্রায় ডবল হবে। প্রত্যেক প্রদেশেই দেশী মন্ত্রীরাও গুন্‌তিতে বেড়ে যাবে। শাসন-বিভাগের ডিরেক্‌টার ইত্যাদি বড়-বড় চাক্‌রির সংখ্যা বাড়বে। তাতে হিন্দু-মুসলমানের ডজন-কয়েক লোক হোমরা-চোমরা হ'তে পারবে। হয়ত বা ভারতের নানা প্রদেশে গোটা কয়েক লাটসাহেবি পদও হিন্দু-মুসলমানের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

লেখক—তাহ'লে আর কী চাই?

সরকার—কিন্তু "খাঁটি" স্বরাজের টিকি দেখা যাবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ডমিনিয়ন অধিকার আজ ভারতের যত দূরে তখনও তত দূরেই থেকে যাবে। আর সত্যিকার স্বাধীনতা তো আলোচনার অন্তর্গতই নয়। স্বাধীনতার কথাটা ছিকেয় তুলে রাখ্‌লে সাধারণতঃ লোকের মনে বেশী কষ্ট হবে না। (পৃঃ ৮৩৬)

সাত কোটি জার্মাণ বনাম বিশ কোটি রুশ

লেখক—এইবার বর্তমান লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—জার্মাণির যান্ত্রিক আর আর্থিক ক্ষমতা আজও বিপুল। "ইচ্ছা কর্‌লে" জার্মাণরা এখনো তিন বছর—১৯৪৭-এর শেষ পর্যন্ত—লড়্‌তে পারে। জাপানের ক্ষমতাও ঠিক সেইরূপ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে হার্‌তে বাধ্য জার্মাণ আর জাপানী। এই ভবিষ্য-বাণী আমার পক্ষে নতুন-কিছু নয়। ১৯৪০ হ'তে ১৯৪৩ পর্যন্ত যত বই ও প্রবন্ধ লিখেছি তাতে জার্মাণি আর জাপানকে হারিয়ে ছেড়েছি।

লেখক—এই যুদ্ধের শেষ দেখ্‌ছেন কবে? (পৃষ্ঠা ৬৩৮)

সরকার—হিসাব ক'রে বল্‌তে হবে। ধরা যাক যেন,—মাঠে, দরিয়ার আর আশ্‌মানে লড়াই আজই শেষ হ'লো। কিন্তু সেটা যুদ্ধের শেষ নয়। কাগজে-কলমে সন্ধি সই করার অবস্থা আস্‌বে বছর তিনেক পর (১৯৪৭-৪৮)। এই যাত্রায় সন্ধির ব্যবস্থা করা অতি-জটিল সমস্যা। অনেকগুলা দেশের সীমানায় মীমাংসা করা আবশ্যক হবে। ১৯৪৭-৪৮-এর আগে এই লড়াইয়ের পাকাপাকি খতম দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে নানা-প্রকার হ-য-ব র-ল জুট্‌লেও জুট্‌তে পারে। তার জন্যেও মাঠে-দরিয়ায় আশমানে লড়াই চল্‌লে আশ্চর্যের কিছু নাই। হয়ত ইংরেজ ও মার্কিণ পল্টন জার্মাণ পল্টনের সাহায্যে রুশিয়াকে লিথুয়ানিয়া, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারে। কে জানে? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র (১৯৩৯-৪৮?) বড্ড ভ-

জ-ক-টয় পরিপূর্ণ।

লেখক—তাহ'লে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের শেষ ফলাফল কেমন মনে হচ্ছে?

সরকার—সাত কোটি জার্মাণ নরনারী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের অন্তর্গত হবে। ১৯১৯ সনের ভার্সাই সন্ধিতে বহুসংখ্যক জার্মাণ নরনারী ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের গোলাম ছিল। ১৯৪৮-এর সন্ধিতে কোনো জার্মাণ লোক আর বিদেশী রাষ্ট্রের গোলাম থাক্‌বে না। কাজেই লড়াইয়ে হেরেও জার্মাণরা সত্যি-সত্যি জিতে যাবে। অদ্ভুত কথা বল্‌ছি? (পৃঃ ৮০৮)

লেখক—এইরকম ঘটা সম্ভব কি?

সরকার—বৃটিশ সাম্রাজ্যের আত্মরক্ষার জন্য ইয়োরোপে শক্তিশালী আর ঐক্যবদ্ধ জার্মাণি আবশ্যক। ইংরেজের পক্ষে জার্মাণরা বেশী বিপজ্জনক না রুশরা বেশী বিপজ্জনক? এই হচ্ছে বর্তমানের সওয়াল। ১৯৩৯ সনের অবস্থা ইংরেজ জাত্ ভুলে গেছে। আজ ইংরেজরা ১৯৪৫ সনের অবস্থা মাফিক ব্যবস্থা করবে।

লেখক—সমস্যাটা কী?

সরকার—সাত কোটি জার্মাণ বনাম বিশ কোটি রুশ—এই সমস্যার সম্মুখে এসে পড়্‌লো ইংরেজ জাত। ইতিমধ্যেই বিশ কোটি রুশের "অতি-বৃদ্ধি" ঘ'টেছে। জার্মাণরা "কায়দা ক'রে" ইয়োরোপের অনেকগুলা দেশ রুশিয়ার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সেই সব দেশ রুশিয়ার গোলামে পরিণত হ'য়েছে। তারপর জাপান হার্‌বা মাত্র বিশ কোটি রুশের সাম্রাজ্য ধাঁ ক'রে ঢুকে পড়্‌বে এশিয়ার মঙ্গোলিয়ার, মাঞ্চুরিয়ায়, উত্তর চীনে আর কোড়ীয়ায়। এশিয়ায়ও বিশ-কোটিওয়ালী রুশিয়ার "অতিবৃদ্ধি" অবশ্যম্ভাবী।

লেখক—এই সমস্যার মীমাংসা কোথায়?

সরকার—বিশ-কোটিওয়ালী রুশিয়ার অতিবৃদ্ধি থেকে নিজকে বাঁচাবার জন্য ইংরেজ নরনারী ইয়োরোপে সাত-কোটি জার্মাণের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী দেশকে নিজেদের বন্ধু ও সহযোগী সমঝিতে বাধ্য হচ্ছে। জার্মাণির বন্ধুত্ব ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্য এশিয়ায় আর দুনিয়ার অন্যত্র টিক্‌তে পার্‌বে না। আমার বিবেচনায় এই হ'লো ১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসের ইংরেজ-চোখে দুনিয়ার হালচাল। (পৃঃ ৮৩৮)

লেখক—জাপানের ভবিষ্যৎ কেমন দেখ্‌ছেন?

সরকার—জাপান যেই হেরে যাবে,—অম্‌নি বৃটিশ সাম্রাজ্য জাপানের সঙ্গে সমঝৌতা আর বন্ধুত্ব কায়েম ক'র্‌বে। এশিয়ায় বিশ কোটি রুশের "অতিবৃদ্ধি" হ'তে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাঁচোআর জন্য অবশ্যম্ভাবী ইংরেজ-জাপানী মিলন-সন্ধি। অর্থাৎ দেখ্‌ছি একদিকে জার্মাণির সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধুত্ব, অপর দিকে জাপানের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধুত্ব।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, ইংরেজরা রুশিয়ার কমিউনিজ্‌ম্ ভয় করে?

সরকার—না। কোনো মিঞার কমিউনিজ্‌ম্ বা আর কোনো "ইজ্‌ম্" দেখে বৃটিশ সাম্রাজ্য ডরায় না। বর্তমানে ইংরেজদের ভয় প্রধানতঃ বা একমাত্র,—রুশ জাত, রুশ নরনারী,—রুশিয়ার সাম্রাজ্য, রুশিয়ার অতিবৃদ্ধি। (পৃষ্ঠা ৪৪৬, ৭৩০, ৭৩১)

লেখক—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কী বল্‌ছেন?

সরকার—১৯৪৭-৪৮-এর পর মার্কিণ জাতের সঙ্গে ইংরেজদের বনিবনাও বেশ-কিছু ক'মে আস্‌বে। ইংরেজ-জাপানী বন্ধুত্বের অন্যতম লক্ষ্য থাক্‌বে এশিয়ায় মার্কিণ জাতের নয়া নয়া এক্‌তিয়ার, আধিপত্য আর প্রভাব অর্থাৎ "অতি বৃদ্ধি" খানিকটা খর্ব করা।

অবশ্য মার্কিণের সঙ্গে বৃটিশের মারামারি-কাটাকাটির লড়াই অনেক দিন পর্যন্ত ঘ'ট্‌বার সম্ভাবনা নাই।

জার্মাণ ও জাপানীর সঙ্গে ইংরেজের বন্ধুত্ব অবশ্যম্ভাবী (১৯৫৩)

লেখক—আপনি এত সব আজগুবিও ভাব্‌তে পারেন?

সরকার—বৃটিশ সাম্রাজ্য যদ্দিন বেঁচে র'য়েছে তদ্দিন দুনিয়ার আন্তর্জাতিক লেনদেনকে অন্য কোনো গড়নে ঢালা অসম্ভব। ইংরেজ জাত জার্মাণির "অতিবৃদ্ধি" চায়না বটে, কিন্তু জার্মাণির মৃত্যু বা অপমৃত্যু বা অতি- দুর্বলতা তার পছন্দসই নয়। জার্মাণির শক্তিশালী সহযোগী ও সুহৃৎভাব চায় বৃটিশ সাম্রাজ্য। জার্মাণি হার্‌বা মাত্র "অতি-বৃদ্ধি" ঘ'ট্‌বে রুশিয়ার। কাজেই রুশিয়ার "অতি-বৃদ্ধি" ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত ইংরেজের সোআস্তি নাই। যেন-তেন-প্রকারেণ রুশিয়াকে ইংরেজের পক্ষে কাবু করা চাইই-চাই। এইজন্য অতি-জরুরি ইংরেজ-জার্মাণ বন্ধুত্ব আর ইংরেজ-জাপানী বন্ধুত্ব।

লেখক—মার্কিণ সম্বন্ধে ইংরেজের মনোভাব কিরূপ?

সরকার—বর্তমান যুদ্ধে ইংরেজরা দায়ে-প'ড়ে মার্কিণের "অতিবৃদ্ধি" ঘটিয়েছে। কাজেই যুদ্ধের শেষে যেন-তেন-প্রকারেণ মার্কিণ অতিবৃদ্ধি ভেঙে দেওয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের চরম স্বার্থ। জার্মাণি আর জাপান যদি বেশ-কিছু বড় আর শক্তিশালী থাকে,—অথচ "অতি-কিছু" না হয়—তাহ'লেই মার্কিণ ভায়ারা ইংরেজের সঙ্গে নরম সুরে কথা কইতে অভ্যস্ত হবে। এই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির মারপ্যাঁচ্‌।

লেখক—এত-সব আন্তর্জাতিক রদ-বদল, দৃশ্য-পরিবর্তন আর ওলট-পালট কবে আন্দাজ দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—ধ'রে নিচ্ছি যেন,—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র পাকাপাকি খতম কর্‌বার জন্য সন্ধি হ'লো ১৯৪৭-৪৮ সনে। তার বছর চার-পাঁচেক পর দুনিয়ার আন্তর্জাতিক গড়নটা দাঁড়াবে নিম্নরূপ ঃ—(১) রুশিয়ার বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের "খোলাখুলি শত্রুতার" আন্দোলন। সেটা অবশ্য "লড়াই" নয়। (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের "মন-কষাকষি" আর বনিবনাওয়ের অভাব। একে খোলাখুলি "শত্রুতা" বল্‌বো না। (৩) অ্যাংলো-জার্মাণ সম্‌ঝৌতা ও বন্ধুত্ব। এই জিনিষটা ঘ'টবে ভেতরে-ভেতরে অর্থাৎ খোলাখুলি নয়। (৪) অ্যাংলো-জাপানী সমঝৌতা ও বন্ধুত্ব। এটাও ভেতরে-ভেতরে গ'জে উঠ্‌বে, অর্থাৎ খোলাখুলি নয়। আমি ১৯৫২-৫৩ সনের আবহাওয়ায় এই ধরণের আন্তর্জাতিক গড়ন দেখ্‌তে পাচ্ছি। আজ থেকে সাত-আট বছরের ভেতর।

লেখক—তার অবস্থা কিরূপ?

সরকার—এই সব হচ্ছে তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের তোড়-জোড় মাত্র। সেটা হয় তো ১৯৭০-৭৫ সনে দেখা দিতে পারে। তখন অবশ্য কোন্‌ মিঞা কোন্‌ দিকে যাবে আজ বলা সম্ভব নয়। কেননা ১৯৫২-৫৩ হ'তে ১৯৭০-৭৫ সনের ভেতর আবার হরেক-রকমের ওলট-পালট অবশ্যম্ভাবী। তার জন্যে শেআনা রাষ্ট্রবীরেরা আজই তৈয়ের আছে। দুনিয়ার

আহাম্মুকরা তা বুঝ্‌বে না।

("বিনয় সরকারের বৈঠকে', প্রথম ভাগ "১৯৮০ সনের বাঙালী" ২৭২-২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নরেন লাহার বারান্দা

৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫

মন্মথ—নরেন লাহার বারান্দায় অনুষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক-বণিক্ বৈঠক-সমূহের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় কি?

সরকার—বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ আর বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষৎ আমাদের এই দুই পরিষদের সংবাদ বাংলা, ইংরেজি দুই কাগজেই ছাপা হয়। "আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষৎ" ইত্যাদি অন্যান্য পরিষদের কাজকর্ম লড়াইয়ের যুগে (১৯৩৯ সেপ্টেম্বর হ'তে) ধামা-চাপা র'য়েছে। আগে সেই সবের বৃত্তান্তও সর্বদাই ছাপা হ'তো।

লেখক—আপনার প্রবর্তিত এই পরিষৎ-সমূহের মেলামেশাকে বৈজ্ঞানিক-বণিক্ বৈঠক বল্‌ছেন কেন?

সরকার—এই পরিষদগুলার তদবিরে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা আলোচনা করে। বৈজ্ঞানিক শব্দে বুঝ্‌তে হবে যে-কোনো বিদ্যানুরাগী গবেষক। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাই একমাত্র বিজ্ঞান নয়। অধিকন্তু এই পরিষদগুলার ব্যবস্থায় চিকিৎসা, রসায়ন, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্যার প্রতিনিধিরাও হাজির থাকে।

লেখক—আপনার এই সকল ব্যবস্থায় বণিক্‌দের ঠাঁই কোথায়?

সরকার—বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদে চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তো আছেই। তা ছাড়া আছে সরকারী চাক্‌রেদেরও ঠাঁই। বস্তুতঃ কি ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ, কি সমাজবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রত্যেক পরিষদেই নানা প্রকার বিজ্ঞান-সেবকের সঙ্গে রকমারি বণিক্-বেপারী আর রকমারি সরকারী চাক্‌রে সর্বদা এক মজলিশে বসে। কোনো আলোচনাই একমাত্র বণিকশ্রেণীর মুড়ো দিয়ে চালানো হয় না।

লেখক—নরেন লাহার বারান্দায় এই ধরণের বৈজ্ঞানিক-বণিক্ বৈঠক কতদিন ধ'রে চল্‌ছে?

সরকার—'আর্থিক উন্নতি' মাসিক সুরু হ'য়েছে ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে। সেই সঙ্গেই সূত্রপাত ধনবিজ্ঞান-পরিষদের। এই বৈঠকে ১৯২৭ সনে ব্রজেন শীল ব'কে গেছেন মজুর ও মজুরি সম্বন্ধে। শিবচন্দ্র দত্ত প্রধান আলোচক ছিল। আর এই ক'দিন হ'লো, ইংরেজ চাষ-প্রেমিক এল্‌ম্‌হার্স্ট চালিয়েছেন বিলাতের মোসাবিদা-প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫)।

লেখক—নরেন লাহার বারান্দায় অনুষ্ঠিত প্রথম দিক্‌কার কোনো বৈঠক সম্বন্ধে কিছু মনে আছে?

সরকার—মনে পড়্‌ছে একটা বৈঠকের কথা। তখন অবশ্য নরেন লাহার বারান্দা নাম দেওয়া চল্‌তো না। কেন না তখন তাঁর বাবা আর দাদা সুরেন বেঁচে। এই আড্ডার

নাম ছিল সেকালে হৃষীকেশের রাজবাড়ী।

লেখক—কবেকার কথা বল্‌ছেন?

সরকার—১৯২৬-এর মাঝামাঝি। সে-বছর গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙে থাক্‌বার সময় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের চিঠি পাই যে, তাঁরা একটা ইংরেজি ত্রৈমাসিক চালাবেন। তার সম্পাদক হ'তে হবে এই অধমকে। তখনকার দিনে চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজা হৃষীকেশ।

লেখক—তাতে বৈজ্ঞানিক-বণিক্ বৈঠক কোথ্‌থেকে এলো?

সরকার—সেই সময়ে হৃষীকেশ তাঁর বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। দোতলার যে-ঘরে আর যে-বারান্দায় সেদিন নরেনের বৈঠক ব'সেছিলেন সেই ঘরে আর সেই বারান্দায়ই হৃষীকেশের বন্ধুরাও এসেছিলেন। হালের বৈঠকটার মতন হৃষীকেশের বৈঠকেও বৈজ্ঞানিক-বণিক্‌দের তর্কাতর্কি চ'লেছিল।

লেখক—কিছু মনে আছে?

সরকার—সেই সময় এই অধম মাত্র মাস সাত-আটেক হ'লো সাড়ে বার বছর বিদেশ-প্রবাসের পর দেশে ফিরেছে। ইয়োরামেরিকার তাজা-তাজা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যবিষয়ক তথ্য, তত্ত্ব ও সংখ্যা ছিল এই ক'-টা আঙুলের আগায় আর ঠোঁটে-চোখে-মুখে। ইতিমধ্যে নরেনের তদবিরে "আর্থিক উন্নতি"'র কয়েক সংখ্যা সম্পাদন ক'রেছিলাম। তা ছাড়া চেম্বারের ত্রৈমাসিক "জার্নালের" প্রথম সংখ্যার জন্য তোড়-জোড় চালাচ্ছিলাম।

লেখক—বৈঠকে কী হ'লো?

সরকার—এই অধমকে কেন্দ্র ক'রে চেম্বারের বণিকেরা দেশ ও দুনিয়া সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা চালিয়েছিলেন। মেঘনাদ, শিশির ও জ্ঞান সেদিন ইয়োরামেরিকায় নয়া-নয়া শিল্প-বিপ্লব সম্বন্ধে চড়া-চড়া কথা শোনালেন। সেই সবেরই রকমারি জুড়িদার গরম-গরম বাণী-বুখ্‌নি-বয়েৎ ঝাড়্‌তে হ'য়েছিল এই অধমকে ১৯২৬ সনে। সেই বাণী-বুখনি-বয়েৎগুলা বসে মেঘনাদ ইত্যাদির পাঁতিগুলার বড়্‌দা-বিশেষ।

লেখক—নরেন লাহার বারান্দায় অনুষ্ঠিত আর দু-একটা মজলিশের কিছু খবর দেবেন?

সরকার—"বঙ্গীয় দান্তে-সভা"'র কথা বল্‌ছি। বেশী পুরোণো ঘটনা নয়। ইতালিয়ান সংস্কৃতির চর্চা ছিল সেই বৈঠকের মুদ্দা।

লেখক—কবেকার খবর?

সরকার—১৯৩৮-এর নবেম্বর। তখনও বর্তমান লড়াই বাঁধ্‌তে মাস দশেক বাকী। সেই বৈঠকে ছিলেন নরেনই বাড়ীর কর্তা।

লেখক—তাতে কী হ'য়েছিল? ইতালিয়ানদের কে-কে উপস্থিত ছিল?

সরকার—ইতালিয়ানদের ভেতর ছিলেন কন্‌সাল-জেনার‍্যাল জ্যুরিয়াতি, কাউন্ট মিলেসি, ভারতশাস্ত্রী ডক্‌টর কারেল্লি, ডক্‌টর বক্কেত্ত, বেনাসালিঅ ইত্যাদি বণিক্-বৈজ্ঞানিকের দল। পেপ্লার ইত্যাদি নরেনের কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুও ছিল।

লেখক—আলোচনায় যোগ দিয়েছিল কে-কে?

সরকার—জজ চারু বিশ্বাস, অ্যাটর্নি যতীন বসু, হুমায়ুন কবির, জ্যুরিয়াতি, নরেন নিজে আর এই অধম।

লেখক—আর কোনো বাঙালী এসেছিল?

সরকার—সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তা কর্নেল অনিল চ্যাটার্জি, অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলি, দাঁতের ডাক্তার রফি আহম্মদ, চামড়া-রাসায়নিক বিরাদ দাশ, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন দাশগুপ্ত, অ্যাডভোকেট কেশব গুপ্ত, পালি-শাস্ত্রী নলিনাক্ষ দত্ত, ইতালি-শাস্ত্রী মণি মৌলিক, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার বাণেশ্বর দাশ, কাউন্সিলার নলিন পাল ইত্যাদি।

লেখক—"নরেন লাহার বারান্দা" নামটা সুরু হ'লো কী ক'রে?

সরকার—নরেনের বাবা আর দাদা যখন বেঁচে সেই সময়ে বাড়ীর নীচের তলার দক্ষিণ বারান্দায় পরিষদ্‌গুলার বৈঠক বস্‌তো। প্রথম-প্রথম (১৯২৬-২৯) গোল পাথুরে টেবিলের চার-দিকে বসা হ'তো। তারপর পশার বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফরাস পেতে "টোল" চালানো হ'তে লাগ্‌লো (১৯৩২-৩৯)। ক্রমশঃ মুখে-মুখে র'টে গেল,—"বিনয় সরকারের টোল" চ'ল্‌ছে "নরেন লাহার বারান্দায়"। কয়েক বছর ধ'রে বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকেছি।

লেখক—বৈজ্ঞানিক-বণিক্ বৈঠক কল্‌কাতার আর কোথাও বসে না কি?

সরকার—আজকাল কল্‌কাতার যেখানে-সেখানে ডজন-ডজন বৈঠক বসে। মজলিশের অন্ত নাই। কোনো কোনো বৈঠক বসে পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ীতে। নির্মলচন্দ্রের ঘরে বসে "শনিবারের বৈঠক।" তাঁর ছেলে প্রতাপ প্রাধান চাঁই। কোনো-কোনো মজলিশের জন্য সমিতি, সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। পূর্ণিমা-সম্মেলন চল্‌ছে, রবি-বাসর চল্‌ছে। তাছাড়া রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি সার্বজনিক পরিষৎও আছে।

লেখক—দু-একটা ঘরোআ বৈঠকের নাম কর্‌বেন?

সরকার—লাহা-পরিবারেরই কোনো-কোনো বাড়ীতে ঘরোআ বৈঠক আছে। পালি-ভক্ত বিমলা লাহা নরেনের মতন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বৈঠক বসাতে অভ্যস্ত। সেখানে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ লেখাপড়া সম্বন্ধীয় বাক-বিতণ্ডা চলে। "ইণ্ডিয়ান কালচার" নামক ত্রৈমাসিকও তার আছে। তার দাদা সত্যচরণও বৈঠকী লোক। সত্যচরণের হাতে "প্রকৃতি" মাসিক বেরুতো। তার সব-কিছুই পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিদ্যার মাল। সত্যচরণের পাখীর বাগানে বৈজ্ঞানিক মজলিশ ব'সেছে অনেকবার। বিমলা-সত্যচরণের বৈঠকে বণিকদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের মোলাকাৎ হয় কম। এবিষয়ে বোধ হয় নরেনের মেজাজ স্বতন্ত্র।

মে ১৯৪৫

বিক্রমপুর-সম্মিলনী

১ মে ১৯৪৫

সুবোধ—আপনি আবার বাঙাল হ'লেন কবে? দেখ্‌ছি বিক্রমপুর-সম্মিলনীর সভায়ও আপনার আনাগোনা আছে?

সরকার—কেন, কোথাও আবার কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি ক'রেছি না কি?

লেখক—আপনাকে মালদহের লোক ব'লে জানি চিরকাল। "কলিকাতায় মালদহ সমিতি"র প্রবর্তক আপনাকে বলে লোকেরা। ধাঁ ক'রে আপনি আবার "বিক্রমপুরের

পোলা" হ'লেন কোথ্‌থেকে? "বিক্রমপুরের মাপে" বাঙালী জাত্‌কে গ'ড়ে তুল্‌তে চাচ্ছেন আপনি। এ আবার কোন্ ঢঙের মতিগতি? দেখ্‌ছি "স্যারকারিজম্"-এর (১৯৩৯) এখনো নতুন-নতুন অধ্যায় লিখ্‌তে হবে।

সরকার—এসবের খবর জুট্‌লো কোথ্‌থেকে!

লেখক—কেন? সেদিন (২৫শে মার্চ) ইন্দুভূষণ সেন আর প্রশান্ত মহালানবিশের সংবর্দ্ধনা হ'লো বিক্রমপুর-সম্মিলনীর উৎসবে। ইন্দু হ'য়েছেন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট। প্রশান্ত পেয়েছেন বিলাতী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (সভ্য) পদ। এই জন্য হ'লো সভা মহাবোধি সোসাইটিতে। আর তাতে আপনাকে বক্তৃতা কর্‌বার জন্য ডেকেছিল। আপনি ব'লেছেন—"বিক্রমপুরের পোলারা বাঙ্‌লায় দিগ্‌বিজয়ী, ভারতে দিগ্‌বিজয়ী, দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়ী। বাঙ্‌লাদেশের প্রত্যেক জেলা আর প্রত্যেক পরগণাকে বিক্রমপুরের মাপে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। বিক্রমপুরের মাপকাঠি হ্চ্ছে বাঙালী জাতের উন্নত সম্বন্ধে আদর্শ মাপকাঠি।"

সরকার—ইন্দু সেন আর প্রশান্ত মহালানবিশের সম্বর্দ্ধনার দিন কোনো বক্তৃতা হয় নি। আমি ব'কেছি কে বল্‌লে? সেদিন বকাবকির ব্যবস্থা ছিল না। তবে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল। তাতে হিস্যা নিয়েছি জবরভাবে।

লেখক—সত্যি বল্‌ছেন আপনি বক্তৃতা করেন নি? আমি অবশ্য আজকাল রেলের চাক্‌রে হিসাবে বড্ড-বেশী ভবঘুরে ভাবে জীবন কাটাচ্ছি। সব খবর সঠিক পাই না। বলুন বিক্রমপুরের কাহিনীর কিছু। ফাঁক তালে কিছু শুনে নি।

সরকার—তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বল্‌ছি আমি তো বকিই নি। আর কোনো মিঞাও বকেনি। সাক্ষী আছে বেঙ্গল সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের যতীশ দাশ, গিরিশ-গবেষক হেমেন দাশগুপ্ত, অধ্যাপক জিতেন গুহ, মেয়ে ইস্কুল-কলেজের সরকারী পরিদর্শক সুনীতিবালা গুপ্ত, ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত, চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ, ব্যারিস্টার সত্যেন চ্যাটার্জি, প্রিন্সিপ্যাল অপূর্ব চন্দ ইত্যাদি অনেকে। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারিস্।

লেখক—সভাপতি কে ছিলেন? সম্পাদক ইত্যাদি কর্মকর্তা কে-কে?

সরকার—সভাপতি ছিলেন সত্যানন্দ বসু। কল্‌কাতার ডজন-ডজন প্রতিষ্ঠানের ইনি সম্পাদক। এই সম্মিলনীর সম্পাদক হচ্ছেন প্রফুল্ল বসু। ইনি আর্যস্থানের বীমা-কর্মী। কর্মকর্তা "বিক্রমপুরের ইতিহাস"-লেখক যোগেন গুপ্ত।

লেখক—তা হ'লে বাজারে রট্‌লো কী ক'রে যে, আপনি সেই সভায় বিক্রমপুরের মাপে বাঙালী জাত্‌কে জরীপ ক'রেছেন? তাছাড়া বোলচালগুলা শুনে মনে হ'লো বিনয় সরকারী বুখ্‌নি বটে। এই দিক্ দিয়ে "সার্‌কারিজম্" বইটা বাড়ানো আবশ্যক মনে হ'য়েছে।

সরকার—ওঃ, মনে প'ড়েছে। এই বছরই (১৯৪৫) জানুয়ারি মাসের ১৪ই তারিখে একটা সভা ব'সেছিল। মহাবোধি সোসাইটিতেই বিক্রমপুর-সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন জজ্ সুধীররঞ্জন দাশ। তাতে এই অধমকে ক'রেছিল "প্রধান অতিথি"। সেই সভায় ব'ক্‌তে হ'য়েছিল বটে।

বিক্রমপুরের মাপে বাঙালী চলুক বাড়্তির পথে

লেখক—কী ব'কেছিলেন মনে আছে?

সরকার—বিলকুল মনে নেই।

লেখক—"বিক্রমপুরের মাপ" শব্দটা ব্যবহার করেন নি?

সরকার—অসম্ভব নয়। তবে ওসব হচ্ছে আমার আটপৌরে কথা। জানিসই তো বাঙালী জাত্‌কে জরীপ করি আমি নানা উপলক্ষ্যে নানা কায়দায়। সাংস্কৃতিক, আত্মিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক,—রকমারি জরীপ চালানো আমার পেশা। এই অধমের পক্ষে সংখ্যা নাড়াচাড়ি করা লেখাপড়ার বা অনুসন্ধান-গবেষণার ডালভাত বিশেষ। কাজেই বাঙালীর মাপে দুনিয়াকে অথবা দুনিয়ার মাপে বাঙালীকে জরীপ করা আমার আবহাওয়ায় লেগেই আছে। জাপানী মাপে, বিলাতী মাপে, ভারতীয় মাপে, মারোআড়ি মাপে,—কোন্ মাপেই বাঙালী জাত্‌কে পরখ্ ক'রে দেখি নি? সুতরাং বিক্রমপুরের মাপে বাঙালী জাত্‌কে বাজিয়ে দেখার কথা হয়তো জানুয়ারি মাসের সেই জল্‌সায় পেড়েছি।

লেখক—বলুন তাহ'লে দু'এক কথায় বিক্রমপুরের মাপটা কী?

সরকার—অতি-সোজা। আজ বাঙলাদেশে র'য়েছে ছয় কোটি নরনারী। ধরা যাক্ যেন এই দেশের জেলা-সংখ্যা ত্রিশ। সহজে বুঝবার জন্য ত্রিশ বল্‌ছি। ঠিক সংখ্যা দিচ্ছি না। তাহ'লে জেলায় গড়পড়্‌তা লোকসংখ্যা দাঁড়ায় কত?

লেখক—বিশ লাখ।

সরকার—বেশ। কোনো জেলায় অবশ্য লাখ দশেক,—কোনো জেলায় লাখ চল্লিশেক। ধ'রে নিলাম প্রত্যেক জেলায় গড়ে নরনারীর সংখ্যা ২০ লাখ।

লেখক—বেশ তো। তারপর কী বল্‌ছেন?

সরকার—বিক্রমপুর ঢাকা জেলার একটা পরগণা। ধরা যাক্ যেন ঢাকা জেলার আধা-আধি লোকের বাসস্থান বিক্রমপুর।

লেখক—তাই সই। বিক্রমপুরের বাঙালদের সংখ্যা ১০ লাখ ধ'রে নেওয়া গেল। এখন কী করতে বল্‌ছেন? নিশ্চয় যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ কর্‌তে বল্‌বেন। অঙ্কে আমি পণ্ডিত নই কিন্তু!

সরকার—বুঝা যাচ্ছে যে, গুন্‌তিতে "বিক্রমপুইরা" বাঙাল গোটা বাঙালী জাতের ষাট ভাগের এক ভাগ মাত্র। অর্থাৎ ফি ষাট জন বঙ্গচন্দ্রের ভেতর মাত্র একজন হচ্ছে বিক্রমপুরের বাঙালী।

লেখক—তাতে হ'লো কী?

সরকার—মনে করা যাক্ যেন,—তামাম বাঙ্‌লাদেশে বাঙালীর বাচ্চারা ষাট্‌টা আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কায়েম ক'রেছে। প্রতিষ্ঠানের মতন প্রতিষ্ঠান। অথবা ষাটটা আন্দোলন চালাচ্ছে। এমন আন্দোলন যা "ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া" চলে। অথবা ষাটটা "বাপ কা বেটা" পায়দা ক'রেছে। "লোকে যারে নাহি কর্‌ছে। ধ'রে নিচ্ছি যেন ছয় কোটি বাঙালীর জাত্ এই গোটা ষাটেক প্রতিষ্ঠান, গোটা ষাটেক আন্দোলন আর গোটা ষাটেক পুরুষ-নারীর দৌলতে দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয় চালাচ্ছে।

লেখক—ধ'রে নেওয়া গেল। কী বলতে চাচ্ছেন?

সরকার—তাহ'লে বিক্রমপুরের হিস্যায় পড়ে একটা মাত্র বাঙালী প্রতিষ্ঠান, একটা

মাত্র বাঙালী ব্যক্তি (পুরুষ বা মেয়ে), একটা মাত্র বাঙালী আন্দোলন। বুঝ্তে হবে যে, যদি তামাম বাঙ্লাদেশের চৌহদ্দির ভেতর মাত্র একটা ক'রে বিক্রমপুইরা প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও ব্যক্তি থাকে তা'হলেই বাঙালী হিসাবে "বিক্রমপুইরা পোলা"র ইজ্জদ রক্ষা পেতে পারে। এরি নাম বাঙালী মাপে বিক্রমপুরকে চুম্‌রে নেওয়া অথবা বিক্রমপুরের মাপে বাঙালী জাত্‌কে জরীপ করা। বিচার-প্রণালী খুবই সহজ-সরল।

লেখক—শেষে পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কী?

সরকার—যার চোখ যেমন সে তেমন চোখ নিয়ে বাঙালা দেশটা জরীপ ক'রে বেড়াক। দেখ্‌তে পাবে যে, কল্‌কাতায় আর মফস্বলে "বিক্রমপুইরা পোলারা" ষাট জন বাঙালীর বাচ্চার ভেতর মাত্র এক জন নয়,—বোধ হয় দশ জন। বিক্রমপুরের লোকের তৈরি প্রতিষ্ঠান ষাটটা বাঙালী প্রতিষ্ঠানের একটা মাত্র নয়—বোধ হয় দশটা। আর বিক্রমপুরের বাঙালীদের চালানো আন্দোলন ষাটটা বাঙালী আন্দোলনের একটা মাত্র নয়,—বোধ হয় দশটা। কোনো ক্ষেত্রেই বিক্রমপুর বাঙলা দেশের ষাট ভাগের এক ভাগ নয়,—বোধ হয় ছয় ভাগের এক ভাগ।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, বিক্রমপুরের আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক কাজ-কর্ম বাঙালী জাতের সমবেত কাজ-কর্মের ষষ্ঠাংশ? অথচ বিক্রপুরের লোকসংখ্যা বাঙালীজাতের যাটা ভাগের এক ভাগ মাত্র?

সরকার—অবিকল তাই বল্‌ছি। ঠারে-ঠোরে হিসাব চালানো গেল। দৃষ্টান্তের খাতিরে ব'লে দিলাম ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি দশ ভাগের এ ভাগও হয় তাতেও বঙ্গ-সমাজে আর বঙ্গ-সংস্কৃতিতে বিক্রমপুরের দান খুবই উঁচু দরের দাঁড়িয়ে যাবে। কেন না নাক-গুন্‌তিতে বাঙালীজাতের ষাট ভাগের এক ভাগ মাত্র হচ্ছে বিক্রমপুরের বাঙালীরা। নজর রাখ্‌তে হবে অনুপাতটা দিকে।

লেখক—অতএব কী বল্‌ছেন?

সরকার—সোজা কথা। বাঙলাদেশের প্রত্যেক জেলা আর প্রত্যেক পরগণা বা মহকুমাকে বিক্রমপুরের মাপে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। বিক্রমপুরের মাপে বাঙালী জাত্‌ চলুক বাড়্‌তির পথে। বাপ্‌কা বেটা বাঙালীরা প্রত্যেক জেলায় "বিক্রমপুইরা বাঙালের গোঁ" নিয়ে জীবন সুরু করুক। গড়-পড়তা বাঙালীর কাছে বিক্রমপুইরা পোলার নতুন-কিছু শিখ্‌বার নেই। গড়-পড়তা বাঙালীর বাচ্চারা বিক্রমপুরের বাঙালীকে আদর্শ ক'রে আর্থিক, রাষ্ট্রিক আর সাংস্কৃতিক কর্মক্ষেত্রে চলা-ফেরা কর্‌তে শিখুক। এরি নাম বিক্রমপুর-মাহাত্ম্য।

লেখক—বিনয়-সরকারী দর্শনের (সার্‌কারিজ্‌মের) এই সকল দিক আমার জানা ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণে ঢোকাতে হবে।

বাঙালী-মাপে বিক্রমপুর খাটো

সুবোধ—গড়-পড়্‌তা বাঙালীর কাছে বিক্রমপুরে একদম কিছুই শেখ্‌বার নেই? এত উঁচুতে বিক্রমপুর?

সরকার—বাঙালী জাত আজ পর্যন্ত বিক্রমপুরকে মাত্র দুটা কর্মক্ষেত্রে হারাতে পেরেছে। বাঙালী-মাপে বিক্রমপুর ঐ দুই হিসাবে বেশ-কিছু খাটো। বিক্রমপুর সকল

বিষয়েই উঁচু বা সেরা নয়। আহাম্মুকের মতন যা-তা বল্‌লে চল্‌বে না।

লেখক—মজার কথা। শুনি সেই কর্মক্ষেত্র দুটা কী। কোন্-কোন্ বিষয়ে বিক্রমপুর সেরা নয়?

সরকার—সুকুমার সাহিত্যের কথা বল্‌ছি। বিক্রমপুরের পোলারা এখনো রবির মতন কবি পায়দা কর্‌তে পারেনি,—বঙ্কিমের মতন গাল্পিক খাড়া কর্‌তে পারেনি—আর গিরিশের মতন নাট্যশিল্পীও ঝাড়তে পারেনি। এই দুর্বলতাটা মারাত্মক।

লেখক—অপর কোন্ কর্মক্ষেত্রে বিক্রমপুরের বাঙালরা সার্বজনিক বাঙালী মাপে খাটো?

সরকার—রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম হয় নি বিক্রমপুরে। আর বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ'র মতন বাপকা বেটাও জন্মে নি বিক্রমপুরে।

লেখক—সার্বজনিক বাঙালীর কাছে এই দুই কর্মক্ষেত্র ছাড়া বিক্রমপুরের শিখ্‌বার কিছু নাই বল্‌ছেন। অবাঙালী ভারতের কাছে বিক্রমপুরের শিখ্‌বার কিছু আছে?

সরকার—না। অবাঙালী ভারতের কোনো দশ লাখ নর-নারীর পরগণা বা জেলা বিক্রমপুরকে কোনো কর্মক্ষেত্রে হারাতে পার্‌বে কি না সন্দেহ।

লেখক—তা হ'লে বিক্রমপুর শিখ্‌তে পারে কার কাছে? কোথায়? বিক্রমপুর কি দুনিয়ার সেরা?

সরকার—কে বল্‌ছে বিক্রমপুব দুনিয়ার সেরা? বিক্রমপুরের বাঙালরা শিখ্‌তে পারে বিলাতে ইংরেজের কাছে, জার্মাণিতে জার্মাণের কাছে, ফ্রান্সে ফরাসীর কাছে, আমেরিকায় মার্কিণের কাছে, জাপানে জাপানীর কাছে, রুশিয়ায় রুশের কাছে: ইত্যাদি।

"মালদা ভোলা অসম্ভব"

লেখক—তা হ'লে বিক্রমপুর দুনিয়ার সেরা নয়? যা-হ'ক, বাঁচা গেল! বাপ্‌রে! আচ্ছা বলুন তো আপুনি নিজকে বিক্রমপুরের লোক বলেন, না মালদহের লোক বলেন?

সরকার—সাদাসিধে ভাবে আগে ব'লে থাকি মালদার লোক। যদি কেহ খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে তাহ'লে বলি বিক্রমপুরের লোক। এই হচ্ছে দস্তুর।

লেখক—এই ধরণের প্যাঁচালো জবাব কেন?

সরকার—মালদায় আমার জন্ম। বিক্রমপুরে জন্ম আমার বাপ্-মার। ভাইয়েদের ভেতর বিজয়ের জন্ম মালদায়, ধীরেনের কল্‌কাতা (কালীঘাটে)।

লেখক—এই প্রভেদ? তাতেই আপনি নিজকে ভারতের সেরা জনপদ বিক্রমপুরের লোক বল্‌তে অ-রাজি? একমাত্র জন্মের খাতিরে মালদহ আপনাকে বিক্রমপুর থেকে টেনে নিচ্ছে?

সরকার—মজার কথা বল্‌ছি। আমার মেয়ে (ইন্দিরা) বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজবের সময় বিক্রমপুরের মেয়ে ব'লে নিজের পরিচয় দেয়!

লেখক—কেন? ইন্দিরার জন্ম তো ইতালিতে? মা তো জার্মাণ? ইতালির সেই অঞ্চল তো এখন জার্মাণির দখলে?

সরকার—তবে আর মজা কাকে বলে? ও কখনো নিজকে মাল্‌দার মেয়ে বলে না।

আশ্চর্যের কথা।

লেখক—মালদহ আপনার জন্মভূমি। এই জনাই মালদহের প্রতি আপনার টান এত বেশী? না আর কোনো কারণ আছে?

সরকার—মালদার লোকজনের সঙ্গে আমার হাড়-মাস মাখানো র'য়েছে। মালদার পোদ্দার, সাউ, চুনিয়া, নুনিয়া, কাঁসারি, পাঝ্‌রা, মহলদার ইত্যাদি জাতের ছোক্‌রারা আমার পরম আত্মীয়। আমার জীবনের আসল ভিত্‌ এদের ভেতর র'য়েছে। রক্তের যোগ, নাড়ীর যোগ, আঁতের যোগ মালদহীয়াদের সঙ্গে অতি-নিবিড়। মাল্‌দার নামে আমার জিহ্বের জল পড়ে।

লেখক—কবিতা আওড়াচ্ছেন নাকি?

সরকার—মালদার কোনো ছেলে-বুড়ো আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে আস্‌লে আমার সমস্ত শরীর-মন-প্রাণ চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। মালদার কথা উঠ্‌বামাত্র আমার চোখে একটা নতুন আলো জ্বলে, আর মুখে আপনা-আপনিই একটা আনন্দ প্রকাশ পায়,—এই কথা ব'লেছে অনেকবার আমার স্ত্রী ও মেয়ে। কী করা যাবে? এর নাম যদি কবিতা হয় তো কবিতাই ব'ক্‌ছি।

লেখক—আপনাকে যদি কেহ বলে যে, আপনাকে হয় মালদহ ভুল্‌তে হবে, না হয় বিক্রমপুর ভুল্‌তে হবে। তা হ'লে আপনি কী কর্‌বেন?

সরকার—আগে বল্‌বো যে, বিক্রমপুরও ভুলতে রাজি নই। মালদাও ভুল্‌তে রাজি নই। কিন্তু জোরজবরদস্তির ফলে যদি একটা ভুল্‌তে বাধ্য করানো হয়, তাহ'লে বিক্রমপুর ভুল্‌তে রাজি আছি। সাজানো মালদা ভুল্‌তে পারবো না। তাহ'লে যে আমাকে ১৯০৫-১৪ ভুলতে হয়। মালদা ভোলা অসম্ভব।

লেখক—যাহ'ক, এইবার "সার্‌কারিজ্‌ম্‌" সম্বন্ধে একটা জবর খবর পাওয়া গেল। দেখ্‌ছি কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পড়্‌লো। ভাব্‌ছিলাম বল্‌বেন,—"বিক্রমপুর ভুল্‌তে পারবো না"। জবাব পেলাম "মালদা ভোলা অসম্ভব"। আপনার সাধের বিক্রমপুরও বিনা বাক্যব্যয়ে বর্জন কর্‌তে পারেন?

সরকার—দুনিয়ায় অনেক আজ্‌গুবি চলে।

লেখক—আল্‌টপ্‌কা ভাবে—আর একটা কথা জেনে নি। বলুন তো কল্‌কাতা ছাড়া আপনি বাঙ্‌লাদেশের কোন্‌ পল্লীতে বা শহরে চিরকাল বাস ক'র্‌তে পারেন? বিনয়-সরকারী দর্শনের আরও দু-একটা "চিচিঙ ফাঁক" হ'য়ে যাক। "সার্‌কারিজ্‌ম্‌" বইটার দ্বিতীয় সংস্করণে এই সব ঢুকে যাবে।

সরকার—কোথ্‌থাও না। আমার পক্ষে চিরকালের জন্য পল্লীবাসী হওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া বাঙ্‌লা দেশের এমন কোনো শহর নেই যেখানে এই অধম চিরকাল বাস কর্‌তে পারে। মেজাজটা আমার বড্ড-বেশী শহর-নিষ্ঠ। তাছাড়া মহা-শহরের বাইরে আমার দম্‌ আট্‌কে যায়। চাই বিপুল শহর।

লেখক—বাঙলাদেশের বাইরে কোনো ভারতীয় শহরে চিরকাল কাটাতে পারেন?

সরকার—স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৪) মনে হ'তো যেন বোধ হয় মারাঠাদের পুণা শহরে বসবাস করা চল্‌তে পারে। কিন্তু একালে আর সে বাতিক নেই। আজকাল আমি অতি-মাত্রায় বঙ্গ-চন্দ্র। সকলেই জানে যে, অবাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে মাখামাখি আমার খুব-বেশী। কাশীর শিবপ্রসাদ ছিল আমার "ভাইয়া"। বিহারের "ভাইয়া রাজেন্দার"

ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মারোআড়িদেরকে আমি বাঙালী স'ম্‌ঝে থাকি। তারাও আমার "ভাইয়া"। কিন্তু তবুও অবাঙালী ভারতীয় শহরে চিরকাল বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই অধম হচ্ছে "পাঁড় বাঙালী"।

নিউইয়র্ক, প্যারিস বার্লিন ও তোকিও বনাম লন্ডন, রোম, মস্কো ও পিকিঙ

লেখক—ভারতবর্ষের বাহিরে যদি কোথাও চিরকাল থাক্‌তে হয় তাহ'লে কোন্ দেশে থাক্‌তে পারেন? "সারকারিজ্‌ম্" বুঝ্‌বার জন্য এই কথাটাও জানা আবশ্যক।

সরকার—এই প্রশ্নটা জবরদস্ত্। আগে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি,—আমার রাহা-খরচ আর খাই-খর্চা দেবার ব্যবস্থা আছে তো?

লেখক—ধরুন। চিরজীবন প্রবাসে কাটাবার জন্য আপনার খরচ-পত্র সব-কিছু পেয়েছেন। তাহ'লে কোন্ দেশে চিরকাল কাটাতে চান?

সরকার—নিউইয়র্ক, প্যারিস ও বার্লিন। এই তিন শহরের যে-কোনোটায় আমার চির-প্রবাস সম্ভব। ওখানকার লোকজন ঠিক যেন আমার বাঙালী ভাই-বোন্। তোকিওতে সম্ভব হ'তো যদি জাপানী ভাষাটা দখলে থাক্‌তো। মার্কিণ, ফরাসী, আর জার্মাণের মতন জাপানীরাও আমার পছন্দসই।

লেখক—আপনি তো ইতালিয়ান ভাষা জানেন। রোমে চির-প্রবাসী হ'তে চান না? আপনার মেয়ের জন্ম তো ইতালিতে?

সরকার—না। রোমে চিরকাল কাটানো সম্ভব নয়। মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা চল্‌তে পারে।

লেখক—লন্ডনে চিরকাল কাটাতে পারেন না? সেখানে তো ভাষা-সমস্যা নাই।

সরকার—না। তবে বিলাতের লোকগুলা ভাল। লন্ডনের সঙ্গে আনাগোনা আমি সর্বদাই পছন্দ করি।

লেখক—মস্কোর দিকে আপনার মেজাজ যায় না?

সরকার—আমি কখনো রুশিয়ায় থাকি না। যাওয়া-আসা কর্‌তে আপত্তি নাই। অধিকন্তু আমার ইচ্ছা,—আমাদের দেশের লোকেরা অনেকে গিয়ে রুশিয়ায় প্রবাসী হোক,—কম-সে-কম ঘুরা-ফেরা করুক,—রুশ ভাষাটা দখলে আনুক। কিন্তু আমার পক্ষে মস্কোয় চিরজীবন কাটানো অসম্ভব।

লেখক—চীন দেশে চিরকাল কাটাতে পাবেন? পিকিঙ্ কিম্বা শাংহাই কেমন পছন্দ হয়?

সরকার—কোনো মতেই না।

লেখক—চিরজীবন কাটাবার জন্য নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন আর তোকিও বেছে নিচ্ছেন কী জন্যে?

সরকার—মার্কিণ, ফরাসী, জার্মাণ ও জাপানী মাপে বাঙালী জাত্‌কে চাব্‌কিয়ে বড় ক'রে তুল্‌বার জন্য। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভাঙে।

কুনীতি, নর্দমা, অপরাধ

৩মে ১৯৪৫

সুবোধ—আপনার বিরুদ্ধে একটা সার্বজনিক নালিশ আছে জানেন?

সরকার—আমার বিরুদ্ধে তো কত নালিশই থাক্‌তে পারে? শুধু একটা কেন? কোন্‌টার কথা বল্‌ছিস্‌?

লেখক—বাজারের লোকেরা ব'লেছে অনেকবার যে, বিনয় সরকার কখনো কোনো লোকের, প্রতিষ্ঠানের বা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে শেখেনি। লোকটা দেশ-বিদেশের নর-নারীকে শুধু প্রশংসা ক'রেই ম'লো! এই সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—এই নালিশটার মানে কী?

লেখক—জনসাধারণের মত হ'চ্ছে—আপনি মানব-চরিত্র বুঝেন না। দুনিয়ার লোক এক-তরফা সুখ্যাতির পাত্র নয়। তাদের দোষও আছে বিস্তর।

সরকার—এই "মহাসত্যটা" আবিষ্কার কর্‌বার মতন লোক দুনিয়ায় হাজার-হাজার। এমন-কোনো ম্যাড়াকান্ত নেই যে পৃথিবীর সব-কয়টা লোকে সাধু-চরিত্র স'ম্‌ঝে সংসার চালায়। কোনো-না-কোনো হিসাবে "চরিত্রহীন" নরনারী হচ্ছে,—দুনিয়ার রামা-শ্যামা-আব্‌দুল-ইস্‌মাইল হ'তে হোমরা-চোমরা-পীর-পাঁড়-মহাবীর-মহাত্মারা সবাই। সকলেই তা জানে। "কসুর"-হীন মানুষ নাই।

লেখক—তাহ'লে আপনি তের-খণ্ডে সম্পূর্ণ "বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর (১৯১৪-৩৫) হাজার-পাঁচেক পৃষ্ঠার ভেতর কোনো বিদেশী লোকের বা প্রতিষ্ঠানের একটা মাত্র কু-ও দেখান নি কেন? "সারকারিজম্‌" (১৯৩৯) বইটা লিখ্‌বার সময় অপনার এই অসম্পূর্ণতা অনেকবার মনে প'ড়েছে।

সরকার—দুনিয়ার নর-নারীর পাপ আর কু-গুলা আমার মেজাজে প্রথম স্বীকার্য। তার প্রমাণ দরকার হয় না। সাধুগুলাও জোচ্চোর আর জোচ্চোরগুলাও সাধু—এই হচ্ছে আমার আটপৌরে মানব-দর্শন। অপরাধ-বিজ্ঞানের আলোচনায় এই হ'লো বনিয়াদ। কাজেই কোনো লোকের দোষ-বিশ্লেষণ করা আমার পেশায় দাঁড়ায় নি। জুচ্চরি আর বাটপাড়ি অতি সনাতন ও সার্বজনিক মাল। এই সকল পাপ-জাতীয় সাওদার বেপারী আমি নই।

লেখক—আপনার দস্তুর কী?

সরকার—সব সময়েই ধ'রে নিই যে, পুরুষ ও স্ত্রীগুলা মানুষ নামক জানোআরের বাচ্চা। এরা তথাকথিত দেব-দেবী নয়। এরা রক্তমাংসের বোঁচ্‌কা। জানোআরের রকমারি কু অবশ্যম্ভাবী। সেই সব হরেক-রকম কু-য়ে মানব-চরিত্র গঠিত। মানুষগুলা জ্যান্ত নর্দমা বিশেষ। পাপে আর কুনীতিতে ভরা দুনিয়ার প্রত্যেক পুরুষ আর প্রত্যেক স্ত্রী। নর্দমার বা আঁস্তাকুড়ের নোংরা জঞ্জাল ঘাঁটা-ঘাঁটি কর্‌লে দুর্গন্ধ বেরুতে পারে মাত্র। ও-পথ মাড়ানো আমার দস্তুর।

লেখক—আপনি দুর্নীতির বিশ্লেষণ এড়িয়ে যেতে চান?

সরকার—সেই দুর্গন্ধে নাক গুঁজ্‌তে না যাওয়াই ভাল। এই হচ্ছে আমার মতি-গতি। পাপ-বিজ্ঞানের, নর্দমা-বিজ্ঞানের, কুনীতি-বিজ্ঞানের, অপরাধ-বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

লেখক—"বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী ছাড়াড় অন্যান্য বইয়ে—ইংরেজিতে আর

বাংলায়—আপনি মানুষের চরিত্র নানা ভাবে বিশ্লেষণ ক'রেছেন। আপনার মোলাকাৎ-গুলার ভেতরেও দেশী-বিদেশী, বাঙালী-অবাঙালী, ভারতীয়-অভারতীয় বহু স্ত্রী-পুরুষের কাজ ও চিন্তা আলোচিত হ'য়েছে। এই সকল আলোচনায় আপনি পাপ, কুনীতি, নর্দমা, আঁস্তাকুড় ও অপরাধগুলা এড়িয়ে চ'লেছেন?

সরকার—নিশ্চয়। নর্দমা বা আঁস্তাকুড় ঘেঁষে চলা এই অধমের দস্তুর নয়। বাঙালী-অবাঙালী নর-নরনারীর নর্দমাগুলা, "কুসুরু"গুলা, দুর্নীতিগুলা, কু-গুলা আমার প্রত্যেক আলোচনায়ই উহ্য থাকে। মানুষের জীবনে আমি দেখি একমাত্র কাজ-কম্ম,—কাজ-কর্মের আকার-প্রকার আর কাজ-কর্মের বহর। অনীতি, কুনীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি নর্দমার মাল সম্বন্ধে আমার বক্তব্য চেপে রাখি। কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লেও জবাব দিতে রাজি হই না।

কাম, কাঞ্চন, কীর্তি ও কাজ-কর্ম

লেখক—কাজ-কর্ম ছাড়া কি মানুষের আর কিছু নাই?

সরকার—আছে বৈ কি। মানুষমাত্রকে আমি প্রধানতঃ চার শক্তির বোঁচ্‌কা সম্‌ঝে থাকি। মানুষের রক্ত-মাংস চলে এই চার শক্তির জোরে। চার রকমের প্রেরণা, আকাঙক্ষা, চাহিদা হামেশা দেখ্‌তে হবে প্রত্যেক লোকের জীবনে।

লেখক—কী-কী সেই চার শক্তি বা প্রেরণা?

সরকার—প্রত্যেক মানুষই প্রথমতঃ কাম-শক্তির জানোআর। তার দ্বিতীয় শক্তি হচ্ছে কাঞ্চন। তৃতীয়তঃ মানুষ মাত্রেই কীর্তিশক্তির জানোআর অর্থাৎ যশের ও সুখ্যাতির আশায় চলে। চতুর্থ শক্তি হচ্ছে কাজ-কর্ম। বিনা কাজ-কর্মে মানুষ থাক্‌তেই পারে না। কাজের নেশা, কাজের আনন্দ, কাজের অহঙ্কার প্রত্যেক মানুষেরই রক্তের সঙ্গে ভাস্‌ছে।

লেখক—এই চার শক্তি কি প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে সমান?

সরকার—রাধামাধব। তাহ'লে দুনিয়ার দুশো' কোটি পুরুষ ও স্ত্রী এক ঢঙের লোক হ'য়ে পড়্‌তো। তা নয়। কাম, কাঞ্চন, কীর্তি ও কাজ-কর্ম এই চার শক্তির মাত্রা হিসাবে মানুষগুলা পৃথক্-পৃথক্।

লেখক—পৃথিবীর লোকেরা একরূপ নয়?

সরকার—মাত্রাগুলা অগণিত। কাজেই শক্তিগুলার যোগাযোগ আর সমাবেশও রকমারি। সত্যি কথা,—দুশো' কোটি পুরুষ-নারী দু'শো কোটি আলাদা-আলাদা জানোআর। অথচ প্রত্যেক মানুষ-জানোআরের মগজে আর কলিজায় এমন কি হাত-পায়েও কামও আছে, কাঞ্চনও আছে, কীর্তিও আছে আর কাজ-কর্মও আছে। এই হচ্ছে আমার মেজাজ-মাফিক ব্যক্তিগত চিত্ত-বিজ্ঞান বা সামাজিক চিত্ততত্ত্বের বনিয়াদ।

লেখক—এই চিত্তবিজ্ঞানের কথা বল্‌ছেন কেন?

সরকার—বল্‌ছি এই জন্য যে, কোনো লোকজনের সম্বন্ধে বকাবকি কর্‌বার সময় আমি কাম, কাঞ্চন আর কীর্তি এই তিন শক্তির খেলা বাদ দিয়ে যাই। আলোচনা করি একমাত্র কাজ-কর্ম।

লেখক—একটু বস্তুনিষ্ঠভাবে বলুন না?

সরকার—কোনো বিজ্ঞানবীরের কথা উঠ্‌লে আমি ব'লে থাকি যে,—লোকটা সাত-সাতটা গবেষণা ক'রেছে অথবা গোটা পাঁচেক আবিষ্কারের জন্য নামজাদা। স্বদেশসেবক

সম্বন্ধে বলি যে, তিনটা হাসপাতাল কায়েম ক'রেছে,—দুটা পুকুর কাটিয়েছে ইত্যাদি। দেশহিত-বিষয়ক কাজ-কর্মের ফিরিস্তি দিয়েই আমি খালাশ। এইরূপ হচ্ছে আমার রেওয়াজ কবি সম্বন্ধে, ফকীর সম্বন্ধে, গায়ক সম্বন্ধে, কারবারী সম্বন্ধে, অর্থাৎ সকলের সম্বন্ধেই।

অপরাধ-বিজ্ঞান

লেখক—তাহ'লে বিজ্ঞানবীর, স্বদেশ-সেবক, দার্শনিক, বণিক, চিত্রশিল্পী ইত্যাদি লোকজনের সম্বন্ধে আপনি কোন্-কোন্ কথা বাদ দিয়ে যান?

সরকার—"অপরাধ"গুলা, জুচ্চরিগুলা, বাটপাড়িগুলা, পাপগুলা, দোষগুলা বাদ দিয়ে যাওয়া আমার দস্তুর। বিজ্ঞানীবীরটা, দর্শনবীরটা অনকে সময়ে পরের টাকা লুটে খায়। এই টাকা লোটার সন্ধান নিতে আমার নজর যায় না। স্বদেশসেবক বাবাজীরা তাদের পরিবার ও পাড়ার লোকের সঙ্গে অনেক সময়েই মানুষের মতন ব্যবহার কর্‌তে অভ্যস্ত নয়। সেই বিষয়ে-আমার আলোচনা চলে না। নাম-কে-বাস্তে বহুৎ লোক দাতা হয়। এই দুর্বলতার কথা আমি বিশ্লেষণ করি না। অসংখ্য লোকের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন ক'রে বেপারী-ব্যাঙ্কার বাহাদুরেরা টাকার বাজারে নেপোলিয়নী করেন। এসব অপরাধও আমি খতিয়ে দেখি না। মানুষের হাড়-মাসে কাম-কাঞ্চন-কীর্ত্তির দাগ, পশুত্বের চিহ্নোৎ আছেই-আছে। নর্দমা, জঞ্জাল, আঁস্তাকুড় ছাড়া মানুষের রক্ত-মাংস হয় না। অপরাধ-বিজ্ঞান, (কৃমিনলজি) বিদ্যার আলোচনায় এই সব অ-আ-ক-খ বিশেষ। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে দোষ বা কসুরগুলার আলোচনা অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থাৎ বাজে কথা।

লেখক—আপনি তো সংস্কৃতি-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়েছেন। এই সবের ভেতর নর্দমা, আঁস্তাকুড়, অপরাধ, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান একদম আলোচিত হয় নি? তাহ'লে আপনার আলোচিত বিজ্ঞানগুলা অসম্পূর্ণ নয় কি?

সরকার—রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক ভাবে অল্পবিস্তর অপরাধ-বিজ্ঞানের (কৃমিনলজির) চর্চা ক'রেছি। তার ভেতর মানবজীবনের নর্দমা, পাপ ও কু-গুলার বিশ্লেষণ আছে। তবে বেশী-বেশী আলোচনা নাই। তার জন্য স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ আবশ্যক।

লেখক—কোন্-কোন্ বইয়ে অপরাধ-বিজ্ঞানের গবেষণা পাওয়া যায়?

সরকার—"পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স ১৯০৫" বইটা চার খণ্ডে বেরিয়েছে। প্রথম খণ্ডের তারিখ ১৯২৮ (মান্দ্রাজ)। অপর তিন খণ্ড বেরিয়েছে লাহোরে (১৯৪২)। অপরাধ ও শাস্তি সম্বন্ধে নানা আলোচনা আছে। কিন্তু পাপ, "কসুর", কুনীতি, দুর্নীতি, আঁস্তাকুড় ইত্যাদির বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত এই চার খণ্ডে বোধ হয় দেওয়া হয়নি।

লেখক—বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কোন্ বইয়ে?

সরকার—"ভিলেজেস অ্যান্ড টাউন্‌স্ অ্যাজ্ সোশ্যাল প্যাটার্নস্" (কলিকাতা ১৯৪৩) বাইয়ের জায়গায়-জায়গায় মানুষের পাপ ও কু-গুলা দেখানো আছে। তবে এই কু-গুলা সম্বন্ধে আল্‌গা গবেষণা চালানো খুবই জরুরি। এই ক্ষেত্রের আলোচনায় তথ্যনিষ্ঠ আর সংখ্যানিষ্ঠ ঢাউস-ঢাউস বই বেরিয়ে এলে ভাল হয়। আমার পক্ষে এই দিকে বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হয় নি। অপরাধ-বিজ্ঞানের চর্চায় অনেক গবেষক লেগে গেলে খুশী হবো।

ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

বিনোদবিহারী চক্রবর্তী-প্রণীত "আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্‌" বইয়ের ভূমিকা

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

বৎসর সাত-আট হইল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্তী প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম বীরপুরুষ লিওনিদাস সম্বন্ধে একখানা ছোট বই লিখিয়াছিলেন। আলোচনার বস্তু ছিল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় গ্রীক-পারশিক লড়াই বিষয়ক। বইটা পড়িয়াই বলিয়াছিলাম,—"রচনায় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইতেছি। লিখিবার ভঙ্গীতে জীবন ব্যাখ্যা করিবার ওস্তাদি ধরিতে পারা যায়। এই কৌশলের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে অনেক হইলে আনন্দের কথা হইবে। বিদেশী লোকজন ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে মাথা খেলাইবার দৃষ্টান্ত হিসাবেও এই পুস্তিকা সবিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"

তাহার পর বিনোদবিহারী বাংলা সাহিত্যে দেখা দেন "রেগুলাস" নামক গ্রন্থের প্রণেতা রূপে। রেগুলাস ছিলেন কার্থেজের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইয়ের সময়ের রোমান কন্‌সাল্‌ ও সেনাপতি। সে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝির কথা। এই বইয়েও লেখক খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য ও জীবন-বৃত্তান্তের ভিত্তির উপর বীরবরের চরিত্রও ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একদিকে দেখিতেছি কার্থেজের নর-নারীর ধরণ-ধারণ, অপর দিকে প্রকাশ পাইতেছে রোমান স্বদেশ-সেবকের চিত্তবৃত্তি। কোনো নাট্যকারের হাতেও রেগুলাসের কর্ম ও চিন্তা আরও বেশী উজ্জ্বলরূপে বিশ্লেষণ্‌ করা সম্ভবপর হইত না। জীবনী পড়িতে-পড়িতে পাঠকের গ্রন্থকারকে অপূর্ব উপন্যাসের লেখক রূপে সম্বর্দ্ধনা করতে বাধ্য হইবেন।

এইবার প্রকাশিত হইতে চলিল বর্তমান যুগের অন্যতম বীরের কাহিনী। কাল উনবিংশ শতাব্দী। স্থান আমেরিকা। পাত্র আব্রাহাম্‌ লিঙ্কল্‌ন্‌। এই বইয়ে গ্রন্থকার নতুন এক কায়দা দেখাইয়াছেন। লিঙ্কল্‌ন্‌ নিজেই যেন নিজের জীবনী বিবৃত করিয়া যাইতেছেন, —ইহাই বর্তমান গ্রন্থের রচনা-কৌশলে। বলা বাহুল্য এই লিখনরীতি সোজা নয়। একজন বিদেশী বীরপুরুষকে দিয়া তাঁহার নিজের মুখে আত্মকাহিনী প্রচার করানো অতি উঁচু দরের সাহিত্য-সাধনায়ই সম্ভবপর হয়। ঠিক যেন কাল্পনিক কথোপকথন লেখা! তাহাতে শিল্পনৈপুণ্যের দরকার হয় প্রচুর। এই সকল তরফ্‌ হইতে বিনোদবিহারীর "আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্‌" বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ। অধিকন্তু জীবনী-রচনায় গ্রন্থকার যে-তথ্যানুরাগ, বস্তুনিষ্ঠা, চিত্ত-বিশ্লেষণ এবং সহজ সরল প্রকাশরীতি দেখাইলেন তাহা বহু শিল্প-নিপুণ সাহিত্য-সাধকের চিন্তায়ই অমূল্য বিবেচিত হইবার কথা।

ঠিক এই প্রণালীতেই বিনোদবিহারী আর একখানা বই লিখিয়াছেন। তাহাও মার্কিণ বীরের জীবনী। এই বীরের নাম "গারফীল্ড"। গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

বিনোদবিহারী দেখিতে-দেখিতে চারখানা জীবনচরিত লিখিলেন। প্রত্যেক চরিত্র-কথায়ই আমরা শক্তিযোগী কর্মবীর,—মানুষের মতন মানুষ—পাইতেছি। এই ধরণের মানুষ গড়িবার প্রার্থনাই চিল বিবেকানন্দের প্রার্থনায়। লেখক মানুষগুলাকে জ্যান্ত রক্তমাংসের জীব-রূপেই আমাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে জোর আসিল। বাঙালীর চিন্তাকে কর্মনিষ্ঠায় আর কর্তব্যজ্ঞানে ভরপুর করিয়া তোলাও গ্রন্থকারের অন্যতম কৃতিত্ব

রহিয়া গেল।

বাংলাদেশে আজ জর্জ ওআশিংটনের জন্য স্মৃতি-পরিষৎ কায়েম হইতেছে। বাঙালী জাতির সঙ্গে ইয়াঙ্কি নরনারীর নিবিড়তম লেনদেন সুরু হইবার সুযোগ দেখা যাইতেছে। এই আবহাওয়ায় বিনোদবিহারীর "আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্" আর "গারফীল্ড" বেশ সময়োপযোগী সাহিত্য সন্দেহ নাই।

কোথায় গ্রীক-ইতিহাস, কোথায় রোমান কাহিনী, আর কোথায় মার্কিণ কথা! এই তিন যুগের বিভিন্ন জগতের নরনারী সম্বন্ধে যুবক-বাংলার সাহিত্যসেবী "জলের মতন" অনায়াসে লিখিয়া যাইতে পারে। এই দৃশ্য বাঙালীর ইতিহাস অতি মহত্ত্বপূর্ণ। আর এই লেখাও কেমন? ঠিক যেন লেখক তাঁহার নিজ বন্ধুরই সুপরিচিত জীবনের অলিগলি খুলিয়া ধরিয়াছেন। বুঝিতেছি—যুবক-বাংলার চিন্তাশীল মহলে বিশ্বশক্তির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কায়েম হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের উপর বিনোদবিহারীর দাগ মুছিয়া যাইবে না।

জানুয়ারি ১৯৩৩

রেজাউল করিম-প্রণীত "ফরাসী বিপ্লব" বইয়ের ভূমিকা

১ জানুয়ারী ১৯৩৩

এই কেতাবের যে-কোনো দুই পাতা উল্টাইলেই যে-কোনো পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, রেজাউল করিম সুলেখক। অধিকন্তু ইয়োরামেরিকার গোড়ার কথা তাঁহার কব্জার ভিতর আছে। কেবল তাহাই নয়। সেই সকল কথা তিনি যে-কোনো লোককে সম্ঝাইয়া দিতেও সুপটু।

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা পড়িয়া দেখিবার সুযোগও আমার জুটিয়াছে। একস্থানে তিনি "জাতীয়তা গঠনে হজরত মোহম্মদের" কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আরএক উপলক্ষ্যে তিনি "নয়া ভারতের ভিত্তি" দেখাইয়াছেন। সর্বত্রই তাঁহার মাথায় সমাজ ও রাষ্ট্র লইয়া চিন্তা করবিার ক্ষমতা দেখিতে পাই। সর্বত্রই তাঁহাকে ভাবুকতাময় শক্তিশালী সাহিত্যের স্রষ্টারূপে স্পর্শ করিতেছি।

যুবক মুসলমানের নিকট হইতেও বাংলা সাহিত্য এই সকল সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হইতেছে,—এই কথাটার কিম্মৎ খুব বেশী। ১৯০৫ সনের পরবর্তী যুগে বাঙালী জাতি যে-সকল কারণে নানা প্রকারে দৌলতমন্দ্ হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতর বাঙালী মুসলমানের শক্তি একালের নয়া বাঙ্লায় কর্মযোগের অপূর্ব বনিয়াদরূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। তাহাতে হিন্দু বাঙ্লার কোমরও যারপর নাই দৃঢ়তা লাভ করিতেছে। বাঙ্লার নরনারী এক নবীন গৌরবের যুগে পা ফেলিতে চলিল।

বিদেশে থাকিবার সময় কাজি নজরুলের কবিত্বকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা লাইপৎসিগ, ১৯২২) গ্রন্থে তাহার চিহ্নোৎ আছে। ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিবার পর,—"আর্থিক উন্নতি" মাসিক সম্পাদনের সংস্রবে তাহের উদ্দিন আহম্মদকে সহযোগী রূপে পাইয়াছিলাম। রবার্ট ওয়েন,

লুই ব্লাঁ ইত্যাদি বিষয়ক তাঁহার লেখা রচনায় এবং অন্যান্য প্রবেন্ধে একটা নবশক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল। অকাল মৃত্যুর দৌরাত্ম্যের তাহেরের নিকট হইতে বাংলা অর্থ-সাহিত্য অল্প-কিছু মাত্র লাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আছে তাজা চোখ আর বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে আদর্শ-নিষ্ঠার মেলমেশ।

আবার দেখিতেছি রফিদিন আহম্মদ কলিকাতায় ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে গ্রন্থ-পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া যুবক বাঙ্‌লার শক্তিযোগের ক্ষেত্র বাড়াইয়া দিতেছেন। এদিকে কয়েক বৎসর ধরিয়া "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র তদ্‌বিরে বিজ্ঞান কে বিজ্ঞান, দর্শন কে দর্শন, ইতিহাস কে ইতিহাস, সাহিত্য কে সাহিত্য, সকল ধারায়ই মুসলমানের চিন্তা ফুটিয়া উঠিতেছে। আর সেদিন প্রাচীন কবি কায়কোবাদের বক্তৃতায় যে-সুর শুনিলাম (২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩২) তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত শক্তি-গঠিত নয়া বাঙ্‌লার পূর্বাভাষই সূচিত হইতেছে। রেজাউল সেই নয়া বাঙ্‌লারই "বিশ্ব-শক্তি"-সেবী সাহিত্য-সাধক।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় যুবক বাঙ্‌লার নিকট অতি প্রিয়। প্রায় একশ' বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতির লেখক-পাঠকেরা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে জীবন গড়িয়া চলিয়াছেন। বিদেশী হইলেও ফরাসী বিপ্লব বাঙালীর নিকট বাহিরের জিনিষ নয়,—ইহা আমাদের অতিমাত্রায় ঘরের কথা। কিন্তু রেজাউল করিমের এই ক্ষুদ্র রচনায় ফরাসী বিপ্লব যে-ব্যাখ্যা লাভ করিল তাহা হইতে যুবক বাঙ্‌লা ইতিহাসের সোআদ, সমাজ-দর্শনের সোআদ, স্বদেশ-সেবার কর্মকৌশল, আর রাষ্ট্র-গঠনের কর্মকৌশল বেশ-কিছু নয়া-নয়া আকারে দক্ষ করিতে পারিবে।

গ্রন্থকার ওস্তাদির সহিত ঐতিহাসিক তথ্যের নিরেট রূপ-রস খুলিয়া ধরিয়াছেন। বিশ্বশক্তির আলোচনায় রেজাউল করিম সুপথে চলিতেছেন। যুবক বাঙ্‌লায় এই সুপথের পথিক জুটিবে ঢের।

ডিসেম্বর ১৯৩৪

রাধেশচন্দ্র রায়-প্রণীত "যন্ত্রযুগের নেপোলিয়ন হেনরী ফোর্ড"-বইয়ের ভূমিকা

২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৪

জীবন চরিত-লেখায় বাঙালী পাকিয়া উঠিতেছে। জীবন হইতে জীবন আমদানীত করিবার ব্যবসায় বাঙালী লেখকদের ওস্তাদি বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। একালের বাঙালী জীবনচরিত-লেখকের জীবন গড়িবার কর্ম-কৌশলে সুপটু।

এই বইয়ে শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র রায় জীবনের হাটে-বাজারে সওদাগরি করিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনায় পাকড়াও করিতেছি জীবনী-শক্তির কেন্দ্রে-কেন্দ্রে চলাফেরা করার অভ্যাস। বইটার ভিতর তিনি বাঙালী জাতির ছেলে-বুড়োকে আর মেয়ে-পুরুষকে গড়িয়া-পিটিয়া খাড়া করাইবার যন্ত্রপাতি বিস্তর আনিয়া হাজির করিয়াছেন। নয়া বাঙলার নরনারী "হেন্‌রী ফোর্ড"-কেতাবের গ্রন্থকারকে বাঙালী জাতির অন্যতম গঠনকর্তারূপে,

সম্বর্দ্ধনাযোগ্য বিবেচনা করিবে।

হেন্‌রী ফোর্ড মার্কিণ বীর, একালের ইয়াঙ্কিস্থানের প্রতিনিধি,—জবরদস্ত প্রতিনিধি। মার্কিণ বাচ্চাদের ভিতর সেকালের হুইট্‌ম্যান যে চীজ্‌, একালের ফোর্ড সেই চীজ্‌,—অবশ্য নিজনিজ কোঠের ভিতর। উভয়েই মার্কিণ অত্মার বিপুল মূর্তি। হুইট্‌ম্যান খাইয়া বাঙালী জাতি বাড়্‌তির পথে আগুআন হইয়াছে। কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় সেই বাড়্‌তির চিহ্নোৎ দেখিতে পাই। রাধেশচন্দ্রের ফোর্ড খাইয়াও বাঙালী জাতি বাড়তির পথেই আরও আগুআন হইতে পারিবে।

ইতিমধ্যে সাহিত্য-শিল্পী, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী "আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন" ও "জেমস্‌ গারফীল্ড" বইয়ে দুই-দুইটা মার্কিণ কর্মবীরকে বাঙালীর পাতে-পাতে পরিবেষণ করিয়া যুবক বাঙলার জীবনে শালশা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। বাঙালী জাতির জীবন-স্পন্দনে আমেরিকার দান অসীম। রাধেশচন্দ্রও আমেরিকাকে দুহিয়া বঙ্গজননী পুষ্টিসাধন করিলেন।

যুবক বাঙলার পাঠশালায়-পাঠশালায় কবি হেমচন্দ্রের

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়;
হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্য বলে
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়"

অরণ্যে রোদনে পরিণত হয় নাই। জয় হেমচন্দ্রের জয়। আর জয় একালের যুবক বাঙলার।

হেন্‌রী ফোর্ড যন্ত্রবীর। যুবক বাঙলার রক্ত চায় একালের যন্ত্রপাতির শালশা। সেই শালশাও রাধেশচন্দ্র বাঙালী সমাজে প্রচুর পরিমাণেই বাঁটিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বইটার আগাগোড়া লোহা-লক্কড়ের গীতা বিশেষ। এই শালার সুফল অল্পকালের ভিতরই বঙ্গ-সাহিত্যে আর বঙ্গ-সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে।

হেনরী ফোর্ড মোটর-বীর। একালের দুনিয়ায় যে-সকল শক্তির দৌলতে নতুন ঢঙের শিল্প-যুগান্তর,—"দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব",—সাধিত হইতেছে, সেই শক্তিসমূহের আবহাওয়ায় দেখিতে পাই নয়া-নয়া যানবাহন আর নয়া-নয়া সড়ক,—বিজলীর তেজ আর মোটর গাড়ীর দিগ্‌বিজয়। সেই নয়া যানবাহনের অন্যতম জগদ্‌গুরু বা যুগ-প্রবর্তক ঋষি এই মার্কিণ বীর ফোর্ড। আর তাঁহারই মর্মবাণী, কুলের কথা, ঘরের কথা আর ভিতরকার কথা কায়দা করিয়া নিংড়াইয়া বাহির করিয়াছেন বাঙালী বাধেশচন্দ্র। "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের" অন্যতম জন্মদাতাকে যে-লেখক বাঙালী সমাজের ঘরে-ঘরে পরিচিত করাইয়া দিলেন সেই লেখককে বাঙালী জাতি বড় শীঘ্র ভুলিবে না।

হেনরী ফোর্ড "যুক্তিবীর"। "র‍্যাশন্যালিজেশন" বা "যুক্তি-যোগ" ফোর্ডের শ্বাস-প্রশ্বাস বিশেষ। কারখানা চালাইবার কাজে বাজে খরচ নিবারণ করিতে সে ওস্তাদ। মজুর-কেরাণীর হাড়মাসের অপব্যবহার বা দুর্ব্যবহার নিবারণ করিতে সে ওস্তাদ। বাজারে মাল ফেলিবার ব্যবসায় আর দোকানদারিতে পয়সার অপব্যয় ও সময়ের অপব্যয় নিবারণ করিতে সে ওস্তাদ। এই সকল বরবাত-নিবারণের কর্ম-কৌশলে একালে "র‍্যাশনাল" বা "যুক্তিনিষ্ঠ" উপাধি লাভ করিয়াছে। "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের" এক বড় খুঁটাই হইল এই

"যুক্তিনিষ্ঠা"। রাধেশচন্দ্র যুক্তিযোগের অন্যতম অবতারকে বাঙালী চাষী-বণিক-শিল্পীর দুয়ারে-দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিলেন। বাঙলার নরনারী তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিল।

হেন্‌রী ফোর্ড মজুর-কেরাণীদের সুখ-দুঃখে দরদী বেপারী-বীর। মজুর-কেরাণীর শক্তি-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা সাধনের কাজে ফোর্ডের মগজ খেলিয়াছে বিস্তর। মেহনতের "তঙখার" হার বাড়াইয়া ফোর্ড-প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার শিল্প-সংসারে সফলতার নতুন পথ দেখাইয়া দিয়াছে। অধিকন্তু পাড়াগাঁয়ের চাষীর কাজ-কর্মের সঙ্গে শহুরে কারবারের সহযোগ কায়েম করাও ফোর্ডের কর্মনীতির মস্ত কীর্তি। হেনরী ফোর্ডের জীবনী-লেখক বাঙালী জাতির নিকট সমাজ-সংস্কারের নানা পথ খুলিয়া ধরিলেন। নয়া মজুর-সেবকেরা, চাষী-সেবকেরা, মধ্যবিত্ত-সেবকেরা আর পল্লী-সেবকেরা গ্রন্থকারের নিকট অনেক তাজা-তাজা হদিশ পাইবেন।

রাধেশচন্দ্র পাকা লেখক। লোহালক্কড়কে দিয়া কথা কওয়াইবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। ফোর্ড-জীবনের ঘটনাগুলাকে তিনি সাজাইয়াছেন নিজের খেয়াল মাফিক। আর আসল কথা,—লেখকের পাল্লায় পড়িয়া হেনরী ফোর্ড নিজ জীবনের নানা কথা বাঙলার নরনারীর নিকট খুলিয়া ধরিতে বাধ্য হইয়াছেন। জীবন-চরিত রচনার এই কায়দায় রাধেশচন্দ্র বিনোদবিহারী কর্তৃক প্রবর্তিত পথের পথিক। এই পথ পাঠক মাত্রকে পুলকিত করিবে।

মার্চ ১৯৪৩

আশুতোষ ঘোষ-প্রণীত "ভাবধারা"-বইয়ের ভূমিকা

৯ মার্চ ১৯৪৩

হাজার-ভুজা বাঙালী জাতি অনেক-কিছু ভাঙিতেছে, আবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক-কিছু গড়িতেছে। এই ভাঙা-গড়ার ভিতর আশুতোষ ঘোষ ঢুঁড়িতেছেন জ্যান্ত-তাজা কর্মযোগের হদিশ।

লেখক রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের পথ-ঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল। বিবেক-অভেদকে তিনি শক্তি-যোগের ও স্বদেশ-যোগের ঋষি সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ডুবুরি হিসাবে তিনি তুলিয়াছেন "শিশুমন থেকে আরম্ভ ক'রে মানব-মনের প্রত্যেক স্তরের" শিল্প-বিশ্লেষণ, আর আবিষ্কার করিয়াছেন "জীবনের পরিপূর্ণতার" পথ। "পৃথিবীতে ভাগবত-জীবন প্রতিষ্ঠা" হইতেছে তাঁহার বিচারে অরবিন্দ-দর্শনের আসল মুদ্দা। তাহা ছাড়া তিনি "সাহিত্যিক কবি সুরশিল্পী দিলীপকুমারে"র হাতে "জড়ধর্মী মনের একটা নূতন বনেদ গ'ড়ে তোলার" বাস্তুশিল্প পাকড়াও করিয়াছেন।

তেত্রিশ পৃষ্ঠার রচনা,—কিন্তু যারপরনাই শাঁশাল। চিন্তাগুলা বলিষ্ঠ। লেখাটা গোঁজামিলশূন্য, নিরেট ও সরল। লেখকের বাহাদুরি তারিফযোগ্য। চোখ আছে। বাজে মালের দিকে নজর নাই। প্রাণটা দরদশীল ও আন্তরিকতাময়।

বিশেষ আনন্দের কথা,—আশুতোষ তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার খপ্পরে পড়িতে রাজি নন। তাঁহার ভাবধারা, মানব-নিষ্ঠ, জীবন-নিষ্ঠ ও বর্তমান-নিষ্ঠ।

এ-কালের বঙ্গ-সংস্কৃতির যাচাই করিতে-করিতে তিনি ভবিষ্যতের জন্য আশা ছড়াইতেছেন। তাঁহার মগজের প্রধান ধান্ধা ঃ—"ভারতের অবনতি কেন হইল?" তাঁহার প্রাণের কথা ঃ—"সে-জাতির ধ্বংস কোথায়?" বেশ প্রশ্ন, বেশ জবাব।

যুবক বাঙ্‌লার অন্যতম বিচক্ষণ প্রতিনিধির সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের বাড়্‌তি উপভোগ করিতেছি।

সেপ্টেম্বর ১৯১৬

বাঙালী *

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬

(১)

দেশ্‌টা যাদের নয় অন্যদেশের চেয়ে
　　বেশী সুন্দর কিম্বা বেশী সুষমার খনি,
অন্য জাতের চেয়ে নয় নরনারী যার
　　বেশী সুশ্রী, বেশী সাধু কিম্বা গুণী,—
জেনে-শুনেও এসব যারা ভালবাসে
　　তাদের নিজের নদী-খাল নিজের ভাইবোন্‌
সেই বাঙালী পাঁচকোটি লোক মোরা
　　ইংরেজ, ইতালিয়ান বা ফরাসী জাতের মতন।

(২)

বাদামী রঙের বেঁটে লোকের গাত্র
　　খানা রাখে যেথায় ভূমণ্ডলের ঐ নগাধিরাজ,
গর্জে ধরার ভীষণতম সাগর
　　যার পদতলে শিখাতে ভাঙাচুরার কাজ,—
কাল-বৈশাখীর প্রলয়-নাচন বছর-বছর
　　পল্লী-শহরের উড়ায় ঘরবাড়ী যেথায়

---

* জাপানের তোকিওয় থাকিবার সময় বিনয় সরকার এই কবিতা লিখিয়াছিলেন। তারিখ ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬। রচনাটা ১৯৪১ সনের মার্চ মাসে "মৌচাক" পত্রিকায় প্রথম ছাপা হইয়াছে। প্রকাশের পূর্বে কবি হেমেন্দ্রবিজয় সেন ছন্দটা দুএক স্থানে "মেরামত" করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শব্দগুলা বেশী বদলাইতে দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য পত্রিকায় এবং স্বতন্ত্রভাবেও এই কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙালী জাতি সম্বন্ধে বিনয় সরকারের যেরূপ মতিগতি ছিল ১৯৪২-১৯৪৫ সনে প্রকাশিত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থেও সেইরূপ মতিগতিই দেখা যাইতেছে।

কবিতাটাকে বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকা বিবেচনা করা যাইতে পারে অথবা শেষ সিদ্ধান্তে রূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে। ইহার ভিতর "বিনয় সরকারের বঙ্গদর্শন" সূত্রাকারে পাওয়া যাইতেছে।

ইতি

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশক।

জলে-ভরা পাহাড়-ঘেরা আর গ্রীষ্ম-বর্ষায়
ভিজা-পোড়া জঙ্‌লা বাংলা দেশে সেথায়।

(৩)

মোলায়েম কল্পনায় দুর্বলের সম
স্বপ্নে মাতে না যারা অতীত্-ভবিষ্যের,
দারিদ্র্য যাদের সর্বপ্রধান বিঘ্ন
শিক্ষার, স্বাস্থ্যের আর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের,
পরাজয়ে ডর নাই যাদের, আশা নাই বুঝে
তবুও কর্তব্য করে দিবায়-নিশায়,
ভারতের প্রাণ এশিয়ার মান ছড়ায় যারা
আলাস্কা, তুর্কী, আফ্রিকা, ফ্রান্স, চীন, আর্জেণ্টিনায়,
বিশ্বের জ্ঞান হজম করা, আর বাড়িয়ে দেওয়া
বিশ্বশক্তি যারা বুঝে আসল জীবন
আধ্‌পেটা-খাওয়া ডান্‌পিটে সেই বাঙালী
মো'রা জ'ন্মেছি কর্‌তে অসাধ্য সাধন।

(''দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাঙালীর বাড়্‌তি'' ২৬শে জুন ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৬৯০-৬৯১ দ্রষ্টব্য)

নির্ঘণ্ট